শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সংখ্যা - ১ - ৩২,
৩৭ - ৫২

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমসাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

ত্রয়োবিংশ বর্ষ

(বঙ্গাব্দ ১৩৫১ শ্রাবণ হইতে আষাঢ় ১৩৫২)

সম্পাদক

মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

ঢাকা মঞ্জুষা-প্রিন্টিং-ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনিখিলপ্রভু দাসাধিকারী কর্তৃক মুদ্রিত
এবং কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীকবিভূষণ
ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক প্রকাশিত।
শ্রীগৌরাব্দ—৪৫৯

P 17548

ত্রয়োবিংশ-বর্ষ গৌড়ীয়ের

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধ	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
শ্রীনন্দোৎসব	১-৪।১
ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণ ও দাতা শ্রীকৃষ্ণ	১-৪।৩
অক্ষয় মুদা ...	১-৪।৪
শ্রীশ্রীল কবিদাস বাবাজী মহারাজের নির্য্যাণ	১-৪।৯
বিবিধ-প্রসঙ্গ [শ্রীবল ও শ্রীগৌরীদাস প্রভুর বিরহ-জয়ন্তী, শ্রীশ্রীবৎসলাহন ব্রহ্মচারীর স্বধাম-প্রাপ্তি]	১-৪।১০
শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা-কীর্ত্তনকারী শ্রীশ্রী-আচার্য্য-পাদপদ্ম ...	৫-১২।১১
'দিল্' ঔর 'দিমাগ্' (সংশোধন—১৩-২৮।৮২)	৫-১২।১৪
কৃষ্ণানুকম্পা (সংশোধন—১৩-২৮।৮২)	৫-১২।১৫
"তুমি আমা হইতে বড় কিরূপে ?" (সংশোধন—১৩-২৮।৮২)	৫-১২।১৩
শ্রীকীর্ত্তন-প্রসঙ্গ [সুমেধস্তিথিবিসমূহে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের শ্রীহরি-কথাকীর্ত্তন, কথাচীতে শ্রীহরিকথা] (সংশোধন—১৩-২৮।৮২)	৫-১২।১৫
শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে বার্ষিক উৎসব [পদ্য]	৫-১২।৪২
শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ ও শ্রীগৌড়ীয়	১৩-২৮।৪৩
সুরগীতি ...	১৩-২৮।৪৯
কর্ম্মকাণ্ড ও কর্ম্মযোগ	১৩-২৮।৫৮
কীর্ত্তন-প্রসঙ্গ [শ্রীশ্রীগুরুবর্গের আবির্ভাব ও বিরহ-মহোৎসব ; মোগলসরাই, লক্ষ্ণৌ, পাণ্ডীপুর, গুন্টুর প্রভৃতি স্থানে শ্রীহরি-কীর্ত্তন]	১৩-২৮।৮৫
প্রভুপাদ ও ভোগ্যপাদ ...	২৯-৩০।৯৯
শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবের-বিজ্ঞাপন	২৯-৩০।৮৪
"পুরাণ-পুরুষ"	৩১-৩২।৮৭
"গুরুদেবতাত্মা" ...	৩১-৩২।৯৩
বেটপুর	৩১-৩২।১০২
বিবিধ-প্রসঙ্গ [শ্রীগুরুবর্গ ও শ্রীবলরামপুর আবির্ভাব-তিরোভাব-উৎসব]	৩১-৩২।১০৪
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার একপঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশন-বিবরণ ...	৩৩-৩৪।১০৪
গৌড়ীয়মিশনের কাউন্সিলের অধিবেশন	৩৩-৩৪।১১৯
ঐ সাধারণ সভার অধিবেশন	৩৩-৩৪।১১০
শ্রীগুরুপদেশ	৩৩-৩৪।১১৯
শ্রীগুরুবিজয়	৩৩-৩৪।১১৩
শ্রীনাম ও শ্রীহরিনাম	৩৩-৩৪।১২৫
বিবিধ-প্রসঙ্গ [শ্রীগৌরাবির্ভাব ও শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত]	৩৩-৩৪।১৩২
তোষামোদ ও মানদধর্ম্ম	৩১-৪২।১৩৩
শ্রীপুরুষোত্তমের কয়েকটী প্রাচীন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মঠ ...	৩১-৪২।১৩৮
শ্রীপুরুষোত্তমোৎসব [বিজ্ঞাপন]	৩১-৪২।১৮০
স্বধাম-প্রাপ্তি [শ্রীমদনমোহন দাস]	৩১-৪২।১৮০
শ্রীপুরুষোত্তমধাম ও শ্রীচৈতন্যদেব	৪১-৪৮।১৮১
বিবিধ-প্রসঙ্গ [শ্রীব্রজমোহন দাসের স্বধাম-গমন-সম্বন্ধে 'ভারতবর্ষ', শ্রীগৌরজনের কূর্ম্মাচল-বিজয় ইত্যাদি]	৪১-৪৮।২০৩
বিমুখ-বিত্ত	৪১-৪২।২০৩
অধিকার-নির্ণয়	৪১-৪২।২৪৬
বিবিধ প্রসঙ্গ ... ৪১-৪২। প্রচ্ছদপটের ২য় পৃষ্ঠা	

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

২৩শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৭শে শ্রাবণ, ১৩৫৭; ১২ই আগস্ট, ১৯৫০ | ১ম-৪র্থ সংখ্যা

শ্রীনন্দোৎসব

অদ্য শ্রীনন্দোৎসবের আবৃত্তি করিয়া 'গৌড়ীয়' নববর্ষে প্রবেশ করিলেন।

'নন্দ'-শব্দের অর্থ 'সুখ', 'উৎসব'-শব্দের অর্থও 'সুখ' বা 'আনন্দ'। 'নন্দোৎসব' বলিতে 'সুখের সুখ', 'আনন্দের আনন্দ' অর্থাৎ যে আনন্দ সকলের শিরোদেশে নৃত্য করে, সর্ব্বশিরোমণি আনন্দ। নন্দ—বাৎসল্য-প্রেমানন্দের মূর্ত্ত-বিগ্রহ; সেই নন্দের—প্রেমিকের উৎসব, আনন্দ বা প্রেম।

তৈত্তিরীয়োপনিষদে আনন্দের মীমাংসা বা বিচার হৃত হয়। যে যুবক সাধু, অধীতবেদ, ক্ষিপ্র-কর্ম্মা, দৃঢ়বপু ও বলবান্, তিনি বিত্তময়-ভোগের দ্বারা মনুষ্য-লোকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ ভোগ করিতে পারেন। ইহা মানুষানন্দ। এই মানুষানন্দকে 'এক' পরিমাণ ধরিয়া শ্রুতি প্রজাপতির (ব্রহ্মার) আনন্দ পর্য্যন্ত দশ ভাগ করিয়া ক্রমশঃ শতগুণিত-রূপে অন্যান্য আনন্দ ও শ্রুতীতরূপে অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মানন্দের মীমাংসা করিয়াছেন। মানুষানন্দের শতগুণ মানুষ-গন্ধর্ব্বের আনন্দ। কর্ম্ম-বিদ্যা-বিশেষের দ্বারা যে মনুষ্য গন্ধর্ব্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে 'মানুষ-গন্ধর্ব্ব' বলে। "যে ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ বালস্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি মানুষ-গন্ধর্ব্ব-তুল্য আনন্দ উপভোগ করেন—তাঁহার আনন্দ মানুষানন্দের শতগুণ। আবার মানুষ-গন্ধর্ব্বানন্দ হইতে 'দেব-গন্ধর্ব্বে'র আনন্দ শতগুণ অধিক। জন্ম হইতে যাঁহারা গন্ধর্ব্ব, তাঁহারা 'দেব-গন্ধর্ব্ব'। দেব-গন্ধর্ব্বের আনন্দ হইতে চিরলোকপাল-পিতৃ-গণের আনন্দ শতগুণ অধিক। যাঁহাদের লোক বা স্থান চিরস্থায়ী, তাঁহারা 'চিরলোক' লোক। চিরলোক-লোক-পিতৃগণের যে আনন্দ, তাহা হইতে 'আজানজ' দেবগণের আনন্দ শতগুণ অধিক। 'আজান' অর্থে দেবলোক। পুণ্যকর্ম্ম কর্ম্মবিশেষের দ্বারা যাঁহারা দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা 'আজানজ-দেব'। আজানজ-দেবগণের যে আনন্দ, তাহার শতগুণ 'কর্ম্মদেব'গণের আনন্দ। যাঁহারা অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কর্ম্মের দ্বারা দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা 'কর্ম্ম-দেব'। কর্ম্মদেবগণের আনন্দ হইতে অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি—এই সকল দেবতাগণের আনন্দ শতগুণ অধিক। দেবগণের রাজা—ইন্দ্র এবং তাঁহাদের গুরু—বৃহস্পতি। অন্যান্য দেবতার আনন্দ হইতে ইন্দ্রের আনন্দ শতগুণ অধিক। ইন্দ্রানন্দ হইতে বৃহস্পতির আনন্দ শতগুণ অধিক। বৃহস্পত্যানন্দ হইতে প্রজাপতি বা ব্রহ্মার আনন্দ শতগুণ

অধিক, ব্রাহ্মণত্বানন্দ হইতে পরব্রহ্মের আনন্দ শতগুণ অধিক। ব্রহ্মানন্দের পরিমাণ নির্ণয় করিতে শ্রুতিও অসমর্থ। অতএব ব্রহ্মানন্দ অপরিমেয়। পূর্ব্বোক্ত মান-তুলনায় ব্রহ্মানন্দের যথার্থ পরিমাণ হয় না।

ভগবদাবির্ভাবের অন্তর্গত যেরূপ ব্রহ্মাবির্ভাব ও পরমাত্মা-আবির্ভাব, ভগবদ্ভক্তির পূর্ণতা হেতু 'তৎপ্রয়োজনে'রও তদ্রূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা। অতএব মুক্তগণের যাবতীয় সুখ বা আনন্দ হইতে অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ ও যোগানন্দ হইতে বৈকুণ্ঠ-বাসিগণের আনন্দ শ্রেষ্ঠ। বৈকুণ্ঠসুখ হইতে অযোধ্যা সুখ মহৎ; অযোধ্যা-সুখ হইতে দ্বারকা-সুখ মহত্তর। রস-বিশেষের তারতম্যই এই সুখ-তারতম্যের কারণ। গোলোক-বাসিগণের যে সুখ, তাহা সকল সুখ হইতে অধিকাধিক। এই গোলোকানন্দের কথা যুক্তির দ্বারা প্রদর্শিত হইতে পারে না। যুক্তির গোলোকে প্রবেশ-সামর্থ্যই নাই। প্রীতিই তথাকার সাম্রাজ্ঞী। অতএব গোলোক-সুখের কথা তাহা কিরূপে প্রকাশ করিবে? সেই সুখের অনুভাবক গোলোক-বাসিগণই কেবল অনুভবের দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষ করেন।

নিত্য-বৈকুণ্ঠ-পার্ষদগণ গোপরাজ শ্রীনন্দের অবতার-স্বরূপ। স্বর্গাদিতে অবস্থিত দেবগণ সেই বৈকুণ্ঠবাসিগণেরই প্রতিরূপ। রূপকাস্বর্গত হওয়ায় দেবগণ মাধিকের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকেন। এইজন্যই দেবগণকে অবতার না বলিয়া 'প্রতিরূপ' বলা হইয়াছে।

শ্রীবসুদেবকে 'দ্রোণবসুর অবতার' বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। বৈকুণ্ঠবাসিগণ যখন গোলোকবাসিগণের অবতার, স্বর্গস্থ দেবগণ যখন বৈকুণ্ঠ-বাসিগণের প্রতিরূপ, তখন নিশ্চিত হইল যে, স্বর্গবাসী দ্রোণবসু গোলোকস্থিত নন্দের অবতারের প্রতিরূপ। কৃষ্ণ লীলাচিকীর্ষু শ্রীউপেন্দ্রের সুখ-বিধানের জন্য পৃথিবীতে অবতরণের দেবগণের অবতার হয়, তদ্রূপ শ্রীগোলোকের নিত্যপ্রিয় শ্রীগোপরাজ শ্রীনন্দেরই অবতার বৈকুণ্ঠে নন্দ-নামক নিত্য-পার্ষদ। তাঁহারই প্রতি-রূপ দেব-সমাজে দ্রোণ-নামক বসু। শ্রীগোলোকস্থ নন্দই পৃথিবীতে কদাচিৎ অবতীর্ণ হন। এইরূপে শ্রীগোলোকের শ্রীবলরাম বৈকুণ্ঠে শেষনামী নিত্যপার্ষদ, দেবসমাজে সপ্তপাতালবর্ত্তী ধরণীধররূপে বিখ্যাত। সেই শ্রীবলরামই পৃথিবীতে কদাচিৎ অবতীর্ণ হন। এইরূপেই শ্রীগোলোকের শ্রীদাম শ্রীবৈকুণ্ঠে নিত্যপার্ষদ শ্রীসঙ্কর্ষণ, দেবতা-সমাজে বিনতানন্দন-নামে বিখ্যাত। সেই গোলোকস্থ শ্রীদামই পৃথিবীতে কোন সময়ে অবতীর্ণ হন। সেইরূপেই গোলোকের শ্রীবসুদেব-দেবকী, বৈকুণ্ঠে শ্রীসুতপা-পৃশ্নি, দেবসমাজে শ্রীকশ্যপ-অদিতি-নামে প্রসিদ্ধ। সেই শ্রীবসুদেব-দেবকীই কোন সময়ে গোলোক হইতে ভূলোকে অবতীর্ণ হন। শ্রীকৃষ্ণের অবতারসমূহ যেরূপ অবতারীর সহিত অভিন্ন, সেইরূপ নিত্যপ্রিয় শ্রীগোপরাজ শ্রীনন্দাদির অবতারসমূহও অবতারীর সহিত অভিন্ন। শ্রীনন্দাদির অবতারসমূহ কাল-অনুসারে, কার্য্য-অনুসারে, স্থান-অনুসারে শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যায় কখন অংশরূপে, কখনও পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হন। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ সত্যযুগের আদিতে পৃথিবীর উদ্ধারার্থ অংশরূপে শ্রীবরাহরূপ প্রকট করিয়াছিলেন এবং দ্বাপর-যুগের শেষ-ভাগে নিজ প্রেম-ভক্তির বিস্তারার্থ সুখক্রীড়া-পরিপাটীর জন্য শ্রীবৃন্দাবনে পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীনন্দাদিরও অবতারের ক্রম জানিতে হইবে। সেই গোলোকস্থ শ্রীনন্দাদি কোন পরম প্রেমময় লীলা-বিশেষের বলে আকৃষ্ট হইয়া নিজনাথ সহ কোন স্থানে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিলে পরমেশ্বরের ন্যায় নিজ নিজ অবতারবর্গসহ ব্রহ্মার দণ্ডবরাদিরূপ-রূপবিশেষে ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া প্রাদুর্ভূত হন। সেই সময় তাঁহাদের অবতারগণও তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। এইজন্য মুনিগণ বলিয়াছেন—"দ্রোণাদি নন্দরূপে জন্মগ্রহণ করেন।"

গোলোকে দুঃখ নাই। যেখানে নন্দনন্দন নিত্য বিরাজিত, তথায় দুঃখের কল্পনাও নাই। তবে যে শ্রীকৃষ্ণের বিনোদার্থ দুঃখাদিপ্রতিভাব দৃষ্ট হয়, সেই দুঃখসকল ব্রহ্মসুখ, পরমাত্মসুখ, বৈকুণ্ঠসুখেরও মস্তকোপরি সর্ব্বক্ষণ নৃত্য করে। তথায় যে শোক প্রতীয়মান হয়, তাহা সমগ্র আনন্দরাশির উপর পুনঃ পুনঃ নৃত্য করে। নন্দ—আনন্দ-স্বরূপ। সেই নন্দের নন্দন বা আনন্দ-প্রদাতা যিনি, তাঁহার আবির্ভাবে যে আনন্দ, তাহাই 'নন্দোৎসব'।

আত্মজ আবির্ভূত হইলে মহামনাঃ নন্দ আনন্দিত হইয়া বেদজ্ঞ বিপ্রগণকে আহ্বান ও অলঙ্কৃত করিলেন। ব্রাহ্মণ-গণের দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করাইয়া আত্মজের জাতকর্ম্মাদি ও নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধাদিদ্বারা পিতৃ-দেবলোকের অর্চ্চন করাইলেন। ব্রাহ্মণদিগকে অলঙ্কৃত বিংশতি লক্ষ ধেনু, রত্নরাজি ও স্বর্ণরসদিক্ত-বসনে আবৃত সপ্ত তিলপর্ব্বত দান করিলেন।

নন্দ-ব্রজে সেই আনন্দের দিনে ব্রাহ্মণগণ স্বস্তি-বাচন-পাঠ আরম্ভ করিলেন। পুরাণবক্তৃগণ, বংশকীর্তকগণ ও বন্দিগণ স্তব করিতে লাগিলেন। গায়কগণ গান ধরিলেন। স্বর্গে দুন্দুভিসকল ধ্বনিত হইতে লাগিল। দেবতাগণ শঙ্খধ্বনি-সহকারে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শিব-ব্রহ্মাদি দেবগণ, শিবানী, ব্রহ্মাণী প্রভৃতি দেবীগণ, নারদাদি-ঋষিগণ ও কৃপ প্রভৃতি মুনিগণ প্রচ্ছন্নভাবে গোকুলে আগমন করিয়া বালকের মাতামহ ও মাতামহী প্রভৃতি গোপ-গোপীর সহিত মিলিত হইয়া ধান্য-দুর্ব্বাদির দ্বারা আশীর্ব্বাদচ্ছলে শ্রীনন্দ-নন্দনকে দর্শন করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিলেন। ভগবতী শ্রীপৌর্ণমাসী শ্রীবধূমণ্ডলের সহিত বালক শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া আশীর্ব্বাদচ্ছলে মাতা শ্রীযশোমতীকে যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে বিবিধ মঙ্গলধ্বনি ও নৃত্য-গীতাদির সহিত কোলাহল উত্থিত হইল। গাভী, বৃষ ও বৎসসকল তৈল-হরিদ্রায় চর্চ্চিত হইয়া বিচিত্র ধাতু, ময়ূরপুচ্ছ, মালা, বসন ও ভূষণের দ্বারা অলঙ্কৃত হইল। গোপগণ বহুমূল্য বসন, আভরণ, কঞ্চুক ও উষ্ণীষের দ্বারা ভূষিত হইয়া হস্তে নানা উপহার লইয়া নন্দালয়ে আসিতে লাগিলেন। গোপীসকল যশোমতীর পুত্র জন্মিয়াছে শুনিয়া আনন্দিতা হইলেন এবং বসন ও অঙ্গরাগাদির দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিতে লাগিলেন। গোপ-গোপীগণ দধি-হরিদ্রাদি লইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহামনাঃ নন্দ তাঁহাদিগকে প্রসাদ-স্বরূপ নানাবিধ বস্ত্র, অলঙ্কার ও গোধন এবং অপরাপর বিশেষতঃ বিদূষকদিগকেও প্রচুর ধন-রত্ন প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইতেই নন্দ-ব্রজ সর্ব্ব-সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ঐ পুরী ভগবান্ শ্রীহরির নিবাসস্থান হওয়ায় নিজগুণে মহালক্ষ্মী শ্রীরমাদেবীর বিহার-ভূমি হইল।

শ্রীল রূপগোস্বামি উপাধ্যায় সেই শ্রীনন্দের প্রণাম করিয়া গাহিয়াছেন—

"ক্রতিশপথে স্মৃতিবিততে ভারতমন্ত্রে ভজন্ত ভব-ভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥"

(পদ্যাবলী—১২৭)

ভবভীত ব্যক্তিসকল কেহ শ্রুতিকে, কেহ স্মৃতিকে, কেহ বা মহাভারতকে ভজনা করুন; আমি কিন্তু এইস্থানে শ্রীনন্দেরই বন্দনা করি, যাঁহার অলিন্দে (বারান্দায়) পরব্রহ্ম (শ্রীকৃষ্ণ) ক্রীড়া করেন।

শ্রীল রূপ-গোস্বামিপ্রভু গাহিয়াছেন—

"তব জয়তি নন্দনন্দন পদারবিন্দোক্তভক্তিমকরন্দঃ।
যস্যাধুরীলবাগ্রে মুক্তিসুখং শুক্তিতামেতি॥"

(স্তবমালা, শ্রীনন্দোৎসবাদিচরিতম্)

হে নন্দনন্দন! তোমার শ্রীচরণকমলের অকিঞ্চনা ভক্তিমধু জয়যুক্ত হউন, যাঁহার অণুমাত্র মাধুরীর নিকট মুক্তিসুখ শুক্তির (ঝিনুকের) ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণ ও দাতা শ্রীকৃষ্ণ

পরতত্ত্বের স্বরূপে ভোক্তৃত্ব ও দাতৃত্ব পূর্ণভাবে বিরাজিত। পরতত্ত্ব—অন্বয়জ্ঞান। তিনি পূর্ণ, সনাতন ও পরমানন্দ-স্বরূপক যেহেতু পূর্ণ, সেহেতু তিনি অন্বয়জ্ঞান; যেহেতু সনাতন, সেহেতু তিনি পূর্ণসৎ; যেহেতু তিনি পরমানন্দ, সেহেতু তিনি পূর্ণানন্দ। মায়াধীশ পূর্ণচেতনের অধীনতত্ত্ব-রূপে জীবমায়া ও গুণমায়ার অবস্থান। পূর্ণচেতন—শক্তিমান্; তাঁহার অধীন সমস্ত শক্তি। সুতরাং পূর্ণচেতন স্বরূপতঃই ভোক্তা; তাঁহার এই ভোক্তৃত্ব সনাতন এবং এই ভোক্তৃত্ব স্ব-পর-পরমানন্দময়।

যিনি অধিষ্ঠাতা পূর্ণতত্ত্ব, তিনিই অপূর্ণতত্ত্বসমূহের অভাব পূর্ণ করিতে পারেন অর্থাৎ তিনিই মহাবদান্য হইতে পারেন। যিনি নিত্য, তাঁহার দান বা বদান্যতাও নিত্য। তিনি পরমানন্দময়, তাঁহাকে পাইয়া অনিত্যানন্দে মুগ্ধ জীবসমূহ বঞ্চিত হয়। শ্রুতি (তৈঃ ২।৭।১) বলেন,—

"রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।"

অর্থাৎ পরব্রহ্মই রস বা আনন্দ-স্বরূপ। সেই রস লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হন। এস্থলে অংশভূত জীবের অংশিপ্রাপ্তির বিষয় উক্ত হইয়াছে; অতএব অপূর্ণত্বের

আনন্দের দাতা একমাত্র পরতত্ত্ব। এক অপূর্ণতত্ত্ব অন্য অপূর্ণতত্ত্বকে নিত্যানন্দ দান করিতে পারে না। জীবস্বরূপের আনন্দ পরতত্ত্বের আনন্দের অন্তর্ভুক্ত ও অধীন।

পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ একাধারে ভোক্তা ও দাতা হইয়াও তাঁহার ভোক্তৃত্ব লীলা ও দাতৃত্ব-লীলার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিবার লীলাবিলাস-কল্পে রসরাজ ও মহাভাব-স্বরূপদ্বয় প্রকাশ করিয়া থাকেন। রসরাজস্বরূপে তিনি সম্ভোগ-বিগ্রহ অপ্রাকৃত নবীনমদন, আর মহাভাব-স্বরূপে তিনি মহাবদান্য—পরমকরুণ। তাঁহার রসরাজস্বরূপই মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণরূপ, আর মহাভাবস্বরূপই ঔদার্য্য-বিগ্রহ শ্রীগৌররূপ। শ্রীকৃষ্ণ যখন মাধুর্য্যের দাতা, তখন তিনি পরমকরুণ শ্রীগৌর; আর যখন মাধুর্য্যের ভোক্তা, তখনই তিনি রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ। মাধুর্য্যরসের বর্ণ—শ্যাম, আর মহাভাবের বর্ণ—সবল বা গৌর। তাই শ্রুতি (ছা ৮।১৩।১) বলেন,—

"শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে, শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে।"

সুতরাং শ্যাম হইতে গৌরে ও গৌর হইতে শ্যামে গমন হই। মাধুর্য্য-বিগ্রহ হইতে ঔদার্য্য-বিগ্রহের কারুণ্য ও ঔদার্য্য-বিগ্রহ হইতে মাধুর্য্য-বিগ্রহের প্রেমের সন্ধান লাভ হয়। নানাবর্ণের সমাবেশকে 'সবল' বলে। সমস্ত বর্ণ বা বৈচিত্র্য যেখানে সম্মিলিত, সেখানে 'অকৃষ্ণ' অর্থাৎ গৌরবর্ণ প্রকাশিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের মহাভাবস্বরূপে সমস্তরসের সমাবেশ ও পরিশিষ্টতা আছে। রসরাজ-মূর্ত্তিধর ভোক্তৃকৃষ্ণ—শ্রীশ্যামসুন্দর এবং মহাভাব-মূর্ত্তিধর দাতৃ-কৃষ্ণ—শ্রীগৌরসুন্দর। শ্রীগৌরসুন্দরে যে সম্ভোগ-রস নাই, তাহা নহে; পরন্তু তিনি সম্ভোগ-রসের লীলাময়-বিগ্রহ নহেন। সেই সম্ভোগময়ী লীলাটী তিনি তাঁহার শ্যামসুন্দর-স্বরূপের জন্যই একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর 'নাগর' নহেন; সুতরাং তাঁহাতে সম্ভোগ রস নাই, যেন কেহ এরূপ মনে না করেন। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন, যিনি শ্রীগৌরসুন্দর-সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"অতএব যত মহামহিম সকলে।
'গৌরাঙ্গ নাগর' হেন স্তব নাহি বলে॥"

(শ্রীচৈ ভা আ ১৪।৩০)

তিনিই আবার লিখিয়াছেন,—

"নির্ভয়ে বেড়ায় মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
দ্বিতীয় মদনসুন্দর।"

(শ্রীচৈ ভা ম ২।২৪৪)

"যতেক 'প্রকৃতি' দেখে মদন-সমান।"

(শ্রীচৈ ভা আ ১১।১০)

"বিশ্বম্ভর-মূর্ত্তি যেন মদন-সমান।
দিব্য গন্ধ মালা দিব্য বাস-পরিধান।"

(শ্রীচৈ ভা ম ১।১৮২)

"যতেক প্রকৃতি দেখে মদন-সমান"—এই কথা যেরূপ একদিকে সত্য, আবার "সবে স্ত্রীমাত্র না দেখেন দৃষ্টি-কোণে" (শ্রীচৈ ভা আ ১৪।২৮)—ইহাও সত্য অর্থাৎ শ্রীগৌরস্বরূপে সম্ভোগভাবের অভাব নাই, কিন্তু সম্ভোগ-লীলার অভিব্যক্তিটী শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপেরই বৈশিষ্ট্য ও একচেটিয়া। গৌরনাগরীগণ শ্রীগৌরসুন্দরকে ভোক্তৃস্বরূপে দর্শন করিয়াই নিবৃত্ত হন না, পরন্তু শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদের (জীবগণের) কামচরিতার্থ করেন, কাল্পনিক-কামের উদ্ভব-প্রত্যুদ্ভব প্রদান করেন—এইরূপ কল্পনা করিয়া দাতা ও ভোক্তা উভয় শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের লীলা-বৈশিষ্ট্যকে খর্ব্ব করিতে উদ্যত হয়। এইরূপ অনর্পিতচরী প্রেমভক্তির দাতার পরম দান তাহারা বরণ করিতে পারে না।

শ্রীগৌরসুন্দরকে কেবল মাত্র প্রেমদাতা বলিলে তাঁহার স্বয়ংরূপত্ব বা বিষয়-বিগ্রহত্ব প্রকাশিত হয় না। তিনি প্রেম-বিতরণকারী আচার্য্যমাত্র নহেন, তিনি পরতত্ত্ব। তিনি বিষয়-বিগ্রহ। বিষয়-বিগ্রহে ভোক্তৃত্ব আছে, কিন্তু শ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীশ্যামসুন্দরস্বরূপে যে সম্ভোগ-লীলা-বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা তিনি সেই স্বরূপেই প্রকাশিত করেন। শ্রীগৌরলীলা শ্রীকৃষ্ণ-লীলার পরিশিষ্ট ও সাধ্য-শিরোমণি; ইহা সাধক বা প্রবর্ত্তকগণের উপযোগী লীলা-মাত্র নহে। শ্রুতি বলেন,—

"রাধয়া মাধবো দেবঃ"

অর্থাৎ শ্রীরাধার দ্বারা মাধব দীপ্তিমান্। মহাভাবের দিব্য বিশেষরূপে দ্বিজিতে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তার পূর্ণতম অভিব্যক্তি। শ্রীকৃষ্ণের লীলা-পরিশিষ্টে অর্থাৎ শ্রীরাধা-মাধব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় স্বয়ংভগবত্তার পূর্ণতম অভিব্যক্তি। অতএব গৌড়ীয়ভক্তগণের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-বন্দনের যে আবির্ভাব-বৈশিষ্ট্য, তাহা অগৌড়ীয়গণের হৃদয়ে আবির্ভাবের সহিত সমান নহে। গৌড়ীয়গণের শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও অগৌড়ীয়গণের শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে। ইহা অনুভবের বিষয়, কহিবার কথা নয়,

করিলে কাহারও প্রতীতি হইবে না; বরং 'সাম্প্রদায়িকতা'-দোষ আরোপ করিয়া প্রকৃত সত্যের আলোচনা হইতে কপালদোষে চিরনিবৃত্ত হইবে। পঞ্চোপাসক কর্মজড়স্মার্ত তথাকথিত মায়াবাদী প্রভৃতির কথা দূরে থাকুক, শুদ্ধ কৃষ্ণোপাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যেও যাঁহারা "গৌড়ীয়" নহেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে যেভাবে অনুভব করিবেন, তাহা হইতে "গৌড়ীয়"গণের শ্রীকৃষ্ণবিরহাবেশের বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীস্বরূপরূপানুগ গৌড়ীয়গণের হৃদয়ে অবস্থানে শ্রীরাধেন্দ্র-মর্ম্ম নিত্যই 'ভোক্তা-শ্রীকৃষ্ণ ও দাতা শ্রীকৃষ্ণ'রূপে অবতীর্ণ হন। ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণ—ভোক্তা হইয়াও স্বরূপশক্তি শ্রীর বশীভূত; দাতা শ্রীকৃষ্ণ—ভক্তিশ্রী-বিতরণের জন্য শ্রীর সহিত সমাশ্লিষ্ট—শ্রীর ভাব-কান্তি-বিভূষিত।

অশ্রুর মূল্য

সাধন ও সিদ্ধি—উভয় অবস্থাতেই অকপট অশ্রুর মূল্য অনির্ব্বচনীয়। অত্যন্ত অযোগ্য ব্যক্তিরও হৃদয়গুহা হইতে উদ্গারিত অশ্রুপ্রবাহ একটী কণা শ্রীহরির যেরূপ প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে, এরূপ আর কিছুই পারে না। শত শত সাধন, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, সদাচার, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাদিপালন, তীর্থভ্রমণ, এমন কি নববিধা ভক্তি-যাজনের অভিনয় করিয়াও হৃদয়বিগলিত একবিন্দু অকপট-অশ্রুর অভাবে কল্পলতাধারিণি শ্রীহরির কৃপা ও প্রীতি আকৃষ্ট হয় না। যাঁহার অন্ততঃ প্রত্যহ একবারও নিজের অযোগ্যতা অনুভব করিয়া শ্রীহরির কৃপা ও সুখানুসন্ধানের জন্য একবিন্দু অশ্রু নির্গত না হয়, তাঁহার হৃদয়ে নিশ্চয়ই জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জীভূত দুরন্ত অপরাধের বজ্রলেপ আছে। চোখের জল ও চিন্তা অর্থাৎ 'আমার কিছুই হইল না'—হৃদয়ের মর্ম্মস্থল হইতে এই অনুভূতি—এই দুইটী প্রত্যহই প্রত্যেক সাধকের হৃদয়ে সমুদিত হওয়া চাই। কেহ হরি-ভজনে অকপটভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন কিনা, তাহার একমাত্র কষ্টিপাথর—অযোগ্যতার অনুভূতি হইতে উদিত একবিন্দু অকপট অশ্রু। যাঁহার অযোগ্যতার অনুভূতি নাই, শ্রীগুরুদেব ও শ্রীহরিদেবের সুখানুসন্ধানস্মৃতি নাই, তাঁহার চক্ষু হইতে কিছুতেই অশ্রু নির্গত হইবে না। হয়ত তিনি খুব নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া ম্লানমুখে অবস্থান করিতে পারেন, কিংবা নিজের দুর্দ্দশা-দর্শনে শুষ্কেচ্ছামাত্র পোষণ করিয়া দুই-একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে পারেন বা সাময়িক বিমর্ষভাব ধারণ করিতে পারেন, কিন্তু হৃদয় অপরাধমুক্ত না হইলে কিছুতেই অকপট অশ্রুর উদয় হইবে না। যদিও অশ্রুপ্রকাশ প্রীতির সামান্য তটস্থ-লক্ষণমাত্র, তথাপি নিরপরাধ না হইলে কখনই অশ্রুর উদয় হইতে পারে না। স্বভাবপিচ্ছিল চক্ষু হইতে যে অশ্রু নির্গত হয়, তাহা ব্যাধি-বিশেষ; সেরূপ অশ্রুর কথা হইতেছে না। শোক, ভয়, মোহ প্রভৃতিজাত অশ্রু অত্যন্ত জড়াভিনিবেশ এবং অপরাধের পরিচায়ক। দশবিধ নামাপরাধের একটী, কোনও কোনটী বা সবগুলি হৃদয়ে থাকিলে নিজের দেহসৌখ্যের অভাব বা দেহ-সম্বন্ধীয় তথাকথিত আত্মীয়-স্বজনের জাগতিক অভাব-অসুবিধা প্রভৃতিতে কিম্বা কোন জড়-বস্তুর অপ্রাপ্তি বা বিনাশে যে অশ্রুর উদয় হয়, অথবা জড়-প্রতিষ্ঠালাভের আশায় যে কৃত্রিম অশ্রুমোচন, তাহা অপরাধেরই অভিব্যক্তি; উহাতে হৃদয়ে নিজের অযোগ্যতার অনুভূতি হয় না—শ্রীহরির সুখানুসন্ধানস্পৃহা থাকে না, বহির্ম্মুখ দেহমনের সুখানুসন্ধান এবং সুখের অপ্রাপ্তিজনিত খেদ ও অভাববোধরূপ মোহই প্রবল থাকে।

পরমকরুণ শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের নাম উচ্চারণ করিবা-মাত্র যদি হৃদয় বিগলিত হইয়া নয়নে অশ্রুধারা একটী কণিকাও প্রকাশিত না হয়, তবে নিশ্চয়ই শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দকে ইষ্টদেব ও আত্মা বলিয়া বরণ করা হয় নাই, কেবল কোন অভাবিনাশের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ভজন করিবার ছলনা প্রদর্শিত হইতেছে। শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের নামের এমনই শক্তি যে—

> "অজ্ঞামিহ যেন 'চৈতন্য'-নাম সেই লয়।
> কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয়।
> 'নিত্যানন্দ' বলিতে হয় কৃষ্ণ-প্রেমোদয়।
> আউলায় সকল অঙ্গ, অশ্রুগঙ্গা বয়॥"
>
> (শ্রীচৈ চ আ ৮।২২-২৩)

শ্রীকৃষ্ণনাম অপরাধের বিচার করেন, কিন্তু পরমকরুণ অত্যন্ত উদার শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-নাম কোন অপরাধ গ্রহণ করেন না। কেবল নিজের অযোগ্যতা বা অকপট অনুভূতির সহিত যিনি শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের নাম করেন, তাঁহাকেই শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ প্রেম প্রদান করেন; তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা নির্গত হয়। এই অযোগ্যতার অনুভূতিটুকু-পর্য্যন্ত যাহার নাই, সেইরূপ ব্যক্তি দুর্দ্দিবিশিষ্ট। এইজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

"চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এ-সব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার॥"
(শ্রীচৈ চ আ ৮।৩১-৩২)

শ্রীকৃষ্ণের কৃপা যোগ্যতম ব্যক্তির উপর বর্ষিত হয়। পরমভক্ত ব্যক্তি, পরমশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া কম্পাশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিকবিকারে বিভূষিত হন। কিন্তু অযোগ্যতম ব্যক্তিও কেবলমাত্র অকপটে নিজ অযোগ্যতা অনুভব করিয়া সমগ্র সত্ত্বা দ্বারা নিজ-অযোগ্যতার কথা নিবেদন করিতে করিতে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের সম্বোধনাত্মক নামকীর্ত্তন করিলে তাঁহার হৃদয়েও শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের পরম ঔদার্য্যগুণ, পরমকারুণ্যগুণ ও তৎসঙ্গে নিজ অত্যন্ত অযোগ্যতার কথা যুগপৎ স্মৃতিপথে উদিত হইয়া অযোগ্য ব্যক্তির হৃদয়স্থিত দ্রবিত করিয়া দেয়, তখনই হৃদয়বিক্রিয়ার লক্ষণস্বরূপ নয়ন-সরোবর হইতে অশ্রুবিন্দু উদ্গত হইয়া শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মের আরতি করিয়া থাকে—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।
তোমা-বিনা কে দয়ালু জগৎ-সংসারে॥
পতিতপাবন-হেতু তব অবতার।
মো-সম পতিত প্রভু না পাইবে আর॥
হা হা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ-সুখী।
কৃপাবলোকন কর, আমি বড় দুঃখী॥
দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত-গোসাঞি।
তব কৃপা বলে পাই চৈতন্য-নিতাই॥
হা হা স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ।
ভট্টযুগ, শ্রীজীব, হা প্রভু লোকনাথ॥"

এইরূপে সপার্ষদ পরমকরুণ শ্রীগৌরহরির নিকট নিজ-অযোগ্যতা-জ্ঞাপনকালে যদি গোপনে অশ্রুবিন্দু বিগলিত না হয়, তবে নিশ্চয়ই হৃদয়ে দম্ভ অর্থাৎ কাপট্য আছে, অযোগ্যতার অনুভব হয় নাই। কারণ, পরতত্ত্বের উপাসনার একমাত্র অমূল্য উপকরণ—অযোগ্যতার অনুভব হইতে জাত অশ্রুবিন্দু। ইষ্টদেবের পরম উদারতা ও সেবকের অযোগ্যতার অনুভব এবং তাঁহার সেবার একমাত্র উপকরণ অশ্রু—এই তিনটীর যেখানে সংযোগ, সেখানেই মহা-বদান্য শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ বা ঔদার্য্যবিগ্রহ পরতত্ত্বের ভজন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় এই ভজন-রহস্যটী তাঁহার প্রার্থনা-গীতির সর্ব্বপ্রথমেই অযোগ্য জীবের জন্য গান করিয়াছেন,—

"গৌরাঙ্গ বলিতে হ'বে পুলক-শরীর।
'হরি হরি' বলিতে নয়নে ব'বে নীর॥"

শ্রীশ্রীল ঠাকুর মহাশয় "শ্রীগৌরাঙ্গ" নাম উচ্চারণ-মাত্র পুলক-শরীরবিশিষ্ট হইবার আশীর্ব্বাদের কথা দুরিত জীবকে জানাইয়াছেন; ইহার তাৎপর্য্য কি? জীব যখন নিজের অযোগ্যতমতা ও শ্রীগৌরহরির পরমোদারতা অনুভব করিতে পারে, "পরমকারুণিকো ন ভবৎপরঃ,পরমশোচ্যতমো নচ মৎপরঃ" (শরণাগতি, ৬৬),—এই অনুভব যখনই সুতীব্রভাবে হয়, তখনই শরীরে পুলক হইয়া থাকে, তখনই হৃদয় বিগলিত হয় এবং শ্রীগৌরহরির নামকীর্ত্তনে নয়ন হইতে অশ্রুধারা নির্গত হয়, এতৎপূর্ব্বে পুলকাশ্রুর উদ্গম হইতে পারে না।

পরমকরুণ শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ দেখিলেন যে, কলিহত জীব অজ্ঞাতিমান, অজ্ঞাতিনিবেশ, জন্মজন্মান্তরের অপরাধ-পুঞ্জ হইতে মুক্ত হইবার পর যে হরিভজন করিবে, এরূপ আশা নাই। এজন্য পরম উদার দুই ঠাকুর অত্যন্ত অযোগ্য পক্ষেও যাহা উপলব্ধি করা একান্ত স্বাভাবিক, সেই অযোগ্যতার অনুভূতি ও তাহার অভীষ্টদেবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔদার্য্যগুণের স্মৃতিতে পুলক ও অশ্রুর উদ্গম হইতেই শিবদ নিঃশ্রেয়োলাভের পথ আবিষ্কার করিলেন; অতএব অশ্রুবিন্দুই পরম-করুণ দুই ঠাকুরের শ্রীচরণার্চ্চনের

অধিতীয় অনন্ত উপকরণ। নিতাইচাঁদ করুণা করিয়া আর্ত্ত বিষয়ীর বিষয় বা সংসার-বাসনা তুচ্ছ করিয়া দেন। বস্তুতঃ শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রাকৃত বিষয় স্মরণে অন্যান্য অযোগ্য জীবের কিছুতেই অধিকার লাভ হইতে পারে না।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর "তমসসাধ্যং ছন্দসাং যতেদং" (শ্রীভা ২।৩।২৭) শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—"যেষাঞ্চ চিত্তদ্রবেঽপি সতি চিত্তস্যাশ্মসারতা তিষ্ঠেদেব, তে তু দুশ্চিকিৎস্যা এব জ্ঞেয়াঃ"—অর্থাৎ যাহাদের চিত্ত দ্রব হওয়া সত্ত্বেও চিত্তের কাঠিন্য থাকিয়াই যায়, তাহাদের আর মঙ্গলের আশা নাই।

চারিপ্রকার অপরাধীর চক্ষু হইতে অশ্রু বহির্গত হয় না—(১) বিষয়ী, (২) অবজ্ঞাকারী, (৩) অরুচিবিশিষ্ট ও (৪) বিদ্বেষী। কিন্তু শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বহুত কৃপায় সেই বিষয়ী অপরাধীও যদি "এমন নির্দ্দয় মোরে কেবা কৃপা করে। এক নিত্যানন্দ-বিনু জগৎ-ভিতরে॥" (শ্রীচৈ চ আ ৫।২০৭)—এই বলিয়া নিজের অযোগ্যতার তীব্র অনুভবের সহিত শ্রীনিত্যানন্দের শরণাগত হইয়া গোপনে অশ্রুমোচন করেন, তবে তাঁহারও বিষয়বাসনা বিদূরিত হইতে পারে। অবজ্ঞাকারী ব্যক্তিও যদি নিজের অকিঞ্চিৎকরতা ও অযোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া অশ্রুমোচন করেন, তৎপ্রতিও শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপা হয়, তিনিও প্রেম পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন। অরুচি-বিশিষ্ট ও বিদ্বেষী ব্যক্তিগণের হৃদয় অপরাধের অশ্মলেপ ও বজ্রলেপের দ্বারা এত কঠিন যে, তাহাতে কখনও অযোগ্যতার অনুভূতি হয় না। বিষয়ীর ধূলিলেপ বা অবজ্ঞাকারীর পঙ্কলেপ পর্য্যন্ত অযোগ্যতার অনুভূতিজাত অশ্রুদ্বারা বিধৌত হইতে পারে, কিন্তু অরুচিবিশিষ্ট ও বিদ্বেষীর কখনকালেও অযোগ্যতার অনুভূতি না হওয়ায় মহাকরুণ পরতত্ত্বের পূজার একমাত্র উপকরণ অশ্রুগঙ্গার একটী কণাও প্রকাশিত হয় না। এজন্য তাঁহারা মহাবদান্য বিগ্রহের করুণা হইতে বঞ্চিত হয়। যদি পরমকরুণ প্রভুবরের অচিন্ত্য কৃপায় কখনও অবজ্ঞাকারী ও বিদ্বেষীর মঙ্গল হয়, তখন তাহাদের মঙ্গল অশ্রুবিন্দুর দ্বারা দিয়াই লাভ হইবে, অর্থাৎ তাহাদের হৃদয় বিগলিত হইয়া নয়নদ্বারা অশ্রু নির্গত না হওয়া পর্য্যন্ত মঙ্গল-লাভ হইবে না।

শরণাগতি-বিগলিত হৃদয়-গঙ্গোত্রী হইতে অশ্রুবিন্দু বিনির্গত হইয়া নেত্রযুগলের দ্বারে উচ্ছলিত হয় এবং শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের পাদ্য রচনা করে। এই যে অযোগ্যতার অনুভূতিরূপ চিন্তা বা আবেশময়ী স্মৃতি, তাহাই অশরণাগতকে শরণাগত করিয়া দেয়, জড়াভিমানীকে অজ্ঞাতসারে 'তৃণাদপি সুনীচ' অর্থাৎ পরম করুণ প্রভুবরের পরিকরগণের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিরূপ অভিমানে অভিমানী করায়। "এই অশ্রুবিন্দুর এইরূপ মহিমা যে, তাহা ব্রহ্মানন্দ ও পরমাত্মানন্দকেও নিষ্কাম করিয়া সচ্চিদেক পরতত্ত্বের—লীলা-পুরুষোত্তমের—অধিষ্ঠিত চিত্তকেও বিগলিত ও বিগলিত করিয়া তাঁহার নেত্রের অশ্রু আকর্ষণ করে। অযোগ্যতার অনুভূতিজাত অশ্রুবিন্দু-দর্শনে স্বয়ং অক্ষিত ভগবান্ পর্য্যন্ত করুণাবিগলিত হইয়া অশ্রুমোচন করেন। অবনীর যেরূপ সংপতিকে বশীভূত করিবার একমাত্র অস্ত্র—অশ্রু, অসমর্থ শিশুর যেরূপ মাতাপিতার করুণা উদ্রেক করিবার একমাত্র উপায়—ক্রন্দন, সেইরূপ অন্যান্য অযোগ্যের অত্যন্ত-করুণকে আকর্ষণ করিবার একমাত্র অস্ত্র—অশ্রুকণা। এই জন্যই অশ্রুর এত মূল্য। অযোগ্যতার পূর্ণ অনুভূতি দূরের কথা, অনেকেরা নবধাভক্তির শুদ্ধস্তরভিন্নক যাজনও শ্রীহরির অশ্রু আকর্ষণ করিতে পারেন, আর যাঁহারা পূর্ণ শরণাগত হইয়া অশ্রু-অর্ঘ্যের দ্বারা ইষ্টদেবের নিরন্তর পূজা করেন, তাঁহাদের ত কথাই নাই। শ্রীমৈত্রেয়-ঋষি বলিতেছেন,—

"যস্মিন্ ভগবতো নেত্রাজ্জাতঃ স্বর্ধুনিবিন্দবঃ।
কৃপয়া সম্পরীতস্য প্রপন্নেঽর্পিতয়া ভৃশম্॥
তস্মৈ বিন্দুসরো নাম সরস্বত্যা পরিপ্লুতম্।
পুণ্যং শিবামৃতজলং মহর্ষিগণসেবিতম্॥"

(শ্রীভা ৩।২১।৩৮-৩৯)

এই আশ্রমে কর্দ্দম-ঋষির শরণাগতি দর্শনে ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের অন্তঃকরণ স্নেহাপ্লুত হইয়া তাঁহার নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু-বিন্দু পতিত হইয়াছিল। শ্রীভগবানের সেই স্নেহাশ্রুই সরস্বতী-জলের সহিত পরিব্যাপ্ত হইয়া পবিত্র, মঙ্গলাবহ, অমৃততুল্য সুস্বাদু জলে পরিপূর্ণ, মহর্ষি-গণ-সেবিত 'বিন্দুসরোবর'-নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

শরণাগত ভক্তের অশ্রুর এইরূপ মূল্য যে, তাহা শ্রীভগবানের অশ্রুবিন্দু আকর্ষণ করিয়া ভক্তগণের নিত্য অবগাহনযোগ্য, মঙ্গলাবহ, অমৃতোপম বিন্দুসরোবর রচনা

করিতে পারে। শাস্ত্রবক্তিতে শ্রীগুরুদেবের ভজন করিয়াই কর্ম্ম-কবি নিজেকে কৃতকৃতার্থ ও জগতের এইরূপ মঙ্গল করিয়াছিলেন; আর যাঁহারা অজ্ঞানান্ধ দ্বারা মহাভাব-স্বরূপ মহাবদান্য শ্রীগৌরহরির আরাধনা করেন, তাঁহাদের অজস্র মূল্য প্রদানেও যে ব্যক্তিগণ দূরে থাকুক, বৈকুণ্ঠ-বাসিগণ পর্য্যন্ত প্রদান করিতে পারেন না। ব্রহ্মজ্ঞানীর অভিমানকারী রামভদ্রপুরী শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের শ্রীমুখ-কমল হইতে নির্গত অজস্রধারার মূল্য উপলব্ধি করিতে না পারায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গপাদপদ্মের শ্রীচরণে অপরাধ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরহরি চিত্তদ্রবতা-কম্পাশ্রুপুলকাদি-রহিত ঔপনিষদ-ব্রহ্মজ্ঞানকেও ধিক্কার দিয়াছেন।

"ক্রুতমপোপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ।
যত্র ক্বচিত্ত দ্রবচিত্ত-কম্পাশ্রুপুলকাদয়ঃ॥"

(শ্রীভ স, ৬৯ অঙ্ক)

শ্রীহরিকথামৃত হইতে শুষ্ক জীবহৃদয়ে যে চিত্তদ্রবতা, কম্প ও অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিকভাব-বিকার প্রকটিত হয়, সেই সব লক্ষণ ঔপনিষদ ব্রহ্মজ্ঞানে না থাকায়, সেই ব্রহ্মজ্ঞান দূরে অবস্থান করুক অর্থাৎ উহার প্রয়োজন নাই।

মহাভাব-স্বরূপ শ্রীশ্রীগৌরহরি শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদন-লীলা প্রকট করিয়া সিদ্ধি বা সাধ্যভক্তির বাহ্য ও অন্তর উভয় লক্ষণেই 'অজস্রধারার মূল্য' বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন।

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদ-রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥
যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে॥"

(শিক্ষাষ্টক—৬,৭)

শ্রীগৌরহরির শ্রীমুখোদ্গীর্ণ প্রথম শ্লোকটীতে সিদ্ধির বাহ্যলক্ষণ ও দ্বিতীয় শ্লোকটীতে সিদ্ধির অন্তর্লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে। উভয়ত্রই "নয়নং গলদশ্রুধারয়া", "চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্" শ্লোকাংশদ্বয়ের দ্বারা অজস্র সর্ব্বোত্তম মূল্য অর্থাৎ সাধ্যভক্তির চরম অবস্থাতেও অজস্রই জীবের দেয়, ইহাই প্রকাশিত হইয়াছে।

পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে যে,—অযোগ্যতম, দুর্ব্বলতম, কোটী কোটী অনর্থগ্রস্ত বিষয়ী দুরাচার অপরাধী ব্যক্তির মঙ্গল-লাভের একমাত্র উপায়—অযোগ্যতার তীব্র অনুভূতির সহিত কৃপা-প্রার্থনাযুক্ত অজস্র ধারা পরমকরুণ পরতত্ত্বের আরাধনা। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই আরাধনার কথা স্বরাক্ষরে একটী গীতির মধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন,—

"যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হ'লে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
প্রাণ না রাখিব আর॥"

(শরণাগতি)

বর্ণাশ্রমিগণ আপনাদের সুযোগ্যতা অনুভব করিয়া সেই সকল যোগ্যতার দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনায় নিযুক্ত হন, জ্ঞানিগণ বৈরাগ্যাদি সাধন-সম্পত্তির যোগ্যতা লইয়া ব্রহ্মের উপাসনা করেন, যোগিগণ অষ্টাঙ্গযোগ-সাধনের যোগ্যতার অনুভূতি লইয়া পরমাত্মার উপাসনায় সচেষ্ট হন। শ্রীনারায়ণের উপাসকগণও সদাচারাদি-যোগ্যতা লইয়া শ্রীনারায়ণের অর্চ্চনে তৎপর হন। কিন্তু পরমকরুণ পরতত্ত্বের উপলব্ধিকারণের অযোগ্যতার অনুভূতিই তাঁহাদের একমাত্র যোগ্যতা। এই অযোগ্যতার তীব্র ও অকপট অনুভূতি হইতেই অনুক্ষণ যে অশ্রু-ধারার প্রবাহ প্রকটিত হয়, তাহাতেই অযোগ্যতম জীব পরমকরুণ প্রভুর শ্রীপাদ-পদ্ম কোলাহলে প্রাপ্ত হইয়া অনায়াসে ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হন এবং শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে অবগাহন-পর্য্যন্ত করিবার দুর্ল্লভ সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন। "করুণা না হ'লে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, প্রাণ না রাখিব আর"—এই চিত্তবৃত্তিটী যখন বাস্তব ও ঐকান্তিক হয়, তখন পরমকরুণ পরতত্ত্ব উপলব্ধ হইয়া এরূপ রুদনকারীর হৃদয়ে স্বয়ং অবরুদ্ধ হন। অযোগ্যতার সুতীব্র অনুভূতির সহিত যে অশ্রু, তাহা অধিপতিকে জয় করে, সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রকে অবরুদ্ধ করে, পূর্ণতম নিরপেক্ষকেও সাপেক্ষতম অর্থাৎ দীনবৎসল করিয়া দেয়। অশ্রুর এত বড় মূল্য যে, স্বয়ং ভগবান্ তাঁহাকে পূর্ণভাবে বিলাইয়া দিয়াও 'ঋণী' বলিয়া অভিমান করেন।

শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের নির্য্যাণ

শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ গত ৭ই শ্রাবণ (১৩৪১), ২৩শে জুলাই (১৯৩৪), রবিবার শুক্লা চতুর্থী তিথিতে সন্ধ্যার পরে তাঁহার আবির্ভাব-স্থান ময়মনসিংহ-জেলান্তর্গত কিশোরগঞ্জ-মহকুমার অধীন 'মজিদপুরে' নির্য্যাণ লাভ করেন। শ্রীল বংশীদাসের আবির্ভাবের ঠিক সন-তারিখ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ তিনি ৯০ বৎসরের কিছু অধিক কাল ধরাধামে প্রকটলীলা করিয়াছেন। তাঁহার গ্রামবাসী এক বৃদ্ধ ব্যক্তি বলেন যে,—তিনি ১২৬৪ বঙ্গাব্দে আবির্ভূত হন। কিন্তু এই উক্তি কতদূর অভ্রান্ত, তাহা বিচার্য্য। শ্রীশ্রীল বংশীদাসের কৌপীন-গ্রহণের পূর্ব্বের নাম ছিল—শ্রীভৈরবচন্দ্র দাস। তাঁহার পিতা শ্রীনাতন দাস মজিদপুরের নিকটস্থ পাটিয়া-গ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক মজিদপুরে শ্বশুরালয়ে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালে জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরাধামোহন দাসও মজিদপুরেই বাস করেন। তাঁহার (শ্রীল বংশীদাসের) মাতা শ্রীসর্ব্বসুন্দরী বেশ বুদ্ধিমতী ছিলেন।

শ্রীভৈরবচন্দ্র দাস তদানীন্তন সামাজিক প্রথানুসারে অল্প বয়সেই বিবাহ করেন এবং একটি পুত্রসন্তান লাভ করেন। তিনি মজিদপুর-গ্রামের নিকট জামালপুরের শ্রী আখড়ার তদানীন্তন মহান্তের নিকট হইতে কৌলিক প্রথানুসারে মন্ত্র গ্রহণ করেন। ঐ পুত্রসন্তানটিকে গৃহে রাখিয়া তিনি ৪০ বৎসর বয়সে মজিদপুর হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে 'নিগোয়াইর' গ্রামের আখড়ার জনৈক ভেকধারীর নিকট হইতে কৌপীন গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম 'শ্রীবংশীদাস' হয়। বর্ত্তমানে যেস্থানে তিনি অপ্রকটলীলা প্রকাশ করিয়াছেন, কৌপীন-গ্রহণের পর সেই স্থানেই 'শ্রীমধুসূদনজী'-শ্রীবিগ্রহ (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ) প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় তিন বৎসর অবস্থান করেন। তখন তিনি উদাসীনভাবে একতারা বাজাইয়া গান করিতেন এবং মাধুকরী ভিক্ষার দ্বারা শ্রীবিগ্রহের সেবা করিতেন। কিছুদিন পরে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে শ্রীনবদ্বীপে গমন করিয়া ভজনার্থ আদেশ করেন। তখন তিনি ছিন্নকন্থা ও করঙ্গ-কৌপীন-মাত্র সম্বল করিয়া শ্রীনবদ্বীপে চলিয়া আসেন এবং তথায় কিছুকাল অবস্থানের পর পদব্রজে ভারতের বিভিন্ন তীর্থ ও বিভিন্ন স্থান পর্য্যটন করেন। তৎপরে তিনি পুনরায় শ্রীকোলদ্বীপে আগমন করিয়া শ্রীগঙ্গাতটে 'ভাঙ্গার চড়া'য় বাস করিয়া ভাবমার্গে শ্রীগৌর-বিদ্যানন্দ-প্রভাবের শ্রীবিগ্রহ সেবা করিতে থাকেন। তথায় ক্রমশঃ একটি মন্দির নির্ম্মিত হয়। ১৩৪৫ সালে বর্ষাকালে শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীনবদ্বীপ হইতে মজিদপুরে আসিয়া তথায় করেন। পুনরায় ১৩৪৭ সালের অগ্রহায়ণ-মাসে তিনি শ্রীকুলিয়ায় আসিয়া ফাল্গুন-মাসে শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তীর্থস্থানসকল দর্শন করিয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনে কিছুকাল বাস করেন। ১৩৪৮ সালে পুনরায় তিনি শ্রীনবদ্বীপে আগমন করেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঋণদায়ে ঐ মন্দির-বাটী নীলামে উঠে। তখন শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র তাঁহাকে জানাইলেন যে,—'পরের বাড়ীতে থাকা উচিত নহে।' এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীল বংশীদাস উক্ত মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন এবং তদবধি শ্রীগঙ্গার তীরে তাঁহার মঠে বাস করিতে থাকেন।

গত ১৩৪৯ সালে চৈত্রমাসে তিনি নৌকাযোগে পরিক্রমার বহির্গত হইয়া প্রথমে শ্রীশ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীপাট কালনায় শুভবিজয় করেন; তথা হইতে শান্তিপুর, শান্তিপুর হইতে কলিকাতা হইয়া ট্রেণে শ্রীপুরীধামে শুভবিজয়পূর্ব্বক তথায় শ্রীরথযাত্রা পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। শ্রীরথযাত্রার পর গো-যানে কটক, ভুবনেশ্বর, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থান হইয়া শ্রীগয়াধামে শুভবিজয় করেন। গয়া হইতে কাশী, তথা হইতে নৌকাযোগে পাটনা, পাটনায় কিছুদিন অবস্থানের পর মুঙ্গেরে আসিয়া কতকদিন অবস্থান করেন; তথা হইতে ভাগলপুরে শুভবিজয় করেন। ভাগলপুরে প্রায় আড়াই মাস অবস্থানপূর্ব্বক তথা হইতে সাহেবগঞ্জ ও রাজমহল হইয়া শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের স্থান শ্রীপাট খেতুরী-সন্নিকটস্থ 'প্রেমতলী'তে শুভবিজয় করেন। প্রেমতলী হইতে গোয়ালন্দ-ঘাট হইয়া নারায়ণগঞ্জ, তথায় কএক দিন অবস্থানপূর্ব্বক তথা হইতে খানপুর, খানপুর হইতে কাপাসিয়া-গ্রামে শুভবিজয়-পূর্ব্বক তথায় কএকদিন অবস্থান করিয়া নৌকাযোগে তথা হইতে ৫ই চৈত্র (১৩৪০), ১৮ই মার্চ্চ (১৯৩৪)

তারিখে তিনি মজিদপুর-গ্রামে শুভবিজয় করেন। মজিদপুর হইতে কেবলমাত্র দীক্ষা-গুরুপাট জামালপুর-গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। জামালপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক পুনরায় মজিদপুরে পঞ্চবটীতে তাঁহার মধ্যে আসিয়া ভজন করিতে থাকেন। গত ৭ই শ্রাবণ, রবিবার শ্রীস্নানযাত্রে শ্রীকৃষ্ণের হিন্দোলোৎসব-আরম্ভ-দিবস সন্ধ্যার পর তিনি অপ্রকট-লীলা প্রকাশ করেন।

শ্রীশ্রীল বৎসরের অপ্রকটের পর জামালপুরের আখড়ার ও মজিদপুরের পারিপার্শ্বিক গ্রামবাসী কতিপয় ব্যক্তি মজিদপুরেই 'পঞ্চবটী'-নামক স্থানে শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধি প্রদান করেন। সমাধির উপরেই শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের সেবিত শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-গদাধর, শ্রীগোপাল ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের ব্যবহৃত তাঁহার মধ্যে অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ অধরতত্ত্বে আবির্ভূত হইয়া অপরসম্প্রদায়ের নিকট হইতে দীক্ষা ও কৌপীনাদি গ্রহণ করিবার লীলা প্রকাশ করিয়া আবেশময়ী প্রগল্‌ভা ভক্তির জয় ঘোষণা করিয়াছেন। সিদ্ধমহাপুরুষের আচরণ দুর্ভাগা ব্যক্তিগণ ধারণা করিতে পারে না এবং তাঁহার অনুকরণ করিলেও লাভের অধঃপতন অনিবার্য্য। তিনি হেঁয়ালীচ্ছলে যে-সকল কথা বলিতেন, কিংবা কৃপাপূর্ব্বক যে-সকল শাসন-বাক্য প্রয়োগ করিতেন, তাঁহার আরাধ্যদেবের সহিত যে-সকল রহঃকথা কহিতেন, কখনও বা কোঁদল করিতেন অথবা স্বানুভবানন্দে অবস্থিত হইয়া কখনও ঔদাসীন্য, কখনও পারুষ্য, কখনও নানাপ্রকার ক্রিয়ামুদ্রা প্রকাশ করিতেন, কখনও বা সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র প্রভুবৎ, কখনও উন্মত্তবৎ, কখনও বালকবৎ যে-সকল আচরণ প্রকট করিতেন, তাহা একমাত্র বিশুদ্ধনলী বৈষ্ণবকৃপায় দ্বারাই অনুভবের বিষয় হয়। এইরূপ সিদ্ধমহাপুরুষের অপ্রকটে পৃথিবী একটি মহারত্ন-শূন্যা হইল! আমরা সেই মহাপুরুষের উদ্দেশে কোটি কোটি দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া প্রগল্‌ভা ভক্তির জয়, ভক্তের জয়, ভক্তবৎসল শ্রীহরির জয় ও শ্রীহরিধামের জয় গান করিতেছি।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

গত ৯ই শ্রাবণ, ৩১শে জুলাই সোমবার একাদশী-তিথি হইতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক শ্রীমহাপ্রভুতোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। গত ১৮ই শ্রাবণ, ১লা আগষ্ট শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ও শ্রীশ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিতের বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীহরিকীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, অভিভাষণ, পাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা, আলোচনা ও মহাজন-পদাবলী সংকীর্ত্তন-মুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে ও বিভিন্ন শাখামঠেও এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

গত ২১শে শ্রাবণ, ৬ই আগষ্ট, রবিবার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়াছে।

গত ২৬শে শ্রাবণ, ১১ই আগষ্ট, শুক্রবার শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর গুরুবর্গের আনুগত্যে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মতী-উৎসব কীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে। ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ও মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিমধুর প্রভু শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণ, শ্রীহরি-কথা অনুকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন ও মধ্যরাত্রে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলাপাঠ, 'শ্রীকৃষ্ণজন্মস্থিপেবিদিঃ' অনুসরণে অভিষেক, পূজা, আরতি-কীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ-অনুষ্ঠান-মুখে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীজন্মাষ্টমী-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত উৎসবে যোগদান করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে ও বিভিন্ন শাখামঠেও এই উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

অন্তর্ধানপ্রাপ্তি—গত ১৮ই শ্রাবণ, ৩রা আগষ্ট শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত সেবক শ্রীশ্রীবৎসলানন্দ ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বর শ্রীত্রিভক্তি-গৌড়ীয়মঠে সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীক্ষেত্রবাসঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীগুরু-পূজা ও শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-সংখ্যা

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পাক্ষিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
—শ্রীরূপগোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
"বিষয়" বলিয়া ত্যাগ ফল্গু বৈরাগ্য॥

২৩শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২১শে আশ্বিন, ১৩৪১; ৭ই অক্টোবর, ১৯৩৪ | ৫ম-১২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা-কীর্ত্তনকারী শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম

শ্রীস্বরূপদামোদর-শ্রীসনাতন-শ্রীহরিদাস-শ্রীরামরায়-শ্রীস্বরূপ-শ্রীরঘুনাথ-শ্রীজীবাদি শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদ গোস্বামিবৃন্দের ধারায় শ্রীকবিরাজ-শ্রীনরোত্তম-শ্রীবিশ্বনাথ-শ্রীবলদেব-শ্রীজগন্নাথ-শ্রীভক্তিবিনোদ-শ্রীগৌরকিশোর জগদ্গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীভক্তিবিনোদ-শ্রীগৌরকিশোরের শ্রীপাদপদ্মের বিশুদ্ধিসংরক্ষণের জন্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জগদ্গুরুরূপে শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন। তিনি শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর হইয়াও উদর ও ভূমি-ব্রহ্মবাদের উপাসক জগজ্জীবের অধিকারের স্বল্পতা-দর্শনে তাহাদের নিকট তত্তদধিকারোচিত কথাই অধিকভাবে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের কীর্ত্তিত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের হৃদয়ের কথা—যাহা শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের গূঢ়তম সম্পত্তি, তাহা তিনি হাটে-বাজারে বিতরণ করেন নাই। শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের আরাধ্যবস্তুকে পুনরায় লোকলোচনে আবিষ্কার করিবার জন্য তিনি সেবাপথের প্রতিবন্ধক কণ্টকাকীর্ণ 'কুব্জ কাটিয়া' বিপুলভাবে সাংখ্য-জ্ঞানের কথা উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের ভাষায় এই 'সাংখ্যজ্ঞান'-শব্দের অর্থ 'দেহাদি-ব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞানমাত্র' (শ্রীভা ৪।৩১।১২) অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধি নিরাসপূর্ব্বক আত্মস্বরূপের সন্ধান-চেষ্টা। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—'যদি সর্ব্বভূতগণের আত্মা শ্রীহরি আত্মদান না করেন অর্থাৎ প্রেষ্ঠরূপে অনুভূত না হন, তাহা হইলে ঐ সাংখ্যজ্ঞানের অনুশীলনও নিরর্থক।'

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সমস্ত প্রচারের মধ্যে সাংখ্য-জ্ঞানের কথা বিপুলভাবে বিস্তার করিলেও, বিশেষতঃ ষড়জন-বিভজন-বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিলেও অপ্রকট

লীলাবিস্তারের অব্যবহিত পূর্ব্বে ইহজিতে তাঁহার প্রাণের কথা কীর্ত্তন করিবার আদেশ দিয়াছেন। "গৌরীয়ন-কথার কীর্ত্তন"—যাহা শ্রীচরিতদাসের নিত্যসিদ্ধ নিজস্ব-সেবা, সেই শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা কীর্ত্তন করিবার ভার তিনি কৃপাপূর্ব্বক প্রদান করিয়াছেন এবং সেই কীর্ত্তনকারীর স্বরূপটীও 'আত্মানমেব' শ্লোকে নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া যে সার্ব্বকালিক শ্রীহরিকীর্ত্তনের কথা শ্রীগৌরসুন্দর কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীরঘুনাথের শ্রীমুক্তাচরিতের বাণীর মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীরূপের পদধূলি হইয়াই শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা সতত কীর্ত্তনীয়।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলাবিহারের পর তাঁহার এই অমিয় উপদেশ লইয়া কুতর্ক উপস্থিত হইল। চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণের মতে শ্রীল প্রভুপাদ সকলকেই সমভাবে শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার (?) করিতে আদেশ করিয়াছেন, কেবল কোন বিশেষ ব্যক্তিকে তাহা কীর্ত্তন করিবার ভার প্রদান করেন নাই। "তুল্যদণ্ড-ন্যায়" অবলম্বনপূর্ব্বক যখন তালপতি আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিতে লাগিল, তখন সত্য আপনস্বরূপ প্রকাশ করিয়া ফেলিল। যাহারা ঐ উপদেশকে অধিকারি-নির্ব্বিশেষে প্রয়োগ করিতে বাধিত হইয়াছিল, তাহারা আনুকরণিক ও মাৎসর্য্যপূর্ণ কুনাট্য আরম্ভ করিয়া রাজসিকী ও তামসিকী ভক্তির পরিচয় প্রদান করিল। শ্রীল প্রভুপাদের কথিত শ্রীশ্রীনাথাচার্য্যের অবৈধ আনুকরণিক চক্রবিপ্রলম্বুহের কুনাট্য পুনরায় আরম্ভ হইল! রাজসিকী ও তামসিকী ভক্তির উদ্ধত-নৃত্যে নানাপ্রকার উৎপাত উপস্থিত হইল! কোথায় শ্রীরূপের পদধূলি হইয়া শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথের কথা কীর্ত্তন, আর কোথায় বেশোপজীবী, ভিক্ষোপজীবী, সুরোপজীবী, কথোপজীবী, অভিনয়োপজীবী হইয়া ঘরে-কথা বলি কপ্‌চাইয়া উদরভরণ বা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি-সংগ্রহের প্রচেষ্টা! ইহাই কি শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথের কথা-প্রচারের নমুনা? শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথের কথা-প্রচারের ফলেই কি কৌটিল্য, অশ্রদ্ধা, জড়াভিনিবেশ, ভক্তিসৈথিল্য, রাজসিকী ও তামসিকী ভক্তির আস্ফালন এবং তাহাকেই 'শ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবা' বা 'শ্রীগুরুপ্রেষ্ঠ' বলিবার আস্পর্দ্ধাময়ী চিত্তবৃত্তিসমূহ প্রকাশিত হয়? বহির্ম্মুখতার চিরন্তন স্বভাব-বশতঃ এইরূপ চিত্তবৃত্তির প্রতি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সহানুভূতি এবং তাহার ছায়া-সম্পাতে বহু সাধক ও কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তির যে কি দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহা অবর্ণনীয়। সঙ্ঘের এই অবর্ণনীয় করোরতম পরীক্ষার দিনে ও ভয়াবহ কুজ্ঝটিকার অন্ধকারের মধ্যে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর অপ্রাকৃত হরিকথা-কীর্ত্তন-বাণ্যে শ্রীরূপরঘুনাথের কথার মূর্ত্তবিগ্রহরূপে কে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? কাঁহার জিহ্বা-প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সুখানুসন্ধানাবেশময় শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথের কথা মহোল্লাস অনর্গল অবতীর্ণ হইয়া অপরাধ-প্রবণ ব্যক্তি-গণকেও রক্ষা করিয়াছিল, বহু স্খলিতপদকে, সংশয়বাদী ও বিপরীত-ধারণা-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অলৌকিকী শ্রদ্ধা ও শরণাগতির দ্বারে আকর্ষণ করিয়াছিল? কাঁহার শ্রীমুখপদ্ম-বিগলিত শ্রীরূপরঘুনাথের বাণী নির্ব্বাপিত-প্রায় শত শত জীবন-প্রদীপকে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আরতির উপকরণ করিয়া তুলিয়াছে? কাঁহার শ্রীমুখপদ্মোদ্ভবী হইতে উৎসারিত শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথের কথা শত শত জীবের জন্ম-জন্মান্তরের বিপরীত সংস্কার শোধিত করিয়া পূর্ণানন্দময়ের কৃপায় মূর্ত্তবিগ্রহের শ্রীচরণরেণুকে জীবনের একমাত্র কাম্যবস্তু বলিয়া বরণ করাইয়াছে? 'প্রত্যক্ষং কেন বাধ্যতে?' শ্রীরূপরঘুনাথের কথা কীর্ত্তন করিলেন কে? করিতেছেন কে? জগদ্‌গুরুরূপে প্রকাশিত হইলেন কে? শ্রীরূপানুগবর শ্রীজীবের শ্রীভক্তিসন্দর্ভে লিখিত কৌটিল্য, অশ্রদ্ধা, জড়াভিনিবেশ, দাম্ভিকতা, নিজকৃত-ভক্তাভিমানিত্ব প্রভৃতির আকাশ-পাতাল-ভেদিনী জড়বল-ক্ষয়কারিণী বাক্‌পটুতা, সন্ন্যাসবক্তার বাগ্‌বৈখরী, রজস্তমো-গুণের লম্ফঝম্পপূর্ণ পৈশাচিক তাণ্ডব চক্রবিপ্রের দল সব অনুকরণ করিল, কিন্তু শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথের কথার—শ্রীশ্রীজীব-প্রভুর শ্রীভক্তিসন্দর্ভের অনুভবসিদ্ধ ব্যাখ্যার অনুকরণ করিতে ত' পারিল না! অন্তর্দ্বহির্ম্মুখদ্রষ্টার অনুকরণ করা যায় না, অনুকরণের দ্বারা জীবের জীবন পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না, স্বভাব প্রকাশিত হয় না। অনুকরণ করিয়া কেহ অনুভব বা আবেশ আনয়ন করিতে পারে না। অনুকরণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধান হয় না, তাহা অনু-সরণের কথা। অপ্রাকৃত জাতি, দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়ার স্বাভাবিক দ্রষ্টা না হইলে অনুসরণ হয় না। শ্রদ্ধা-হৃদয়ের

রূপ, যেখানে স্থান মস্তিষ্কের বৃত্তি বা কর্ম্মদক্ষতার স্থান দৈহিক বৃত্তি নহে। সুতরাং অনুকরণকারিগণ শ্রীরূপানুগ-বর শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের নানাপ্রকার ক্রিয়া-মুদ্রার অনুকরণ করিলেও শ্রীভক্তিসন্দর্ভের অনুভবসিদ্ধ কথাগুলি জগদ্-গুরু শ্রীপাদ-পদ্মের বা শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথের প্রকৃত কথার কীর্ত্তনের অনুকরণ করিতে পারিল না। অতএব শ্রীরূপের কথাই জীবজগতের গুরুরূপে—শ্রীজীবপ্রভুরূপে—অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মরূপে অবতীর্ণ হইলেন।

অন্তরে অনাদররূপ অপরাধ, অথচ বাহিরে তদর্চ্চনাদি আড়ম্বর-রূপ কৌটিল্যের দ্বারা শ্রীরূপরঘুনাথের কথার অবতার পূজিত হইবার যোগ্য নহেন জানিয়া কুটিলাঙ্গগণ স্ব-স্ব গহ্বরে আত্মগোপন করিল; অভক্তাভিনিবেশও স্ব-স্ব স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ফেলিল; ভক্তিসিদ্ধিলতা পেচকবদন বা 'বেগুন-বেচা-মুখ' আর ঢাকিয়া রাখিতে পারিল না। রাজসিকী ও তামসিকী ভক্তির পৈশাচিক ভাবগুলিও স্ব-স্ব গহ্বরে প্রবেশ করিল।

শ্রীরূপরঘুনাথের কথার কৃপাবতারের নিকট—শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর অমোঘ বীর্য্যের নিকট সকলেই তাহাদের মুখোস খুলিতে বাধ্য হইল। যাঁহারা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে একান্ত-ভাবযুক্ত হইয়া শ্রীচরণকমল-রেণুর লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য। কতকগুলি ব্যক্তি নিরপেক্ষের অভিনয়ে অবস্থিত হইল, আর কতকগুলি সমালোচকের সজ্ঞায় অপরাধী ও তথাকথিত প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে আত্ম-বিনাশ সাধন করিল। শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর বীর্য্য অগ্নিসদৃশ সর্ব্বশোধক। সেই অগ্নির সম্মুখে আসিয়াও আর্দ্র-ইন্ধনের ন্যায় যাহাদের চিত্ত শোধিত না হয়, চিরকাল দুর্গন্ধ বাষ্পেই পরিণত থাকে, তাহাদের নিশ্চয়ই কোন দুরন্ত অপরাধ আছে।

শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথের কথোপনীতা ভক্তির দ্বারা অনন্যভক্তি হইতে অনন্যভাবা ভক্তি বা ভক্তি-যোগের যে সন্ধান প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেই তিনি যে শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথের কথাকীর্ত্তনের মূর্ত্ত কৃপাবতার, তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলাবিস্তারের পর সজ্ঞ-পতিহীন যে সঙ্ঘের পরিকল্পনা, পাত্ররাজহীন পাত্র-সমষ্টিনিয়মনের যে স্বপ্ন অথবা সকল পাত্রেরই সমান অধিকার, সকলেই স্ব-স্ব প্রধান, সুতরাং পাত্রত্যাগের কোনই প্রয়োজনীয়তাই নাই—এইরূপ যুক্তি-বিরোধী, শাস্ত্র-বিরোধী ও বাস্তবতা-বিরোধী মাৎসর্য্যপূর্ণ মতবাদের যখন অভ্যুদয় হইয়াছিল এবং আমলা বা গোমস্তার দ্বারা ভক্তিপ্রতিষ্ঠান (?) পরিচালনা করিবার যে পরিকল্পনা হইয়াছিল, তাহাতে সঙ্ঘ একটী পঞ্চায়তী বা বারোয়ারী যৌথকারখানারূপে পরিণত হইত।

শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর প্রথম কথা—'সাধুসঙ্গমাত্রের নিদান—মহতের সঙ্গ। যখনই সংসার-ভ্রমণকারী জীবের সংসারক্ষয়ের সময় উপস্থিত হয়, তখনই জীবের ভাগ্যানুসারে সেই জাতীয় সাধু বা মহতের দর্শন লাভ হয়। যদি কেহ সেইরূপ মহতের দর্শন না পায়, জানিতে হইবে—তাহার বর্ত্তমান বা পূর্ব্বজন্মকৃত অপরাধ অথবা পরম্পরাগত অজ্ঞাত দুরন্ত অপরাধ নিশ্চয়ই বর্ত্তমান আছে। মহতের সাক্ষাৎ অবতার-সত্ত্বেও যদি তৎপ্রতি কাহারও মহদ্বুদ্ধি বা মঙ্গলোদয় না হয়, তবে মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ শ্রীনারদের দর্শন সর্ব্বক্ষণ লাভ করিয়াও দেবতাগণের শ্রীনারদকে সাধারণ পুণ্যবান্ ঋষিরূপে দৃষ্টির ন্যায় মহতের শ্রীচরণে কোন না কোনরূপ প্রচ্ছন্ন অনাদর, অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস, সংশয় বা কৌটিল্যরূপ দুরন্ত অপরাধ আছে জানিতেই হইবে।' পৃথিবীতে মহতের অভাব কল্পনা করা বা মহতের আবির্ভাব-সত্ত্বেও মহতের শ্রীচরণে শরণাগত না হওয়ারূপ যে দুরন্ত অপরাধ, বহির্ম্মুখ জগতের যে দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি, তাহার বিশ্লেষণ শ্রীশ্রীজীবপ্রভু যেভাবে করিয়াছেন, ঠিক তাহার অবিকল একটী বিরাট্ প্রতিচ্ছবি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলার পর প্রকাশিত হইয়াছিল। অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণ তাহাদের এই জঘন্যতম মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধিটিকে ব্যষ্টিগত হইতে সমষ্টিগত, ব্যক্তিগত হইতে সঙ্ঘগত করিবার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার অকথ্য ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। যখন এই জঘন্যতম ব্যাধিকে কল্পিত অর্থাৎ অপাত্রীয়, অধমাধিকারোচিত হেত্বাভাস বা ছলের মধ্য দিয়া পাত্রত্বজ্ঞানহীন পাত্রসঙ্ঘ, গণেশহীন গণ, কর্ণধারহীন প্রতিষ্ঠান, গুরুহীন সম্প্রদায়, পঞ্চায়তী বা বারোয়ারী যৌথকারখানার ন্যায় কেবল কর্ম্ম-দক্ষতার দ্বারা, প্রীতিহীন জড়বলকণ্ডূয়নকারী বাগ্বৈখরীর দ্বারা, শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের সন্তোষচেষ্টালেশহীন প্রচারের নামে লাভ-

পূজা-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের অভিসন্ধির দ্বারা পরিচালনা করিবার পরিকল্পনা হইয়াছিল, সেই সন্ধিক্ষণে প্রাপঞ্চিকতাকারী দুর্গন্ধ বাষ্পব্যাপ্ত জগতে—

"সাধু পাওয়া বড় ভাগ্যের জানিয়া।
সাধুভক্তরূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া।"

(প্রেমবিবর্ত্ত)

—এই মহাজনোক্তি সার্থক করিয়া শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম শ্রীশ্রীভক্তিসুহৃদ্দের নিষ্কাম্বরীয় কীর্ত্তনকারী বিগ্রহরূপে—শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথের কথা-কীর্ত্তনের কৃপাবতাররূপে—'পরম-করুণ' প্রভুদ্বয়ের কৃপার মূর্ত্তবিগ্রহরূপে—শ্রীজাহ্নবীদেবীশক্তির অপ্রাকৃত দূতরূপে—শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর বরপুত্ররূপে—পরম-সর্ব্বগ্রহারী গৌড়ীয়গুরুগণের নয়নতারারূপে জীবজগতে উদিত হইলেন।

শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথের প্রথম কথাই—শ্রদ্ধা। অশ্রদ্ধালুর সঙ্গ ভক্তিসঙ্গ বা ভক্তি-প্রতিষ্ঠান নহে; অতএব সর্ব্বাগ্রেই শ্রদ্ধালু-নির্ব্বাচন হইল। শ্রীরূপরঘুনাথের কথা শুনিবে কে? গ্রহণই বা করিবে কে? অশ্রদ্ধালু কখনও বৈকুণ্ঠকথা শ্রবণ করিতে পারে না। শ্রদ্ধালুর মধ্যে আবার তারতম্য আছে। লৌকিক-শ্রদ্ধালুর যে অধিকার, শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধালুর অধিকার তাহা হইতে অনেক বড়। লৌকিক-শ্রদ্ধা সত্ত্বগা, তাহা আরোপসিদ্ধা ভক্তির কারণ; আর শাস্ত্রার্থাববারণ-জাতা যে নির্গুণা শ্রদ্ধা, তাহা সঙ্গসিদ্ধা বা নির্গুণা শুদ্ধা ভক্তির কারণ। লৌকিকী শ্রদ্ধার দ্বারা শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথের কথা বুঝা যায় না, তাহাতে নির্গুণা শ্রদ্ধার প্রয়োজন হয়। নির্গুণা শ্রদ্ধার বাহ্যলক্ষণ—ভগবৎসম্বন্ধী দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে বিশ্বাস এবং তাহার অন্তর্লক্ষণ—ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ প্রাপ্তবস্তুর লাভে বা বিনাশে অবিহ্বলতা। এইরূপ শ্রদ্ধার উদয় হইলে মহৎকীর্ত্যমান উপদেশের শুশ্রূষার জন্য নিরন্তর উৎসাহময়ী অনুবৃত্তি হয়। তখন দুষ্ট ও প্রতিষ্ঠাদিময়ী চেষ্টার লেশমাত্র থাকে না; সমগ্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র পাত্ররাজ যে শ্রীগুরু-পাদপদ্ম, তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধও থাকে না। মহতের সেবা না করিলে এই শ্রবণযোগ্যতা লাভ হয় না। কায়মাঠ্য, মনঃপাঠ্য ও বাক্‌পাঠ্য থাকিলে শ্রবণ হয় না। মহদ্ব্যবিভাবিত ও মহৎকীর্ত্যমান উপদেশ কায়মনোবাক্যের দ্বারা সৎকারপূর্ব্বক কর্ণপুটে পানই শ্রবণ। ইহার দ্বারা অবিচ্ছিন্ন অমৃতধারাবৎ শ্রবণানুবৃত্তি বা ভগবৎসাক্ষাৎকার হয়। নির্গুণা শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, লৌকিকী শ্রদ্ধা—যাহা আরোপসিদ্ধা ভক্তির কারণ, তাহা উদিত হইলেও কর্ম্মফল আত্মসাৎ করিবার অভিলাষ থাকে না। সেখানে অভিনয় করিয়া সংবাদপত্রের স্তম্ভে, প্রস্তর-ফলকের গাত্রে, শুষ্ক-বৈষ্ণবের মুখে প্রশস্তি দেখিবার বা শুনিবার যে চিত্তবৃত্তি, তাহা কর্ম্মফল-পরিত্যাগকারী অত্যন্ত প্রাথমিক ভাগবত-ধর্ম্মযাজীর চিত্তবৃত্তির মধ্যেও নাই। সুতরাং উহা রাজসিকী বা তামসিকী ভক্তির অভিনয়।

শ্রীরূপরঘুনাথের কথা সরাগবক্তা কীর্ত্তন করিতে পারে না। নিরন্তর চিদ্‌বিলাসানুভববুক্ত বীতরাগ বক্তাই তাহা কীর্ত্তন করিতে পারেন। ইহাই শ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীজীব প্রভুর অভিমত। অতএব বক্তৃনির্ব্বিশেষে শ্রীরূপরঘুনাথের কথা-কীর্ত্তনকারী হইতে পারে না। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী যদি সকলের প্রতিও বর্ষিত হইয়া থাকে, তথাপি একমাত্র বীতরাগ-বক্তার মধ্যেই তাহা সার্থকতা-মণ্ডিত হইবে। স্বাতী-নক্ষত্রের জল চরাচর বস্তু-নির্ব্বিশেষে পতিত হইলেও সকল বস্তু হইতেই পঞ্চরত্নের আবির্ভাব হয় না। হস্তী, গো, মৃগ, সর্প ও শুক্তিরূপ আধারে পৃত হইলেই গজমুক্তা, গোরোচনা, মৃগনাভি, মণি ও মুক্তা—এই পঞ্চরত্নের আবির্ভাব হয়। শ্রীরূপানুগবর শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু বলেন—"শ্রীভগবৎ-কৃপা মহৎকে দ্বার করিয়াই অবতীর্ণ হয়, স্বতন্ত্রভাবে অবতীর্ণ হইতে পারে না।" সুতরাং যাহাদের মত—'মহদ্-ব্যতীতও সঙ্গের অস্তিত্ব থাকিতে পারে', তাহারা ভগবৎকৃপার প্রতি দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে। আমরা কিন্তু অত্যন্ত অযোগ্য বলিয়া একমাত্র কৃপারই কাঙ্গাল। জাহ্নবীদেবীর দূতরূপ মহৎ যদি সেই কৃপাবিতরণ না করেন, তবে কাহারও তাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই বা এ পর্য্যন্ত কেহ পান নাই। অতএব আমরা প্রতিষ্ঠাশ্রিত শ্রীগুরুপাদপদ্মের পাদত্রাণের তলে নিত্য আশ্রয়ই ভিক্ষা করি।

'দিল্' ও'র 'দিমাগ্'

'দিল্' এই ফার্সী শব্দের অর্থ 'হৃদয়', আর 'দিমাগ্' এই আরবী শব্দের অর্থ 'মস্তিষ্ক'। দিল্ (হৃদয়) রুচির আধার ও দিমাগ্ (মস্তিষ্ক) বিচারের আধার। বিমুখ জীবের উন্মুখতা-লাভের দুইপ্রকার পথ—(১) বিচারপ্রধান পথ ও (২) রুচিপ্রধান পথ। অজাতরুচির পক্ষে বিচারপ্রধান মার্গ। রুচিপথে মহতের চরণে অপরাধ থাকিলে বিচারপ্রধান পথের প্রতি প্রবলতা হয়। মনস্তোষক ও রুচিবর্দ্ধক হরীতকীকে কষায় ও তিক্ত বোধ করিয়া পরিত্যাগ করিলে পেঁয়াজের খোসা ছাড়াইবার প্রবৃত্তি হয়। খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে ভিতরে কোন বাস্তব বস্তুই পাওয়া যায় না; কেবল সময়ক্ষেপ ও পরিশ্রম সার হয়, হস্তও দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া পড়ে।

যাহার সত্তাতে সকলের সত্তা—যাহার অমরতাতে সকলের অমরতা, তাহাই হৃদয়। হৃদয় থাকিলে প্রাণীর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সচেতন থাকে, হৃৎপিণ্ড বন্ধ হইয়া গেলে মৃত্যু হয়। হৃদয়ের কথা সমস্তই অন্তর্মুখী, আর মস্তিষ্কের কার্য্য কেবল অন্তরিন্দ্রিয়দমন, এইজন্য তাহা বাহিরেরমুখী। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেলে মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ সুস্থ থাকিলেও মৃত্যু অনিবার্য্য; আর মস্তিষ্ক বিকৃত হইলেও যদি হৃদয়টি সুস্থ থাকে, তাহা হইলে মৃত্যু ত' হয়ই না, পরন্তু কোন না কোনদিন মস্তিষ্কের বিকৃতিও দূর হইতে পারে।

স্বভাবের আধার—হৃদয়; আর বিচারের আধার—মস্তিষ্ক। হৃদয়ের স্বভাবের নাম 'রতি' বা 'প্রীতি'। হৃদয়স্থ হওয়াকেই 'কূটস্থ-অবস্থা' বলে। চতুর্মুখ ব্রহ্মা কেবল মস্তিষ্ক বা মনীষার দ্বারা বেদবিচারে সমর্থ হন নাই। তাঁহার মস্তিষ্ক-চতুষ্টয় থাকিলে কি হইবে, তিনি বেদের সমগ্র তাৎপর্য্য মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া ধারণা করিতে পারিলেন না। কূটস্থ বা হৃদয়স্থ হইয়াই শ্রীহরিতে রতিপ্রদ ভক্তিযোগাখ্য বস্তু নিশ্চয় করিতে পারিলেন।

"ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্নেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ॥"

(শ্রীভা ২।৯।৩৪)

ভগবান্ ব্রহ্মা কূটস্থ অর্থাৎ হৃদয়স্থ বা একাগ্রচিত্ত হইয়া সকল বেদশাস্ত্র স্বীয় মনীষার দ্বারা তিনবার বিচারপূর্ব্বক যাহা হইতে শ্রীহরিতে রতির আবির্ভাব হয়, সেই ভক্তি-যোগাখ্য বস্তু নিশ্চয় করিয়াছিলেন। এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, কূটস্থ বা হৃদয়স্থ না হইলে কেবল মনীষার দ্বারা সকল জীবজগতের পিতামহ চতুর্মুখ ব্রহ্মাও বেদশাস্ত্রের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে পারেন না। ব্রহ্মার মস্তিষ্ক চারিটী বা বহু, কিন্তু হৃদয় একটী। মস্তিষ্ক-চতুষ্টয় বা অনন্ত মস্তিষ্ক সেই এক হৃদয়ের অধীন হইয়া বেদের তাৎপর্য্য যে ভক্তিযোগ, তাহা নির্ণয় করিয়াছিলেন। অতএব হৃদয়ের অনুগত মস্তিষ্কই তত্ত্ব-নির্ণয়ে সমর্থ। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—

"তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।"

সেই স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম ভগবান্ ব্রহ্মার বুদ্ধিবৃত্তি প্রবর্ত্তন করিয়া হৃদয়ের দ্বারা তত্ত্ববস্তু বা বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। হৃদয়েরই দ্বারাই তত্ত্ববস্তুর প্রকাশ হয়। মস্তিষ্কের দ্বারা, মনীষার দ্বারা, বিচারের দ্বারা তত্ত্ববস্তু নির্ণয় করিতে গেলে ব্রহ্মাদির ন্যায় সূরিগণও মোহগ্রস্ত হন।

মস্তিষ্কের দ্বারা অন্তরিন্দ্রিয়দমনপূর্ব্বক জ্ঞান পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে, আর হৃদয়-দ্বারা বিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভব বা সাক্ষাৎকার লাভ হয়। মস্তিষ্কের পথে অন্তরিন্দ্রিয়দমনপূর্ব্বক যে জ্ঞান, তাহা কূপের ধারের উপরে ভ্রমণ করিবার বুদ্ধির ন্যায় বিপজ্জনক। মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের মিশ্রণে পরমাত্মোপাসনা-যোগের উৎপত্তি। কর্ম্মার্পণ করিয়া বা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা যে পরমাত্মা, তৎপ্রতি বিমুখ বা বিপথগামী ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিতে করিতে হৃদয়স্থ বা কূটস্থ পুরুষের দিকে একমুখী করিবার যে চেষ্টা, তাহাই রাজযোগ। এইরূপ চেষ্টায় কৃত্রিমতা ও মস্তিষ্কের কার্য্য আছে; কিন্তু ইহার মধ্যে ধ্যান ও ধারণারূপ ভক্তির একটু সামান্য মিশ্রণ থাকায় অর্থাৎ তাহা ভক্তিবিশেষ হওয়ায় যোগ ফলদায়ক বা মুক্তি-প্রাপ্ত হয়। ভক্তির আকার ধ্যান, ধ্রুবানুস্মৃতি ও সীমাবদ্ধের অধীন না হইলে পরমাত্মার উপাসনা কার্য্যকরী হইতে পারে না। পরমাত্মা-উপাসক হৃৎকমলে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ বা অনিরুদ্ধ বিষ্ণু—যিনি গীতার পরিভাষায় 'অধিযজ্ঞ পুরুষোত্তম' এবং শ্রীমহাভারতে মোক্ষধর্ম্ম-নারায়ণীয়ে 'মহাত্মা' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তাঁহারই ধ্যান করেন।

"কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদাবকাশে, প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ-গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি॥"
(শ্রীভা ২।২।৮)

কোন কোন যোগিপুরুষ স্ব-স্ব দেহের অভ্যন্তরস্থ হৃদয়পদ্মে বিরাজিত চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধৃক্ তর্জ্জনী-অঙ্গুষ্ঠের বিস্তার-প্রমাণ পুরুষকে ধারণার দ্বারা স্মরণ করিয়া থাকেন। পরমাত্মোপাসক মহাত্মারা ধ্যান বা তদ্রূপ-বৈভবের উপলব্ধি না করিয়া হৃৎকমলেই তাঁহাকে ধ্যান করেন। এই ধ্যানে ভক্তির আকার আছে—আবেশ আছে। ধ্যান হৃদয়ের দ্বারাই হয়, মস্তিষ্কের দ্বারা হয় না।

ব্রহ্মা স্বয়ং মোহহীন হইয়াও যখন বিশ্ব-বিমোহন শ্রীকৃষ্ণকে মুগ্ধ করিবার উপক্রম করিলেন, তখন বৈশারদী বিকুণ্ঠমায়ার প্রভাবে মোহগ্রস্ত হইলেন। যেরূপ খদ্যোতের আলোক সূর্য্যালোকের নিকট তিরস্কৃত হয়, সেইরূপ নিজের মায়া মহাপুরুষের প্রতি প্রযুক্তা হইয়া, কিছুই করিতে পারিলেন না, পরন্তু নিজেরই লাঘবী নাশ করিলেন। ব্রহ্মা ব্রজবনে ক্রীড়াশীল শ্রীকৃষ্ণের গো-বৎস ও গো-পালকগণকে অন্যত্র লইয়া গিয়া স্বয়ং অন্তর্হিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই গোবৎস ও গোপালকরূপে প্রকাশিত হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা মানবের একবৎসর পরিমাণ পরে পুনরায় সেই বনে আসিয়া দেখিলেন—শ্রীহরি পূর্ব্বেরই ন্যায় গোপালক ও গোবৎসগণের সহিত ক্রীড়ারত আছেন। তখন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন,—'গোকুলে যে-সকল গোপবালক ছিল, আমি গোবৎসগণের সহিত তাহাদিগকে যোগনিদ্রায় শায়িত করিয়া রাখিয়াছি। তাহারা আজ পর্য্যন্ত উত্থিত হয় নাই। কিন্তু আমার মায়ায় মোহিত বালকগণের অতিরিক্ত, তাহাদের সমসংখ্যক এই সকল বালক এখন কোথা হইতে আসিয়া একবৎসর যাবৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতেছে?' ব্রহ্মা এইরূপে বহুকাল চিন্তা করিয়াও কল্পিত ও শ্রীকৃষ্ণ-প্রকাশিত বালকগণের মধ্যে কাহারা সত্য ও অসত্য, তাহা কোনরূপে জানিতে সমর্থ হইলেন না। যখন মস্তিষ্ক-চতুষ্টয়ের মনীষা সম্পূর্ণ পরাজয়-গ্রস্ত হইয়া পড়িল, তখন ব্রহ্মা হৃদয়ের দ্বারা শরণাগত হইয়া মস্তিষ্কের বিচারপর বা অতদ্বিরসনের পথকে নিন্দা করিতে করিতে শ্রীতির আধার হৃদয়ের যে অকৈতব-ভক্তিযোগ, তাহারই মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥"
(শ্রীভা ১০।১৪।৩)

মস্তিষ্কের বৃত্তি যে জ্ঞান, তাহাতে প্রয়াস অনুমাত্রও না করিয়া সাধুগণের নিবাসে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাদের শ্রীমুখ হইতে স্বতঃ নিত্যপ্রকটিত আপনার নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদির কথা কর্ণাঞ্জলিতে পান করিয়া যাঁহারা সেই শ্রুতিগতা কথাকে বিশেষভাবে কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা সংকার-পূর্ব্বক জীবনধারণ করেন, যদিও তাঁহারা অন্য কিছুই না করেন, হে অজিত! আপনি ত্রিলোকের অন্য সকলের দ্বারা অজিত হইয়াও তাঁহাদের দ্বারা বশীভূত হন অর্থাৎ প্রীতির আধার হৃদয়ই আপনাকে বশীভূত করিতে পারে, জ্ঞানের আধার মস্তিষ্ক পারে না। মস্তিষ্ক দ্বারা ভালবাসা যায় না, হৃদয়ের দ্বারাই ভালবাসা যায়। এই প্রতিবিম্বিত জগতেও মাতা যে পুত্রকে ভালবাসেন, কাপ্তা যে কান্তকে ভালবাসেন, তাহাতে মস্তিষ্কের ক্রিয়া নাই। বিচার করিয়া ভালবাসা যায় না। ভালবাসা হৃদয়ের স্বাভাবিকী বৃত্তি। শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে আরও বলিতেছেন,—

"শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥" (শ্রীভা ১০।১৪।৪)

ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ হৃদয়ের আশ্রয় ব্যতীত কেবল মস্তিষ্কের দ্বারা তত্ত্ববস্তু জানা যায় না। সরোবর হইতে নির্গত নির্ঝরসমূহের মত যে ভক্তি হইতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থসমূহের নির্গম হয়, এইরূপ নিখিল-মঙ্গল-জননী তোমার ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা জ্ঞানসাধনের জন্য যত্নবান্ হন, তাঁহাদের কেবলমাত্র ক্লেশই ফলরূপে লাভ হইয়া থাকে। যেমন অল্পপরিমাণ ধান্য ত্যাগ করিয়া অন্তঃসারহীন স্থূল-খড়্কাতাসরাশি যাহারা অবঘাত করে (কুটিয়া থাকে), তাহাদের যেমন কোন ফল অর্থাৎ তণ্ডুল লাভ হয় না, কেবল ফলরূপে হাতের বেদনাই হয়, সেইপ্রকার যাহারা ভক্তিকে তুচ্ছ করিয়া কেবল-বোধ-লাভের জন্য প্রযত্ন করিয়া থাকে, তাহাদের কেবল তপস্যাদি শ্রমই লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে আরও বলিলেন যে, শাস্ত্রে যে যথা যথা জ্ঞানোপদেশ করা হইয়াছে, সেই জ্ঞানও ভক্তির অন্তর্ভুক্তরূপে লাভ করিতে পারা যায়। কেবল জ্ঞান স্বতন্ত্রভাবে পাইবার সম্ভাবনা নাই। এইজন্য শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া বলিতেছেন,—

"পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিন-
স্ত্বদর্পিতেহা নিজকর্মলব্ধয়া।
বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া
প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুত তে গতিং পরাম্॥"

(শ্রীভা ১০।১৪।৪)

হে ভূমন্! আপনি স্বরূপে ও গুণে পরিপূর্ণ-ভগবৎস্বরূপ; ব্রহ্ম স্বরূপে পূর্ণ বটে, কিন্তু গুণ-রহিত। এই পৃথিবীতে পূর্বে অনেক মহাভাগ্যযোগিগণ রাশি-রাশি যোগসাধনে জ্ঞান-লাভ করিতে না পারিয়া, পরে তাঁহাদের লৌকিক ও নিজ নিজ কর্মসমূহ আপনাতে অর্পণপূর্বক তৎফলে মহৎকৃপায় ভগবৎকথায় রুচিরূপা ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন; আবার কথোপনীতা অর্থাৎ ভগবৎকথা-প্রভাবে ভগবৎসান্নিধ্য-কারিণী পুনরায় কথনীয়া রুচিরূপা অর্থাৎ কীর্ত্তনীয় শ্রীভগবানে রুচি অর্থাৎ আবেশময়ী ভক্তিদ্বারাই সুখে আয়তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীভগবত্তত্ত্ব পর্য্যন্ত উপলব্ধিপূর্বক আপনার শ্রীতিমাধুর্য্যানুভবরূপ পরমাস্তরঙ্গা গতি বা সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন।

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"

(শ্রীভা ১০।১৪।৮)

অতএব যে ব্যক্তি নিজোপার্জ্জিত কর্মফলরূপ পারিব সুখদুঃখ ভোগ করিতে করিতে তাহাকে তোমার কৃপার ফলরূপেই জানিয়া হৃদয়, বাক্য ও কায়ের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে নমস্কার বিধানপূর্বক জীবনধারণ করেন, সেই ব্যক্তি সংসার হইতে মুক্তি ও তোমার পদসেবা—এই আনুষঙ্গিক ও মুখ্য ফল-দুইটিতে দায়ভাগী হন। সুকৃতির দায়প্রাপ্তিতে যেরূপ জীবনই কারণ, তদ্রূপ ভক্তেরও জীবন অর্থাৎ ভক্তিমার্গে স্থিতিই কারণ।

"তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥"

(শ্রীভা ১০।১৪।২৯)

হে দেব! হে ভগবন্! জীবাত্মার যে ব্রহ্মসুখানুভব, তাহাও কেবল আপনার ভক্তিলেশের দ্বারাই হয়, অন্য উপায়ে হয় না। যদিও শুদ্ধ জীবাত্মা মায়া ও মায়িক-অংশ-বিচ্যুত, তথাপি আপনার শ্রীচরণকমলের কৃপালেশে অনু-গৃহীত জীবাত্মাই আপনার মহিম-শব্দ-বাচ্য যে 'ব্রহ্ম', তাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারে। আপনি মৎস্যদেবরূপে বলিয়াছেন যে, আপনার মহিমাই 'পরব্রহ্ম'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত এবং আপনার দ্বারাই অনুগৃহীত; আপনি ভগবৎস্বরূপে অনুগ্রাহক এবং আপনার মহিমারূপ পরব্রহ্ম আপনার অনুগৃহীত অধীন তত্ত্ব। যে জীব আপনার কৃপালেশের দ্বারা অনুগৃহীত নহে, এরূপ কেহই দীর্ঘকাল বহুশাস্ত্রাভ্যাস, যোগাভ্যাস, জ্ঞানাভ্যাসাদির দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব বিচার করিয়াও তাহা জানিতে পারে না।

"তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিবসে তব পাদপল্লবম্॥"

(শ্রীভা ১০।১৪।৩০)

হে নাথ! এই ব্রহ্মজন্মেই হউক, কিংবা পশুপক্ষী প্রভৃতির মধ্যে বা তির্য্যগ্‌যোনি প্রভৃতি জন্মেই হউক, যাহাতে আমি আপনার নিজ জনগণের সেবকের অন্যতম হইয়া আপনার শ্রীচরণকমল সেবা করিতে পারি, আমার সেইরূপ মহাভাগ্য লাভ হউক।

"তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্।
যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ-
স্ত্বন্নাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব॥"

(শ্রীভা ১০।১৪।৩৪)

জগতের ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি বা সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা মুক্তিকে আমি জলাঞ্জলি দিয়াছি। 'কিরূপে শ্রীব্রজবাসিগণের চরণধূলি লাভ হয়'—ইহাই আমার একমাত্র ভাবনার বিষয়। এইজন্য

আমি শ্রীবৃন্দাবনে কোন কোমল-তৃণ-গুল্মাদি-জন্ম প্রার্থনা করি। আপনার প্রেমময়ি ব্রজবাসিগণ যদি কখনও সেই কোমল তৃণাদির উপর তাঁহাদের শ্রীচরণকমল বিন্যাস করিয়া যথেচ্ছাচার বিচরণ করেন, তখন আমি ধন্যাতিধন্য হইব। কিন্তু সেইরূপ অতি তুচ্ছ বিষয়ে লোভ করিবারই বা আমার কি যোগ্যতা আছে? অতএব আমি শ্রীবৃন্দাবনের তৃণ-জন্মের আশাও পরিত্যাগ করিয়া যথোপযুক্ত অন্য একটি বর আপনার নিকট প্রার্থনা করি। গোকুলে অথবা গোকুলনগরীর প্রান্তে হাড়ি, ডোম বা অন্য কোন নীচজাতির চরণরজোঽভিষেক যেখানে হয়, এইরূপ কোন স্থানে শিলাপীঠাদি কোন জন্ম যেন আমার হয়। যদি বলেন,—'শ্রীব্রজবাসিগণের এইরূপ আনুগত্যের কি কারণ এবং জগৎপূজ্য জগৎস্রষ্টা পরমেষ্টি তোমার গোকুলস্থ নীচজাতিগণের পদধূলিতে নির্লজ্জের ন্যায় এরূপ লোভেরই বা কারণ কি?' তদুত্তরে বলিতেছি,—"সৌন্দর্য্য-সৌন্দর্য্যাদিগুণবিশিষ্ট শ্রীভগবান্—যাঁহার শ্রীমুখে সর্ব্বদা কুন্দপুষ্পবৎ হাস্য বিরাজিত, সেই শ্রীবৃন্দের মনঃপ্রাণই শ্রীব্রজবাসিগণের একমাত্র জীবাতু; ভোজন-পানাদি তাঁহাদের জীবনোপায় নহে। অধিক কি, শ্রীব্রজবাসিগণের পরমঃ অনাদিকাল হইতেই অদ্যাপি নিখিল বেদের শিরোভাগ উপনিষৎসমূহ কেবল অনুসন্ধান করিতেছেন, কিন্তু লাভ করিতে পারেন না। আমি ত আর শ্রুতিসমূহ হইতে অধিক নহি; সুতরাং শ্রুতিগণই যাঁহাদের শ্রীচরণরজের কাঙ্গালিনী হইয়াছেন, তাঁহাদের শ্রীচরণরজঃপ্রাপ্তির লোভ করিতে আর লজ্জা কি? অতএব হে নাথ! আমি ব্রজবাসিগণের অনুগামিত্ব প্রার্থনা করি। আমাকে রাগানুগামৃতাম্বুধিতে নিমজ্জিত করুন,—ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

শ্রীব্রহ্মা মস্তিষ্কের দ্বারা—মনীষার দ্বারা ভাগবত-তত্ত্ব বিচার করিতে গিয়া তাঁহার মনীষাজাত মায়ার কবলে মায়াধীশ ভগবান্‌কে কবলিত করিতে চেষ্টা করিয়া যখন সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হইয়া নিজেই মোহিত হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি মস্তিষ্কের সমস্ত চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া প্রীতির আধার যে হৃদয়, সেই হৃদয়ের সমগ্রতার দ্বারা—প্রাণকোটীর দ্বারা একমাত্র হৃদয়বন্ধু, ব্রজবাসিগণের হৃদয়েশ্বর, হৃদয়রাজ, হৃদয়-সর্ব্বস্ব, হৃদয়বল্লভ, হৃদয়-বৈভব শ্রীবৃন্দের সেবায় লোলুপবিশিষ্ট হইলেন। শ্রুতিও এই হৃদয়ের মহিমা গান করিয়াছেন—

"এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ" (মুণ্ডক ৩।১।৯)।

হৃদয়ের মধ্যে বিচিত্রতা বা বিলাস আছে, মস্তিষ্কে বিলাস নাই। মস্তিষ্ক একটা দিক্ বোধে অর্থাৎ 'নেতি, নেতি' করিয়া নির্ব্বিশেষে পৌঁছিতে চায়। এইজন্য ব্রহ্মা শ্রীভগবান্‌কে বলিলেন—"হে ভগবন্!' আপনার যে মহিমস্বরূপ ব্রহ্ম, তাঁহার জ্ঞান আপনার শ্রীপাদপদ্মের প্রসাদের লেশে অনুগৃহীত হইলেই লাভ হয়।" অনাদি-অনন্তকাল বিচার করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। হৃদয়ের অধীন মস্তিষ্ক বা মনীষাই সত্তা বস্তু উপলব্ধি করিতে পারে। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষাচ মনীষিণাম্।
যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্।"
(শ্রীভা ১১।২৯।২২)।

আমার ভজনই 'বুদ্ধি' অর্থাৎ বিবেক, 'মনীষা' অর্থাৎ চাতুর্য্যের ফল। সত্য ও অমৃতস্বরূপ আমাকে অসত্য, মর্ত্য, বিনাশী মনুষ্যদেহের দ্বারা এই জন্মেই যে লাভ করা যায়, তাহাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের যথার্থ বুদ্ধি এবং মনীষিগণের প্রকৃত মনীষা।

রুচিপ্রধান-পথে যে বিচার নাই, তাহা নহে। রুচির মধ্যেই বিচার অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু কেবল বিচারের মধ্যে রুচি না থাকিতে পারে। বিচার-জিনিষটী অবাস্তব, আর অনুভব বা আস্বাদন-জিনিষটী বাস্তব। মিছরির বিচার করা অপেক্ষা মিছরির আস্বাদনে অধিক বাস্তবতার উপলব্ধি বা সুখানুভব হয়; কেবল সুখানুভব নয়, মিছরির সমগ্রতা বা সত্তার এবং আস্বাদকের সমগ্রতা ও সত্তার সার্থকতা সম্পন্ন হয়। বুদ্ধির দ্বারা ব্রহ্মানন্দেরও বিরূপণ হয় না, প্রেমানন্দ ত' দূরের কথা। এইজন্যই তৈত্তিরীয়োপনিষৎ প্রজাপতির আনন্দ-পর্য্যন্ত মস্তিষ্ক বা মনীষার দ্বারা পরিমাণ করিয়া পরে বলিলেন,—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" (তৈঃ ২।৯।১) অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দের পরিমাণ না পাওয়ায় যাহা হইতে মনের সহিত বাক্য নিবৃত্ত হয়।

হৃদয়হীন মস্তিষ্কের দ্বারা এ জগতে যেরূপ মৃত্যু অনিবার্য্য, তদ্রূপ হৃদয়হীন অর্থাৎ প্রীতিহীন মস্তিষ্ক অর্থাৎ বিবেক বা জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা পতন অনিবার্য্য।

শ্রীপৃথুর প্রতি জ্ঞানোপদেশের পর শ্রীসনৎকুমার বলিলেন,—

"যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥
কৃচ্ছ্রো মহানিহ ভবার্ণবমপ্লবেশাং
ষড়্বর্গনক্রমসুখেন তিতীর্ষন্তি।
তৎ ত্বং হরের্ভগবতো ভজনীয়মঙ্ঘ্রিং
কৃত্বোডুপং ব্যসনমুত্তর দুস্তরার্ণম্॥"

(শ্রীভা ৪।২২।৩৯-৪০)

যাঁহার পাদপল্লবর্ষিত অঙ্গুলি-কৃপাণির স্মরণপ্রভাবে সাধুগণ কর্ম্মগ্রথিত অহঙ্কাররূপ হৃদয়গ্রন্থিকে অনায়াসে ছেদন করিতে সমর্থ হন, কিন্তু যাঁহারা নির্ব্বিষয়-বুদ্ধি ও যাঁহারা ইন্দ্রিয়-সমূহকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়াছেন, এইরূপ যোগিগণও নিজচেষ্টায় তদ্রূপ ফললাভে সমর্থ হন না, সেই শরণ্য শ্রীবাসুদেবকেই ভজন কর। যাহাদের কামাদি ষড়্বর্গসঙ্কুল ভবার্ণবোত্তরণের ভেলা শ্রীপরমেশ্বরের পাদপদ্ম নহে অর্থাৎ যাহারা শ্রীভগবানে শরণাগত নহে, সেইরূপ-যোগিগণ মহাক্লেশকর উপায়ে পরম আয়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবার প্রয়াসী হইলেও তাহাতে অসমর্থ হয়। অতএব হে রাজন্! তুমি একমাত্র ভজনীয় শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মকে নৌকারূপে স্বীকার করিয়া ব্যসনরূপ দুস্তর সমুদ্র উত্তীর্ণ হও। ভক্তিবিরহিত যোগিগণ ভবসমুদ্রোত্তরণের ইচ্ছা করেন মাত্র, কিন্তু উত্তীর্ণ হন না।

যাঁহারা কেবল মস্তিষ্কের বিচার-দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তাঁহাদের সেই জ্ঞান সত্ত্বগুণ-সম্বন্ধে আবির্ভূত হইয়া থাকে, তাহা নির্গুণ নহে। ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীভগবানে পরাখ্যা ভক্তির পরিকররূপে ব্রহ্মানুভব করিয়া থাকেন, এইজন্য তাহা নির্গুণ। যাহা ভগবৎপ্রসাদ বা ভগবৎ ও ভাগবত-কৃপা-শক্তিলব্ধ নহে, তাহা নিশ্চয়ই নির্গুণ নহে। নির্ভেদ-ব্রহ্মানুভবরূপ মোক্ষ শ্রীভগবানের প্রসাদ হইতে উত্থিত নহে; যেহেতু, যাহারা শ্রীভগবান্‌কে দ্বেষ করিয়া থাকে, তাহারাও শ্রীহরির হস্তে নিহত হইয়া সাযুজ্যমুক্তি লাভ করে। সুতরাং যাহা ভগবদ্বিদ্বেষিগণের প্রাপ্য, সেইটি কিরূপে সাধকগণের সাধন-তুষ্ট শ্রীভগবানের প্রসাদ বা অনুগ্রহ হইতে পারে? অধিক কি, ব্রহ্মাদিগের আদিগুরু চতুঃসনাদিও সেই অভেদব্রহ্মানুভবাত্মক মোক্ষকে ভগবৎ-প্রসাদ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, শ্রীনারদ, শ্রীউদ্ধব, শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীধ্রুব, শ্রীপৃথু, শ্রীঅম্বরীষ—এই সকল পরমবিজ্ঞ ভক্তি-রসিকগণ ত' স্বীকার করেনই নাই। নিখিল জ্ঞান ও ক্রিয়া-শক্তির প্রবর্ত্তক—শ্রীভগবান্; সুতরাং তাঁহারই সুখানু-সন্ধানোদ্দেশে প্রযোজিত যে জ্ঞান ও ক্রিয়া-স্বরূপা শ্রীহরি-ভক্তি, তাহা নির্গুণ। অতএব প্রীতির আধার হৃদয়ের বৃত্তি আত্মবৃত্তি—নির্গুণ, কিন্তু মস্তিষ্কের বৃত্তি জ্ঞান—সগুণ। তবে যে জ্ঞান ভক্তিযোগ-সমন্বিত অর্থাৎ ভক্তির আনুগত্যকারী, তাহা নির্গুণ, উহাই প্রীতির আধার হৃদয়ের অনুগত বিচারেই শ্রীভগবানের সন্তোষ-বিধানে সমর্থ।

"যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্।"

(শ্রীভা ১।৫।৩৪)

এই সংসারে ভগবদাজ্ঞা-পালনরূপ প্রীণনরূপ যে কর্ম্মার্পণ বিহিত হয় ও সেই কর্ম্মার্পণের ফলরূপ যে জ্ঞান, তাহা নিশ্চয়ই ভক্তিযোগের আশ্রিত অর্থাৎ অনুগত বা অনুচর; ভক্তিযোগের সহচরত্ব-হেতু এই জ্ঞান ভগবদ্‌জ্ঞান, নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান নহে।

শ্রীপ্রহ্লাদের যে ব্রহ্মদর্শন বা অহংগ্রহোপাসনা-প্রতিম ভাব দৃষ্ট হয়, তাহা নির্ব্বিশেষজ্ঞান নহে, তাহা অপ্রাকৃত কৃতভক্তি—জ্যোতির মধ্য দিয়া জ্যোতিরভ্যন্তরস্থ চিদ্‌বিলাস-রূপ-দর্শন। শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (১৩৫ অনুচ্ছেদ) যে দ্বিবিধ ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলিয়াছেন, তাহারই অন্তর্গতরূপে ভগবদুপাসকগণের আনুষঙ্গিকভাবে যে ব্রহ্মজ্ঞান—যাহা শ্রীভগবানে পরাখ্যা ভক্তির পরিকর, তাহাই শ্রীপ্রহ্লাদের ব্রহ্মজ্ঞান। শ্রীবৈষ্ণবাধিপতি ধ্যানী বৈয়াসি-সম্প্রদায়ের আচার্য্য। হৃদয়হীন মস্তিষ্কের দ্বারা যে জ্ঞানানুশীলনের চেষ্টা জ্ঞানি-সম্প্রদায়ে চলিয়াছিল, সেই সম্প্রদায়ের অর্থাৎ শঙ্কর-সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধির জন্য তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার অবলম্বন করিয়া হৃদয়ের অনুগত মস্তিষ্ক অর্থাৎ ভগবৎসুখানুসন্ধান-ধ্যানরূপ ভক্তিযোগের আশ্রিত বা অনুচর যে জ্ঞান, সেইজ্ঞানেরই আদর করিয়াছেন। মস্তিষ্কে প্রীতি, ভাব বা রসের আবির্ভাব হয় না; হৃদয়েই প্রীতি, ভাব ও রসের আবির্ভাব হয়। শ্রুতিশাস্ত্রেও (তৈ ২।৭।১) শ্রীভগবান্‌কে 'রসো বৈ সঃ'—এই মন্ত্রে 'রস-

স্বরূপ' বলিয়াছেন। সেই রসস্বরূপের অনুভব মস্তিষ্কে হয় না, হৃদয়েই হয়। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

"অতীত্য ভাবনাবর্ত্মং যদ্ভক্তসংস্কারভাবতঃ।
হৃদি সম্ভোজ্জ্বলে যদ্যৎ স্বয়তে স হ্যসৌ মতঃ॥"

(শ্রীভ র সি, ৮।৫।৯)

ভাবনার পথ অতিক্রমপূর্ব্বক ভক্তসংস্কারাতিশয়ের আধার-স্বরূপ যে হার্দ্দিভাবে শুদ্ধসত্ত্ব পরিমার্জ্জিত উজ্জ্বলহৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তাহাই 'রস' বলিয়া বিবেচিত হয়।

রসস্বরূপ শ্রীভগবানকে 'হৃদয়নাথ', 'হৃদয়রাজ', 'হৃদয়েশ্বর', 'প্রাণনাথ', 'প্রাণবল্লভ'—এই সকল নামেই সম্বোধন করেন; মস্তিষ্ক উত্তমাঙ্গ হইলেও কেহ তাঁহাকে 'মস্তিষ্কনাথ' বা 'মস্তিষ্কেশ্বর' বলেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

"উদিত তপন হইলে অস্ত,
দিন গেল বলি' হইবে ব্যস্ত,
তবে কেন এবে অলস হই',
না ভজ হৃদয়-রাজে।"

হৃদয়ের রাজা বা হৃদয়ের পতির ভজনই—গৌড়ীয়গণের ভজন। 'হৃদয়' বলিতে এখানে হৃৎপিণ্ড নহে বা প্রাদেশ-পরিমিত অন্তর্য্যামী মহাত্মার আবাস-স্থানমাত্রও নহে; 'হৃদয়' বলিতে প্রীতি ও আবেশের আধার। যোগিগণের হৃৎকমল হইতেও প্রীতির আধার সহস্র-কোটিগুণে ব্যাপক। এই হৃদয়ই প্রীতিমান্ আশ্রয়তত্ত্বের সমগ্র সত্তা।

সাধক-অবস্থায় হৃদয় হইতে অভিরুচি ও সিদ্ধাবস্থায় স্নেহ বা প্রীতির আবির্ভাব হয়। নিরবচ্ছিন্ন অভিরুচি বা আবিষ্টতাই মনোগতি বা হৃদয়গতি। শ্রীমদ্ভাগবতে এই অবিচ্ছিন্না মনোগতির কথা শ্রীকপিলদেব শ্রীদেবহূতিকে এইরূপ বলিয়াছেন,—

"গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতির্অবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥"

(শ্রীভা ৩।২৯।১১-১২)

আমার গুণ-শ্রবণমাত্রেই অর্থাৎ তদ্বিষয়ে অন্য কোন উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অভিপ্রায়ে নহে, সমুদ্রাভিমুখে গঙ্গার অভিসারের ন্যায় সর্ব্বগুহাশয় আমার প্রতি যে বিষয়ান্তর-কর্ত্তৃক অবিচ্ছিন্না হৃদ্গতি প্রকাশিত হয় এবং লীলা-পুরুষোত্তমের প্রতি ফলানুসন্ধানশূন্যা সাক্ষাৎস্বরূপা যে ভক্তি, তাহাই নির্গুণ নিষ্কাম স্বরূপসিদ্ধভক্তিযোগের লক্ষণরূপে উক্ত হইয়াছে।

'আমি সমস্ত মাপিয়া লইতে পারি'—এইরূপ আত্মম্ভরিতা হইতে মস্তিষ্কের বিচারের পথ বা আধ্যক্ষিকতার উদয় হইয়াছে; আর স্বীয় অযোগ্যতার তীব্র অনুভূতি হইতে কবির উদয় হয়। কর্ম্মফলের দ্বারা কাহারও মস্তিষ্ক পরিষ্কার থাকে, কাহারও অন্য রেখা থাকে; কিন্তু হৃদয় কর্ম্মফলের বাধ্য নহে। মহতের সঙ্গ বা কৃপাফলে হৃদয়ের বৃত্তি প্রকাশিত হয়। শ্রদ্ধা—হৃদয়ের গুণ। কাব্যে 'সহৃদয়' বলিয়া একটা কথা শুনা যায় অর্থাৎ সমস্তদার যিনি, তিনি 'সহৃদয়'। আজ সমগ্র মানবজাতি হৃদয়শূন্য, তাই synthetical বা মিলনের পথ পরিত্যাগ করিয়া—শ্রুতির পথ পরিত্যাগ করিয়া analytical mood বা বিশ্লেষণের পথে ধাবিত। Synthetical বা মিলনের পথই সংহিতার মত—বেদের মত। যাহা হিতের সহিত বর্ত্তমানা, তাহা 'সহিতা' বা 'সংহিতা'। এই সংহিতা বহুমুখীকে একমুখী বা মিলন করায়, ইহাই 'যোগ'। বিভাগে অহিত; তাহা analytical process. শ্রীনারায়ণের দিকে গতিতে যোগ—তাহা synthesis. Analytical মতবাদই জগতের মত; তাহাতে জাতিতে জাতিতে ভেদ, উদরের ভেদ, ভিটার ভেদ। Analysis involves predominance, synthesis involves service. যত অন্তর্য্যামি-দৃষ্টি কম হইবে, ততই উদরভেদ-বুদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। এই দুই-দুঁড়ির ভেদবুদ্ধি হইতে যুদ্ধবিগ্রহ—প্রলয়-ভয়করী রৌদ্রলীলা।

Analytical mood প্রকৃতিকে তুলাপেলা করিতে চায়। প্রকৃতির মধ্যে যে আড়াল—যে গোপনীয়তা, তাহাকে নষ্ট করিয়া দেখিবার চেষ্টাই প্রকৃতির সন্তানের বেয়াদবি। প্রকৃতির পুত্র হইয়া প্রভুত্বকামী ভৌমপতি বা রুদ্রবৎ অভিমান! মাকে মামা (বিকৃতে মা) করিবার চেষ্টা! রুদ্রাভিমানী পুত্রের প্রকৃতিকে ঐরূপ উলঙ্গ করিবার চেষ্টা দেখিয়া প্রকৃতি লজ্জায় মিহা কাটিতেছে! ইহাতে প্রকৃতির পুত্রগণের অর্থাৎ প্রভুত্বকামিগণের মহাকালীয় উদরে প্রবেশ ও বহির্গমনরূপ কেবল জন্মমরণমালারূপ সংসারচক্র চলিতেছে। প্রকৃতির দ্বারা শিবত্ব বা মঙ্গলময়ত্ব পদদলিত

হইয়াছে। শিবত্ব বা মঙ্গলময়ত্ব-দর্শনেই জীবের অন্তর্য্যামী সংকর্ষণের আকর্ষণে প্রবিষ্ট হওয়া যায়। এই সংকর্ষণের আকর্ষণে প্রবিষ্ট না হইলে সংসৃতি হইতে উদ্ধারের উপায় নাই। প্রকৃতি হইতে আবির্ভূত হইয়া অর্থাৎ প্রকৃতিরূপ কারণের কার্য্য হইয়া মস্তিষ্ক প্রকৃতিকেই মাপিতে পারে না; কিন্তু তাহার কি দুঃসাহস যে, প্রকৃতির অতীত বস্তুকে মাপিতে চাহিতেছে! তাই প্রকৃতি লজ্জায় জিভ কাটিয়া বলিতেছে,—"তুমি ছেলে হইয়া আমাকে আর কত উলঙ্গ দেখিবে? এখন মস্তিষ্কের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমের শরণাগত হও। হৃদয়ের বৃত্তি রতি বা প্রীতিরূপ অগ্নির সংস্পর্শে অগ্নিত্ব-প্রাপ্ত ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা শিব বা মঙ্গলময় প্রভুরূপী শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ কর। শিব যাঁহার শ্রীচরণামৃত মস্তকে ধারণ করিয়া শিব-স্বরূপ হইয়াছেন, সেই মঙ্গলের মঙ্গল, সেই গুরুর গুরু, সেই মূল-সঙ্কর্ষণ ও তাঁহার বৈভবগণের শুশ্রূষা কর।" তাদাত্ম্যাপন্ন ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা তাঁহার শুশ্রূষা হয়। সমগ্র হৃদয় বা সত্তার দ্বারা যে শ্রবণেচ্ছা, তাহা শুশ্রূষা, মস্তিষ্কের দ্বারা নহে; অথবা প্রসঙ্গ ও পরিচর্য্যারূপা যে সেবা, আবেশের সহিত ইষ্টদেবের যে সুখানুসন্ধান, সেই জ্ঞান, সেই ধ্যান, সেই তপ, সেই তপ—শুশ্রূষা বা পরিচর্য্যা।

ভূতানুকম্পা

'ভূত'-শব্দের অর্থ 'প্রাণী'। 'ভূতানুকম্পা' বলিতে প্রাণী বা জীবমাত্রেরই প্রতি দয়া। এই ভূতানুকম্পা বা 'জীবে দয়া' ধর্ম্মটী মনোধর্ম্মের ছাঁচে পড়িয়া নানা প্রকার ব্যভিচারী রূপ প্রকাশ করিয়াছে। "ভূতমহেশ্বরেরই ভূত" এই বিজ্ঞানের বিন্দুমাত্র অভাব হইলে ভূতমহেশ্বর হইতে ভূতকে পৃথক্ করিয়া বা ভূতকেই ভূতমহেশ্বরের সহিত একাকার করিয়া যে কল্পনাময় দর্শনের পিপাসা, তাহা হইতেই নানাপ্রকার অনর্থ ও অসজ্জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে। এইজন্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে (৯।১১) শ্রীঅর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।"

সর্ব্বভূত-মহেশ্বররূপ আমার পরমভাব জানিতে না পারিয়া মূর্খগণ আমাকে 'মানবতনু-গ্রহণকারী' বলিয়া প্রাকৃত-বুদ্ধি করে।

কতকগুলি ব্যক্তি ভূতমহেশ্বরকে 'ভূত' মনে করে, আবার কতকগুলি লোক ভূতকেই 'ভূতমহেশ্বর' মনে করে; অন্য কতকগুলি লোক ভূতরূপী আপনাকেই ভূত-মহেশ্বর কল্পনা করে, অন্য কতিপয় লোক ভূতরূপী নিজ হইতে অন্য ভূতের উদর-ভেদ করিয়া থাকে; কতকগুলি লোক ব্যষ্টিভূত ও সমষ্টি-ভূতের অন্তর্য্যামী অধিষ্ঠান ও অধি-দৈবত-পুরুষোত্তমের সংবাদ না জানিয়া ব্যষ্টিভূত ও সমষ্টি-ভূতকে ভূত-মহেশ্বররূপে কল্পনা করে; কতকগুলি লোক ভূতকে ভূতমহেশ্বর হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া ভূতমহেশ্বরের পূজার অভিনয় করে। ইহারা সকলেই ভূতমহেশ্বরের 'পরম-ভাব' জানিতে না পারিয়া তাঁহার অবজ্ঞাকারী। ইহারা ভূতমহেশ্বরের শুদ্ধ-পরমতত্ত্বে গভীর ও স্পষ্টভাবে প্রাকৃত-বুদ্ধিকারী।

অনাদর, অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞাহেতু মহিমজ্ঞান বা স্বরূপ-জ্ঞানের অভাব হয়। ভূতমহেশ্বরের অনাদর হইতে ভূতের অনাদরের উদ্ভব হইয়াছে। সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামি-দৃষ্টি যত কম হইবে, ততই উদর-ভেদ ও উদরের অবস্থিতির স্থানভেদ-জাত ভেদবুদ্ধি, সংঘর্ষ, দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অশান্তির বিশ্ব-ব্যাপিনী অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইতে থাকিবে। সর্ব্বভূতে সর্ব্বভূত-মহেশ্বরের অন্তর্য্যামিত্ব-দর্শনের অভাবে যে ভূঁই ও ভূঁড়ির ভেদবুদ্ধি বিশ্বভূতের বক্ষে আরোপণ করিয়াছে, তাহা হইতে রাজনীতি ও অর্থনীতিরূপ ভেদনীতির জন্ম হইয়াছে। ভূতের ভূঁইয়ের ভেদ হইতে রাজনীতির ভেদ ও ভূতের ভূঁড়িভেদ হইতে অর্থনীতির ভেদের পরিকল্পনা হইয়াছে। সমস্ত ভূতের অন্তর্য্যামী সর্ব্বভূত-মহেশ্বর; তাঁহার মানুষী-তনু অপ্রাকৃত অর্থাৎ প্রাকৃতের ন্যায় সৌষ্ঠবানুভূতক

হইলেও প্রকৃতির অতীত—এই জ্ঞান যাহাদের মোষাশা অর্থাৎ নিষ্ফল-আশাবিশিষ্ট, যাহাদের মোঘ-কর্ম্মা অর্থাৎ নিষ্ফল-কর্ম্মা, যাহারা মোঘ জ্ঞানী অর্থাৎ বৃথাজ্ঞানী বা কুতর্কাশ্রিত-শাস্ত্রজ্ঞানবিশিষ্ট ও যাহারা বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়াও বুদ্ধিনাশ-কারিণী রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতির আশ্রিত, তাহাদের কিছুতেই হইবে না। সর্ব্বভূত-মহেশ্বরের সংমভাব এবং তাঁহার অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি যত হইবে, তত কৃতানুকম্পা-স্বরূপ অন্তর্যামি-দৃষ্টি হইতে ভগবদ্বৈভব-দর্শনের দিকে অভিসার হইবে।

বর্ত্তমান যুগে বিশ্বে হিংসা ও প্রতিহিংসার যে বিশ্ব-ব্যাপিনী রাক্ষসী মূর্ত্তির অনুভব হইয়াছে, তাহার মূলে ভূত-মহেশ্বরের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ব্বক ভূতের প্রতি অকরুণা-রাহিত্য। যে ভূতকে তোষণরূপে পরিণত করা যায়, কেবল তাহাকেই সাময়িকভাবে অর্থাৎ তোষকালে তোষণের প্রলোভনে অপস্বার্থপরতা-সিদ্ধির যে চেষ্টা—যেমন ছাগমাংস-ভক্ষণের জন্য ছাগকে তৃণাদির দ্বারা লালন বা পুষ্ট করিবার যে ছলনা, তাহা ভূতানুকম্পা নহে, কাপট্যময়ী ভূতহিংসা।

শ্রীকপিলদেব শ্রীদেবহূতিকে বলিতেছেন,—

"আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্॥"

(শ্রীভা ৩।২৯।২৬)

ইহার তাৎপর্য্য শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু বলিতেছেন,—"'অন্তরোদরম্' উদরভেদের ভেদং করোতি, ন তু মদধিষ্ঠানত্বে-নাত্মসমং পশ্যতি; তত্তশ্চ ক্ষুধিতাদিকমপি দৃষ্ট্বা স্বোদরাধিক-মেব কেবলং বিভর্ত্তীত্যর্থঃ। তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুরূপোঽহ-মুল্বণম্; তদ্বাং সংসারম্।" (শ্রীভ ন, ১০৫ অনুচ্ছেদ)

যে ব্যক্তি নিজের ও পরের মধ্যে উদর-ভেদহেতু পরস্পর ভেদবুদ্ধি করে অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ উদর বা দেহ আছে বলিয়া 'অমুক ব্যক্তি পর'—এইরূপ মনে করে, কিন্তু আমার অধিষ্ঠান-হেতু আত্মসম দর্শন করে না, সুতরাং ক্ষুধিত ব্যক্তিকে দেখিয়াও সে কেবল নিজ উদরাদিই পোষণ করে, সেই ভেদ-দর্শনকারীর মৃত্যুরূপী হইয়া আমি তাহাকে ভীষণ ভয় অর্থাৎ সংসারে পাতিত করি।

যাঁহারা বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়া কর্ম্মার্পণাত্মক কর্ম্ম-মিশ্র অর্চ্চন করিবেন, তাঁহাদের সেই অর্চ্চন ভূত-দয়া ব্যতীত সিদ্ধই হইতে পারে না। অর্চ্চনকার্য্যে কেবলমাত্র ভূতে অনাদর-কারী ব্যক্তিরই সত্বর ফললাভ হয় না; নতুবা যে-কোন প্রকারে শ্রীভগবানের পূজাদ্বারা ফললাভ অবশ্যই হয়।

"দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি॥"

(শ্রীভা ৩।২৯।২১)

সর্ব্বভূতে একই অন্তর্যামিমাত্র—এইরূপ দৃষ্টিরহিত, অতএব দেহে আত্মাভিমানী, সুতরাং ভূতসমূহের প্রতি বদ্ধবৈর ব্যক্তির মন কখনই শান্তি লাভ করে না। শ্রীমহাভারতে উক্ত হইয়াছে,—

"পিতেব পুত্রং কৃপণো নোদ্বেজয়তি যো জনম্।
বিশুদ্ধস্তস্য হৃষীকেশস্তুষ্টঃ প্রণীদতি॥"

কৃপালু পিতা যেমন পুত্রকে উৎপীড়ন করেন না, তদ্রূপ যিনি অন্য কোন ব্যক্তিকে উদ্বেগ প্রদান করেন না, সেই বিশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তির প্রতি ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশ শীঘ্রই প্রসন্ন হন।

শ্রীকপিলদেবও বলিয়াছেন,—

"অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে।
নৈব তুষ্যেঽর্চ্চিতোঽর্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ॥"

(শ্রীভা ৩।২৯।১৪)

হে অনঘে! ভূতসমূহের অবজ্ঞাকারী অর্থাৎ নিন্দাকারী ব্যক্তি উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট বস্তুসমূহ এবং তদুৎপন্ন অনুষ্ঠান-সমূহের দ্বারা অর্চ্চাতে পূজা করিলেও তাহার পূজায় আমি তুষ্ট হই না।

ভূতদ্বেষ অপেক্ষাও ভূতনিন্দা অধিকতর দোষাবহ। ইহা শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বলিয়াছেন—

"যজ্ঞেশের নিন্দুক আছয়ে কোনকালে।
পরচর্চ্চকের গতি নহে কভু ভালে॥"

(শ্রীচৈ ভা ম ১৩।৪৩)

মহৎ বা বৈষ্ণবের নিন্দা বা অনাদর দূরে থাকুক, শ্রীকপিলদেব সাধারণ প্রাণিগণেরও অবমাননাদির নিন্দা করিয়াছেন,—

"অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্॥"

(শ্রীভা ৩।২৯।২১)

শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু বলেন,—"শ্রীকপিলদেবের সাধারণানামপি প্রাণিনামবমানাদিকং নিন্দিতং, কিমুত তদ্বিধানাম্ ; ... 'কৃতেষু' ব্রহ্মাদিপরীত্যা অপ্রাণজীবমারভ্য ভগবদর্পিতাত্ম-জীবপর্য্যন্তেষু ; 'ভূতাত্মা' তদন্তর্যামী, তং মামবজ্ঞায়, তেষামবজ্ঞয়া তদধিষ্ঠানকত্বেন মমৈবাবজ্ঞাং কৃতবতে কৃত্বেত্যর্থঃ। অতস্তাং কৃত্বা যোঽর্চ্চাং মৎপ্রতিমাং কৃতবতে, স 'তদ্বিড়ম্বনং' তস্যা অবজ্ঞামেব কৃতবতে ইত্যর্থঃ।" (শ্রীভ স, ১০৪ অনুচ্ছেদ)

অর্থাৎ মদ্ভক্ত বৈষ্ণবগণের কথা ত দূরে থাকুক, শ্রীকপিলদেব সাধারণ প্রাণিগণেরও অপমানাদি কার্য্যের নিন্দা করিয়াছেন। হে মাতঃ! আমি সর্ব্বভূতে অর্থাৎ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসাদি প্রাণবৃত্তিহীন (সুপ্তচেতন) জীব হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণকারী জীব পর্য্যন্ত (পূর্ণবিকচিত-চেতন) সকল ভূতের অন্তর্যামী ; সেইরূপ আমাকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক অর্থাৎ তাহাদিগের অবজ্ঞার দ্বারা তাহাদের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়স্বরূপ আমাকেই অবজ্ঞা করিয়া যে ব্যক্তি আমার অর্চ্চা স্থাপন করে, সে অর্চ্চার বিড়ম্বনা অর্থাৎ অবজ্ঞাই করে।

"যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ॥"

(শ্রীভা ৩।২৯।২১)

" 'মৌঢ্যাৎ' শৈলী দারুময়ী বা কাচিৎ প্রতিমেয়মিতি মূঢ়বুদ্ধিত্বাৎ যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু বর্ত্তমানং পরমাত্মানমীশ্বরং মাং হিত্বা তস্যা মদৈক্যবিভাবা 'অর্চ্চাং' মদীয়াং প্রতিমাং ভর্জ্জতে, কেবল-লোকরীতি-দৃষ্ট্যা তস্যৈব জলাদিকমর্পয়তি, তস্য চ মূঢ়স্য মদ্ভক্তাভাবাৎ সর্ব্বভূতাবজ্ঞাপি ভবতি।" (শ্রীভ স, ১০৪ অনুচ্ছেদ)

যে ব্যক্তি মূঢ়ভাবশতঃ অর্থাৎ 'এই প্রতিমাটী প্রস্তরময়ী, কাষ্ঠময়ী'—এইরূপ মূঢ়বুদ্ধিপ্রযুক্ত সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান পরমাত্মা ঈশ্বরস্বরূপ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ আমার সহিত আমার অর্চ্চামূর্ত্তির ঐক্যবুদ্ধি না করিয়া মদীয় প্রতিমার ভজন করে, যে কেবল লৌকিক-রীতি-দৃষ্টিতে সেই প্রতিমার জলাদি অর্পণ করে, সেই মূঢ় ব্যক্তির সর্ব্বভূতে আমার দর্শনাভাবহেতু সর্ব্বভূতের প্রতি অবজ্ঞারূপ দোষ হয়। তাহার সেইরূপ অর্চ্চন মদ্যে ভক্তাভক্তি-বিধানের ন্যায় নিরর্থক হয়।

"অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা ॥"

(শ্রী ভা ৩।২৯।২৭)

এইহেতু সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত আমাকে যথাযুক্ত যথাশক্তি দানের দ্বারা, দান-সামর্থ্যের অভাবে সম্মানের দ্বারা মিত্রভাবে অভিন্ন-দৃষ্টিতে বা ভিন্ন-দৃষ্টিতে পূজা করিবে। 'অভিন্ন-দৃষ্টিতে' বলিবার কারণ এই যে, শ্রীসনকাদির প্রতি জয়-বিজয়ের অপরাধ-হেতু তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা-প্রদান-প্রসঙ্গে শ্রীনারায়ণের উক্তি,—হে ঋষিগণ! ব্রাহ্মণ, দুগ্ধবতী গাভী ও অনাথ প্রাণিসমূহ—এই তিনটী আমারই তনুকে অর্থাৎ অধিষ্ঠানকে আমা হইতে ভেদবুদ্ধিতে যাহারা দর্শন করে, আমার প্রতি অধিকারলব্ধ দণ্ডধারী যমের ক্রুদ্ধ গুহাকার সর্পতুল্য দুস্তর্ক চক্ষুদ্বারা পাপনষ্ট-চক্ষু সেই ব্যক্তিগণের চক্ষুগুলিকে ছেদন করে। অতএব শ্রীভগবানের এই সকল অধিষ্ঠান ভূতসমূহকে শ্রীভগবান্ হইতে ভিন্নদৃষ্টিতে দেখিলে শ্রীভগবানেরই অবমাননা করা হয়। 'অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা' অর্থে 'অন্তর্য্যামি-দৃষ্টিতে দেখা' বা 'ভগবানের অধিষ্ঠানরূপে দেখা' ; ভূতগণের দেহ বা আকারকে শ্রীভগবানের সহিত একাকার করা নহে। যাহারা ভূতগণের দেহকেই 'সর্ব্বতনু ভগবান্' বা 'নারায়ণ' বলে, তাহাদের দর্শন রাক্ষস-দর্শন ; ইহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

'ভিন্নদৃষ্টিতে দর্শন' এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিলে স্বদেহ-সম্পর্কিত স্ত্রী-পুত্রাদি ভূতের প্রতি যেভাবে দৃষ্টি করা হয়, তাহা হইতে অতি বিলক্ষণ অর্থাৎ পৃথক্ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্মান-জনক দৃষ্টিতে পূজা করিবে—ইহাই তাৎপর্য্য। সকল প্রাণীর সম্বন্ধে সাধারণভাবে সম্মানের উপদেশ থাকিলেও শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকপিলদেব পাত্রের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিয়া সম্মানের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিয়াছেন। বিষ্ণুর সমস্ত পাত্রের মধ্যে বৈষ্ণবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অন্য জীবের প্রতিও যোগ্যতানুসারে যথাশক্তি আদর করা কর্ত্তব্য। ইহাও পরে প্রদর্শিত হইবে।

বর্ণাশ্রমে অবস্থিত ব্যক্তিগণ প্রাণিমাত্রকে অন্তর্য্যামি-দৃষ্টিতে আদর করিবেন। যদি দ্রব্যাদির দ্বারা একান্ত সামর্থ্য না থাকে, তবে অন্ততঃ মানদান অর্থাৎ আসনাদি-প্রদান বা মিষ্ট কথায় আদর করিতেই হইবে। যাহারা ইহা না করিবে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ, দুগ্ধবতী গাভী ও অনাথ প্রাণীকে

কোনরূপে পরিত্যাগ করিবে, তাহারা বর্ত্তমান যুগের কিরূপ গণের কোথায় নিম্নে পতিত হইবে। গৃহস্থলীলাভিনয়কারী স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর অতিথি-সেবা ও প্রাণিমাত্রের প্রতি আত্মপ্রদর্শনের লীলা প্রকাশ করিয়া উহার-ছেষকারী জীব-জগৎকে কৃতার্থের শিক্ষা দিয়াছেন। এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বলিয়াছেন,—

"প্রভু সে পরম-চারী ঈশ্বর-স্বভাব।
দুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার।
দুঃখীরে দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি'।
অন্ন, বস্ত্র, কড়ি-পাতি দেন গৌরহরি॥
নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে।
যা'র যেন যোগ্য, প্রভু দেন সবাকারে॥
• • • •
গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম।
'অতিথির সেবা'—গৃহস্থের মূলকর্ম॥
গৃহস্থ হইয়া অতিথি-সেবা না করে।
পশু-পক্ষী হইতে 'অধম' বলি তা'রে॥
যা'র যা না থাকে কিছু পূর্ব্বাদৃষ্ট দোষে।
সেই তৃণ, জল, ভূমি দিবেক সন্তোষে॥
'তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সূনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন।"
(শ্রীচৈ ভা আ ১৪।১১-১৩, ২১-২৪)

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি'।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি'॥
এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম—সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্ম-রক্ষী, যা'র ইথে নাহি ক্ষতি॥"
(শ্রীচৈ ভা অ ৩।২৮-২৯)

"প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্।
প্রবিষ্টো জীব-কলসা তত্তদেব ভগবানিতি॥"
(শ্রীভা ১১।২৯।১৬)

শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজের নিকট শ্রীনারদ গৃহস্থগণের যে ভাগবত-ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা হইতে এই উপদেশ পাওয়া যায়,—

"যাবদ্ ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি॥"
(শ্রীভা ৭।১৪।৮)

যে পরিমাণ অর্থাদি-দ্বারা উদর পূর্ণ হয়, তদ্বারাই অর্থাদিতেই শরীরিগণের অধিকার। ইহা অপেক্ষা অধিক আকাঙ্ক্ষী চৌর, অতএব দণ্ডার্হ।

"মৃগোষ্ট্রখরমর্কাখুসরীসৃপখগমক্ষিকাঃ।
আত্মনঃ পুত্রবৎ পশ্যেৎ তৈরেষামন্তরং কিয়ৎ॥"
(শ্রীভা ৭।১৪।৯)

মৃগ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, মর্কট, মূষিক, সর্প, পক্ষী ও মক্ষিকা—ইহাদিগকে স্বীয় পুত্রের তুল্য দর্শন করিবে; যেহেতু, পুত্রাদি হইতে ইহাদের পার্থক্য কি পরিমাণ?

"আধাবাদ্যেহবসায়িভ্যঃ কামান্ সংবিভজেদ্ যথা।
অপ্যেতয়োর্ন তেষাং নৃণাং স্বত্বগ্রহো যতঃ॥"
(শ্রীভা ৭।১৪।১১)

কুক্কুর, পতিত ব্যক্তি এবং চণ্ডাল প্রভৃতিকে যথাযোগ্য ভোগ্যবস্তু বিভাগ করিয়া দিবে। মমতাস্পদ একমাত্র ভার্য্যাকে অন্ন-সেবার উপেক্ষা করিয়াও অতিথি-সেবায় নিযুক্ত করিবে।

"কৃতানুকম্পা শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সমস্ত শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহা জানিতে পারা গেল; অতএব কৃষ্ণকেই 'পরমেশ্বর' জানিয়া তাঁহাদের সেবা করাই ত কর্ত্তব্য? পৃথক্ পরমেশ্বরের পূজা বা অর্চ্চনের প্রয়োজন কি? পরমেশ্বর আমাদের দৃষ্টির গোচরীভূত নহেন, কৃষ্ণসমূহ আমাদের স্থূল-দৃষ্টিরও অন্তর্গত; অতএব, প্রত্যক্ষ গুরুদেবকে নারায়ণ বা পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়া তাঁহারই সেবা ও তাহাতে প্রেমের অনুশীলন করা যাউক্। পরমেশ্বরই নানাপ্রকার অভাবগ্রস্ত কৃষ্ণরূপে আমাদের সেবা ও প্রীতি গ্রহণ করিবার জন্য এই জগতে বহুমূর্ত্তিতে আবির্ভাবিত হইয়াছেন; অতএব অতিথি-নারায়ণ, দরিদ্র-নারায়ণ, দুঃস্থ-নারায়ণ রোগার্ত্ত-নারায়ণ প্রভৃতিরই সেবা ও তাহাদিগের প্রতি প্রেমই পরমধর্ম্ম।"—যখন এই প্রকার এক মায়াবাদ মতবাদ জগতে প্রকাশিত হইল, তখন এইরূপ এক ছড়া (slogan) প্রচারিত হইল,—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

যাঁহারা পরমেশ্বরের পূজা করিবার সময় বলিতেছিলেন—'পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়ের অতীত; পরমেশ্বর নিত্যসুখবোধতনু,

আনন্দনিধি, পূর্ণ, সনাতন পরমানন্দকন্দ", তাঁহারাই তাঁহাদের পূর্ব্বকথা ভুলিয়া গিয়া এখন বলিলেন—"আমাদের প্রত্যক্ষ-ইন্দ্রিয়গোচর, কর্ম্মফলবাধ্য, ত্রিতাপ-বৈচিত্র্যের নানা দুঃখ ও ক্লেশে জর্জ্জরিত, অভাবগ্রস্ত, রোগী, দরিদ্র, মেথর, মূর্দ্ধাফরাস —ইহারাই নারায়ণ।"

সকলজীবেরই অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে নারায়ণ বাস করেন সত্য, কিন্তু কর্ম্মফলবাধ্য যে দেহ বা ভূতাকার, তাহা কি নারায়ণ? এখানে কতকগুলি লোক বৈশারদী মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া বলিলেন,—"ইহারাই নারায়ণ বটে। 'পঞ্চ-ভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ি'-কাঁদে।' পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়িয়া ব্রহ্ম বা নারায়ণ আপনাকে দুঃখিত, দরিদ্র ও অভাব-গ্রস্তের ন্যায় দেখাইতেছেন। সুতরাং ইহাদের সেবা করিলে ব্রহ্মেরই—নারায়ণেরই উপাসনা হইবে। ইহাদিগের প্রতি প্রীতি করিলেই অর্থাৎ ভূত-প্রেম করিলেই হইবে।"

আজ এই মতবাদ সমস্ত বহির্ম্মুখ মানবজাতির মস্তিষ্ককে মহামারীর ন্যায় গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার প্রতিকূলে কোন যুক্তি বা শাস্ত্রীয় বিচার শুনিবার বা চিন্তা করিবার কাহারও সামর্থ্য নাই। এই সংক্রামক মনোধর্ম্মে শতকরা প্রায় শতজন বহির্ম্মুখ ব্যক্তি আক্রান্ত। অন্তর্য্যামি-দৃষ্টির পরিবর্ত্তে আকারকেই 'নারায়ণ' মনে করিতেছে, অথচ ইহারা সাকার-উপাসনার বিরুদ্ধবাদী! ইহারা 'নিরাকার ব্রহ্মের ইহাই সাকার রূপ'—এইরূপ কল্পনা করিয়া লইয়াছে। তাহাতে ব্রহ্মদর্শনের বা অন্তর্য্যামী পরমাত্মাদর্শনের পরিবর্ত্তে ভূতদর্শনরূপ রাক্ষসদর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপ ভূত-দর্শনকে শ্রীমদ্ভাগবত 'কল্পাবপাদদর্শন' বা 'রাক্ষস-দর্শন' বলিয়া-ছেন; কারণ, ভূত কখনও ভূতমহেশ্বর নহেন। অনাদি-বহির্ম্মুখ যে সকল জীব কর্ম্মফলে বিভিন্ন ভূতাকারে বিভিন্ন সংসার-দশা লাভ করিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে ভূতমহেশ্বরকে অন্তর্য্যামি-রূপে দর্শন করিয়া ভূতের প্রতি অনুকম্পা করিলেই পরস্পরের মঙ্গল হয়। অন্তর্য্যামি-দর্শন পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভূতানুকম্পা অর্থাৎ কর্ম্মফল-বাধ্য ভূতাকারের বা তাহাদের দেহধনের সেবা করিলে সংসার-দশা লাভ হয়। অন্তর্য্যামি-দর্শন হইতে উন্মুখতা আরম্ভ; আর ভূতাকার-দর্শনে বিমুখতারই পুনরাবৃত্তি। ভূত কখনই ভূতমহেশ্বর হইতে পারে না—জীব কখনও ব্রহ্ম নহে। জীব বা ভূত মায়াবশযোগ্য, আর ভূতমহেশ্বর বা শ্রীনারায়ণ মায়াধীশ। যাঁহারা ভূতকে নারায়ণ কল্পনা করিয়া ভূতাকারের ইন্দ্রিয়-তর্পণকে 'ভূতপ্রেম' বলেন, তাঁহাদের প্রেম জাগতিক কাম-মাত্র। কারণ, অন্তর্য্যামী বা পরমাত্মা হইতে বদ্ধজীবকে পৃথক্ করিয়া বা বদ্ধজীবকেই সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র মনে করিয়া তাহার যে বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়-তর্পণের চেষ্টা, তাহা কাম ব্যতীত আর কি হইতে পারে? বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়গুলি প্রকৃতির বিকৃতি; ইহাই সাংখ্য-শাস্ত্র ও বিজ্ঞান নির্ণয় করিয়াছেন। প্রকৃতির বিকৃতিগুলির তর্পণ মায়িক কাম ব্যতীত আর কি? এজন্য যাহারা অন্তর্য্যামি-দৃষ্টি-রহিত হইয়া ভূত-প্রীতির অভিনয় করে, তাহারা আপাত-ভূত-রক্ষক হইয়া পরে ভূত-ভক্ষক হইয়া পড়ে। যাহাদিগের প্রতি সাময়িক প্রীতি প্রদর্শন করে, তাহাদিগকেই পরবর্ত্তীকালে খণ্ডকালে বলি দেয়। তাহাদের এই প্রীতির অভিনয় কেবল প্রভুত্ব-কামনা। ইহারা সম্ভবতঃ স্বজাতিপ্রীতিরূপ-বহির্ম্মুখতা-নিবন্ধন মানুষকে 'নারায়ণ' বলিয়া ছাগ, মেষ, কুক্কুট, কচ্ছপ প্রভৃতি ভূতকে 'অনারায়ণ' মনে করে অথবা যুক্তির খাতিরে 'নারায়ণ' বলিতে বাধ্য হইয়া সেই কল্পিত নারায়ণগুলিকেই রাক্ষসের ন্যায় ভক্ষণ করে। যদি দরিদ্র নারায়ণ হয়, মেথর-মূর্দ্ধা-ফরাস নারায়ণ হয়, তবে অতিদীন অসমর্থ ছাগ-মেষাদি কি নারায়ণ নহে? তাহাদিগকে ভক্ষণ করাই কি তাহাদিগের প্রতি প্রেম? "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?"—এই উক্তি কি মনুষ্যের প্রতি প্রযোজ্য? ছাগমেষাদির প্রতি কি প্রযুজ্য নহে? ইহারা কি মেথর-মূর্দ্ধাফরাস হইতেও অধিক দীন, অনাথ ও অভাব-গ্রস্ত নহে? অনাথ-নারায়ণ কি কেবল স্বজাতি মনুষ্যই? অনাথ ছাগ-মেষ-কুক্কুট-কচ্ছপাদির জন্য যে অনাথাশ্রম উন্মুক্ত হয় ও তাহাদের প্রতি যে প্রেম করা হয়, তাহা কি কেবল তাহাদিগকে কিছুদিন খোঁয়াড়ে বা খাঁচার মধ্যে আটকাইয়া রাখিয়া তাহাদের অঙ্গ সাময়িকভাবে পুষ্ট করাইয়া তাহাদিগকে যূপকাষ্ঠে আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে?

যাহারা উক্ত ছড়াটি (slogan) গান করে, তাহাদিগকে যদি কেহ এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তবে তাহারা বলে,—"আমরাও জীবে নারায়ণ আছেন, ইহা বিচার করিয়াই তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিরূপ মানবদেহে সেবা করিতে বলি।" তখন যদি তাহাদিগকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা যায়,—"জীবে নারায়ণ ও জীবই নারায়ণ—উভয়ই কি এক? আর স্বরূপশক্তির

বৃত্তি প্রীতি বা প্রেম কি অনিত্য মৃতদেহে প্রযুক্ত হইতে পারে?" যদি আরও জিজ্ঞাসা করা যায়,—"তোমরা অন্যান্য মৃতগণকে ঈশ্বর ভাব কি? না, কেবল মনুষ্যকেই ঈশ্বর মনে কর?" তখন তাহারা বলে,—"মনুষ্যের জীবনের অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা অধিক মূল্য আছে।" যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, "এই মূল্য কি তোমাদের সুবিধাবাদের দিক্ হইতে? তোমরা তথাকথিত সভ্যমানব-সমাজের অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং নরমাংসভোজী নহ, অথবা নরনির্মিত দণ্ডনীতিতে অন্যান্য জীবহত্যায় কোন দণ্ড নাই, কিন্তু নরহত্যায় দণ্ড আছে—এই বিচারে কি তোমরা নরকে 'নারায়ণ' বলিতেছ? কিন্তু ছাগকে ত 'নারায়ণ' বলিতে পারিতেছ না? কেবল সময় সময় কি যুক্তির খাতিরে মৌখিকভাবে ছাগেরও নারায়ণত্ব স্বীকার করিতেছ?" শ্রীকপিলদেব কিন্তু জীবের তাত্ত্বিক বিচার করিয়াছেন। প্রত্যেক জীবেই অন্তর্যামি-রূপে বিষ্ণু আছেন। যে জীব যতটা বিষ্ণুর অধিক সন্তোষ বিধান করে, সেই জীব ততটা শ্রেষ্ঠ এবং সেই জীব ততটা অধিক আদর পাইবার যোগ্য—ইহাই শ্রীকপিলদেব শ্রীমদ্-ভাগবতে ভূত-বিজ্ঞানের বিচার অবতারণা করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন।

"জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানাং ততঃ প্রাণভৃতঃ শুভে।
ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরাস্তত্রাপ্যেকেন্দ্রিয়াদয়ঃ॥
তত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ।
তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ শব্দবিদো বরাঃ॥
রূপভেদবিদস্তত্র ততশ্চোভয়তোদতঃ।
তেষাং বহুপদাঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতুষ্পাদস্ততো দ্বিপাৎ॥
ততো বর্ণাশ্চ চত্বারস্তেষাং ব্রাহ্মণ ঊষ্মভঃ।
ব্রাহ্মণেষপি বেদজ্ঞো হ্যর্থজ্ঞোঽভ্যধিকস্ততঃ॥
অর্থজ্ঞাৎ সংশয়চ্ছেত্তা ততঃ শ্রেয়ান্ স্বধর্মকৃৎ।
মুক্তসঙ্গস্ততো ভূয়ানদোগ্ধা ধর্মমাত্মনঃ॥
তস্মান্ময্যর্পিতাশেষ-ক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ।
ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্যস্তকর্মণঃ।
ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্তুঃ সমদর্শনাৎ॥"

(শ্রীভা ৩।৩১।২৮-৩৩)

মাতা দেবহূতিকে ভগবান শ্রীকপিলদেব বলিতেছেন—"হে মঙ্গলদায়িনি মাতঃ! অচেতন পদার্থ অপেক্ষা জীব অর্থাৎ সচেতন পদার্থ—শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা (যাদাদি ক্রিয়াশীল) প্রাণবৃত্তিমান্ স্থাবরপদার্থ—শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা জ্ঞানবান্ পদার্থ—শ্রেষ্ঠ; আর তদপেক্ষা ইন্দ্রিয়বৃত্তিবিশিষ্ট বৃক্ষাদি—শ্রেষ্ঠ।

স্পর্শ অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয়দ্বারা অনুভবশীল বৃক্ষাদি অপেক্ষা রস অর্থাৎ জিহ্বেন্দ্রিয়-দ্বারা অনুভবশীল ঘৃতাদি—শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা গন্ধ অর্থাৎ নাসিকেন্দ্রিয়দ্বারা অনুভবশীল ভ্রমরাদি—শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা শব্দ অর্থাৎ কর্ণেন্দ্রিয়দ্বারা অনুভবশীল সর্পাদি—শ্রেষ্ঠ।

সেই সর্পাদি অপেক্ষা রূপভেদবিৎ অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারা বস্তুর রূপবৈশিষ্ট্যানুভবশীল কাকাদি পক্ষী—শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা উভয়দিকে (পঙ্‌ক্তিতে) দন্তযুক্ত (পাদহীন) জীব—শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা বহুপদ জীব—শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা চতুষ্পদ জীব (পশু)—শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা দ্বিপদ জীব (মনুষ্য)—শ্রেষ্ঠ।

মনুষ্যমধ্যে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ, তন্মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ—শ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ—শ্রেষ্ঠ; বেদজ্ঞ অপেক্ষা বেদার্থবিৎ—শ্রেষ্ঠ।

বেদার্থজ্ঞ অপেক্ষা সংশয়চ্ছেত্তা অর্থাৎ মীমাংসাকারী—শ্রেষ্ঠ; মীমাংসাকারী অপেক্ষা স্বধর্মানুষ্ঠানকারী—শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা মুক্তসঙ্গ (অর্থাৎ সঙ্গত্যাগী, নিষ্কাম, অনাসক্ত, বিরক্ত জ্ঞানী)—শ্রেষ্ঠ; যেহেতু তাঁহার স্বকৃত-কর্ম-ফলাভি-সন্ধি নাই।

এই জ্ঞানী অপেক্ষাও যে ব্যক্তি জ্ঞানাদি সাধনের প্রতি আদর না রাখিয়া অশেষ ক্রিয়া ও ক্রিয়াফল আমাতে অর্পণ করেন, সেই ভক্ত—শ্রেষ্ঠ; হে মঙ্গলমূর্ত্তি-জননি! যে ব্যক্তি আমাতে সর্ব্ব-প্রকারে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন বলিয়া নিজ দেহের ভরণপোষণাদির জন্য কোন চিন্তা না রাখিয়া সর্ব্বদা নিজকে ভগবদধীন ভাবনা, ফলকামনামূলক অন্য কোন কামনা না করিয়া একমাত্র ভগবান্ আপনাকে ভক্তি করেন এবং সর্ব্বভূতে ভগবদধিষ্ঠান-বোধে নিজের মত হিত-কামনা করেন, সেই ভক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ প্রাণী আমি আর কাহাকেও দেখি না।

"মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহুমানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥"

(শ্রীভা ৩।২৯।৩৪)

জীবরূপা কলার সহিত অর্থাৎ বিভিন্নাংশের সহিত ভগবান্ অধিযজ্ঞ-পুরুষোত্তম অন্তর্যামী ঈশ্বররূপে সর্ব্বভূতে প্রবিষ্ট, ইহা জানিয়া চিত্তদ্বারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত-সমূহকে সম্মান প্রদানপূর্ব্বক প্রণাম করিবে।

"পুরাণ্যনেন সৃষ্টানি নৃতির্যগৃষিদেবতাঃ।
শেতে জীবেন রূপেণ পুরেষু পুরুষো হ্যসৌ॥
তেষেব ভগবান্ রাজংস্তারতম্যেন বর্ত্ততে।
তস্মাৎ পাত্রং হি পুরুষো যাবদাত্মা যথেয়তে॥"

(শ্রীভা ৭।১৪।৩৭-৩৮)

ভগবান মনুষ্য, পশু, পক্ষী, ঋষি এবং দেবতারূপ শরীর-সকল সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং অন্তর্যামিরূপে তাহাদিগের মধ্যে শায়িত থাকেন, এই কারণে তিনি 'পুরুষ'-নামে প্রসিদ্ধ।

হে রাজন্! সেই শরীরসমূহে ন্যূনাধিকভাবে ভগবান্ অধিষ্ঠিত আছেন; সুতরাং পুরুষই পাত্র। যাবৎ পরিমিত জ্ঞানাংশ যাহাতে প্রতীত হয়, তাহা তদ্রূপ পাত্র হইয়া থাকে।

শ্রীনারদ-যুধিষ্ঠির-সংবাদের "কর্ম্মনিষ্ঠা দ্বিজাঃ কেচিৎ" ইত্যাদি (৭।১৫।১-২) শ্লোকদ্বয় উদ্ধার করিয়া শ্রীল শ্রীজীব প্রভু বলিতেছেন,—"অনেন যথাত্র মনুষ্য প্রভৃতীনাং জ্ঞানি-পুরুষে মুখ্যা, পুরুষান্তরপূজা তু তদভাবে এব, তথা প্রেম-ভক্তিকামানাং প্রেমভক্তপূজা জ্ঞেয়া।" (শ্রীভ স, ২৯৪ অনু)

'জ্ঞাননিষ্ঠকেই হব্য (দেবতার উদ্দেশে দেয় বস্তু) ও কব্য (পিতৃগণের উদ্দেশে দেয় বস্তু) প্রদান করিবে, জ্ঞানি-পুরুষের অভাবে অন্যান্য পুরুষগণকে তাহা প্রদান করিতে হইবে।'—এই উক্তির দ্বারা যেরূপ মুমুক্ষুগণের সম্বন্ধে জ্ঞানি-পুরুষের পূজাই মুখ্যা এবং তাহার অভাববশে অন্য ব্যক্তির পূজা জ্ঞাপিত হইয়াছে, তদ্রূপ প্রেমভক্তিকামীগণের সম্বন্ধেও প্রেমভক্ত-পূজাই মুখ্যা জানিতে হইবে।

এই সকল প্রমাণানুসারে দেহধারী জীবগণের মধ্যে জ্ঞান-বিকাশের তারতম্যানুসারে যে জীবের দ্বারা যতটা অধিক শ্রীভগবানের সন্তোষবিধান হয়, সেই জীবের প্রতি ততটা অধিক আদর প্রদর্শন করাই ভগবান্ শ্রীকপিল-দেবের অভিপ্রায়।

"অতো মদ্ভক্তেষু যাদৃগ্বহুমানাদিকং কর্ত্তব্যম্; অন্যত্র তু যথা প্রাপ্তং যথাশক্তি চেতি ভাবঃ।" (শ্রীভ স, ১০৫ অনুচ্ছেদ)

অতএব আমার ভক্তগণের প্রতি প্রচুর আদরাদি কর্ত্তব্য; অন্যত্র অর্থাৎ অন্যান্য জীবে যথাযোগ্য যথাশক্তি আদর করিতে হইবে। তাহাই পরের শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

ঈশ্বর সর্ব্বভূতে জীবনিয়ামকরূপে প্রবিষ্ট আছেন,—ইহা জানিয়া এই সমুদয় প্রাণীকেই বহুমানপুরঃসর মনে মনে প্রণাম করিবে। অতএব নিত্যাচারাবতার শ্রীভগবদ্দেব বা শ্রীবৈষ্ণব—যাঁহারা পরতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ ও প্রিয় অর্থাৎ পরতত্ত্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রীতিবিশিষ্ট, তাঁহাদের ন্যায় অন্যান্য জীবকে আদর করিতে হইবে না। তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য যথাশক্তি সম্মান করিতে হইবে।

জীবে প্রেম দেখাইতে গিয়া কেহ কেহ মেথরকে আলিঙ্গন করে এবং তাহা সংবাদপত্রের স্তম্ভে প্রচার করিয়া প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করে, অথচ ইহারা বৈষ্ণবকে দর্শন করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। কেহ কেহ মনুষ্য-নির্ব্বিশেষে 'সকলই নারায়ণ' মুখে বলিলেও নিজের দেহ ও দেহ-সম্পর্কিত বস্তুর প্রতি অধিক প্রীতি সম্পন্ন হয় এবং নিজ দেহের সেবাই নারায়ণের সেবা বলিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ দরিদ্র-নারায়ণ রোগি-নারায়ণ ও দুঃস্থ-নারায়ণের সেবাশ্রম বা আর্ত্তাশ্রম প্রভৃতি উদ্ঘাটন করিয়াও ভূঁই-ভেদ ও ভূঁড়িভেদ-জনিত অর্থনীতি ও রাজনীতির বিচার হইতে বাহ্য ও সমষ্টিগতভাবে তাহাদের কল্পিত নারায়ণগণের মৃত্যুসাধক অস্ত্রশস্ত্র ও বিষাক্ত ঔষধাদি আবিষ্কার করিবার জন্য সময় সভা নিয়োগ করে। ইহা একহস্ত নারায়ণের (?) পদদেশে, আর একহস্ত তাঁহার গলদেশে প্রদান করিবার নীতিরূপ কাপট্য ব্যতীত আর কি? অন্তর্যামি-দৃষ্টি-রহিত হইয়া যাহারা ভূতযাত্র-দৃষ্টিতে ভূতকল্পা করে, তাহাদের এইরূপ কল্পাবপাদ-দর্শন বা রাক্ষস-দর্শন অবশ্যম্ভাবী। শ্রীমদ্ভাগবতে সৌদাস-রাজার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আখ্যায়িকাটী দ্রষ্টব্য হয়।

সুদাসপুত্র রাজা সৌদাস কোন সময়ে মৃগয়া করিতে করিতে কোন এক রাক্ষসকে বধ করেন। ইহাতে উক্ত রাক্ষসের ভ্রাতা ভ্রাতৃবধ-প্রতীকার-বাসনায় রাজা সৌদাসের অনিষ্ট-চিন্তা করিয়া তাঁহার প্রাসাদে পাচকরূপে অবস্থান করিতে লাগিল। একদিন কুলগুরু বশিষ্ঠ রাজগৃহে আগমন করিলে উক্ত পাচকরূপী রাক্ষসটী বশিষ্ঠ-মুনিকে নরমাংস রন্ধনপূর্ব্বক প্রদান করে। যোগবিভূতিশালী বশিষ্ঠ দিব্য-দৃষ্টিতে অভক্ষ্য-দ্রব্য পরিবেশিত হইতেছে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধভরে "নরমাংসভোজী রাক্ষস হও" বলিয়া রাজাকে অভিশাপ প্রদান করেন। কিন্তু বশিষ্ঠ কিছুকাল পরে উক্ত কার্য্য রাক্ষসের, পরন্তু রাজার নহে—ইহা জানিতে পারিলেন। রাজা সৌদাস জলাঞ্জলি-গ্রহণপূর্ব্বক গুরু বশিষ্ঠকে প্রতি-শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। ইহাতে রাজ-মহিষী মদয়ন্তী রাজাকে নিবারণ করেন। তখন রাজা সৌদাস

দলচিত্ত, আকাশ, পৃথিবী—সকল স্থানেই ভীষণরূপ দর্শন করিয়া ভীষণদেব বিনাশ হইবে ভাবিয়া সেই মৃতপুত্র কলাগুলি নিজ-পদতলে নিক্ষেপ করেন। ইহাতে সৌদাসের পদতল কালবশতঃ অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং তিনি বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষস-ভাবাপন্ন হন।

"বাসিতো মন্ত্রবস্ত্যাপো জলজাঃ পাদয়োর্জগৌ।
তিস্রঃ খলবলীং সর্ব্বং পশ্যন্ ভীষণরূপধৃক্ ॥"

(শ্রীভা ৯।৯।২৪)।

যে রাজা সৌদাস সর্ব্বত্র ভীষণদর্শন করিয়া ভীষের অনিষ্টাশঙ্কায় নিজপদদ্বয়ে সেই অনিষ্ট বরণ করিয়াছিলেন, সেই কালবশাই রাক্ষস-ভাবাপন্ন হইয়া অন্য এক বনবাসী ব্রাহ্মণকে তাঁহার সাধ্বী পত্নীর নিকট হইতে বল-প্রয়োগে গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ তাঁহাকে বিধবা করিয়া ব্যাঘ্রের পশু-ভক্ষণের ন্যায় ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন।

কৃতকে কৃতমহেশ্বর বা নারায়ণ-কল্পনা যেরূপ রাক্ষস-দর্শন বা পাষণ্ডী মতবাদ, অন্তর্যামি-দৃষ্টিরহিত হইয়া কেবল কৃতানুকম্পা-বৃত্তিও তদ্রূপ সংসারের হেতু। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে মহাভাগবতবর শ্রীভরতের আদর্শে লোকশিক্ষাচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। মহারাজ শ্রীভরত সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীহরিক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক শ্রীহরিভজন করিতেছিলেন। মহানদীর তটে শ্রীভরতের প্রণব-জপ-কালে একটী পূর্ণগর্ভা জলপান-রতা হরিণী সহসা সিংহগর্জ্জনে ভীষণ ভয়বিহ্বলা হইয়া লম্ফ-প্রদানপূর্ব্বক নদী উল্লঙ্ঘন করায় তাহার গর্ভপাতহেতু গর্ভস্থ শিশুটী জলে পতিত হয় ও হরিণী প্রাণত্যাগ করে। তখন শ্রীভরত "মৃগঃ জার্য্যাঃ সাধব উপশমশীলাঃ কৃপণসুহৃদ এবংবিধার্থে স্বার্থানপি গুরুতরা-নুপেক্ষেত" (শ্রীভা ৫।৮।১১) অর্থাৎ উপশমশীল আর্য্য সাধুগণ দীনজনের সুহৃদ্, তাঁহারা দীনব্যক্তিগণকে কৃপা করিবার জন্য আপনাদের গুরুতর অর্থও উপেক্ষা করেন—এই বিচার করিয়া স্রোতে ভাসমান অনাথ হরিণশিশুটীকে নিজ আশ্রমে লইয়া সর্ব্বতোভাবে লালন-পালন করিতে থাকেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, অনাথ প্রাণী শ্রীভগবানের তত্ত্ব অর্থাৎ অধিষ্ঠান। সেই অধিষ্ঠানকে যে ঔদ্ধত্যবুদ্ধিতে দর্শন করে, সে যমদণ্ড্য হয়। অনাথ হরিণশিশুটীকে রক্ষা করায় ভরতের কেন মৃগত্ব-প্রাপ্তি অর্থাৎ হরিজনকারীর ন্যায় বৈকুণ্ঠগতি না হইয়া সংসার-গতি লাভ হইয়াছিল? এজন্য হইলে কৃতানুকম্পার ফল কি শ্রীভগবানের তোষণ হয় না? সংসার-গতিই কি লাভ হয়? শ্রীভগবদুক্তি ও সাধুশাস্ত্রের উক্তির সহিত ভরতের গতির সঙ্গতি কোথায়? ভরতের এইরূপ গতি দেখিয়া কেই বা কৃতানুকম্পার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে সাহসী হইবে?

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীভরতসম্বন্ধে ও শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে ইহার সমাধান করিয়াছেন। প্রথমে একটী কথা জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, ভক্তিসিদ্ধ শ্রীভরতের এই যে কৃতপালনেচ্ছারূপ সাত্ত্বিক-কষায়-প্রতিম ভাব, তাহাকে কোন কোন তত্ত্ববিৎ "শ্রীভগবানের প্রতি উৎকণ্ঠা-বর্দ্ধনার্থ ভগবদিচ্ছানুসারেই সংঘটিত হইয়াছিল" (শ্রীভ স, ১৫৮ অনু) —এইরূপ বলিয়া থাকেন। কারণ, দুর্ব্বল সাধারণ প্রারব্ধ কর্ম্ম কিছুতেই পরমবলবতী ভগবদ্ভক্তিকে বাধা দিতে পারে না।

অতএব কেবল লোক-শিক্ষা-কল্পে মহাভাগবত ভরতের দ্বারা শ্রীভগবানই ঐরূপ আচরণ করাইয়াছিলেন। শ্রীভরত অন্তর্যামি-দৃষ্টিতে কৃতানুকম্পা না করিয়া কেবল-কৃতদৃষ্টিতে অর্থাৎ মাংসদৃষ্টিতে মৃগশাবকের প্রতি দয়া-প্রদর্শনের অভিনয় করিয়া তৎপ্রতি আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তজ্জন্যই তাঁহার সমস্ত ধর্ম্মাচরণ একেবারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছিল। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে বিশেষরূপে বর্ণিত রহিয়াছে। হরিণ-শিশুতে ভরতের এইরূপ আত্মীয়-অভিমান হইয়াছিল যে, উহাকে অহরহঃ তৃণাদির দ্বারা পোষণ, মৃগাদি হইতে রক্ষণ, কণ্ডূয়নাদির দ্বারা প্রীতি-সম্পাদন ও চুম্বনাদির দ্বারা লালন প্রভৃতি ব্যাপারে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার নিজের স্নানাদি নিয়ম, অহিংসাদি আচরণ ও মহাপুরুষ বিষ্ণুর পরিচর্য্যাদি কৃত্য প্রত্যহ এক একটী করিয়া ভ্রষ্ট হইতে থাকায় কতিপয় দিনের মধ্যেই সমস্ত ধর্ম্মাচরণই একেবারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছিল (শ্রীভা ৫।৮।৮)। মৃগশিশুর অন্তর্যামী মহাত্মাকে না দেখিয়া কেবল মৃগশিশুর দেহে অত্যাসক্ত হওয়ায় বিষ্ণুর আবেশের পরিবর্ত্তে ভরতের উপবেশন, শয়ন, ভ্রমণ, স্নান, ভোজনাদি প্রত্যেক কার্য্যেই মৃগদেহেরই আবেশ হইয়াছিল (শ্রীভা ৫।৮।১১)। অন্তর্যামি-দৃষ্টিতে কৃতানুকম্পা করিলে পরমাত্মার অনুসন্ধানই প্রবল হয় এবং ক্রমে ক্রমে শ্রীভগবানে আবেশ

হয়, কৃতাকারের প্রতি আবেশ হয় না; কিন্তু ভরতের কৃতাকারের জন্যই বিরহে ও মিলনে সর্ব্বক্ষণ আবেশ হইয়াছিল এবং তজ্জন্য তদন্তর্ধানীর পূজা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহাতেই তিনি ভগবৎস্মৃতি হইতে ভ্রষ্ট হইলেন (শ্রীভা ৫।৮।২৬)। সুতরাং যে বিষয়ে যাহার অতিনিবেশ, তত্তৎপ্রাপ্তি তাহার স্বাভাবিক অর্থাৎ পরমার্থার আবেশের দ্বারা মুক্তি ও ক্রমে প্রীতিলাভ হইতে পারে; কিন্তু কৃতাকার মাত্রের আবেশের দ্বারা দ্বিতীয়াভিনিবেশবশতঃ স্মৃতি বা সংসৃতি অনিবার্য্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে কৃতানুকম্পা-প্রদর্শনকারী অতিথিপরায়ণ আর এক মহাত্মার আচরণ বর্ণিত আছে। তিনি ভরতবংশীয় রন্তিদেব। তিনি কিছুই নিজে সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন না, সর্ব্বস্ব দান করিতেন। তাহাতে আত্মীয়-পোষ্যবর্গের সহিত অত্যন্ত কষ্টভোগ করিতেন, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তাঁহাদের শরীর কম্পমান হইত। তাহাতে তিনি সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া জলপান পর্য্যন্ত করিতেন না; কিন্তু তিনি সর্ব্বভূতে অন্তর্যামি-দৃষ্টিতে এইরূপ অতিথিসেবা ও কৃতানুকম্পা করিতেন। একদিন ভোজনকালে রন্তিদেব ভোজন করিতে যাইবেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন—

"তস্মৈ সংবিভজন্নন্নং সোদকমাদৃত্য শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
হরিং সর্ব্বত্র সম্পশ্যন্ স ভুক্ত্বা প্রযযৌ দ্বিজঃ॥"

(শ্রীভা ৯।২১।৬)

রন্তিদেব সর্ব্বভূতে ভগবৎসম্বন্ধ দর্শন করিতেন। সুতরাং তিনি অতিথিকে সমাদর করিয়া শ্রদ্ধা-সহকারে ঘৃত-পায়সাদি বিভাগ করিয়া দিলেন। অতিথিও অন্ন ভোজন করিয়া চলিয়া গেলেন।

ইহার পর রন্তিদেব অবশিষ্ট অন্ন স্বজনগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া স্বয়ং ভোজন করিতে যাইবেন, এমন সময় অন্য একজন শূদ্র অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকেও তিনি ভগবৎসম্বন্ধ-দৃষ্টি করিয়া অন্ন বিভাগ করিয়া দিলেন। সেই শূদ্র ভোজনান্তে গমন করিলে, কুক্কুর-পরিবেষ্টিত হইয়া একজন কুক্কুর-স্বামী অতিথি আসিলেন। রন্তিদেব সেই কুক্কুরস্বামীকে ও কুক্কুরদিগকে বহু সম্মান করিয়া অবশিষ্ট অন্ন প্রদান করিলেন এবং অন্তর্যামি-দৃষ্টিতে তাহাদিগকে নমস্কার করিলেন। ইহার পর মাত্র একজনের পরিমাণ পানীয় জল অবশিষ্ট থাকিল। তিনি সেই জলটুকু পান করিতে যাইবেন, এমন সময় এক চণ্ডাল অতিথি আসিয়া পানীয় জল প্রার্থনা করিল। তাহাকে অন্তর্যামি-দৃষ্টিতে জলদান ও মিষ্টবাক্যে আদর করিয়া শ্রীরন্তিদেব অভ্যর্থনা করিলেন। ফলাকাঙ্ক্ষিগণের ফলদাতা ব্রহ্মাদি দেবতাবর্গ ও বিষ্ণু-বিনির্ম্মিতা মায়া শ্রীরন্তিদেবকে ছলনা ও পরীক্ষা করিবার জন্য তৎপরে আগমন করিলেন। কিন্তু—

"স বৈ তেভ্যো নমস্কৃত্য নিঃসঙ্গো বিগতস্পৃহঃ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্ত্যা চক্রে মনঃ পরম্॥"

(শ্রীভা ৯।২১।১৭)

আসক্তিরহিত ও বিষয়ভোগস্পৃহাশূন্য হইয়া শ্রীরন্তিদেব ব্রহ্মাদি দেবতাবর্গকে নমস্কার করিয়া কেবলমাত্র ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে ভক্তিসহকারে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন।

"ঈশ্বরালম্বনং চিত্তঃ কুর্ব্বতোঽনন্যরাধসঃ।
মায়া গুণময়ী রাজন্ স্বপ্নবৎ প্রত্যলীয়ত॥"

(শ্রীভা ৯।২১।১৯)

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! শ্রীরন্তিদেব ভগবদ্ভক্তির অন্যফলাপেক্ষারহিত হইয়া চিত্তকে ভগবন্নিষ্ঠ করিয়াছিলেন; সুতরাং গুণময়ী মায়া তাঁহার নিকট স্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হইত।

"তৎপ্রসঙ্গানুভাবেন রন্তিদেবানুবর্ত্তিনঃ।
অভবন্ যোগিনঃ সর্ব্বে নারায়ণপরায়ণাঃ॥"

(শ্রীভা ৯।২১।১৮)

শ্রীরন্তিদেবের অনুগতজন সকলে তাঁহার (শ্রীরন্তিদেবের) কৃপাশক্তিপ্রভাবে ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ যোগী হইয়াছিলেন।

শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু দয়াবীরত্বে স্বাত্মিভাবরূপা ভগবৎ-প্রীতিসমুৎপন্না দয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই দয়ার সমস্ত জীবকে তৃণীয় অর্থাৎ শ্রীভগবানের বলিয়া উপলব্ধি হয়। দয়াবীররসের দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভে শ্রীরন্তিদেবের উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীরন্তিদেব ও শ্রীভরতের কৃতানুকম্পার দুইটি পৃথক্ আদর্শের দ্বারা শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু ক্রমসন্দর্ভে অন্তর্যামি-দৃষ্টিহীন কেবল কৃতানুকম্পার দ্বারা যে বন্ধন হয় ও অন্তর্যামি-দৃষ্টির সহিত কৃতানুকম্পায় যে ভগবৎসন্তোষ হয়,

তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীরন্তিদেব শ্রীবাসুদেবে ভক্তিময় যে মোক্ষের প্রতি অনাদর করিয়াছিলেন, তাহাও ভগবানের কারুণ্যবিভাবনময় ভক্তিকৃত।

"কেবলজীবকারুণ্যং খলু বিহায় ভবতি ভরতবৎ। যো মোক্ষানাদরঃ; সোঽপি তৎকারুণ্য-বিভাবনময়ভক্তিকৃতঃ।" (ক্রমসন্দর্ভে ৯।২১।৫—৮)

অতএব শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—"অতএব কেবলকৃতানুকম্পয়া শ্রীভগবদর্চনং ত্যক্তবতো ভরতস্যাস্তরায়ঃ। তস্মাদ্ভূতদয়ৈব ভগবদ্ভক্তিমুখ্যা, নার্চনমিতি নিরস্তম্।" (শ্রীভ স. ১০৪ অনু)

অতএব অন্তর্যামি-দৃষ্টিহীন কেবল-কৃতানুকম্পা বা জীবে দয়ার দ্বারা শ্রীভগবদ্ভজন-পরিত্যাগকারী ভরতের বিঘ্ন হইয়াছিল। সুতরাং ভূতদয়াদ্বারাই ভগবদ্ভক্তি মুখ্যা অর্থাৎ যাঁহারা প্রাণীর প্রতি দয়া করেন, তাঁহারাই প্রকৃত ভগবদ্ভজন করেন। 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' ভগবানের পৃথক্ পূজার আর প্রয়োজন কি?—এই নাস্তিক্য মতবাদ নিরস্ত হইল।

অতএব অন্তর্যামি-দৃষ্টিহীন কেবল-কৃতানুকম্পার দ্বারা শ্রীভগবদ্ভজন-পরিত্যাগকারীরই পতন হয়, ইহাই শ্রীভরত মহারাজ অভিনয় করিয়া দেখাইলেন। শ্রীরন্তিদেব অন্তর্যামি-দৃষ্টিতে কৃতানুকম্পা করিয়াছেন এবং সর্ব্বক্ষণ শ্রীবাসুদেবে ভক্তিবিশিষ্ট ও অভিনিবিষ্ট ছিলেন। এইজন্য ফলদাত্রী দেবতাগণ ও ভগবতী মায়া তাঁহাকে বঞ্চনা করিতে পারেন নাই। শ্রীবাসুদেবে ভক্তির আবেশে আবিষ্ট শ্রীরন্তিদেবের অনুসরণকারী ব্যক্তিগণও শ্রীনারায়ণ-পরায়ণ ভক্তিযোগী হইয়াছিলেন। অন্তর্যামি-দৃষ্টিহীন কৃতানুকম্পার ভরতের কৃতের নগর আদরের প্রতি আবেশ হইয়াছিল, আর অন্তর্যামি-দৃষ্টিযুক্ত শ্রীরন্তিদেবের কৃতানুকম্পারূপ কর্ম্মার্পণের ফলে তাঁহার শ্রীবাসুদেবে আবেশ হইয়াছিল। অতএব অন্তর্যামি-দৃষ্টিহীন কেবল কৃতদয়া বা জীবে দয়া বা আধুনিক কালের অতাত্ত্বিক-পরিভাষার যাহা 'জীবসেবা বা' 'জীবপ্রেম', উহা ভগবদ্ভক্তি, আর পৃথক্ ভগবদ্ভক্তি নাই—ইহাই মুখ্য উপাসনা, শ্রীবিগ্রহ অর্চনের প্রয়োজন নাই। সুতরাং 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'—এই নাস্তিক্য-মতবাদ নিরস্ত হইল।

কৃতানুকম্পার বিচারের আর একটী সংশয় ও কুতর্ক অজ্ঞ ব্যক্তিগণের হৃদয়ে উদিত হয়। প্রাণিমাত্রকেই যখন হিংসা করা উচিত নহে ও আদর করা উচিত এবং শ্রীভগবান্ প্রাণিমাত্রের প্রতি হিংসাকারীর অর্চ্চন স্বীকার করেন না, তখন অর্চ্চনের জন্য যে পত্র-পুষ্পাদি চয়ন করা হয়, তদ্দ্বারা অনিচ্ছাকৃত হিংসা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। যদি ছাগাদি-বলি হিংসা বলিয়া বিহিত হয়, তবে কেন পুষ্প-পত্রাদি অর্চ্চনোপকরণ সংগ্রহ-চেষ্টা হিংসা বলিয়া গণিত না হইবে? কুতার্কিকগণ এইভাবে বিচার করিয়া যখন দেখিতে পায় যে, বাহ্যদর্শন করিয়া অবস্থান করিলেও হিংসা অনিবার্য্য, তখন তাহারা হিংসাকেই জীবের নৈসর্গিক ধর্ম্ম বলিয়া বহুমানন করিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন,—

"নিষেবিতানিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণ মহীয়সা।
ক্রিয়াযোগেন শস্তেন নাতিহিংস্রেণ নিত্যশঃ।
মদ্ভিন্নদর্শন-স্পর্শ-পূজা-স্তত্যভিবন্দনৈঃ।
ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সত্ত্বেনাসঙ্গমেন চ॥"

• • • •

"মদ্ধর্ম্মণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ।
পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাম্॥"
(শ্রীভা ৩।২৯।১৫-১৬, ১১)

"নাতিহিংস্রেণ' প্রাণ্যাদিপীড়াপরিত্যাগ ফলপত্রাদি-জীবাবয়বরূপীকারার্থঃ।" (শ্রীভ স, ২২৯ অনুচ্ছেদ।

"নাতিহিংস্রেণ অতিহিংসারহিতেনেত্যুক্তি-পদ্বেন ভগবদ্ধর্ম্মিণ-মার্চ্চন-লেপনতদর্থারাদিবিবিধ-নৈবেদ্যসাধনাদিষ্বপি - দুর্ব্বার-দুর্লক্ষ্য-সূক্ষ্মজীবহিংসন-শাক-পত্র-মূল-ফলাদিস্তোটনাদাবপি ন ক্ষতিরিতি জ্ঞাপিতঃ।' (শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর)

শ্রীকপিলদেবেরই উক্তি হইতে জানা যায় যে, অতিহিংসা-রহিত যে পাঞ্চরাত্রিক অর্চ্চনরূপ ক্রিয়াযোগ, তাহা ভূত-সমূহের মধ্যে অন্তর্যামিভাবনার দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে সন্তুষ্ট লাভ করায়। এই স্থানে 'নাতিহিংস্র'-শব্দের দ্বারা পত্র-পুষ্পাদি-চয়ন-লক্ষণা অর্চ্চন-ক্রিয়ার সামান্য হিংসাও বিহিত হইয়াছে এবং ইহা ভূতসমূহের মধ্যে ভগবদ্ভাবনার বিরোধী নহে। পরন্তু বিরোধী হইলে এই উভয় লক্ষণকে একসঙ্গেই তাঁহার প্রাপ্তির উপায় বলিয়া বলিতেন না। শ্রীভগবান্ যাহাতে সন্তুষ্ট হন, সেইভাবে অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছার অনুকূলে ও অবিরোধে নিখিল চেষ্টা করাই

ভক্তি। ইহাতে ধর্ম্মার্থ-কামিগণের তত্তৎকামনা-পূরয়িত্রী দেবতার প্রতি বলি-প্রদানের ছলে যে আত্মতোষণপর চেষ্টা, তাহা পঞ্চরাত্রোক্ত শ্রীহরিতোষণপর 'সাত্বিহিংসা' হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ধর্ম্মার্থকামমূলক চেষ্টার দ্বারা জীবের সন্তোষ হয়, আর শ্রীহরিতোষণপরচেষ্টাদ্বারা শ্রীহরির প্রীতি হয়। শ্রীহরির প্রীতি যাহাতে হয়, তাহা কখনও হিংসা হইতে পারে না। আর শ্রীহরির প্রীতি যাহাতে না হয়, তাহার আকার হিংসার মত না থাকিলেও তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হিংসা অর্থাৎ জগন্নাশকর কার্য্য। সমস্ত ব্যাপারই শ্রীহরিতোষণের মানদণ্ডে মাপিতে হইবে।

জৈনমতবাদের ভূতাদয় বা অহিংসা, আর শুদ্ধ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের ভূতাদয় ও অহিংসার প্রভেদ এই যে, পূর্ব্বোক্ত মতবাদে ভূতমাত্র-দর্শনে ভূতানুকম্পা বিহিত হয়, আর বিষ্ণু-উপাসকগণ ভূতের অন্তর্যামি-দৃষ্টিতে ভূতানুকম্পা করিয়া থাকেন; এইজন্য বিষ্ণু-উপাসকগণের 'খাটমল খিলাইবা'র অর্থাৎ ভাড়াটিয়া মনুষ্যের রক্ত ছারপোকাকে খাওয়াইবার অর্থাৎ একপ্রাণীপ্রতি হিংসা করিয়া আর এক প্রাণীর প্রতি দয়ার ছলনা করিবার প্রয়োজন হয় না। একদিকে যেমন "বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?"—নীতিবাদী ব্যক্তিগণ ছাগকে অনীশ্বর বলিয়া মনুষ্যকে ঈশ্বর বলিবার পক্ষপাতী অথবা ছাগ-নারায়ণকে মনুষ্য-নারায়ণের ভোজ্য করিবার পক্ষপাতী, আর একদিকে এই মতবাদি-গণেরই প্রতিযোগিরূপে জৈনমত মনুষ্যকে দিয়া ইতর প্রাণীর সেবা করাইতে বদ্ধপরিকর। বিষ্ণু-উপাসকগণ এই উভয় মতবাদী হইতে বিলক্ষণ। তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর তোষণের জন্য শ্রীবিষ্ণুর অধিষ্ঠান-বোধে সর্ব্বভূতে আদর করিয়া থাকেন এবং যিনি বিষ্ণুর যত অধিক তোষণ করেন, তাঁহার প্রতি ততটা আদর ও প্রীতি প্রদর্শন করেন।

কেহ কেহ ভূতানুকম্পা-সম্বন্ধে এত বিচার শ্রবণ করিয়াও আবার জিজ্ঞাসা করেন যে,—যদি ঘরে বিষাক্ত সর্প দুষ্ট হয়, তবে কি তাহাকে মারিব না? মশা, ছারপোকা, পিপীলিকা প্রভৃতি গৃহের নিত্যসহচর প্রাণিগুলি যদি আমাদিগকে আক্রমণ করে বা আমাদের দ্রব্যাদি নষ্ট করে, তবে কি আমরা তাহাদিগকে বাধা দিব না? এই সকল প্রশ্ন অত্যন্ত বালোচিত ও প্রাকৃতবুদ্ধিজাত। যাঁহারা শ্রীভগবানে সর্ব্বপিতাত্মা নহে বা শ্রীভগবৎসুখানুসন্ধানকে সকল বিষয়ে মানদণ্ড করেন নাই, তাঁহাদিগের অনন্ত প্রশ্ন, অনন্ত সন্দেহ অনন্তকাল হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়া থাকিবে। যাহারা ভগবৎসুখানুসন্ধানে সতত যুক্ত থাকেন, শ্রীভগবান্‌ই তাঁহা-দিগকে সর্ব্বক্ষণ বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। শ্রীতিমানের নিকট হিংস্র প্রাণীও হিংসা হইতে নিবৃত্ত হয়। শ্রীগৌর-সুন্দর যখন ঝারিখণ্ডের পথ দিয়া কৃষ্ণানুসন্ধান করিয়া চলিতেছিলেন, তখন বন্য হস্তী, ব্যাঘ্র, ভল্লুকাদিও হিংসা-রহিত-ভাব প্রদর্শন, অধিক কি, প্রেমপুলকিত হইয়া নৃত্য ও পরস্পর সম্ভাষণ করিয়াছিল। শ্রীল ঠাকুর হরিদাস যখন ফুলিয়ার গঙ্গাতীরে নির্জ্জন গুহায় ভজন করিতেছিলেন, তখন গুহাবাসী বিষাক্ত সর্পের জ্বালায় অন্যান্য সকলের ক্লেশের কথা শুনিয়া ঠাকুর হরিদাস স্থান পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলে মহাপ্রভু নিজেই ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল। শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীবারাণসী গঙ্গার উত্তরতীরে শ্রীবক্রেশ্বর-শিবের স্থানে ভজনকালে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু মশকের অত্যন্ত উপদ্রব দেখিয়া স্থান ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলে শ্রীবক্রেশ্বর-মহাদেবের ইঙ্গিতমাত্র সেই স্থান মশক-রহিত হইয়া অদ্যাপি তাহার সত্যতা প্রমাণিত করিতেছে। সূর্য্যকুণ্ডে শ্রীল মধুসূদন দাস গোস্বামী মহারাজ যখন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন, তখন হিংস্র সর্প পর্য্যন্ত হিংসা ভুলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিতে আসিত এবং যখন অন্ত করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ও সমাপ্তিকালে হুতবহ করিয়া চলিয়া যাইত। পরমপ্রীতিমান্ মহাভাগবতগণের কথা দূরে থাকুক, যাঁহাদের মধ্যে পরমার্গতির আভাসও আসিয়াছে তাঁহারাও পৃথিবীর কোন বস্তু হইতে ভীত হন না। এখনও মুনি-ঋষি ও ভজনানন্দিগণ কত গভীর বনে, পর্ব্বত-গুহায়, কত উপত্যকায় হিংস্র জন্তু প্রভৃতির সহিত বাস করিতেছেন। যাহার হৃদয়ে হিংসার বৃত্তি আছে, তাহাকেই অপরে হিংসা করিতে বাধ্য হয়। যাঁহারা অন্তর্যামি-দৃষ্টিতে ভূতাদয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা ভজন-প্রভাবে যতই উন্নত হইবেন, ততই তাঁহাদের সর্ব্বত্র ভগবদ্বৈভব স্ফূর্ত্তি হইতে থাকিবে। অতএব ভূতাদয় যে কেবল প্রাকৃত কনিষ্ঠ কনিষ্ঠের জন্য বিহিত হইয়াছে, তাহা নহে; তবে পার্থক্য এই যে, উত্তম মহাভাগবতগণে ভূতাদয়টী শাস্ত্র-শাসনমূলক ত' নহেই, তাহা অতি স্বাভাবিক ও অধিষ্ঠীয় প্রীত্যাস্পদের সম্বন্ধে পরমচারু-বিশিষ্ট। এই

সম্বন্ধে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু যাহা অতি গম্ভীরভাবে বিচার করিয়াছেন, তাহার একটু সংক্ষিপ্ত দিগ্‌দর্শন করা হইতেছে।

যাঁহারা প্রথমোপাসক অর্থাৎ যাঁহাদের বৈকুণ্ঠপ্রকৃতি বা স্বভাবমাত্র আরব্ধ হইয়াছে, সেইরূপ মাত্র প্রারব্ধভক্তি ব্যক্তিগণ লোক-পরম্পরাগত শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তির পূজা করেন, কিন্তু ভক্ত ও সর্ব্বপ্রাণীতে তাঁহাদের আদর নাই; এইরূপ কনিষ্ঠ-সোপানাশ্রিত কনিষ্ঠগণের ভাবি-মঙ্গলের জন্য অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাবস্থিত এইরূপ কর্ম্মমিশ্র-অর্চ্চনকারিগণের অধিকারের উন্নতির জন্য অন্তর্যামি-দৃষ্টিতে সমস্ত ভূতের প্রতি আদর পাত্র বিধান করিয়াছেন। ইহাঁরা বর্ণাশ্রমে অবস্থিত অভিমান করিয়া যদি যুগপৎ বিষ্ণুর অর্চ্চন ও সর্ব্বভূতকে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান-জ্ঞানে সম্মান না করেন, তবে ইহাদের কোনদিনই বিষ্ণুবেশ হইবে না: কেবল লোকপরম্পরাগত শ্রদ্ধায় প্রতিমার অর্চ্চন বর্ণাশ্রমাভিমানিগণের অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধিকারিগণের কোন দিনই নির্গুণ শ্রদ্ধার উদয় করায় না, পরন্তু তাঁহাদের অর্চ্চনাভিনয়ও ব্যর্থ হয়। এইজন্য যাহারা কর্ম্মমিশ্র-অর্চ্চনকারী লৌকিক শ্রদ্ধাবান্, তাহারা 'সর্ব্বভূতে অন্তর্যামিরূপে বিষ্ণু বিরাজিত আছেন'—এই জ্ঞানটি শাস্ত্র-শাসনের দ্বারাও যদি লাভ করেন এবং তৃতীয়ের সহিত অর্চ্চন করেন, তবে শীঘ্রই ঘৃণা, দ্বেষ ও দেহাত্মবুদ্ধি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবেন এবং বহুতের কৃপায় শ্রদ্ধা যত পরিপক্ক হইতে থাকিবে, ততই শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা বা নির্গুণা শ্রদ্ধার দিকে গতি লাভ করিবেন; শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রতি আদরযুক্ত, সর্ব্বভূতে সম্মানকারী, শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন করিতে করিতে প্রেমের নিকটস্থ হইতে থাকিবেন। তখন কনিষ্ঠসোপানাশ্রিতের কনিষ্ঠতা হইতে তাঁহাতে উত্তম-সোপানাশ্রিত মুখ্য কনিষ্ঠতা প্রকাশিত হইলে সেইরূপ নির্গুণ-শ্রদ্ধাযুক্ত সাধকের সর্ব্বভূতাদর-বৃত্তিটী সর্ব্বত্র শ্রীভগবদ্বৈভব-স্ফূর্ত্তির দ্বারা দিয়া প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইবে। 'সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা ভগবদ্-বৈভব-স্ফূর্ত্তি' অর্থে 'সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের লীলাকর্ত্তৃত্ব-শক্তি-স্বীকার' অর্থাৎ তাঁহার ধাম, তাঁহার লীলা ও পরিকরাদির স্ফূর্ত্তি। এইরূপ সম্বন্ধ সাধকের সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে,—

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥

(শ্রীচৈ চ ম ২২।১৪৩ ধৃত স্কান্দবচন)

হে ব্যাধ! তোমার যে অহিংসাদি গুণ হইয়াছে, তাহা অদ্ভুত নয়, কেননা, যাঁহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা অন্যের ক্লেশদ হন না।

শ্রীনারদের কৃপাপ্রাপ্ত ব্যাধ তখন সম্পূর্ণ শরণাগত হইয়া শ্রীতুলসী-সেবা, নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন ও শ্রীনাম-ভজন-প্রভাবে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রতি আদরযুক্ত, নির্গুণ শ্রদ্ধাযুক্ত ও প্রেমের নিকটস্থ হইতেছিলেন, তখন একদিন শ্রীনারদ শ্রীপর্ব্বতমুনির সহিত উক্ত ব্যাধকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। উক্ত ব্যাধ দূর হইতে শ্রীগুরুদেবের দর্শন প্রাপ্ত হইয়া

"আস্তে-ব্যস্তে ধাইয়া আসে, পথ নাহি পায়।
পথের পিপীলিকা ইতি-উতি ধরে পায়॥
দণ্ডবৎ-স্থানে পিপীলিকারে দেখিয়া।
বস্ত্রে স্থান ঝাড়ি' পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥"

(শ্রীচৈ চ ম ২৪।২৬৪-২৬৫)

ইহাতে—

"নারদ কহে,—'ব্যাধ, এই না হয় আশ্চর্য্য।
হরিভক্ত্যে হিংসাশূন্য হয় সাধুবর্য্য॥'"

(শ্রীচৈ চ ম ২৪।২৬৬)

শ্রীনারদের কৃপালব্ধ ব্যাধের পিপীলিকাকে দেখিয়া বস্ত্রের দ্বারা স্থান ঝাড়িয়া যে দণ্ডবৎ করিবার আদর্শ, তাহা জৈন বা বৌদ্ধ-মতবাদোত্থ তথাকথিত অহিংসা নহে। তাহাতে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সবিশেষ-পরতত্ত্বের লীলাকর্ত্তৃত্বশক্তি স্বীকার অর্থাৎ শ্রীধাম, লীলা ও পরিকরস্ফূর্ত্তিরূপ ভগবদ্বৈভব-স্ফূর্ত্তি আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা শ্রীহরিভক্তিতে প্রবৃত্ত অর্থাৎ নির্গুণ সম্বন্ধ সাধক, তাঁহাদেরও সর্ব্বত্র ভগবদ্বৈভবের স্ফূর্ত্তি আরম্ভ হয়; সিদ্ধগণের ত' সর্ব্বভূতাদরের মধ্যে সপরিকর ইষ্টদেবের দর্শন পরিপক্কই হইয়া থাকে; আর যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ রাগাত্মিক শ্রীগোকুলবাসিগণের মঙ্গলকামনাময় সিদ্ধ-বপুরাদিভাবে শুদ্ধ হইয়া সুতীব্র আবেশের সহিত তাঁহাদের চরিত্র অনুসরণ করেন এবং সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিজ ভক্তের প্রতিও বন্ধুভাবের অনুধ্যান করেন, সেই রাগানুগ ভক্তগণের সর্ব্বজীবে সর্ব্বত্র শ্রীহরি-বুদ্ধি স্বভাবতঃই

উচিত হইয়া থাকে। প্রেমের প্রথমোপলব্ধাবস্থা-প্রাপ্ত ভাগবতগণের অহিংসা ও উপরম কিন্তু নিজেরই অসাধারণ স্বভাব। যেমন শ্রীশুকাগোস্বামি-প্রভুর উক্তি,—

"যদ্ভাগবতাঃ সহসৈব ধীরা
ব্যপোহ্য দেহাদিষু সঙ্গমূঢ়ম্।
ভজন্তি তৎ পারমহংস্যমধ্বা
যন্নিষ্ঠহিংসোপশমঃ স্বয়ংষ্টঃ ॥"

(শ্রীভা ১১।১৮।২২)

জ্ঞানী ও ভাগবতত্ত্ব-ভেদে পরমহংস দুই প্রকার। জ্ঞানি-পরমহংসকে আদি-পরমহংস ও ভাগবত পরমহংসকে অন্ত্য বা পরাকাষ্ঠাস্বরূপ ভাগবত-পরমহংসও বলা হয়। শ্রীহরিতে অনুরক্ত ধীরগণ সহসাই দেহাদি বস্তুগত আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া পরমকাষ্ঠাপন্ন পরমহংসের লাভ করেন। সেই অবস্থায় অহিংসা অর্থাৎ মৈত্রী ও উপরম অর্থাৎ পরতত্ত্ব-আবেশময় অনুভবানন্দ বা উপশম অর্থাৎ নৈষ্ঠিকী ভক্তি স্বভাবসিদ্ধরূপেই বর্ত্তমান থাকে। অহিংসারূপ শান্তি কেবল ব্যতিরেকভাবে প্রকাশ না করিয়া মৈত্রীরূপ অন্বয়ভাবে প্রকাশিত হয় অর্থাৎ সর্ব্বভূতকে অভীষ্টদেবের নিজজনরূপে দর্শন হয়, আর উপরম বা উপশম কেবলমাত্র ব্যতিরেকভাবে না হইয়া নিরঞ্জিত-তৈলধারাবৎ ভগবৎস্মৃতিরূপ নির্ব্বন্ধ বা অভিনিবেশরূপে বাস্তব অন্বয়ভাবে প্রকাশিত হয়।

পরমসিদ্ধ অর্থাৎ উত্তমোত্তম মহাভাগবতগণের চেতন-অচেতন সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাবের উপলব্ধি স্বভাবসিদ্ধ; তাহাই শ্রীঋষি মহারাজ বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥"

(শ্রীভা ১১।২।৪৫)

উত্তমোত্তম মহাভাগবত স্থাবর-জঙ্গমাদি সর্ব্বভূতে অভীষ্ট শ্রীভগবদ্ভাব অর্থাৎ শ্রীভগবানের আবির্ভাব-দর্শনরূপ বহিঃসাক্ষাৎকার করেন এবং নিজের মধ্যে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত ইষ্টদেবের লীলা-পরিকরবর্গকে দর্শন করেন; ইহাই তাঁহাদের অন্তঃসাক্ষাৎকার। ইষ্টদেবের প্রতি নিজের রতি হইতে আরম্ভ করিয়া অনিবচ্য মহাভাব পর্য্যন্ত ভাবে সর্ব্বভূতকে বিভাবিত দর্শন করেন এবং স্বচিত্তে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শ্রীইষ্টদেবের অবতারের আশ্রয়বিগ্রহরূপে ভূতসমূহকে দর্শন করেন। উত্তম মহাভাগবতের প্রতি কেহ অজ্ঞতাক্রমে শত্রুতাচরণ করিলেও সেই শত্রুর প্রতি অথবা শ্রীভগদ্বিদ্বেষী বা শ্রীভাগবত-বিদ্বেষীর প্রতি ইষ্ট-দেবেরই স্ফূর্ত্তি হয়; আর, অধম-মহাভাগবতের বিদ্বেষীর ব্যবহারে চিত্তে অনভিনিবেশরূপ উপেক্ষার উদয় হয়। উত্তম মহাভাগবত শ্রীশুকদেবের কংসের প্রতি 'ভোজকুল-কুলাঙ্গার'-রূপে উক্তি বা শ্রীউদ্ধবের ভক্তবিদ্বেষী ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনের নিন্দা একই তাৎপর্য্যপর। শ্রীশুকদেবের ভগবদ্-বিদ্বেষীর প্রতি শাসন ও শ্রীউদ্ধবের ভক্তবিদ্বেষীর প্রতি নিন্দা —উভয়েরই মধ্যে ইষ্টদেবের স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

"তুমি আমা হইতে বড় কিরূপে ?"

বহুকাল-সঞ্চিত ক্রোধাগ্নেয়গিরির মুখিবর এক গৃহস্বামী একদিন কম্পিত-কলেবরে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া তাঁহার পত্নীকে বলিতেছিলেন,—

"তুমি আমা হইতে বড় কিরূপে ?"

পতির এইরূপ ক্রোধব্যঞ্জক গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া প্রতি-বেশিগণ প্রকৃত ব্যাপারটী জানিবার জন্য দ্রুতপদ-সঞ্চারে তথায় ধাবিত হইল। সকলেই উপস্থিত হইয়া দেখিল—সাধ্বী পত্নী নীরবে মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছেন এবং তদুপরি পতি অজস্র গালি বর্ষণ করিতেছেন। অনু-সন্ধানে জানিতে পারা গেল—পত্নী শ্রীতুলসীর সেবা করেন, শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবকে শ্রদ্ধা করেন, তাঁহাদের শ্রীমুখ হইতে শ্রীহরিকথা-শ্রবণার্থ স্নেহ-স্নেহ-বিগলিত মন, নিজের ভোগ-বিলাসের প্রতি বিন্দুমাত্রও দৃষ্টিপাত না করিয়া অতিথি-অভ্যাগতকে ও সর্ব্বভূতকে দ্রব্যাদির দ্বারা তুষ্ট করেন; বিশেষতঃ, বৈষ্ণবের প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করেন। ইহাই পতির পত্নীর প্রতি ক্রোধের মূল কারণ। সেই

গৃহস্থের একটী পুত্র ও একটী কন্যা আছে। পুত্র ও কন্যা মাতার অনুসরণে সাধু-মুখ-বিগলিত শ্রীহরিকথা-শ্রবণে কটি-বিশিষ্ট ও সদাচারসম্পন্ন দেখিয়া গৃহস্বামীর ক্রোধের সীমা নাই। 'সকলেই ছারখারে হইয়া গেল, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের হইয়া গেল, যোগার্জ্জিত অর্থ ও' অতিথি-অভ্যাগত ও সর্ব্বভূতের আদরে নিযুক্ত হইতেছে. সুতরাং আখেরের জন্যে কিছুই থাকিল না'—ইহা দেখিয়া গৃহস্থের ক্রোধ রাখিবার আর স্থান নাই। এই ক্রোধ তুষানলের ন্যায় অন্তরে পুষিতে পুষিতে অবশেষে তথায় এক আগ্নেয়গিরির আবির্ভাব হইয়াছে। একদিন পত্নীকে পুত্র ও কন্যার সহিত শ্রীহরিকথা-শ্রবণার্থ উদ্যোগিনী দেখিয়া পতির সেই ক্রোধাগ্নেয়গিরি অকস্মাৎ উৎপাদিত হইয়া পড়িল।

গৃহস্বামী ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন,—পত্নী, পুত্র ও কন্যা বিক্রীত-পশুবৎ তাঁহারই ভোগ্য বস্তু, সুতরাং তদধীন। তিনি গৃহস্বামী, গৃহের সম্রাট্, একমাত্র দণ্ডমুণ্ড-বিধাতা। যাহারা তাঁহার অধীন ও ভোগ্যতম, তাহারা কি করিয়াই বা তাঁহা অপেক্ষা বড় হইতে পারে? জন্মদাতা পিতা পুত্র ও কন্যা অপেক্ষা লঘু বা ভোগ্য পত্নী অপেক্ষা লঘু,—ইহা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও বিস্ময়কর। তাই গৃহস্বামী বলিয়া উঠিলেন—"তুমি আমা অপেক্ষা বড় কিরূপে? তোমার খাওয়া-পরা বন্ধ করিব; দেখি, তোমার কতটা আস্পর্দ্ধার সীমা!" বয়সের বা ব্যবহারিক প্রভুত্বের ভৌমরাজ্যে যে পারমার্থিকতার পরিমাপ হয় না—ইহা বহির্ম্মুখগণ বলিতে পারে না।

যাহারা সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণের অভিনয় করিয়াও প্রভুত্ব বিষয়ী, স্ত্রীপুত্র-পতি-পরিজন-দেহ-গেহ প্রভৃতিতে 'আমি ও আমার'-বুদ্ধিযুক্ত, তাহারাই শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের নিকট দাস্যে-দণ্ডবতের কপটতা করিয়া, সন্ন্যাস-বক্তার সঙ্গে বাস্‌বৈখরীর ফুলঝুরি ছুটাইয়া, পরোপদেশে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াও যখন নিজের উপর পরীক্ষার সময় উপস্থিত হয়, তখন নির্লজ্জভাবে প্রকৃত মনোভাবসমূহ প্রকাশ করিয়া ফেলে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ ঐ সকল বহুমূর্ত্তিকে নষ্ট করিয়া দেখাইয়া একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণের 'মুণ্ডনবিধানের' উদ্দেশ্যে তাহাদের ঐরূপ পরীক্ষার অবসর প্রদান করেন।

'দাস্যে-দণ্ডবৎ' অর্থে সমগ্র সত্তা বা নিজ সমগ্র স্বত্বের অভিমান বিসর্জ্জনপূর্ব্বক আত্মনিক্ষেপ। শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের নিকট সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবতের কেবল আকার দেখাইলাম, অথচ দেহ-গেহের অহঙ্কারাভিমান করত স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে নিজ সম্পত্তি বলিয়া হৃদয়ে পূর্ণভাবে ধরিয়া রাখিলাম, তাহা হইলে তাহা কি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের নিকট একটী ব্যায়াম প্রদর্শন-মাত্র হইল না? যদি 'আমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার, আমি বিক্রীত পশু, আমার সমগ্র সত্তা—তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের রেণুর, আমার বাক্তিগত কোন পৃথক্ স্বত্ব বা তত্ত্ববিল নাই',—এইরূপ অভিনিবেশ না থাকে, তাহা হইলে কি সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবতের অভিনয় কেবল জড়ীয় বঞ্চনাকারী ব্যায়ামমাত্রে পর্য্যবসিত হইল না? যদি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-শ্রীপাদপদ্মে আমার সমগ্র সত্তার সহিত 'আমার বলিতে যাহা কিছু' সমগ্রভাবে সমর্পণ করিয়া দিতে না পারি, দেহ-গেহ-পরিজনে নিজ-স্বত্ব বা সম্পত্তি-বুদ্ধি রাখি অর্থাৎ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবকেই একমাত্র পূর্ণ স্বত্বাধিকারী বলিয়া বরণ করিতে না পারি, তবে শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবকে ভক্তিরাজ্যে অভিহিত করা কেবল ভণ্ডামি। 'শ্রীহরি-দেব সর্ব্বস্ব হরণ করেন; শ্রীগুরুদেব সেই সর্ব্বস্বহরণকারী শ্রীহরিদেবের প্রতিনিধিরূপে জীবের সর্ব্বস্ব লইয়া শ্রীহরি-দেবের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি দেন,—ইহাই সেবা-ভগবান্ ও সেবক-ভগবান্—এই দুইজনের মধ্যে পরস্পর নিত্য-সম্বন্ধ। শ্রীগুরুদেব শ্রীহরিদেবরূপী অধিষ্ঠান দত্ত্বার অধিষ্ঠান প্রতিনিধি। সর্ব্বস্ব-হরণকারী শ্রীহরিদেবের সেবায় যাহারা সর্ব্বস্ব-প্রদানে যতটা কুণ্ঠিত, শ্রীগুরুদেবের দেহ তাহাদের প্রতি ততটা সঙ্কুচিত। এইজন্যই শ্রীগুরুদেব পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়াও অত্যন্ত পক্ষপাত-ধর্ম্মযুক্ত। এই পক্ষপাতিত্ব শ্রীহরি-দেবকে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ করে। এই পক্ষপাতিত্ব-ধর্ম্ম চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যযুক্ত। নির্ব্বিশেষ-নিরপেক্ষতার মধ্যে চেতনের বিলাস অর্থাৎ প্রীতির সৌন্দর্য্য-বৈচিত্র্য নাই।

শ্রীহরিদেব—যিনি সর্ব্বস্বহরণকারী, তাঁহার প্রতি উন্মুখতার আভাস অর্থাৎ তাঁহার দিকে মাত্র ঘাড় ফিরান কার্য্যটী নিজ-কর্ত্তৃত্বাভিমান-বিসর্জ্জন বা কর্ম্মফলের সমর্পণ হইতে আরম্ভ হয়। যাহারা সমস্ত নিজের জন্য গুটাইয়া রাখিয়াছে, তাহারা অন্য কোন অভিলাষ-চরিতার্থতার উদ্দেশ্যে বাহিরে যতই ভক্তির আকার প্রদর্শন করুক, তাহাদের চেষ্টাগুলি বিমুখতার বিভিন্ন বৈচিত্র্য। এইরূপ কর্ম্মার্পণ হইতে ভাগবতধর্ম্ম আরম্ভ হয়। কর্ম্মার্পণ অসমাক্ ভাগবতধর্ম্ম, আর আপনাকে সেই অধিষ্ঠান দত্ত্বার নিকট সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত করিয়া প্রাণ-

সর্ব্বস্বহারা ও পরম-সর্ব্বস্বহারাগণের গৃহের উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুর হওয়াই ভাগবতধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা। কাঙ্গাল না হইলে আশ্রয়-বিগ্রহশিরোমণি কাঙ্গালিনীর ঠাকুরাণীর পরমেশ্বরগণের কৃপালাভ হয় না। এই চরম দশায় উপনীত হইতে হইলে প্রাথমিকধর্ম্মে প্রবিষ্ট গৃহস্থগণও কিরূপে ক্রমে ক্রমে ধনলাভ করিতে পারেন, তাহার কৌশল ও রহস্য শ্রীভগবান্ প্রচেতোগণকে বলিয়াছিলেন,—

"গৃহেষাবিশতাকাপি পুংসাং কুশলকর্ম্মণাম্।
মদার্ত্তাশাত্তয়াযানাং ন বন্ধায় গৃহা মতাঃ ॥"
(শ্রীভা ৪৩০।১৯)

যাঁহারা কুশলকর্ম্মা অর্থাৎ আমিই নিখিল কর্ম্মের একমাত্র ফলভোক্তা—ইহা জানিয়া আমাতেই সমস্ত কর্ম্মফল সমর্পণ করেন অথবা আমার পরিচর্য্যারূপ কর্ম্মে যাঁহারা কুশল অর্থাৎ দক্ষ অথবা 'কুশল'-শব্দে সুখানুসন্ধানকারী এবং যাঁহারা আমার কথা-প্রসঙ্গে কালযাপন করেন, তাঁহারা গৃহে প্রবিষ্ট বা আবিষ্ট হইলেও গৃহ তাঁহাদের বন্ধনের কারণ হয় না। শ্রীপৃথু-শ্রীপ্রহ্লাদ-শ্রীধ্রুব-শ্রীঅম্বরীষাদি মহাজনের এইরূপই আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সমর্পণ হইতেই শ্রীনারদাচার্য্য অর্থাৎ সুখানুসন্ধানাভাস আরম্ভ হইল। সর্ব্বসমর্পিতাত্মা অকিঞ্চনে এই সুখানুসন্ধানবৃত্তি পরাকাষ্ঠা লাভ করে।

যখন মহারাজ শ্রীযুধিষ্ঠির শ্রীনারদের মুখে নিবৃত্তধর্ম্মাবলম্বী ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসিগণের স্ব-স্ব আশ্রমোচিত ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণনিজজন শ্রীযুধিষ্ঠির আত্মশৈথিল্যচ্ছলে আপনাকে গৃহমূঢ়ধীর অভিমান করিয়া গৃহস্থগণকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার উদ্দেশে শ্রীনারদের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। শ্রীনারদ গৃহস্থগণের শ্রীহরিকে বশীভূত করিবার—শ্রীঅজিতকে জয় করিবার একটী কৌশল ও পরম রহস্য বলিলেন,—

"শৃণ্বন্ ভগবতোঽভীক্ষ্ণমবতার-কথামৃতম্।
শ্রদ্দধানো যথাকালমুপশান্তজনাবৃতঃ ॥
সংদহ্যমানৈরনিশং দৈবভূতাত্মহেলনৈঃ।
বিমুক্তেষূচ্যমানেষু স্বয়ং স্বপ্রবণৃত্বিতঃ ॥
যাবদর্থমুপাসীনো দেহে গেহে চ পণ্ডিতঃ।
বিরক্তো রক্তবত্তস্য নৃলোকে নরভাং ফলম্ ॥"
(শ্রীভা ৭।১৪।৩-৫)

উপশান্ত অর্থাৎ যাঁহারা পরিনিষ্ঠিত, এইরূপ ভগবদ্ভক্তগণে বেষ্টিত হইয়া সংসঙ্গ হইতে শ্রীভগবানের অবতার-কথামৃত নিরন্তর শ্রবণ করিতে করিতে সেই শ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষ যেরূপ যত্নসহই নিজ দেহ-কলত্র-সুতাদির সঙ্গ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ দেহ-পুত্র-স্ত্রী প্রভৃতির প্রতি 'আমি ও আমার'-বুদ্ধি ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করিবে। যে পরিমাণ যত্নের দ্বারা ভজন-নির্ব্বাহ হয়, সেই পরিমাণ দ্রব্য স্বীকারপূর্ব্বক পণ্ডিত ব্যক্তি দেহে ও গৃহে বিরক্ত হইয়া জনসমাজে আসক্তবৎ পুরুষাকার প্রকাশ করিবে অর্থাৎ লোকের নিকট "বিষয়িপ্রায়" থাকিয়া অর্থের রক্ষোক্ষয়-বিষয়ে সম্পূর্ণ বিরক্ত ও ভগবৎসুখানুসন্ধানে সম্পূর্ণ অনুরক্ত থাকিবে—ইহাই ভজনের কৌশল। লোকের নিকট সাধু সাজিয়া অন্তরে বিষয়ী থাকিলে তাহার কোনদিন হরিভজন হয় না, পরন্তু বাহিরে বিষয়িপ্রায় ও আসক্তবৎ পুরুষাকার প্রকাশ করিয়া প্রতিষ্ঠা-বিদ্যাস্পর্শ হইতে পৃথক্ ও বহির্ম্মুখ লোকের তাড়না হইতে বিমুক্ত থাকিলে হরিভজনের সুযোগ হয়—ইহাই ভজনের কৌশল। হরিভজনের আর একটী বিশেষ রহস্য আছে, যাহাতে অনায়াসে অজিতও জিত হন ; তাহা এই,—

"জহ্যাদ্ যদর্থে স্বান্ প্রাণান্ হন্যাদ্বা পিতরং গুরুম্।
তস্যাং স্বয়ং স্ত্রিয়াং জহ্যাদ্ যস্তেন হ্যজিতো জিতঃ ॥"
(শ্রীভা ৭।১৪।১২)

যাহার নিমিত্ত পুরুষ নিজ কোটী প্রাণ পরিত্যাগ করে, পিতাকে, গুরুকেও হত্যা করে, সেই পত্নীতে যে ব্যক্তি স্বয়ং পরিত্যাগ করে, তাহার দ্বারা অজিত শ্রীপুরুষোত্তম বিজিত অর্থাৎ বশীকৃত হন।

যে স্ত্রী-পুত্রাদির দেহের জন্যই আসক্তি, যে দেহকে অবলম্বন করিয়াই স্বত্ববোধ, যাহার পরিণাম কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্ম, সেই অতি নশ্বর বস্তুতে স্বত্ববোধ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রীপুরুষোত্তমের সেবায় আত্মবিক্রয় করিলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্ লাভ হয়।

"কৃমিবিড্ভস্মনিষ্ঠান্ত কোঽয়ং তুচ্ছং কলেবরম্।
ক্ব স্বদীয়রতির্ম্মর্ত্যো ক্ব যাত্মা নভসদৃশঃ ॥"
(শ্রীভা ৭।১৪।১৩)

কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্মে যাহার শেষ পরিণতি, সেই তুচ্ছ শরীর কোথায় ? দেহের সহিত রতিমতী ভার্য্যাই বা কোথায় ? স্বীয় মহিমা-দ্বারা সর্ব্বব্যাপী আত্মাই বা কোথায় ?

শ্রীহরিদেব ও শ্রীগুরুদেবের সুখানুসন্ধানের জন্য দেহ-গেহ-স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের সর্ব্বপ্রকার স্বতন্ত্রত্যাগ অর্থাৎ কোনরূপ স্বতন্ত্রবুদ্ধি না রাখিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীহরিগুরুদেবের সেবায় সর্ব্বতোভাবে সমর্পণ, সেই সমর্পণের মধ্যে 'আমি সমর্পণকারী'—এইরূপ বুদ্ধি পর্য্যন্ত ত্যাগ করে 'ইহারা সকলেই শ্রীশ্রীহরিগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে নিত্যকিঙ্কর, আমার নহে শ্রীশ্রীহরিগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মের নিত্যদেবী'—এইরূপ উপলব্ধি হইলে, তাঁহার নিকট অচিরে শ্রীহরিদেব নিত্য বিরাজিত হন। ইহা পুঁথির কথা নহে—কবির কাব্য নহে; ইহা প্রত্যক্ষ বাস্তব অনুশীলনের বিষয়। শ্রীভক্তবৃন্দগণ এই পথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ; অধিক কি, সংসারস্থ শ্রীনারায়ণ সেবাপরাধের মধ্যেও শ্রীশ্রীহরিগুরুদেবের প্রতি এইরূপ প্রণতি দৃষ্ট হয়। শ্রীহরিদেব ও শ্রীগুরুদেবের সুখানুসন্ধানার্থ শ্রীরামানুজাচার্য্য তাঁহার শিষ্যের দ্বারা একাধিক দেহ-গেহ-স্ত্রী-পুত্রাদির পূর্ব্ব-স্বত্ব-পরিত্যাগের আদর্শ ও শিক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

একসময় শ্রীরামানুজাচার্য্য তাঁহার কয়েকজন শিষ্যের সহিত শ্রীশৈলে গমনার্থ উদ্যোগী হইয়া অহীরেন্দ্র-নামক গ্রামের দিকে অগ্রসর হইলেন। ঐ গ্রামে শ্রীবঙ্গেশ ও শ্রীবরদাচার্য্য নামক তাঁহার দুইজন ব্রাহ্মণ-শিষ্য বাস করিতেন। শ্রীবঙ্গেশ খুব ধনাঢ্য, আর শ্রীবরদাচার্য্য অত্যন্ত নিঃস্ব ছিলেন। ভিক্ষোপজীবী দরিদ্র ব্রাহ্মণ-শিষ্যের পক্ষে আতিথ্যবিধান ক্লেশকর হইবে জানিয়া শ্রীরামানুজ ধনাঢ্য-শিষ্যের গৃহেই ভিক্ষা করিবার ইচ্ছায় তাঁহার সঙ্গী দুইজন শিষ্যকে অগ্রেই তাঁহার আগমন-বার্ত্তা জানাইবার জন্য শ্রীবঙ্গেশের গৃহে প্রেরণ করিলেন। শ্রীবঙ্গেশ শ্রীগুরুদেবের আগমন-বার্ত্তা সত্বর শ্রবণের নিকট প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ নিজ পরিবারবর্গকে শ্রীগুরুদেবের অভ্যর্থনোচিত যাবতীয় দ্রব্য-সংগ্রহে আদেশ করিলেন এবং স্বয়ং তদ্বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিবার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, গৃহ হইতে আর বহির্গত হইলেন না। বাহিরের ঘরে যে দুইজন প্রাপ্ত-প্রায় সত্বর আসিয়াছেন, তদ্বিষয়ে একেবারে বিস্মৃত হইলেন। শ্রীবঙ্গেশের রাজসিক-ভক্তিপ্রদর্শনের ইচ্ছা ছিল। শ্রীগুরুদেবকে নানা উপচারে একদিন সেবা করিবেন এবং নিজে সেবকের প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন—এইজন্যই তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া গুরুসেবকগণের পরিচর্য্যায় উদাসীন হইয়াছিলেন। ইহাতে শ্রীরামানুজাচার্য্য অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহার দরিদ্র শিষ্য শ্রীবরদাচার্য্যের গৃহে ভিক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইলেন। শ্রীবরদাচার্য্য বিদ্বদ্বরের প্রায় নিষ্কিঞ্চন ও শ্রীগুরুদেবতাত্মা ছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও স্বামীর সম্পূর্ণ অনুগামিনী ছিলেন। শ্রীবরদাচার্য্য হস্তে ভিক্ষাপাত্র লইয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে ভিক্ষায় বহির্গত হইতেন এবং ভিক্ষালব্ধ বস্তুর দ্বারা শ্রীগুরুদেব ও শ্রীশ্রীহরিদেবের অর্চ্চাবতারের সেবা করিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীলক্ষ্মীদেবী অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্যবতী ছিলেন। সেই গ্রামেই এক ধনাঢ্য বণিক্ বাস করিত। ঐ বণিক্ শ্রীলক্ষ্মীদেবীর রূপে মুগ্ধ হইয়া ও তাঁহার পতির অত্যন্ত দারিদ্র্যের সুযোগ লইয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে অনেক অর্থাদির প্রলোভন দেখাইয়াছিল; কিন্তু কোনরূপেই সেই সাধ্বীর সতীত্ব হইতে পারে নাই। শ্রীবরদাচার্য্য প্রত্যহ ভিক্ষার্থ বহির্গত হইলে শ্রীলক্ষ্মীদেবী একাকিনীই গৃহে থাকিয়া শ্রীনারায়ণের বিবিধ সেবাকার্য্যে অতিনিবিষ্ট থাকিতেন। অকস্মাৎ একদিন শ্রীবরদাচার্য্যের অনুপস্থিতি-কালে শ্রীরামানুজাচার্য্য তথায় ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইলেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবী তৎকালে একটি ক্ষুদ্র চীরখণ্ড পরিধান করিয়া কুটীরের অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছিলেন। গৃহে স্বামী বা দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই; তিনি তখন শ্রীগুরুদেবের সম্মুখীন হইতে না পারিয়া করতালি-ধ্বনির দ্বারা ইঙ্গিতপূর্ব্বক নিজ অবস্থা জানাইলেন। যতিরাজ তৎক্ষণাৎ নিজ শ্রীঅঙ্গের উত্তরীয়টি বহির্দ্দেশ হইতে গৃহের অভ্যন্তরে নিক্ষেপ করিলেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবী তদ্দ্বারা গাত্র আচ্ছাদনপূর্ব্বক শ্রীগুরুসমীপে উপনীতা হইলেন ও আনন্দে উদ্ভাসিতা হইয়া পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎপ্রণাম করিতে করিতে বলিলেন,—"শ্রীপাদ (বরদাচার্য্য) ভিক্ষার্থ বহির্গত হইয়াছেন। আপনি কৃপাপূর্ব্বক এই আসনে সুখে উপবেশন করুন, এই পাদ্য গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন; আমি শীঘ্রই শ্রীবিষ্ণুর নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া দিতেছি।" ইহা বলিয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবী গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু গৃহে তণ্ডুলকণামাত্রও ছিল না; কি করিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। 'ভিক্ষার্থ সমুপস্থিত শ্রীগুরুপাদপদ্মের কি বিন্দুমাত্রও সুখানুসন্ধান করিতে পারিব না?'—ইহা ভাবিতে ভাবিতে মনে মনে ঠিক করিলেন—'এই অস্থি-মাংস-মল-মূত্রপরিপূর্ণ দেহ-পিণ্ডকে অদ্য ধনাঢ্যের নিকট বিক্রয় করিয়া শ্রীগুরুদেবের সেবায় কৃতার্থ হই না কেন? কলির নামক এক মহাভাগবত

চৌর্য্যবৃত্তি করিয়াও ইষ্টদেবের সেবা করিয়াছিলেন, এইরূপ শুনিয়াছি'—ইহা মনে মনে ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীলক্ষ্মীদেবী গৃহের অপর দ্বার দিয়া বাহির হইলেন এবং বণিকের সপ্তখণ্ডযুক্ত প্রাসাদে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার নিভৃত প্রকোষ্ঠে আসিয়া বলিলেন—"হে বণিক্ ! আমি অদ্য রজনীতে তোমার বাসনা পূর্ণ করিব। আমার শ্রীগুরুদেব অতিথিরূপে আমার কুটীরে আগমন করিয়াছেন। তুমি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তাঁহার সেবোপযোগী স্বাদযুক্ত উপকরণ প্রেরণ কর।"

বণিক্ শত শত প্রলোভন দেখাইয়া যাঁহাকে সংগ্রহ করিবার আশা চিরতরে বিসর্জ্জন করিয়াছিল, সেই সুন্দরী যুবতী অদ্য স্বয়ংই উপযাচিকা হইয়া তাহার নিকট আসিয়াছে দেখিয়া বণিকের আনন্দের সীমা থাকিল না। সে অন্য সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীবরদাচার্য্যের গৃহে বিবিধ দ্রব্য প্রেরণ করিল। শ্রীলক্ষ্মীদেবী তদ্দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবের সম্মুখে আনয়ন করিলেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য তৃপ্তির সহিত সেই নৈবেদ্য ভোজন করিয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এদিকে শ্রীবরদাচার্য্য ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য লইয়া গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন,—তাঁহার কুটীরে শ্রীগুরুদেব সমুপস্থিত এবং যখন শুনিলেন যে, ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য আনিবার পূর্ব্বেই শ্রীলক্ষ্মীদেবী বিচিত্র অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া শ্রীগুরুদেবের তৃপ্তিবিধান করিয়াছেন, তখন তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক পত্নীর নিকট সমস্ত কথা অবগত হইলেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবী সমস্ত কথা নিবেদনপূর্ব্বক যুক্তকরে অধোবদনা হইয়া পতি-সম্মুখে দণ্ডায়মানা রহিলেন।

শ্রীবরদাচার্য্য ক্রুদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, অত্যন্ত আনন্দসহকারে পুনঃ পুনঃ "ধন্যোঽস্মি" "কৃতার্থোঽস্মি" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং সহধর্ম্মিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"অয়ি সাধ্বি ! তুমি অদ্য সতীত্বধর্ম্মের যথার্থ পরিচয় দিয়াছ। কারণ, শ্রীনারায়ণই একমাত্র পুরুষ ; তিনি ব্যতীত প্রকৃতি-কুলের পতি। অস্থিমাংসময় দেহের বিনিময়ে তুমি অদ্য সেই শ্রীপুরুষোত্তমের সেবা করিতে সমর্থা হইয়াছ। শ্রীগুরুদেব সেই শ্রীনারায়ণেরই শ্রেষ্ঠতম। তাঁহার সেবায় শ্রীনারায়ণের সেবা হয়।"

শ্রীরামানুজাচার্য্য এই সকল কিছুই জানিতেন না। শ্রীবরদাচার্য্য শ্রীলক্ষ্মীদেবীর হস্ত ধারণ করিয়া শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে উপনীত হইলেন এবং তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অনেকক্ষণ ধরিয়া দণ্ডবৎপতিত রহিলেন ; পরে ধীরে ধীরে নিজ সহধর্ম্মিণীর আচরণ শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিবেদন করিলে শ্রীরামানুজাচার্য্য বৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। শ্রীগুরুদেবের আদেশানুসারে উক্ত সম্পত্তি কিছু প্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক বণিকের গৃহে গমন করিলেন। শ্রীবরদাচার্য্য বহির্দ্দেশে থাকিলেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবী গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক সেই প্রসাদ বণিক্‌কে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। বণিক্ সহধর্ম্মিণীর সহিত প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। অহো ! শ্রীবরদাপ্রসাদ ও শ্রীবরদামহাপ্রসাদের কি মহিমা ! প্রসাদসম্মানের পরেই বণিক্ অন্য প্রকারের লোক হইয়া গেল। তাহার কামপ্রবৃত্তি কোথায় চলিয়া গেল ! তখন তিনি শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে "মাতা" বলিয়া সম্বোধন করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎপ্রণাম করিতে লাগিলেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবীও এই কথা বহির্দ্দেশে অবস্থিত শ্রীবরদাচার্য্যের নিকট আসিয়া বলিলে পতি-পত্নী উভয়েই শ্রীশ্রীগুরুদেবের মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া তাঁহারই জয়গান করিতে লাগিলেন। অবশেষে বণিক্ শ্রীরামানুজাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্য হইলেন। বণিক্ শ্রীবরদাচার্য্যকে শ্রীনারায়ণের সেবার্থ প্রভূত ভূসম্পত্তি-গৃহ-অর্থাদি-প্রদানে উদ্যত হইয়া শ্রীরামানুজাচার্য্যের অনুমতি প্রার্থনা করিলে আচার্য্য তাহা শ্রীবরদাচার্য্যকে লইতে বলিলেন। ইহাতে নিষ্কিঞ্চন শ্রীবরদাচার্য্য গদগদস্বরভাবে কাতরস্বরে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট বলিলেন,—"প্রভো ! আপনার শ্রীপাদপদ্মের কৃপালব্ধ ব্যতীত আমরা যেন স্বপ্নেও অন্য কোন পার্থিব ধন প্রার্থনা না করি। আমাদের সমস্ত সত্তা ও যাহা কিছু, তাহা ত' আমাদের নহে ; আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের নিত্য বিক্রীত পশু, আপনার শ্রীপাদপদ্মানুসরণই আমাদের সর্ব্বস্ব।"

এদিকে লোকপরম্পরায় যখন বণিক্ শ্রীবরদাচার্য্য শুনিতে পাইলেন যে, শ্রীরামানুজাচার্য্য তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া দরিদ্র শ্রীবরদাচার্য্যের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং কি অপরাধে তিনি শ্রীগুরুসেবা হইতে বঞ্চিত হইলেন জানিতে চাহিলেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য বলিলেন,—"তুমি বৈষ্ণবাপরাধ করিয়াছ ; তোমার গৃহে সমাগত প্রায়

বৈষ্ণব অতিথিসেবের কোন পরিচর্য্যা করে নাই, এইজন্যই আমি তোমার গৃহে গমন করি নাই। এই কপটকপুত ব্রাহ্মণ ও তাঁহার সাধ্বী ব্রাহ্মণী অকিঞ্চন প্রীতি-বলে আমাকে ক্রয় করিয়াছে। তুমি ইহাদের আদর্শ অনুসরণ কর।"

শ্রীবল্লভাচার্য্যের এই যে শ্রীহরিদেবে ও শ্রীগুরুদেবে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা পত্নীর স্বত্ব-বিসর্জ্জনের আদর্শ, তাহাই শ্রীগুরুদেব ও শ্রীহরিদেবকে বশীভূত করিয়াছে। শ্রীবল্লভাচার্য্য এইরূপ স্বত্ব ত্যাগ করিয়াও সহধর্ম্মিণীর সহিত একত্র অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন।

শ্রীগুরুদেবের সেবার্থ শ্রীবল্লভাচার্য্য যেরূপ পত্নী শ্রীলক্ষ্মী-দেবীর নিজ-ভোগের স্বত্ব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, শ্রীরামানুজ-শিষ্য শ্রীকুরেশও সেইরূপ নিজ-ভোগের স্বত্ব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি শ্রীগুরুদেবের সুখবিধানার্থ চোলনৃপতির দ্বারা নানাভাবে নির্য্যাতিত এমন কি, উৎপাটিতনেত্র হইয়াও শ্রীগুরুসেবার অত্যদ্ভুত আদর্শ স্থাপন করিতে পারিয়াছেন। আবার অন্যদিকে শ্রীরামানুজের পূর্ব্বাশ্রমের পত্নী জন্মাবা শ্রীকাঞ্চীপূর্ণে অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবে প্রাকৃত পুত্রবুদ্ধি করায় শ্রীরামানুজ সেই পত্নীকে চিরতরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

শ্রীগুরুসেবার্থ স্বত্বপরিত্যাগ ও নিজসুখার্থ কর্ত্তব্যত্যাগের মধ্যে পার্থক্য আছে। স্বত্ব পরিত্যাগ করিয়াও পরস্পরের একত্রে অবস্থান সম্ভব হইতে পারে, ইহা অদ্বৈতবাদী কল্পনা করিতে পারেনা। স্বত্ব-পরিত্যাগে পরস্পরের মধ্যে ভগবদ্ধাম ব্যতীত অন্য অভিমান থাকে না; এমন কি, আপনার স্বত্ব-পরিত্যাগের অভিমান বা অহঙ্কারও থাকে না। এই স্বত্বপরিত্যাগ প্রথম অবস্থায় কর্ম্মার্পণমূলক হইয়া থাকে; কিন্তু যতটা পরস্পরের ভগবদ্ভিমান প্রবল হয় ও ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানের আবেশে পুষ্ট হয়, ততটা কৃষ্ণদাস-বুদ্ধি হইতে থাকে। ইহা আরোপিত বা মুখে কপটতা বা প্রতিষ্ঠাশা-প্রাপ্তির আশায় লোকদেখান কৃষ্ণদাসাভিমান নহে। তখন পতি-পত্নী, পিতা-পুত্র বা কন্যা, ভ্রাতা বা ভগ্নী, পিতামহ-নপ্তৃ বা নপ্তৃী—ইহাদের মধ্যে পরস্পর দেহ-সম্পর্ক বা পরস্পর স্বত্ববোধ বা ভোক্তৃভোগ্য-বোধ থাকে না। পরস্পর ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানময় আবেশে দেহবুদ্ধি-বিমুক্ত ও ইষ্টদেবের গৃহে ক্রীত দাস হইয়া গোলোক বা ভগবদ্-বৈকুণ্ঠ লাভ হয়। এইজন্যই শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীগৌর-হরির সংকীর্ত্তনরাসের সহায়কারিণী শ্রীমালিনীদেবীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, আবার পত্নীবুদ্ধিও করেন নাই। এইজন্যই শ্রীশ্রীবাস পুত্রের প্রতি ও শ্রীশ্রীরামপণ্ডিত প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের প্রতি বা দুঃখী প্রভৃতি দাসীগণের প্রতি পুত্রবুদ্ধি, ভ্রাতৃবুদ্ধি ও দাসীবুদ্ধি আনুষঙ্গিকভাবেই অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া অথচ সর্ব্বক্ষণ একত্রে অবস্থান করিয়া শ্রীগৌরহরির সংকীর্ত্তন-রাস-নৃত্যে অভিনিবিষ্ট ছিলেন। স্বয়ং শ্রীগৌরহরি যখন শ্রীবাসপণ্ডিতের নিজের ও নিজ-সম্পর্কিত ব্যক্তিগণের ভোগ-চেষ্টাদির প্রতি উদাসীন দেখিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাসী হইতে বলিয়াছিলেন, তখন পণ্ডিত তাহাতে তাঁহার অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন (শ্রীচৈ ভা অন্ত্য ৫।৩৩)। শ্রীরামপণ্ডিত ও শ্রীবাসপত্নী বাহ্যদৃষ্টিতে ভ্রাতা ও ভগ্নীরূপে একত্রে অবস্থান করিয়াও শ্রীগৌরহরির সুখানুসন্ধানের আবেশে সর্ব্বক্ষণ আবিষ্ট ছিলেন। শ্রীশিবানন্দ ও শ্রীবাসানন্দ পুত্রগণের প্রতি তোমা পুত্রবুদ্ধি ও মহাভাগবত পুত্রগণ পিতৃদেবের প্রতি প্রাকৃত পিতৃবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন। শ্রীবাসানী শ্রীকুল শ্রীরঘুনন্দনের প্রতি পুত্রবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর শ্রীগৌরহরির সেবাশিক্ষায় গুরুবুদ্ধিতে অভিনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীল মুকুন্দ একত্রে অবস্থান করিয়াও ভ্রাতৃবুদ্ধির পরিবর্ত্তে উভয়ের পরস্পর শ্রীগৌরহরির সম্বন্ধে ভগবদ্বৈষ্ণব দর্শন হইয়াছিল। এইভাবেই কুলীনগ্রামবাসী শ্রীগৌরপার্ষদগণের মধ্যে ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধান-তাৎপর্য্যই প্রকটিত হইয়াছিল। অধিক কি, শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীজীব-প্রভৃতি শ্রীবৃন্দাবনে একত্র অবস্থান করিয়াও—পরস্পর ভ্রাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্র-সম্বন্ধ ভেদভাবে প্রাকৃত লোকে দর্শন করিয়া থাকে, তাহাদের চিন্তার অতীত সর্ব্বোর্দ্ধ রাজ্যে অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাধীশ্বরেশ্বর-ধর্ম্মে অবস্থিত ভাগবত পরমহংসগণের গুরুপাদপদ্মরূপে স্বতঃসিদ্ধভাবে নিত্য শ্রীশ্রীরাধামাধবের সুখানুসন্ধানে আবিষ্ট ছিলেন। শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ও শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের একত্রাবস্থানের মধ্যে এবং আমাদের পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরু-বর্গের মধ্যেও এই আদর্শ দেদীপ্যমান।

যাহারা মায়াসক্ত, যাহাদের সদ্গুরুপাদপদ্মে অভিগমন হয় নাই, যাহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মে অশ্রদ্ধাবিশিষ্ট ও মর্কট-বুদ্ধিকারী, স্ব-পৃগালতুল্য দেহ ও দেহসম্পর্কীয় বস্তুতে

আত্মবুদ্ধিকারী, কামুক, জন্মজন্মান্তরের প্রাক্তন ভয়ঙ্কর অপরাধে অথবা আধুনিক বা পরম্পরাগত অপরাধে অপরাধী, তাহারা স্ত্রীপুত্রাদি তুচ্ছ বাঁধনের স্বত্ব ত্যাগ করিতে পারে না। ইহা তাহাদের স্বপ্নের অতীত—ভাবনারাজ্যের অতীত রাজ্যের কথা। শ্রীগুরুদেবের আমারই মত রক্তমাংস-নির্ম্মিত দেহ—এইরূপ দৃষ্টিবুদ্ধি প্রচ্ছন্নভাবেও যাহার অন্তরে আছে, তাহার সমস্ত সাধনভজনের অভিনয় কুক্কুরশৌচবৎ নিরর্থক।

প্রায় বিশবৎসর পূর্ব্বে একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। এক অত্যন্ত স্থৈণ পুরুষ তাহার দ্বিতীয় পক্ষের যুবতী পত্নীর রক্তমাংসের প্রতি সর্ব্বদা স্নেহদৃষ্টি রাখিয়া চলিতেন। "কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ"—এই নীতিটি মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহার আচার-বিচারের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছিল। কামুকগণ জগৎকে কামিনীময় দেখে, কিন্তু ঐ ব্যক্তি সেই নীতিও অতিক্রম করিয়া জগদতীত বৈকুণ্ঠকেও কামিনীময় দর্শন করিতেন! তাঁহার সহধর্ম্মপরায়ণা পত্নী যখন সদ্‌গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিতা হইলেন, তখন সেই স্থৈণ পুরুষটী স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার গুরুদেব কিভাবে দীক্ষা দিবেন?" পত্নী বলিলেন—"শুনিয়াছি শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক জীবের কর্ণপুটে মন্ত্র প্রদান করেন।" তখন পতি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি সেই সময় তথায় থাকিব।" পত্নী বলিলেন—"শ্রীগুরুমন্ত্র অপরের শুনিবার অধিকার নাই; তুমি যদি হরিজন হও, তবে তুমিও সেই মন্ত্র শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে কর্ণে শুনিতে পাইবে।" তখন পতি বলিল—"তবে তুমি কি করিয়া একাকিনী গুরুদেবের নিকট যাইবে?" পত্নী বলিলেন—"আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সমীপে উপনীত হইয়া তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত শ্রীমন্ত্র কর্ণে গ্রহণ করিব ও তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইব।" পতি বলিলেন—"তোমার গুরুদেব যদি তোমাকে একটি কাগজে মন্ত্র লিখিয়া দেন, আর তুমি নির্জ্জনে একাকিনী তোমার ঠাকুরঘরে বসিয়া উহা জপ কর, তবেই ত' হইতে পারে?" তখন পত্নী বলিলেন,—"শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রবণ না করিলে মন্ত্রশক্তি লাভ হয় না। ঠাকুরঘরেও ত' আমি একাকিনী থাকি।" তখন পতি বলিলেন—"ঠাকুর ত' অচেতন পাথর, তাহার সহিত একত্রে থাকিলে তোমারও কোনরূপ সতীত্ব-নাশের ভয় নাই; গুরুদেব রক্তমাংসের মনুষ্য, সুতরাং তাহার নিকট আমি কিছুতেই তোমাকে একাকিনী মন্ত্রোপদেশ শুনিতে দিতে পারি না; আর যদি নির্ব্বিকার পরম সাধু হন, তাহা হইলেও 'একটি পুরুষের নিকট একটি যুবতী একাকিনী একঘরে রহিয়াছে',—ইহা শুনিয়া লোকেই বা কি বলিবে?"

পাঠক! একদিকে স্ত্রীবশ্যাচার্য্যের আদর্শ দেখুন, আর একদিকে ভয়ঙ্কর অপরাধী স্থৈণ কামুকের বিচার দেখুন। এই জাতীয় মনোভাব প্রচ্ছন্নভাবেই হউক, আর স্পষ্টভাবেই হউক, অপরাধী ব্যক্তিগণের মধ্যে নানা আকারে লুক্কায়িত থাকে। এই সকল ব্যক্তি অনেক সময় পরম্পরাগত অপরাধ অর্জ্জন করে এবং প্রাকৃত-সহজিয়াগণের সুধাধার, গুরুপ্রসাদীমত বা প্রাউস্ সাহেবের মধুরার ইতিহাসে বর্ণিত পুষ্টি-সম্প্রদায়ের মত বা কিশোরীভজা সম্প্রদায়ের মতে রঞ্জিত চক্ষুর দ্বারা মহাভাগবত-শিরোমণি জগদ্‌গুরুপাদপদ্ম-গণকেও দর্শন করিতে গিয়া অবমানিত হয়। ইহাদের যুক্তি এই যে,—'ঘরপোড়া গরু সিন্দুরে মেঘ দেখিলে ভয় হয়।' কিশোরীভজা, কর্ত্তাভজা, গুরুপ্রসাদী, বাউল, সহজিয়া প্রভৃতি 'গুরু'নামধারিগণের নিকট আমরা যখন বঞ্চিত হইয়াছি, তখন পৃথিবীতে যে সদ্‌গুরু আছেন, তাহার প্রমাণ কি? তবে যে সদ্‌গুরু বলিয়া একটা কিছুর আশ্রয় গ্রহণ করি, সে কেবল আরোপিত গুরুমাত্র। তাহার প্রতি সর্ব্বদাই আমার তীব্র দৃষ্টি থাকে—মস্তিষ্কের দ্বারা তাহাকে সর্ব্বক্ষণ আমারই পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা, তালমকের বিচার, অতীত পুঁথিগত বিদ্যা ও আমার মনোধর্ম্মের ছাঁচে ঢালা মহাজনের তথাকথিত আচরণের তৌলদণ্ডে মাপিয়া লই। যে ব্যক্তি তাঁহার জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত আমার তৌলদণ্ডের পরীক্ষায় টিকিয়া গেলেন, তাঁহাকে আমি 'গুরু' বলিয়া স্বীকার করি, আর অন্যত্র যে 'গুরু' বলিয়া ভক্তিভক্তির অভিনয়, সে কেবল আমার মনোধর্ম্মের নিকট 'গুরু'নামধারীর পরীক্ষার অবসর মাত্র।

দেহাদক্ত পশুচরিত্র ব্যক্তি ও পরম্পরাগত গুরুদেবতাত্মার আদর্শের মধ্যে এইরূপ পার্থক্য লক্ষিত হয়। যাহারা পশু-প্রকৃতি, তাহারা কখনই আত্মবলি বরণ করিতে পারে না। জন্মজন্মান্তরের দুর্দ্দমনীয় অপরাধ থাকিলে এরূপ পশু-মনোভাবই চিরন্তনকে অধিকার করে। এইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি।
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্বুদ্ধিঃ সদ্গুরৌ তথা॥"
(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১ম অনুচ্ছেদধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ-বাক্য)

যে-কাল পর্য্যন্ত পাপরাশির দ্বারা হৃদয় মলিন থাকে, তাবৎ কাল নিশ্চয় সদ্গুরুতে সদ্বুদ্ধি ও শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি হয় না।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় করুণা করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

"অহঙ্কার অভিমান, অসৎসঙ্গ অসজ্জ্ঞান,
ছাড়ি' ভজ গুরুপাদপদ্ম।
কর আত্মনিবেদন, স্নেহ-গেহ, পরিজন,
গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব॥
সংসার-ঝাটোয়ারে কাম-ক্রোধে বান্ধি' মারে,
হুঙ্কারি' কহয়ে হরিদাস।
কর হরিসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমকথা-রস-রঙ্গ,
তবে হ'বে বিপদ বিনাশ॥
স্ত্রী-পুত্র বান্ধব যত, মরি' যা'বে শত শত,
আপনাকে হও সাবধান।
মুক্তি সে বিষয়হত, না ভজিনু হরিপদ,
মোর আর নাহি পরিত্রাণ॥"

শ্রীকীর্ত্তন-প্রসঙ্গ

কীর্ত্তনপ্রচারব্রতধারী মহাভাগবতগণ কলিহত-জীবের প্রতি অহৈতুক করুণাপরবশ হইয়া বিভিন্ন ভগবল্লীলা-স্থলীতে পরিভ্রমণ করেন। তাঁহাদের শ্রীমুখবিগলিত ভগবৎপদাম্ভোজ-সুধাকণালিপ্ত আন্তরিকবিশ্বাস কুবিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণেরও শুশ্রূষা ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া ক্রমে ক্রমে মঙ্গল উৎপন্ন করে। নিরপরাধে সাধুমুখের শ্রীমুখবিগলিত বাণীর অনুশীলন করিতে করিতে চিত্তের বিষয়মল বিদূরিত হয়; যদৃচ্ছাক্রমে চিত্তটী আবেশময়ী ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া থাকে।

গত ২৯শে আষাঢ়, শ্রীব্রজবাসী অষ্টগোস্বামীর অন্যতম শ্রীশ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-বাসরে শ্রীগুরু-পাদপদ্ম শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যামুখে সমগ্র শ্রীভাগবত-সন্দর্ভের সংক্ষেপসার কীর্ত্তন করেন।

৩রশে আষাঢ় শ্রীহরিবাসরে শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীগৌড়ীয়-মঠের শ্রীনামহট্ট-শ্রবণসদনে সমবেত ও শ্রীভিন্নদেব-হরের বিষয় বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং তৎপ্রসঙ্গে শ্রীহরি-ভজনে একান্ত বাস্তব অকপট আশাবন্ধময় অনুসন্ধিৎসার উদ্রেক করাইবার জন্য মর্ম্মস্পর্শিনী বাণী প্রকট করিয়া-ছিলেন। ৩রা শ্রাবণ শ্রীধামমায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীগুরু-পাদপদ্ম শ্রীভক্তিসন্দর্ভপাঠমুখে শ্রীরূপানুগ শ্রীভাগবতসিদ্ধান্ত প্রকটিত করেন।

৭ই শ্রাবণ রবিবার অপরাহ্ণ হইতে শ্রীনক্তারাত্রিক আরম্ভ হইবার পূর্ব্বপর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীনামহট্টশ্রবণ-সদনে শ্রীগুরু-পাদপদ্ম পুনরায় শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যা করিয়া-ছিলেন। সেইদিনই সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ তাঁহার আবির্ভাবস্থান মজিদপুরে নির্য্যাণ লাভ করেন।

১৬ই শ্রাবণ দ্বাদশীতিথিতে শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু ও শ্রীশ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর তিরোভাবোৎসব-উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুদেব অহোরাত্র স্বীয় ভজনকুটীরে শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ পারায়ণ করেন।

১৯শে শ্রাবণ শুক্রবার শ্রীশ্রীবলদেব-পূর্ণিমা। শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাব-তিথি-উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবক-ভগবানের শিক্ষাদর্শ প্রকট করিয়া অহোরাত্র উপবাস ও শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাবকালে শ্রীশ্রীগুরুদেবের আবেশে শ্রীভক্তিসন্দর্ভ হইতে শ্রীশ্রীবলদেবতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হন ও অপরাহ্ণে শ্রীবলদেবপ্রভু-সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা হয়। পরদিবস দ্বিপ্রহরে মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীমুকুন্দপ্রেষ্ঠের কৃপায় শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী ও শ্রীশ্রীনন্দ-উৎসব অনুকূল শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞের দ্বারা মণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কলিহত জীবের প্রতি অযাচিত করুণা করিয়া যে 'গোপীনাথ'-নীতি গান করিয়াছিলেন, তাহাতে অভিনব করুণ রাগ সংযোগ করিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেব প্রত্যহ মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত জীবের জন্য শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-গোপীনাথের শ্রীপাদপদ্মে আকুতি করিয়াছেন।

১ই ভাদ্র শুক্রবার শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব। এই দিবস শ্রীশ্রীমুকুন্দদেবের মূর্ত্ত-কৃপাবতার শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রাতঃকাল হইতেই শ্রীশ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন এবং অপরাহ্ণে সন্ধ্যারাত্রিক আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সেইরূপ মৌলিক, অভিনব ও আবেশময় স্বতঃস্ফূর্ত্ত ব্যাখ্যা শ্রবণে এক আত্মঘাতী ব্যাধ ব্যতীত কাহার না হৃদয় বিগলিত হয়? শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের করুণাবতরণ না হইলে কলিহত, কামক্রোধাদক্ত, দেহে-গেহে অভিনিবিষ্ট বদ্ধজীবের কি গতি হইত! কেই বা শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগবর শ্রীগুরুবর্গের সিদ্ধান্ত, আশয়, ইঙ্গিত, ভজনের প্রকার, তাঁহাদের আবেশ, অভিলাষ, সেবাবিলাস ও করুণার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেন! কেই বা শ্রীভাগবতসন্দর্ভ-সিন্ধু হইতে মহামণিসমূহ চয়ন করিয়া সেইসকল অপ্রাকৃত মণি-মন্ত্র মহৌষধের দ্বারা জীবের চরম ও পরম কল্যাণ বিধান করিতেন! শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাপূর্ব্বক প্রকটিত হইয়া কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন না করাইলে কেই বা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের লীলা, শ্রীশ্রীগৌরকিশোরের ভজনের বৈশিষ্ট্য, শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদের করুণার কথা হৃদয়ে এরূপ রেখাপাত করিয়া এত সহজ, সরল, স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় ও আচার-প্রচারের মধ্যে বিবৃত করিতেন! ওঁহারাই ধন্যাতিধন্য, যাঁহারা শ্রীশ্রীগুরুবর্গানুগৈকধন্য। সেই সকল ধন্যতম জনের পদধূলিই আমাদের নিত্য আকাঙ্ক্ষণীয়।

১১ই ভাদ্র, রবিবার শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীদিবসে শ্রীশ্রীরাধা-নিত্যজন—শ্রীজাহ্নবীর নিজদূত শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম কি এক অদ্ভুত আবেশের সহিত প্রভাতু জনগণের হৃদয়ে বিজলি সঞ্চার করিয়া—অভিনব মন্ত্রে মণ্ডিত করিয়া শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। 'শ্রীঅদ্বৈত-প্রকটিত-হুঙ্কার' শ্রীশ্রীনদীয়াপতি-সূত শ্রীশচীদুলাল আবির্ভাব-রহস্য—পঞ্চতত্ত্বের অপূর্ব্ব, অভিনব, মৌলিক ব্যাখ্যা; শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরের বহুত গোলোকের ভাব ও ভাষার অহৈতুকী করুণাপরবশ হইয়া প্রভাতু জনগণের মধ্যে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। যাঁহাদের চিত্তবৃত্তি শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সুখানুসন্ধানে বিভাবিত, সেই সকল বহুজন ইহা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন। কারণ, ইহা মস্তিষ্কের ধারণার যোগ্য নহে।

১৫ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার শ্রীবাসনবাসী ও শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব-উৎসব। এই দিন শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম জীবজগতের প্রভু—জগদ্গুরুর ভাবে বিভাবিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া পরম আবেশ ও আবেগভরে আধ্যক্ষিক মুগজ্ঞানের মস্তিষ্কের দ্বারা প্রকৃতিকে যে উলঙ্গ করিয়া দেখিবার চেষ্টা, যাহা হইতে জড়বিজ্ঞান, জড়দর্শন, জড়-অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি অসংখ্য নীতির উদ্ভব হইয়াছে এবং মহাকালীর উদরে প্রবেশ ও নির্গমনের দ্বারা জীবের যে জন্মমরণমালা সংঘটিত ও ত্রিতাপবৈচিত্র্যের ভোগ হইতেছে, তাহা মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় ব্যক্ত করেন। তৎপরে কয়েকটি অতি সুগোপ্য ভজনের ইঙ্গিত, যাহা তিনি কৃপাপূর্ব্বক ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কৃপায় উদ্ভাসিত, অকপট সুদৃঢ় ভজনেচ্ছু ব্যক্তিগণই হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিয়াছেন। শ্রীনন্দীশ্বর, শ্রীবরষাণীশ্বর, শ্রীগোবর্দ্ধন, শ্রীহরিদেব, শ্রীগোপীশ্বর, শ্রীযোগমায়া-পৌর্ণমাসী, শ্রীমাধীমুখী—এই সকল শ্রীজনগণের সহিত শ্রীগৌরলীলা-পরিকরগণের যে কি অপ্রাকৃত সঙ্গতি, তাহা শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রভাতু জনগণের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীজীবপ্রভুর আবির্ভাবতিথি-উপলক্ষে মধ্যাহ্নে মহামহোৎসব ও শ্রীমহা-প্রসাদ বিতরণ হইয়াছিল।

গত ১৬ই ভাদ্র শুক্রবার শ্রীনামাচার্য্য শ্রীশ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিতে শ্রীনামাচার্য্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাবের রহস্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপাপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এক শ্রীগৌরজন শ্রীনামাচার্য্যের তিরোভাব, আর এক শ্রীগৌরজন শ্রীনামাচার্য্যের আবির্ভাব—ইহা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরেরই করুণাময়ী ইচ্ছায় সংঘটিত হইতেছে। ঐ দিবস কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীল নামাচার্য্য ঠাকুরদ্বয়ের করুণার অনুকীর্ত্তন, সঙ্কীর্ত্তনাবসরে প্রভাতু-

ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ ও অপরাহ্ণে পঞ্চম-চতুর্থী ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

করাচীতে শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তন

গৌড়ীয়মিশনের কয়জন সেবক মুম্বাই শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে করাচীতে শ্রীচৈতন্যবাণী-অনুকীর্ত্তনার্থ গমন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রমাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে উক্ত সেবকগণ করাচীর বিদ্বজ্জনীর মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের বিমল প্রেমধর্ম্মের বাণী বিস্তার করিতেছেন। করাচীর মাননীয় নিকলদাস ভাজিয়ানী, শ্রীপতি মুনাবকর, লোকমল চেলারাম, চাঁদরতন মোহাতা, নিরঞ্জন প্রসাদ, ক্ষেমচাঁদ মোহন লা, হাসানিং আদ্‌ভানী প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণ স্থানীয় 'খলিকদীনা হলে' (স্থানীয় কর্পোরেশনের সুপ্রসিদ্ধ সুবৃহৎ হলে) গত ১৮ই সেপ্টেম্বর (১৯৪৪) মিঃ জামসেদ্ নাসেরবানুজীর সভাপতিত্বে 'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর চরিত ও শিক্ষা' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতার আয়োজন করিয়াছিলেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপোৎসাহিত হইয়া পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যাশ্রিত ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী ইংরাজী ভাষায় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। কীর্ত্তন-সঙ্ঘ রাও বাহাদুর শিবরতন মোহাতা মহাশয়ের উদ্যানে অবস্থান করিতেছেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রমেয়ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব, শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারীজী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ এই কীর্ত্তন-সঙ্ঘের মধ্যে আছেন।

করাচীর 'The Sindh Observer' (১৯শে সেপ্টেম্বর), 'The Daily Gazette' (১৮ই সেপ্টেম্বর), 'The Karachi Daily' (১৩ই সেপ্টেম্বর)-পত্রিকায় করাচীতে গৌড়ীয়মিশনের কীর্ত্তন-সঙ্ঘের কীর্ত্তন-বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে বার্ষিক শ্রীহরিস্মরণোৎসব

বিগত ১১ই আশ্বিন, ২৭শে সেপ্টেম্বর বুধবার হইতে আগামী ১৪ই কার্ত্তিক, ৩১শে অক্টোবর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজ শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের পরিচর্য্যা-পরিষদের সেবোদ্যোগে ঢাকা নগরীতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে অখিল-লোক-মঙ্গলের জন্য ঊর্জ্জব্রত-(নিয়মসেবা) সময়ে বার্ষিক শ্রীহরি-স্মরণ-মহোৎসব। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ উষঃকীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-পাঠ ও ব্যাখ্যা ; শ্রীভাগবতধর্ম্মবিবরিণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসংকীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠি এবং নগরে শ্রীনাম-বিতরণ হইতেছে।

সমগ্র-হৃদয়ের দ্বারা সাধুমুখে শ্রীহরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনই মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভ ও সার্থকতা। শ্রদ্ধালু সজ্জনবৃন্দ এই শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তন-মহোৎসবে কায়মনোবাক্যে যোগদান করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী হউন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

শ্রীঊর্জ্জব্রত—গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য পরমারাধ্যতম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী-গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও কৃপাশীর্ব্বাদে গৌড়ীয়মিশনের অন্তর্গত মঠ-সমূহে গত ১৪ই আশ্বিন (১৩৫১), ২রা অক্টোবর (১৯৪৪) সোমবার পূর্ণিমাতিথি হইতে শ্রীশ্রীঊর্জ্জব্রত (নিয়মসেবা) শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ও মহোৎসবাদিমুখে সুষ্ঠু অনুষ্ঠিত হইতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ-বিরহ-সংখ্যা

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

২৩শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১৪ই মাঘ, ১৩৫১; ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৪৫ | ১৩শ-২৮শ সংখ্যা

শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ ও শ্রীগৌড়ীয়

শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু 'ষট্‌সন্দর্ভ' বা 'শ্রীভাগবতসন্দর্ভে' যে শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্ত-সম্পত্তি গুম্ফিত করিয়াছেন, তাহাই শ্রীগৌড়ীয়গণ হৃদয়সম্পুটে সর্ব্বদা ধারণ করেন। শ্রীভাগবতসন্দর্ভে বেদ-প্রতিপাদ্য অভিধেয়প্রয়োজনাত্মক সম্বন্ধি-পরতত্ত্বরূপ ত্রিবিক্রমের কথা বিবৃত হইয়াছে। প্রতিপাদক শাস্ত্র বা বাচকব্রহ্ম—বেদ, আর প্রতিপাদ্য বা বাচ্যব্রহ্ম—ত্রিবিক্রম—সন্ধিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদিনী শক্তির ঈশ্বর বা শ্রীদ্বারকেশ, শ্রীমথুরেশ ও শ্রীগোকুলেশ শ্রীকৃষ্ণ। এই প্রতিপাদক ও প্রতিপাদ্যরূপ যে সম্বন্ধ (Relation), তাহাকেই দার্শনিক পরিভাষায় 'সম্বন্ধ' বলে। এই সম্বন্ধ আছে যাঁহার, তিনি সম্বন্ধী। এই সম্বন্ধী (পর) তত্ত্ব সর্ব্বপ্রমাণের অপ্রমেয় হইয়াও শব্দব্রহ্মাবতার বেদের প্রমেয়। এইজন্যই বেদান্ত তাঁহাকে 'শাস্ত্রযোনি', 'ঔপনিষদপুরুষ' প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীগীতোপনিষদেও (গী ১৫।১৫) শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ"। শ্রীমৈত্রেয় ঋষি শ্রীগুরুদেবকে "প্রত্যক্ষতঃ" (ভা ৩।১।৩৩)-নামে অভিহিত করিয়াছেন

'বেদ্য'-শব্দের অর্থ—অনুভবনীয়—সাক্ষাৎকারের যোগ্য। বিদ্যা বা জ্ঞানের দুইটি ধর্ম্ম—(১) যাহা অজ্ঞান দূর করে, তাহাকেই 'বিদ্যা' বলে অর্থাৎ ঋণ মোচন করে, দুঃখ মোচন করে; আর (২) অনুভব করায়, সাক্ষাৎকার করায়, ইহাই বেদন-ধর্ম্ম;—কেবল ঋণ-মোচন—দুঃখ-মোচন নহে; সঙ্গে করায়, সুখপ্রাপ্তি করায়। দুঃখ-মোচন শেষ-কথা নহে, তাহা সুখ-প্রাপ্তির দ্বারমাত্র; সুখপ্রাপ্তিটি অন্তঃপুর। যাহা হইতে বেদন-ধর্ম্ম (অনুভব বা সাক্ষাৎকার) লাভ হয়, তাহাই বেদ; তাহা বিদ্যা-দাতা (অজ্ঞান-মোচয়িতৃমাত্র) নহে।

বিদ্যা তিন প্রকার,—(১) ব্রহ্মবিদ্যা, (২) আত্মবিদ্যা ও (৩) বেদনধর্ম্মাত্মক পরবিদ্যা বা রাজগুহ্যবিদ্যা বা রাসময়ী বিদ্যা বা পরা ভক্তি। এই শ্রীরাজগুহ্য-বিদ্যা কৌন্তভসম্পুট শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামরায়-শ্রীশ্রীরূপবিলাস-শ্রীশ্রীসনাতন-রঘুনাথাদি শ্রীগুরুবর্গ হইতে তাঁহাদের নিত্য শিষ্যদেববর্য্য শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী প্রভু লাভ করিয়া উহার মুদ্রা উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন এবং তাহাই 'শ্রীভাগবতসন্দর্ভ'-আকারে প্রকাশ করিয়াছেন।

অতএব শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর বক্তব্যই বা শ্রীভাগবতসন্দর্ভের সিদ্ধান্ত বিচারদ্বারা গ্রাহ্য নহে, তাহা যেমন-তেমনদ্বারা অনুভবনীয়। এজন্যই মহাজন বলিয়াছেন,—

"কেবলা ভাগবতং গ্রাহ্যং, ন যুক্তা ন চ টীকয়া"

অর্থাৎ ভক্তি বা হৃদয়ের বৃত্তির দ্বারাই শ্রীভাগবত-সিদ্ধান্ত ধারণ করা যায়; যুক্তি অর্থাৎ মনীষা বা মস্তিষ্কের বিচার-ধারা তাহা বুঝা যায় না।

বেদ সাক্ষাদ্‌ভাবে কর্ম্মকাণ্ড, গূঢ়ভাবে জ্ঞানকাণ্ড ও পরোক্ষভাবে যেমন-তেমনের কথা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই ত্রিবিধরূপ পরতত্ত্বই সবিশেষ-তত্ত্ব। ব্রহ্মের বিশেষ নাই; এইজন্য তৎসম্বন্ধে সাধনাদি-ব্যাপারও থাকিতে পারে না। অদ্বৈতবাদ বস্তুতঃ দ্বৈতাদ্বৈত-ব্যতীত নিজ স্থান স্থাপন করিতে পারে না। এজন্যই তাঁহারা মায়াকে 'সদসদনির্ব্বচনীয়া' এবং জগতের মিথ্যার সমর্থন করিতে গিয়া 'প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক সত্যাদি' শ্লোকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

ব্রহ্ম—বিশেষধর্ম্মরহিত। যাহা ভেদবৎ, বস্তুতঃ ভেদ নহে, তাহাই 'বিশেষ'। পরমাত্মা ও ভগবান্ বিশেষধর্ম্ম-যুক্ত অর্থাৎ শক্তিমান্ ও বিশারী। পরমাত্মা—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ; তিনি জীব ও মায়াশক্তির প্রভু। জীব—তটস্থা শক্তি। 'তট'-শব্দে সীমা বুঝায়। তত্ত্বের দিক্ হইতে জীব-তত্ত্ব সেইসীমা। যাহা হইতে আর শক্তির সূক্ষ্মত্ব* হইতে পারে না, যাহার গণনা বা পরিমাণ হয় না, যে সীমা হইতে জড় আরম্ভ হইয়াছে অর্থাৎ জীবরূপ চিচ্ছক্তির শেষ-সীমার পরেই জড়মায়ার স্থান। পরতত্ত্বের প্রতি জীবের বিমুখতা বা পরতত্ত্বের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া জড়ের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপের জন্য মায়া তাহার দুইটী প্রভাবের দ্বারা (জীব-মায়ার দ্বারা 'আবরণাত্মক' প্রভাব ও গুণমায়ার দ্বারা 'বিক্ষেপাত্মক' প্রভাব) জীবকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এই বিমুখ-বিমোহিনী বহিরঙ্গা শক্তি মায়া জীব-মায়ারূপে আত্মাতে অনাত্ম-বোধ অর্থাৎ যাহা জীবাত্মা নহে, তাহাতে আত্ম-জ্ঞান বা জড়েতে চিৎ বা চিৎ-এ জড়জ্ঞানরূপ বিপর্য্যয় অর্থাৎ বিপরীত-বুদ্ধি বা বিপরীত-ভাবনার উদয় করাইতেছে। আর, গুণ-মায়া স্বরূপের অস্ফূর্ত্তি অর্থাৎ নিজেকে অভাবনা বা অসম্ভাবনা করাইতেছে; যাহার স্ফূর্ত্তি হওয়ার প্রয়োজন, গুণমায়ার প্রভাবে তাহার স্ফূর্ত্তি হইতেছে না।

যাহা চিচ্ছক্তির প্রতিযোগী, তাহাই ছায়া-শক্তি মায়া। এই প্রতিযোগি-ভাব অভাব ও বিপর্য্যয়-সূচক; যেমন, দুগ্ধের প্রতিযোগী চূণগোলা (দুগ্ধের আকার, কিন্তু দুগ্ধ নহে)। চূণগোলার এক দিকে যেমন দুগ্ধের অভাব আছে, আর এক দিকে দুগ্ধের ভাণ বা ছায়া আছে। সত্যের ভাণ কিন্তু সত্য নহে। অতএব অভাবটী গুণ-মায়ার কার্য্য, আর ভাণ বা বিপর্য্যয়-বুদ্ধি জীব মায়ার কার্য্য।

জ্ঞান—জড়-প্রতিযোগী স্বপ্রকাশ। জ্ঞান-লাভ হইলে গুণমায়া ও জীবমায়া বিরূপ প্রকাশ করিতে পারে না। 'জ্ঞান'-অর্থে—'অনুভব'। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জ্ঞান—(১) অজ্ঞান দূর করে ও (২) সুখপ্রাপ্তি করায়। জড়-মায়ার উক্ত দুই প্রভাব বা উপাধির দ্বারা জীব আচ্ছন্ন হইয়াছে। এই উপাধি অনাদি, কিন্তু জীব-সত্তার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন নহে; ইহাই কর্ম্ম। এই কর্ম্ম প্রাক্-অনাদি ও বিনাশী। যদি ইহা বিনাশী না হইত, তাহা হইলে শ্রীভগবানের অবতারের প্রসঙ্গ বা সাধনাদির কোন প্রসঙ্গ থাকিত না, অর্থাৎ যদি জীবের অনাদিবহির্ম্মুখতা বা অনাদি-কর্ম্ম-বন্ধন চিরতরে বিনষ্ট ও খণ্ডিত হইবার একান্ত অযোগ্য হইত, তাহা হইলে শ্রীভগবানের ভুবনমঙ্গল-অবতার-সত্ত্বেও জীবের কর্ম্ম-বন্ধনের খণ্ডন হইত না এবং সাধন করিয়া সিদ্ধি-লাভের পরও আবার পতনাশঙ্কা বা পতন-যোগ্যতা আছে, জানিয়া জীবের সাধনের প্রতি উৎসাহ হইত না। যদিও আত্মার গঠনে আবরণ বা বন্ধন নাই, তথাপি ইষ্টপ্রাপ্তি অর্থাৎ অভিলষিত বস্তুর প্রাপ্তি ও অনিষ্ট- (অনভিলষিত) বিনাশের জন্য সাধন আবশ্যক। সাধন—উপদেশ-সাপেক্ষ। উপদেশ-শ্রবণ ব্যতীত সাধন হয় না। শাস্ত্র ও শাস্ত্রমূর্ত্তি গুরুই উপদেষ্টা। শাস্ত্র অশরণাগতের ভয় ও শরণাগতের অভয়ের কথা বলেন। আশ্রয় গ্রহণ করিবার উপদেশ-দান ও অনাশ্রিতকে শাসন করেন বলিয়াই বেদের বেদত্ব ও শাস্ত্রত্ব—"শাস্ত্রক্ত তদসমর্থক ভয়, তদ্ভয়রূপত্বাভয় যদতি" (ভ ল, ১৭৪ অঙ্ক)।

*'সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ' (ভা ১১।১৬।১১); 'বালাগ্রশত-ভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহ পরা শ্রুতিঃ॥'

বেদ—শব্দতত্ত্বের শব্দাবতার অর্থাৎ পরব্রহ্মই শব্দব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ হইয়া 'শাস্ত্র' বা 'বেদ'-নামে পরিচিত হন। সেই বেদ—অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন লৌকিক পুরুষ-কর্তৃক কৃত বা রচিত নহে, তাহা স্বপ্রকাশ। পুরুষ বা জীব—দোষ-চতুষ্টয়-দুষ্ট। অতএব বেদ শ্রীভগবানের আংশিক-শক্তি বা বিভূতিস্বরূপ জীবকোটি ঋষিদের দ্বারা প্রণীত বা রচিত অর্থাৎ পৌরুষেয় শাস্ত্র নহে। এইজন্য বেদের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব। এই বেদোদ্যানের চতুর্দিকে অনেকপ্রকার মতবাদের কণ্টক-বেষ্টনী আছে। ইহার নিগূঢ়তম প্রদেশে যে পুষ্পোদ্যান আছে, তাহা একমাত্র পুষ্পবাগের পুষ্পরীতিই বেদ প্রদর্শন করেন। বিভিন্নমতবাদরূপ কণ্টক-বেষ্টনী অতিক্রম করিয়া যাঁহারা বেদকল্পতরুকথিত পুষ্পোদ্যানের গুহ্যতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারেন, তাঁহারাই গুহ্যাতিগুহ্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্বুখ্য বা উপাসনা-স্বরূপা রাজগুহ্য-বিদ্যার পরাকাষ্ঠা রাগময়ী ভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হন।

ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা সুষুপ্তি-দশার উপনীত হওয়া যায়; ইহা মোক্ষের দ্বারস্বরূপ। মহৎকৃপায় ইহা ভক্তির দ্বারস্বরূপ হইতেও পারে। ব্রহ্মবিদ্যা সত্ত্বগুণের উপর করায়, পরতত্ত্ববস্তুর সঙ্গে অভেদ-ভাবনা করায়, কারণ-শরীর-দ্বারা ক্রমশঃ নির্গুণতার দিকে অভিযান করায়। আত্মবিদ্যার দ্বারা পরমাত্মার অনুশীলন হয়। ইহা কিয়ৎপরিমাণে সগুণ ও কিয়ৎপরিমাণে নির্গুণ, কেবল নির্গুণ নহে। বেদশাস্ত্রিকা বিদ্যাই রাজগুহ্যবিদ্যা*, তাহারই অপর নাম 'ভক্তি'। ইহা নির্গুণা পরা বিদ্যা। "সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া" (ভা ৪।২৯।৪০)। তাহাই বিদ্যা, যাহার দ্বারা শ্রীহরিতে মতি হয়। বেদন-ধর্মের দ্বারা মতি বা অভিনিবেশ হয়। এই রাজগুহ্যবিদ্যা বা নির্গুণা ভক্তি শ্রদ্ধা-প্রধানা হইলে তাহাকে 'বৈধী ভক্তি', আর, রুচি-প্রধানা হইলে তাহাকে 'রাগানুগা সাধন-ভক্তি' বলে। রুচির মধ্যে ষোল-আনা হৃদয়, মস্তিষ্ক তাহার অধীন। আর, বৈধীতে চারি-আনা মস্তিষ্ক ও বার-আনা হৃদয়।

হৃদয়ের দ্বারাই বেদন অর্থাৎ অনুভব হয়। বেদ এই হৃদয়ের কথা গূঢ়ভাবে বলিয়াছেন,—"এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ।" (মুণ্ডক ৩।১।৯)। পরমাত্মাকে প্রিয়-জ্ঞানে উপাসনার কথা বেদে আছে,—"আত্মানমেব প্রিয়-মুপাসীত" (বৃ আ ১।৪।৮)। শ্রীতির প্রতিযোগী যে ভয়নক জ্ঞান, তাহাই ভীতি। যে-স্থানে ভীতি, সে-স্থানে শ্রীতি নাই; আর যে-স্থানে শ্রীতি, সে-স্থানেও ভীতি নাই। শব্দ ভীতি বা ভয়-শব্দের দ্বারা শ্রীতিকে ব্যতিরেক-ভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। "দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি" (বৃ আ ১।৪।২)।

অন্যান্য ধর্মের যে শাস্ত্র, তাহা পুরুষ-রচিত ও আপেক্ষিক অর্থাৎ কোন বিশেষ স্থান, কাল ও পাত্রোপযোগী; তাহা বিজ্ঞান ও অনুভব-দাস্য নহে। অপৌরুষেয় বেদের সঙ্কলনকর্তা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ত্রিবিক্রমের লীলা-কৈবল্য যাদবরাহ-সূত্রে ইঙ্গিতে ও তাঁহার অকৃত্রিম-ভাষ্যকৃত শ্রীমদ্ভাগবতে বিস্তৃতভাবে গ্রথিত করিয়াছেন। বেদকল্পতরুর প্রপক্ক ফল শ্রীমদ্ভাগবত—রাজগুহ্যবিদ্যা-প্রতিপাদক অদ্বিতীয় শাস্ত্র; ইহা একাধারে আত্ম ও অন্যপারমহংস্যী সংহিতা। যাহা মিলন করায়, তাহাই 'সংহিতা'।

বহু হইতে একের দিকে, অখিল হইতে মিলনের দিকে অভিসারের কথা—বেদন-ধর্মের কথা বলিয়া বেদ 'বেদ'। সেই বেদ-বেদ্য শ্রীভগবান্—রসস্বরূপ—মূর্তিমান্ শৃঙ্গার-রসের বিষয়-আশ্রয়স্বরূপ রসরাজ-মহাভাবের মিলনের কথা পারম-হংসী সংহিতা কীর্তন করেন।

প্রোজ্ঝিতকৈতব-নিরপেক্ষসত্যগর্ভ কথামৃত নিগম-কল্প-তরুর গলিত প্রপক্কফলস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতই দান করিয়াছেন। কর্মার্পণ, কর্মযোগ, নৈষ্কর্ম্য অর্থাৎ ঐহিক-পারলৌকিক ভোগসুখে নির্বেদ—কর্মকাণ্ড-প্রতিপাদক বেদের শেষ কথা। সুতরাং, তাহাতে ঐরূপ নিরপেক্ষ চূড়ান্ত কথার স্পষ্টোক্তি থাকিতে পারে না। বেদ কর্মার্পণ বা কামনার্পণের কথাই বলিয়া শেষ করিলেন কেন? উহার কারণ এই যে, কামদেবেরই কামনা থাকিবে—একচেটিয়া ইচ্ছাময়েরই ইচ্ছা থাকিবে; জীবের কামনা বা ইচ্ছা কামদেবের বা ইচ্ছাময়ের কামনা বা ইচ্ছার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে অর্থাৎ অপ্রাকৃত কামদেবের সর্বেচ্ছা-স্বতন্ত্রতার আনুগত্য করিলেই তাহা ক্রমশঃ সুখানুসন্ধানে পরিণত হইবে। ভাব বা অভিমানসহ প্রবাহবৃত্তির দ্বারা ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানের সহিত প্রাণে প্রাণে মিলিয়া যাওয়ার নামই 'আবেশ'।

* বিদ্যাসমূহের মধ্যে যাহা রাজা অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহা 'রাজবিদ্যা' এবং তত্ত্ববস্তুসমূহের মধ্যে যাহা রাজা অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহা 'রাজগুহ্য'-ভক্তিরূপ জ্ঞান। (শ্রীবলদেব, গী ৯।২)।

শ্রীমদ্ভাগবত পরকাব্য-শিরোমণি—পরমসংহিতা-শিরোমণি। যদিও ইহা পরমদার্শনিক-শাস্ত্র বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ, তথাপি গৌড়ীয়গণ ইহাকে দর্শনশাস্ত্রমাত্ররূপে দর্শন করেন না। রসিক না হইলে কাব্যমাধুর্য্য উপলব্ধি করা যায় না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিৎকাব্য ও চিদলঙ্কার-শাস্ত্র—শ্রীমদ্ভাগবত। অতএব জড়ের দিক্ হইতে চেতনের দিকে অভিধানমূলক ও তিন্নাত্র-প্রতিপাদক (লীলা-কৈবল্যপ্রতিপাদক নহে) দর্শনশাস্ত্রও সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিৎকাব্য ও সর্ব্বাকর অলঙ্কারশাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্ভুক্ত।

অন্যান্য পুরাণ বিভিন্ন ভগবদাবির্ভাবের নামে প্রকাশিত; যেমন শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীকূর্ম্মপুরাণ, শ্রীবরাহপুরাণ, শ্রীমৎস্য-পুরাণ, শ্রীনৃসিংহপুরাণ প্রভৃতি। কিন্তু উক্ত পুরাণরাজকে 'শ্রীকৃষ্ণপুরাণ' না বলিয়া 'শ্রীমদ্ভাগবত' বলা হইয়াছে। পাণিনির 'উপজ্ঞাতে' (পা ৪।৩।১১৫), 'তেনেদম্' (পা ৪।৩।১২০) ও 'কৃতে গ্রন্থে' (পা ৪।৩।১১৬) এই সূত্রত্রয়ানুসারে (১) 'তেন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীভগবতা উপজ্ঞাতং প্রথমজ্ঞাতং, বিনোপদেশজ্ঞাতং বা ইতি শ্রীমদ্ভাগবতম্' অর্থাৎ সেই 'শ্রী'-যুক্ত ভগবানের দ্বারা ইহা প্রথমেই বিদিত, অপরের উপদেশ-ব্যতীত স্বতত্ত্ববিষয় স্বয়ং-কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত, অতএব অলৌকিক। (২) 'শ্রীভগবত ইদং শ্রৈষ্ঠকলত্রস্বরূপম্' অর্থাৎ শ্রীভগবানের ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রৈষ্ঠকলত্র বা শক্তিরূপ বা আশ্রয়বিগ্রহ-শিরোমণিরূপ। (৩) 'মহামুনিঃ সর্ব্ব-মহদ্মহনীয়চরণ-পঙ্কজঃ শ্রীভগবান্, তেন কৃতো গ্রন্থঃ শ্রীমদ্ভাগবতম্' —মহামুনি অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম পরমহংসকুল-চূড়ামণি যে শ্রীশুকদেব, তাঁহারও একমাত্র প্রার্থনীয় পদবী যাঁহাদের শ্রীপদরজঃ ['বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ' (ভা ১০।৪৭।৬৩)] এমন যে মুনি-পরমহংসগণ-কর্ত্তৃক মহনীয় পূজনীয় চরণপঙ্কজ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহা-কর্ত্তৃক কৃত 'শ্রীমদ্ভাগবত'।

এইরূপ নিগূঢ়ভাবে 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র নামের তাৎপর্য্য প্রকিত করায় পৃথগ্‌ভাবে আর 'শ্রীকৃষ্ণপুরাণ'-আদি নাম বলেন নাই। পূর্ব্বে এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীব্রহ্মদেব-প্রভৃতি মহাজনের হৃদয়ে বিরাজিত ছিলেন, পরে শ্রীব্যাস-রামানন্দ ও শ্রীরূপ-সনাতনের হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন। নবম পদার্থ —মুক্তির আশ্রয় যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম, সেই স্বয়ংরূপ রসরাজ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক চিৎকাব্য, চিদলঙ্কার ও পারমহংসী সংহিতাশাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত আবিষ্কৃত হইয়াছেন। অতএব ঋষি-পণ্ডিত অন্যান্য লৌকিক শাস্ত্রের আর প্রয়োজন কি? অথবা, অপর শাস্ত্রে এইরূপ শ্রীভিন্নধাকাঙ্ক্ষার কথা কি কীর্ত্তিত হইয়াছে?

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥

(ভা ১১।১৪।৩)

যে বেদবাক্যে আমার স্বরূপগত ধর্ম্ম বিরাজিত, তাহা কালপ্রভাবে প্রলয়ে অপ্রকাশিত হইলে এই বেদসংজ্ঞিতা বাণী সৃষ্টির প্রারম্ভে আমি ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়াছিলাম।

শ্রীনাম-রসের আচার্য্য শ্রীশ্রীল ব্রহ্ম-হরিদাসের হৃদয়েই এই বেদসংজ্ঞিতা বাণীর প্রথম প্রকাশ। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকর্ত্তৃক প্রকটিততনু শ্রীমদ্ভাগবতস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দর যখন প্রকট হইলেন, তখন ঠাকুর শ্রীহরিদাস ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু উভয়ে আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। কারণ, সুখস্বরূপ বা আনন্দময়ের সেবা অর্থাৎ রসরাজের সেবা এবং রসরাজ-মহাভাব-মিলিততনুর সেবা একমাত্র গান, বাদ্য ও নৃত্যাত্মক রাসের দ্বারাই হয়।

'সত্যং পরং ধীমহি',—এই স্থানে 'ধীমহি' বলিতে গৌড়ীয়গণের ভাবগর্ভ আবেশময়ী 'প্রবাহস্মৃতি'। এই 'ধীমহি' বা 'প্রবাহস্মৃতি'র অন্তর্গতই কীর্ত্তন। ঐকান্তিকী ভক্তির নাম —'প্রবাহস্মৃতি'।

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥

(ভা ৩।২৯।১১)

যিনি প্রাকৃত গুণময় ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট সর্ব্বজীবের ইন্দ্রিয়-সমূহের অগোচর-স্থানে গুহ্যভাবে ও নিষ্কলরূপে অবস্থান করেন, সেই আমার প্রতি আমার গুণ-শ্রবণমাত্রই, (পরন্তু তদ্বিষয়ে অন্য কোন উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অভিপ্রায়ে নহে) বিষয়ান্তরদ্বারা বিচ্ছেদের অযোগ্যা যে মনোগতি সমুদ্রাভিমুখী গঙ্গা-প্রবাহের ন্যায় প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহা এবং পুরুষোত্তম-বিষয়ে অহৈতুকী অব্যবহিতা যে ভক্তি, তাহাই নির্গুণ-ভক্তিযোগের লক্ষণরূপে উদাহৃত হইয়াছে। এইরূপ ঐকান্তিকী ভক্তির সহিত ভগবদ্‌গুণ অর্থাৎ শ্রীরূপ-গুণ-লীলাদির শ্রবণ—হৃদয়চালিত কর্ণের দ্বারা যে শ্রবণ—অভীষ্টদেবের সুখানুসন্ধানময়ী প্রবাহস্মৃতি ও আবেশের সহিত যে

শ্রবণ, তাহাই আত্যন্তিক বা ঐকান্তিক 'ভক্তিযোগ'। এজন্যই 'যৌষহি'-শব্দের প্রয়োগ। মুক্তি-বাসনা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এই ক্রিয়ানুবৃত্তির সহিত যে ভগবৎসুখানুসন্ধান, তাহাই প্রোজ্ঝিতকৈতব ভাগবতধর্ম্ম বা কেবলা ভক্তি। এই ভক্তি অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা। ভক্তি নিজেই সুখ-রূপা বলিয়া অন্যফলের অনুসন্ধান করে না। কারণ, সমস্ত ফলানুসন্ধানের মূলই সুখ বা আনন্দপ্রাপ্তি, শ্রীভক্তি স্বয়ংই সেই সুখস্বরূপা। আর, ভক্তি—অপ্রতিহতা অর্থাৎ ভক্তি করার মত আর সুখ নাই, ভক্তি না করার মত আর দুঃখও নাই। এজন্য অন্য কোন অবান্তর বস্তুর দ্বারা ইহা বাধিত হইবার অযোগ্য। ভক্তি-বেগ কখনও মন্দীভূত হইলেও হ্রদের জলের মত শুষ্ক হয় না।

রাগভক্তির মধ্যে প্রধান—ধ্যান, আর বৈধী ভক্তির মধ্যে প্রধান—কীর্ত্তন, ইহাই 'অভিধেয়'; রসরাজ-মহাভাবের লীলা-আস্বাদনই 'প্রয়োজন'। শ্রীমদ্ভাগবতের সেবার দ্বারা সেই রসরাজ গোপবধূবিট্ ঈশ্বর সেইদিনই (লঘঃ), সেই-মুহূর্ত্তেই (তৎক্ষণাৎ), হৃদয়ে অবরুদ্ধ (বশীভূত) হন। রসরাজই—ঈশ্বর। "কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থঃ"—স্বরাট্-লীলাপুরুষোত্তম। ব্রহ্মাকে ব্রেজকুলে অবতীর্ণ করাইয়া তাঁহার বশীভূত হইলেন—এইজন্য ঈশ্বর। শ্রীগৌরসুন্দর নীচজাতি বা নীচসঙ্গি অভিমানী শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-প্রভুর দ্বারা বৈষ্ণবস্মৃতি-সঙ্কলন, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকাশ এবং শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও শ্রীধামের প্রকাশ এবং ভূতলে তাঁহার মনোহভীষ্ট স্থাপন করাইলেন; মনু, ভৃগু, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অত্রি, অঙ্গীরা, মরীচি, বশিষ্ঠ-প্রভৃতি ঋষিগণের দ্বারা করান নাই। অতএব শ্রীনাথ-ব্রজের আচার্য্য শ্রীব্রহ্ম-হরিদাস ও শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের অনুগত না হইলে, তাঁহাদের গণে পণ্ডিত না হইলে 'সত্যং পরং'-এর সন্ধান পাওয়া যাইবে না। রসরাজ ও মহাভাব উভয়েই ঈশ্বর ও ঈশ্বরী, তাঁহারা কোনও প্রকার জাগতিক যোগ্যতা বা মায়াস্বাজ্ঞানের অপেক্ষা করেন না। এজন্যই তাঁহারা ঈশ্বর।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে 'কৃতিভিঃ' ও 'শুশ্রূষুভিঃ' —এই দুইটি পদের প্রয়োগ আছে। এই স্থানে 'কৃতি' বলিতে জন্মান্তরে প্রাপ্ত ভগবৎপ্রীতি-সংস্কারযুক্ত—সুকৃতি-সম্পন্ন সৌভাগ্যবান্ অথবা ভাগবাত্মাপন্ন সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়-বান্; আর 'শুশ্রূষু' বলিতে শ্রীগুরুমুখে শ্রীভগবৎসেবার পরিপাটীর বিষয়-শ্রবণে রুচিযুক্ত, অথবা মহতের পরিচর্য্যা-কারী। পরিচর্য্যার পর শ্রবণযোগ্যতা হয়।

গ্রন্থ-ভাগবতরূপ শাস্ত্র ও শাস্ত্রমূর্ত্তি ভক্তভাগবতের কথা সৌভাগ্যবানই শ্রবণ করেন, দুর্ভাগা শ্রবণ করে না। সেই সৌভাগ্যবান্ দুই প্রকার—'লব্ধ' ও 'সদ্ধর'। অজ্ঞের শ্রদ্ধা হয় না। 'অজ্ঞঃ—ন বিদ্যতে জ্ঞা শ্রীভগবতঃ কথা-শ্রবণাদৌ শ্রদ্ধা-লক্ষণা ধীর্বৃত্তির্যস্য সঃ' (ভ দ, ১২ অনু) অর্থাৎ শ্রীভগবানের কথা-শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা-লক্ষণা বুদ্ধিবৃত্তি যাহার নাই, সেই ব্যক্তিই অজ্ঞ। সদ্ধরই রুচিমান্—মহতের কৃপাপ্রাপ্ত; আর দুর্ভাগা—পাপী, অপরাধী; ইহারা মস্তিষ্কের দ্বারা বিচার করে। অপরাধী বা আধ্যক্ষিক অশ্রদ্ধা, জড়াভিনিবেশ ও কৌটিল্য—এই ত্রিপুরে বাস করে। ত্রিপুরারি শিব শিলাকবচতে বিষ্ণুর অংশভূত বাণের দ্বারা ত্রিপুর ধ্বংস করেন। অপরাধীর লক্ষণ—দৈন্যাভাব, চিত্তার্দ্রতারাহিত্য বা অশ্রুহীনতা, নিজ-অযোগ্যতার উপলব্ধি-হীনতা, সর্ব্বপ্রাণীতে ইষ্টোপাস্যধী বা ভগবদ্-দৃষ্টিহীনতা। প্রাণীর প্রতি হিংসা, নিন্দা, বিদ্বেষাদি করিলে তাহা শ্রীনারায়ণের চরণ পর্য্যন্ত পৌঁছে, অর্থাৎ তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধ হয়।

শ্রীগৌরসুন্দর জীবের চরম উপাস্য শ্রীরাধা-মিথুনের একীভূত-তত্ত্ব প্রকট করিয়াছেন। তিনিই তাঁহার দ্বিতীয়-স্বরূপ শ্রীরামরায়ের শ্রীমুখে বক্তা ও প্রেরক হইয়া শ্রবণা-ভিনয় এবং প্রয়াগ ও কাশীর 'দশাশ্বমেধ'-ঘাটে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের কথা বলিয়াছেন। যে-স্থানে দশটি ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব ইষ্টবস্তুর সেবায় বলি হইয়াছে এবং উপাস্যবস্তুর হ্লাদিনী শক্তির প্রভাবে উপাস্যবস্তুর ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যে-স্থানে তাদাত্ম্যাপন্ন ইন্দ্রিয়, সেই স্থানেই সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হয়। সেই শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের নিকট শ্রবণ করিয়া শ্রীশ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভু তদ্বিষয়ে যথাক্রমে, ক্রমভঙ্গরূপে ও অসম্পূর্ণ-ভাবে যে একটি কড়চা লিখিয়াছিলেন, তাহাই আবার শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু বিচারক-সমাজের জন্য বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, মীমাংসা ও সঙ্গতি—এই পঞ্চাঙ্গ-ন্যায়ে পরিপুষ্টিত করিয়া, শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রমাণরূপে গ্রহণপূর্ব্বক সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বকে সেই শব্দ-প্রমাণের প্রমেয়রূপে 'শ্রীভাগবত-সন্দর্ভে' বিবৃত করিয়াছেন।

সম্বন্ধ পরতত্ত্বের মধ্যে ব্রহ্মাবির্ভাব—ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ শ্রীভগবান্। ষড়ৈশ্বর্যের মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য—'শ্রী'। শ্রীভগবান্ পরব্রহ্ম বস্তু হইয়াও শ্রিয়ঃবর্গ-বিশিষ্ট ও চমৎকারিতাযুক্ত। 'শ্রিয়ঃবর্গ বিশিষ্ট' বলিতে—তিনি ভালবাসেন, তিনি ভালবাসার কাঙ্গাল এবং তিনি ভালবাসায় বশীভূত হন। 'শ্রী'-কে প্রতিক্ষণ যিনি নবনবায়মানভাবে আনন্দ দান করিতেছেন, তিনিই 'শ্রীকৃষ্ণ'; তিনি সম্বন্ধি-তত্ত্বের পরিপূর্ণতম পরাকাষ্ঠা—শ্রীভগবদাবির্ভাব।

শ্রীবিষ্ণুর পঞ্চাশটি গুণ বিষ্ণু-বিষ্ণুরূপে সমভাবে আছে। উক্ত পঞ্চাশের উপর নিম্নলিখিত আরও পাঁচটি মহাগুণ পূর্ণরূপে শ্রীবিষ্ণুতে ও আংশিকরূপে শ্রীশিবাদি দেবতায় বর্ত্তমান আছে—(১) সর্ব্বদা স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত, (২) সর্ব্বজ্ঞ, (৩) নিত্যনূতন, (৪) সচ্চিদানন্দ-ঘনীভূতস্বরূপ, (৫) অখিল-সিদ্ধিবন্ধকারী, অতএব সর্ব্বসিদ্ধিদ্বারা বিশেষরূপে সেবিত।

পরব্যোমনাথ শ্রীনারায়ণে আরও পাঁচটি গুণ অধিক বর্ত্তমান; কিন্তু ইহা শিবাদি দেবতা, কিংবা জীবে নাই—(১) অচিন্ত্যমহাশক্তিত্ব, (২) কোটিব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহত্ব, (৩) সকলাবতার-বীজত্ব, (৪) হতশত্রু-সুগতিদায়কত্ব, (৫) আত্মারামগণের আকর্ষকত্ব। এই পাঁচটি গুণ শ্রীনারায়ণাদি বিষ্ণুতত্ত্বে থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণে পরিপূর্ণভাবে ও অদ্ভুতরূপে বর্ত্তমান। এই ষাট গুণের অতিরিক্ত আরও চারিটি গুণ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের একচেটিয়া; তাহা শ্রীনারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই—(১) সর্ব্বলোকের চমৎকারিণী লীলার কল্লোলসমুদ্র, (২) শৃঙ্গার রসের অতুলাপ্রেমদ্বারা শোভা-বিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডল, (৩) ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষী মধুর মুরলী-গীতগান, (৪) যাহার সমান ও যাহা হইতে শ্রেষ্ঠ নাই এবং যাহা চরাচরকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছে—এইরূপ সৌন্দর্য্যশালিতা।

এই সম্বন্ধি-তত্ত্বকে জানাই শেষকথা নহে, অর্থাৎ তাহাতেই আশা মিটে না; তাঁহাকে পাইবার উপায়, বস্তু ও সাধন জানা আবশ্যক। যেমন কোন জ্যোতির্বিৎ কোনও দরিদ্রের হস্তরেখা পর্য্যালোচনা করিয়া যদি বলেন,—'তোমার বহু গুপ্ত পিতৃধন আছে; তুমি ধনী'—এই কথা শুনিয়াই দরিদ্র ধনী হইয়া পড়ে না, বা দরিদ্রের সাধ মিটে না; গুপ্তধন আবিষ্কারের উপায় জানিতে হয় এবং তদ্বিষয়ে যত্ন করিতে হয়। সাধনের দ্বারা ধন লাভ করিবার পর আনুষঙ্গিকভাবে দুঃখনাশ ও মুখ্যভাবে সুস্থদেহে আত্মীয়-স্বজনের সহিত বিহারাদি সুখ-লাভ হয়। সেই সম্বন্ধিতত্ত্বকে পাইবার যে উপায় বা সাধন, তাহাই 'অভিধেয়'। সেই অভিধেয় ত্রিপ্রকার—জ্ঞান, ভক্তিবিশেষ বা যোগ ও কেবলা ভক্তি। তন্মধ্যে শ্রীভগবদাবির্ভাবের পরাকাষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধিতত্ত্বহেতু শ্রীকৃষ্ণপ্রাপক সাধন যে ভক্তি, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনের ফল যে বিমুক্তি বা শ্রীতিরূপ প্রয়োজন তাহাও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীগৌড়ীয়গণের **সম্বন্ধিতত্ত্ব**—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ; **অভিধেয়তত্ত্ব**—ভাবগর্ভা আবেশময়ী প্রবাহানুবৃত্তিময়ী ভক্তি; তাহাই সমস্ত অভিধেয়ের আকর; গৌড়ীয়গণের **প্রয়োজন**—বিমুক্তিও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদি যাবতীয় পুরুষার্থতুচ্ছকারী। **শাস্ত্র**—শ্রীমদ্ভাগবত স্বয়ংরূপ-শাস্ত্র ও তদন্তর্ভুক্তই সমস্ত শাস্ত্র।

ভক্তির আভাসেই কর্ম্ম-জ্ঞানাদির প্রাপ্য প্রয়োজন অনায়াসে লাভ হয়। ভক্তি—স্বতঃসুখস্বরূপা ও অপ্রতিহতা; সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা ও সর্ব্বশাস্ত্রে ভক্তির অধিষ্ঠান, সার্থকতা ও সমন্বয় আছে এবং সর্ব্বোপরি শ্রীভক্তি—শ্রীকৃষ্ণকারিণী; এইজন্য ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাযুজ্য বা উপাসনা-শ্রেষ্ঠ।

পরতত্ত্বাবির্ভাবের মধ্যে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদাবির্ভাব। সেই ভগবদাবির্ভাবের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই শৃঙ্গার-রসরাজ; তাঁহারই রসরাজ একটি রূপ ও মহাভাব আর একটি রূপ। এই রসরাজ—শ্যামরূপ ও মহাভাব—গৌরকান্তি। এই চিল্লীলা-মিথুনের লীলায় প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার আনুকূল্যবিধান অর্থাৎ মাধুর্য্যানুভবই জীবের চরম-পরম প্রাপ্য-পরাকাষ্ঠা বা প্রয়োজন। যাঁহারা সেই লীলারসের সাধক-ভাবুক ও সিদ্ধ-রসিক, তাঁহারাই শ্রীগৌড়ীয়।

শরণাগতি

শ্রীশ্রীরূপানুগবর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু শরণাগতি, শ্রীগুর্বাদি-সাধুসেবা ও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তিকে একাদশ-প্রকার বৈধভক্তিরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

রুচিহীন অবস্থায় কেবলমাত্র শাস্ত্রকথিত বিধি-অনুসারে ভগবৎ-সুখানুসন্ধানের যে চেষ্টা হয়, তাহাই বৈধী ভক্তি। সেই শাস্ত্রকথিত বিধির স্বরূপ দুইপ্রকার; প্রথম বিধি—ভজন করিবার প্রবৃত্তির হেতু ও দ্বিতীয় বিধি—ভজন-অনুষ্ঠানের অনুক্রমে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বোধ-হেতু, অর্থাৎ প্রথম বিধিটি আদেশ পালনরূপা ও দ্বিতীয় বিধিটি প্রণালী-নির্দ্দেশরূপা। শাস্ত্রবিধি প্রথমতঃ ভজন করিবার প্রবৃত্তি দেয়—'ভগবদ্ভজন করা জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য; না করিলে —ক্লেশ, দুঃখ, ত্রিতাপ, নরকভোগ।' এইরূপ শাস্ত্রের অনুশাসন হইতে ভজন করিবার প্রবৃত্তির উদয় হয়। দ্বিতীয়তঃ শাস্ত্রবিধিক্রমে ভজন করিবার প্রবৃত্তির উদয় হইলে সেই অনুষ্ঠেয় ভজনাঙ্গের মধ্যে কোন্‌টি পূর্ব্বে ও কোন্‌টি পরে এবং তাহা কি প্রকারে, কতভাবে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইহা বিধি-দ্বারা প্রদর্শিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত একাদশ-প্রকার [শরণাগতি (১), +শ্রীগুরু-দেব ও সাধুগণের সেবা (২), +শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা-ভক্তি (৩)—১১] বৈধী ভক্তির মধ্যে শরণাগতি একতম। কাম-ক্রোধাদি ষড়্‌রিপু-বিকৃত সংসার-তরে বাধিত হইয়াই মানব অন্য আশ্রয় না পাইয়া শ্রীভগবানের শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ করে।

ভবকদর্থিতানাং দ্রবিণাতানাং
সুত-দুহিতৃ-কলত্রত্রাণ-ভারার্দ্দিতানাম্।
বিষমবিষয়তোয়ে মজ্জতামপ্লবানাং
ভবতু শরণমেকো বিষ্ণুপোতো নরাণাম্॥

(মুকুন্দমালা-স্তোত্র, ১১)

সংসারসমুদ্রে পতিত, সুখদুঃখাদি বিকল্পাবস্থারূপ ঘটিকা-পীড়িত, পুত্র-কন্যা-ভার্য্যাদি-রক্ষণ-পোষণরূপ ভারে নিপীড়িত বা ক্লিষ্ট, দুস্তর বিষয়-জলে নিমজ্জিত হইতেছে, এমন ভরসা-হীন মানবগণের একমাত্র বিষ্ণুপাদরূপ নৌকা—আশ্রয়-স্বরূপ হউক।

যাঁহারা কেবল ভক্তিলাভের জন্যও কামনা করেন, তাঁহারাও কাম-ক্রোধাদি-কৃত ভগবদ্‌বিমুখতায় বাধিত হইবার অভিমান করিয়াই শ্রীভগবানেরই শরণ গ্রহণ করেন। যেমন উক্ত হইয়াছে,—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা
ন্তাসাং তেষাং ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্‌ক্ষ্বাঙ্ঘ্রিপদ্মে॥

(ভ র সি, পশ্চিম-বিভাগ, ২য় লহরী ১, অপরাধ-ভঞ্জন)

হে যদুপতে! কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য —এই ষড়্‌রিপুর কত প্রকার দুষ্ট আদেশই না আমি কত প্রকারে পালন করিয়াছি। তথাপি আমার প্রতি সেই কামাদি রিপুর কোন দয়া হইল না, আমারও লজ্জা বা উহাদিগের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হইল না! এখন আমি সেই কামাদি রিপুকে পরিত্যাগ করিয়া সদ্‌বুদ্ধি লাভ করিয়াছি। তাই, তোমার অভয়-চরণে শরণাগত হইলাম, আমাকে তোমার নিজ-দাস্যে নিযুক্ত কর।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয় শ্রীতিমাত্র-কাম নিত্যসিদ্ধ রাগাত্মিক জন হইয়াও দৈন্যভরে গাহিয়াছেন,—

কামে মোর হত চিত্ত, নাহি জানে নিজ হিত,
মনের না ঘুচে দুর্ব্বাসনা।
মোরে, নাথ, অজীকুরু, তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু,
করুণা দেখুক সর্ব্বজনা॥

অনন্যগতির অবস্থাটি দুইপ্রকারে প্রদর্শিত হইয়াছে,— (১) 'শ্রীহরিব্যতীত আর কোন গতি নাই'—এই অনুভব, আর, (২) না বুঝিয়া যদি পূর্ব্বে অন্য কোন আশ্রয় স্বীকার করিয়া থাকে, তবে তাহার পরিত্যাগ।

'শ্রীহরিব্যতীত অন্য কোনই গতি নাই',—ইহা নিম্নলিখিত শ্লোকে শ্রীদেবকীদেবী জীবজগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

মর্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্
লোকান্ সর্ব্বান্ নির্জ্জগাম নাথমজ্ঞং।
যৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য
সুস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি॥

(ভা ১০।৩।২৭)

মৃত্যুরূপ সর্প হইতে ভীত মরণধর্ম্মি জগৎ নিখিল-ভুবনের প্রতি আশ্রয়লাভের জন্য ধাবিত হইয়া কোথাও নির্ভয় প্রাপ্ত হইতেছে না ; কারণ, আত্মজন্য সমস্ত লোকই কালকবলিত। কেবল মহতের সঙ্গ বা কৃপাজনিত ভক্তির দ্বারা তোমার শ্রীচরণারবিন্দকে আশ্রয় লাভ করিয়া সুদৃঢ়ভাবে শরণ করিতে পারে ; তখন মৃত্যু তাহার নিকট হইতে পলায়ন করে।

শ্রীযামুনাচার্য্যপাদ 'স্তোত্ররত্নে' গাহিয়াছেন,—

ন ধর্ম্মনিষ্ঠোঽস্মি ন চাত্মবেদী, ন ভক্তিমাংস্তচ্চরণারবিন্দে।
অকিঞ্চনোঽনন্যগতিঃ শরণ্য, ত্বৎপাদমূলং শরণং প্রপদ্যে॥

হে শরণ্য প্রভো, আমি ধর্ম্মে নিষ্ঠাযুক্ত নহি, আত্ম-তত্ত্বজ্ঞও নহি, তদধীন শ্রীচরণকমলে ভক্তিমান্‌ও নহি ; শরণ্য, সর্ব্বস্বরহিত ও অন্যগতিহীন হইয়া আপনার পাদমূল আশ্রয়রূপে অবলম্বন করিতেছি।

অন্যতাক্রমে শ্রীহরিপাদপদ্ম-ব্যতীত অন্য আশ্রয় স্বীকার করিয়া থাকিলে, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীভগবৎ পদাশ্রয়ের কথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীউদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া জীবজগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

তস্মাৎ ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্।
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যঞ্চ শ্রুতমেব চ॥
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ॥

(ভা ১১।১২।১৪-১৫)

হে উদ্ধব, অতএব তুমি শ্রুতি-স্মৃতি, বিধি-নিষেধ, শ্রবণযোগ্য ও শ্রুত-শ্রুত সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত দেহিগণের আত্মা বা প্রেষ্ঠ আমাতে একমাত্র দাস্য-সখ্যাদি ভাবের যে-কোন একটির অভিমানের সহিত শরণ গ্রহণ কর। তুমি আমার দ্বারাই অকুতোভয় হইতে পারিবে। কর্ম্মাধিকার বা জ্ঞানাধিকার আত্মাতে আরোপ করিয়া প্রত্যবায়-ভয় ও সংসারাদি-ভয় উপস্থিত হয়। আমা-ব্যতীত অন্য দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করিলেও নানাপ্রকার ভয় বিদ্যমান থাকে। তুমি একমাত্র অনন্যভাবে আমারই শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে রক্ষা করিব।

শ্রীগীতাতেও শ্রীভগবান্ শ্রীঅর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপই বলিয়াছেন,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

(গী ১৮।৬৬)

হে অর্জ্জুন, নিত্যধর্ম্ম সন্ধ্যাবন্দনাদি ও নৈমিত্তিক-ধর্ম্ম প্রায়শ্চিত্তাদি স্বরূপতঃ ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-শরণাপত্তির বিরুদ্ধক বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর। আমার ভজনের জন্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে তোমাকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে না ; আমিই তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব।

শরণাগতির ছয়-প্রকার লক্ষণ 'শ্রীবৈষ্ণবতন্ত্রে' এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥

শ্রীহরির সুখানুসন্ধানের যাহা আনুকূল্য অর্থাৎ সহায়ক, তদর্থে দৃঢ় সংকল্প ; আর শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধানের যাহা প্রাতিকূল্য অর্থাৎ বাধক, তাহার বিশেষরূপে বর্জ্জন ; 'শ্রীকৃষ্ণই রক্ষা করিবেন' বলিয়া সুদৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহাকে গোপ্তা অর্থাৎ পালকরূপে বরণ, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মাহুতি ও দীনতা—এই ছয় প্রকার শরণাগতি।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গীতির মধ্যে গুম্ফিত করিয়া জগজ্জীবকে ষড়ঙ্গ-শরণাগতির উপদেশ করিয়াছেন,—

[১] ভক্তিসাধক আনুকূল্য-বরণ

(ক) কৃষ্ণভক্তি-অনুকূল যে যে কার্য্য হয়।
সতত করিব তাহা করিয়া নিশ্চয়॥
ভক্তি-অনুকূল যত বিষয় সংসারে।
করিব তাহার ত্বরা ইহিতের দ্বারে॥
শুনিব তোমার কথা, সরল করিয়া।
হেরিব তোমার রূপ, নয়ন ভরিয়া॥
তোমার প্রসাদে দেহ করিব পোষণ।
নৈবেদ্য-তুলসী-গ্রাণ করিব গ্রহণ॥
করদ্বয়ে করিব তোমার সেবা নব।
তোমার মন্দিরপথে করিব মার্জ্জন॥
তোমার সেবায় সদা বিলোল করিব।
তোমার বিদ্বেষী জনে দ্বেষ সেবাইব॥
এইরূপে সর্ব্বমতি, আর সর্ব্বভাব।
কৃষ্ণ অনুকূল হবে লভুক প্রভাব॥
কৃষ্ণ ভক্ত-অনুকূল যাহা যাহা করি।
কৃষ্ণ ভক্তি-অনুকূল বলি' তাহা ধরি॥
ভক্তিবিনোদ যাহি জানে সর্ব্বধর্ম্ম।
ভক্তি-অনুকূল তা'য় হয় সব কর্ম্ম॥

(খ) শুদ্ধ-ভকত-　　চরণরেণু,
　　ভজন-অনুকূল।
ভকতসেবা,　　পরম-নিধি,
　　প্রেমলতিকার মূল।
মাধবতিথি,　　ভক্তি জননী,
　　যতনে পালন করি।
কৃষ্ণবসতি,　　বসতি বলি',
　　পরম আদরে বরি।
ধৌর আমার,　　যে-সব স্থানে,
　　করল ভ্রমণ রঙ্গে।
যে-সব স্থান,　　হেরিব আমি,
　　প্রণতি-ভকতসঙ্গে।
মুরম-বাদ্য,　　শুনিতে মন,
　　অবসর সদা যাচে।
গৌরবিধির,　　কীর্ত্তন শুনি',
　　আনন্দে হৃদয় নাচে।
পুলক-বৃষ্টি,　　দেখিয়া মোর,
　　পরম-আনন্দ হয়।
প্রণাম-সেবা,　　করিতে হয়,
　　সকল প্রণাম-ভয়।
যেখিব পুরে,　　ভবন যেথি,
　　পুরেতে গোলোক ভায়।
চরণ-নীর,　　যেখিয়া গঙ্গা,
　　সুখ যা সীমা পায়।
তুলসী যেখি',　　জুড়ায় প্রাণ,
　　মাধবতোষণী জানি'।
গৌরপ্রিয়,　　ধাম যেখানে,
　　জীবন সার্থক মানি।
ভকতি-বিনোদ,　　চক্ষু-ভজনে,
　　অনুকূল পায় যারা।
প্রতি দিবসে,　　পরমহর্ষে,
　　বীকার করয়ে তারা।

শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু—(১) উৎসাহ, (২) নিশ্চয়, (৩) ধৈর্য্য, (৪) তত্তৎ-কর্ম্মপ্রবর্ত্তন (ভক্তির অনুকূল কর্ম্মের অনুষ্ঠান), (৫) সঙ্গত্যাগ (জড়াসক্তি ও অসৎসঙ্গ-ত্যাগ) এবং (৬) সাধুর বৃত্তি বা সদাচার-বরণ—এই ছয়টী ভক্তির অনুকূল সদ্‌গুণের কথা 'শ্রীউপদেশামৃতে' উল্লেখ করিয়াছেন।

[২] ভক্তিবাধক বা প্রাতিকূল্য-বর্জ্জনের সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'শরণাগতি'তে যে-সকল উপদেশ দিয়াছেন, তন্মধ্য হইতে কএকটি গীতি নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

(ক)　কেবল, তুয়া চরণ বিচিত্র।
　　করয়-বিলাসে,　　ভবভয় প্রণষ্ট,
　　দেখয়ে সব বস্তুচিত্র।
　　তুয়া পদ-বিস্মৃতি,　　আ-মর-মরণ,
　　সে-নরকে রহি' যাই।
　　কপিল, পঞ্চশিখ,　　ধৌম্য, জনকোক্তি,
　　ভৈষ্মিনী, বৌদ্ধ আগমে গাই।
　　তব ভক্তি বিনু মতে,　　মুক্তি-মুক্তি যাচন্ত,
　　পাতই নানাবিধ ফাঁদ।
　　সো-সব বঞ্চক,　　তুয়া-ভক্তি-বহির্ম্মুখ,
　　ঘটাওয়ে বিষম পরমাদ।
বিমুখ-বঞ্চনে,　　ভটসো সবু,
　　বিরচিল বিবিধ পাষাণ।
ভকতি-বিনোদ ভেল,　　ভকত-চরণ করি' সার।

(খ) তুয়া-ভক্তি-প্রতিকূল ধর্ম্ম যাতে হয়।
　　পরমযতনে তাহা ত্যজিব নিশ্চয়।
　　তুয়া ভক্তি-বহির্ম্মুখ সঙ্গ না করিব।
　　গৌরাঙ্গ-বিরোধিজন-মুখ না হেরিব।
　　ভক্তি-প্রতিকূল স্থানে না করি বসতি।
　　ভক্তির অগ্রির কার্য্যে যাহি করি গতি।
ভক্তির বিরোধী প্রভু পথ না চলিব।
ভক্তির বিরোধী কথা কভু না বলিব।
গৌরাঙ্গ-বর্জ্জিত স্থান তীর্থ নাহি মানি।
ভক্তির বাধক জ্ঞান-কর্ম্ম তুচ্ছ জানি।
ভক্তির বাধক কালে না করি আদর।
ভক্তি-বহির্ম্মুখ নিজজনে জানি পর।
ভক্তির বাধিকা স্পৃহা করিব বর্জ্জন।
অসক্ত-প্রভৃতি অঙ্গ না করি গ্রহণ।
যাহা কিছু ভক্তি-প্রতিকূল বলি' জানি।
তাহার বর্জ্জনে তারা, এ বিশ্বাস-বাণী।
ভকতিবিনোদ পড়ি' প্রভুর চরণে।
মাগয়ে শকতি প্রাতিকূল্যের বর্জ্জনে।

শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভু 'শ্রীউপদেশামৃতে'—(১) অত্যাহার, (২) প্রয়াস, (৩) প্রজল্প, (৪) নিয়মাগ্রহ (নিয়মের অধিক আদর ও অবহেলা বা অপালন), (৫) জনসঙ্গ (বহির্ম্মুখ লোকের সঙ্গ), (৬) লৌল্য (অব্যবস্থিত-চিত্ততা)—এই ছয়টি ভক্তি-প্রতিকূল দোষের কথা বর্ণন করিয়াছেন।

[৩] 'কৃষ্ণই আমাকে রক্ষা করিবেন'—এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস শরণাগতির তৃতীয় অঙ্গ ; শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

এখন বুঝিনু প্রভু তোমার চরণ।
অশোক-অভয়ামৃত-পূর্ণ সর্ব্বক্ষণ।
সকল ছাড়িয়া * তুয়া চরণকমলে।
পড়িয়াছি আমি, নাথ, তব পদতলে।
তব পাদপদ্ম, নাথ, রক্ষিবে আমারে।
আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ-ভব সংসারে।
আমি তব নিত্যদাস জানিনু এবার।
আমার পালনভার এখন তোমার।
বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে। †
সব দুঃখ ঘুচে গেল ; ও-পদ বরণে।
যে পদ লভিয়া ব্রহ্মা তপস্যা করিল।
যে পদ পাইয়া শিব শিবত্ব লভিল।
যে পদ লভিয়া ব্রহ্মা কৃতার্থ হইল।
যে পদ নারদমুনি হৃদয়ে ধরিল।
সেই সে অভয়পদ শিরেতে ধরিয়া।
পরম-আনন্দে নাচি পরশন পাইয়া।
সংসার-বিপদ হ'তে অবশ্য উদ্ধার।
ভকতিবিনোদে পদ করিবে তোমার।

* আত্মনিক্ষেপ　　† আত্মনিক্ষেপ　　‡ আত্মনিক্ষেপ

[৪] গোপ্তৃত্বে বরণ—এই বিষয়ে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রসিদ্ধ কয়েকটি গীতি এই,—

(ক) কি ছার কি ছার, তোমার বাধেতে,
হইনু শরণাগত।
তুমি দয়াময়, পতিতপাবন,
পতিত-তারণে রত॥
তবসা আমার, এই মাত্র সার,
তুমি ত' করুণাময়।
ভব দয়াপাত্র, আছি মোর দম্ভ,
অতএব দুরাশয়॥
আমারে তারিতে, আছয়ে শকতি,
অবশ্য তোমার আছি।
শুনহ ঠাকুর, তোমার তোমার,
অবশ্য পামরে আছি॥
সকল ছাড়িয়া, আসিয়াছি আমি,
তোমার চরণে আশ।
আমি বিভাবান, তুমি পালয়িতা,
তুমি মোরে কৃপাবাস॥
তোমার সকল, আমি মাত্র দাস,
আমায় তারিবে তুমি।
তোমার চরণ, করিনু বরণ,
আমার যদি ত' আমি।
ভক্তিবিনোদ, কাঁদিয়া পরম,
লয়েছে তোমার পায়।
কৃপা' অপরাধ, আমার কপট দিয়া,
পালন করহে তায়॥

(খ) পরাপুত্র-বিত্তদার-কুটুম্ব-পালনে।
সকলি বাতুল আমি ফিরি ভবে ভবে।
কেমনে অর্জ্জিব অর্থ, কেমনে পা'ব?
কৃষ্ণ-পুত্র-দিব্যদেহ কেমনে পালিব?
এবে আত্ম-সমর্পণে চিন্তা নাহি আর।
তুমি নিস্তারিবে প্রভু, ভরসা তোমার॥
তুমি ত' পালিবে মোরে নিজ দাস জানি'।
তোমার দেবার প্রভু, বড় সুখ মানি॥
তোমার ইচ্ছায় প্রভু, সব কার্য্য হয়।
জীব মূঢ়,—'করি আমি', সে ত' নাস্তি কয়॥
জীব কি করিতে পারে, তুমি না করিলে?
আপনা মাত্র জীব করে, তব ইচ্ছা বলে॥
বিক্ষিপ্ত হইয়া আমি সেবিব তোমায়।
গৃহে আসক্ত হ'লে নাহি মোর দায়॥
ভক্তিবিনোদ নিজ-স্বাতন্ত্র্য ত্যজিয়া।
তোমার চরণ সেবে অকিঞ্চন হইয়া॥

(গ) সর্ব্বস্ব তোমার, চরণে সঁপিয়া,
পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমি ত' ঠাকুর, তোমার কুকুর,
বলিয়া জানহ মোরে॥

বাঁধিয়া বিকটে, আমারে পালিবে,
রহিব তোমার দ্বারে।
প্রসাদ-অন্নেরে, আশিতে না দিব,
রাখিব পড়ের পারে॥
ভব বিভবের, প্রসাদ সেবিয়া,
উচ্ছিষ্ট ভাজিব যাহা।
আমার তোমার, পরম আত্মীয়,
প্রতিষ্ঠিব হ'বে তাহা॥
বসিয়া দুইয়ে, তোমার চরণ,
চিন্তিব সতত আমি।
বাহিরে বাহিরে, বিকটে যাইব,
যখন ডাকিবে তুমি॥
বিষের লোভন, কভু না ভাবিব,
রহিব ভাবের ভরে।
ভক্তিবিনোদে, তোমারে পালক,
বলিয়া বরণ করে॥

(ঘ) • • •
নিজবল-চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া॥
ভক্তিবিনোদ অতি দীন অকিঞ্চন।
তোমার ইচ্ছায় তা'র জীবন-মরণ॥

[৫] আত্মনিক্ষেপ বা স্বতন্ত্রতা-ত্যাগ—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি',
হইনু পরম-সুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল,
ভৌতিকে আনন্দ দেখি॥
অশোক-অভয়- অমৃত-আধার,
তোমার চরণ-দ্বয়।
তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া,
ছাড়িনু ভবের ভয়॥
তোমার সংসারে, করিব সেবন,
লভিব বলের পোষ্টী।
তব সুখ যাহে, করিব যতন,
হ'য়ে পদে অনুরাগী॥
তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম-সুখ।
সেবা দুঃখ-দুঃখ, পরম-সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥
পূর্ণ-ইচ্ছাময়, তুলিনু সকল,
সেবাসুখ পে'য়ে সবে।
আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ভবে?
ভক্তিবিনোদ, আনন্দে ডুবিয়া,
তোমার সেবায় রয়ে।
সব চেষ্টা করে, তব ইচ্ছা-মত,
থাকিয়া তোমার ঘরে॥

[৬] কার্পণ্য বা দৈন্য—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'শ্রীশরণাগতি'তে আত্মনৈরক্ষ্যে জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

(ক) আমার জীবন, সদা পাপে রত,
নাহিক পুণ্যের লেশ।
পরের অহিত, যেখানে যে কত,
নিয়াছি জীবের ক্লেশ॥
নিজ সুখ লাগি', পাপে নাহি ডরি,
দয়াহীন স্বার্থপর।
পরদুখে দুখী, সদা মিথ্যাভাষী,
পরদুঃখ সুখকর॥
অন্যের কামনা, হরিবারে মোর,
সদাই আমার মন।
অন্যের সম্পদ, দেখিলে আমার,
বিদরে দোহিত, হিংসা-গর্ব্ব-বিষদূষণ॥

* আত্মনিক্ষেপ

বিধানক-হত,　　দুকার্য্যে বিরত,
অকার্য্যে উদ্যোগী আমি।
প্রতিষ্ঠা লাগিয়া,　　শাঠ্য-আচরণ,
লোকহত, দম্ভ ভারী।
এ-হেন দুর্জ্জন,　　সজ্জন-বর্জ্জিত
অপরাধী বিষয়ী।
শুভকার্য্য-শূন্য,　　মদমত্ত-সদা,
মায়াসুখে তন্ময়।
মাত্রিকো এমন,　　উপায়-বিহীন,
তা'তে দীন অকিঞ্চন।
ভকতিবিনোদ,　　প্রভুর চরণে,
করে দৃঢ় নিবেদন।

(খ) (প্রভু হে,) তব মোর দুঃখময় কাহিনী।
বিষম-জ্বলাহল,　　দুরাশাগণে পিষলুঁ,
আর অবসাদ নিরবধি।
বেলাশেষে শৈশব,　　পড়াইতে কৈশোর,
গোঁয়াওলুঁ, না কেল বিবেক।
ভোগবশে যৌবনে,　　মত্ত সদা' ধনিসুত,
সুত-মিত্র বাড়ল অনেক।
বৃদ্ধকাল আওল,　　সব সুখ ভাগল,
পীড়াবশে হইনু কাতর।
সর্ব্বেন্দ্রিয় দুর্ব্বল,　　ক্ষীণ কলেবর,
রোগাকারে দুর্নিত অন্তর।
আশাবশ-দীন,　　ভকতিবলে বঞ্চিত,
আর মোর কি হ'বে উপায়।
পতিতবন্ধু তুমি,　　পতিতাধম হাম,
কৃপায় ঠাঁও তব পায়।
বিচারিতে আমি,　　গুণ নাহি পাওবি,
কৃপা কর, ছোড়ত বিচার।
তব পদ পঙ্কজ-　　সীধু পিবাওত,
ভকতিবিনোদে কর পার।

(গ) প্রভু হে! তুয়া পদে এ মিনতি মোর।
তুয়া-পদপদ্মে,　　হাদয় মত্ত মম,
বিষয়-বিষয়ে কেন ভোর।
ছাড়িতে ছাড়ত,　　পুন নাহি মিলই,
অনুদিন করই তরাস।
জীবজন-নাথ,　　তুহুঁ করুণাসি,
তোহারি চরণ মম আশ।
ঐছন দীবজন,　　কাঁহি নাহি মিলই,
তুহুঁ মোরে কর পরকাশ।
তুয়া জন-সঙ্গে,　　তুয়া কথা-রঙ্গে,
ছাড়ই সকল পরমাদ।
তুয়া-ধাম-মাঝে,　　তুয়া-নাম গাওত,
গৌরাঙ্গ দিবানিশি আশ।
তুয়া-পদছায়া,　　পরম সুশীতল,
মাগে ভকতিবিনোদ-দাস।

শরণাগতি—অঙ্গাঙ্গিভেদে উক্ত ছয়প্রকার। ইহার মধ্যে শ্রীহরিকে পালকরূপে বরণটিই—অঙ্গী। শরণাগতির পাঁচটি অঙ্গ উক্ত অঙ্গীকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিত। অঙ্গী থাকিলেই অঙ্গের সার্থকতা হয়। অঙ্গিহীন অঙ্গ—অচেতন ও নিরর্থক। তদ্রূপ শ্রীহরিকে পালনকর্ত্তৃরূপে বরণ বৃত্তিটি পূর্ণভাবে হৃদয়ে থাকিলেই অন্যান্য অঙ্গগুলির শোভা বর্দ্ধিত হয়। যাঁহারা পরতত্ত্বকে পালকরূপে বরণ করে না, তাহাদের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে প্রযত্ন অথবা কোন অচেতন বস্তুকর্ত্তৃক রক্ষিত হইবার বিচার, আত্মনিবেদন ও দৈন্য সমস্তই নাস্তিক্য বা কাপট্যে পর্য্যবসিত হয়। নাস্তিক-গণের মধ্যেও ভোগ-মোক্ষাদি অভীষ্টলাভের জন্য নিজ-নিজ চেষ্টার অনুকূল-প্রতিকূল বিষয় বরণ ও ত্যাগ, 'নিজের বল বা চেষ্টাসমূহই আমাকে রক্ষা করিবে'—এইরূপ বিশ্বাস, নিজের কর্ম্ম, সাধন বা পুরুষকারের প্রতি নির্ভরতা এবং কোথায় কোথায় প্রচ্ছন্ন অহমিকাগর্ভ কপট-দৈন্যও দেখিতে পাওয়া যায়। **গোপ্তৃত্বে বরণকে অঙ্গী বলিবার কারণ এই যে, উহারই 'শরণাগতি'-শব্দের সহিত একার্থতা আছে। বস্তুতঃ, গোপ্তৃত্বে বরণই শরণাগতির স্বরূপ।**

শ্রীভগবান্‌কে গোপ্তৃরূপে বরণের একটি দৃষ্টান্ত কোন প্রাচীন বৈষ্ণবের শ্রীমুখোদ্গীর্ণ একটি স্তব হইতে এইরূপ উদ্ধার করা যাইতে পারে,—

হে গোপালক! হে কৃপাজলনিধে! হে সিন্ধুকন্যাপতে!
হে কংসান্তক! হে গজেন্দ্রকরুণাপারীণ! হে মাধব!
হে রামানুজ! হে জগত্ত্রয়গুরো! হে পুণ্ডরীকাক্ষ! মাং
হে গোপীজননাথ! পালয় পরং জানামি ন ত্বাং বিনা॥
(পদ্যাবলী, ৩৫)

শ্রীযামুনাচার্য্য 'শ্রীস্তোত্ররত্নে' গোপ্তৃত্বে বরণের এইরূপ স্তব করিয়াছেন,—

পিতা ত্বং মাতা ত্বং দয়িততনয়স্ত্বং প্রিয়সুহৃৎ
ত্বমেব ত্বং মিত্রং গুরুরপি গতিশ্চাসি জগতাম্।
ত্বদীয়স্ত্বদ্ভৃত্যস্তব পরিজনস্ত্বদ্গতিরহং
প্রপন্নশ্চৈবং সত্যহমপি তবৈবাস্মি হি ভরঃ॥
(স্তোত্ররত্ন, ৫৭)

হে ভগবন্, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্বর্ত্তী জীবগণের সম্বন্ধে আপনি পিতা, আপনি মাতা, আপনি প্রিয়পুত্র, আপনি প্রিয়বান্ধব, আপনিই মিত্র, আপনিই গুরু ও আপনিই গতি। আমিও আপনার সম্বন্ধযুক্ত আপনার ভৃত্য, আপনার পরিজন, আপনি যাহার গতি তাদৃশ এবং আপনার শরণাগত। এই সেই আমিও আপনারই পালা-স্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছি, ইহা সুনিশ্চিত।

'শ্রীহরিই আমাকে রক্ষা করিবেন'—এই বিশ্বাসটি জড়-বিজয়ের প্রতি শাপ-বর্ষনপ্রসঙ্গে শ্রীব্রহ্মার উক্তির মধ্যে দৃষ্ট হয়,—

বিশ্বস্য যঃ স্থিতিলয়োদ্ভবহেতুরাদ্যো
যোগেশ্বরৈরপি দুরত্যয়যোগমায়ঃ।
ক্ষেমং বিধাস্যতি স নো ভগবাংস্ত্র্যধীশ-
স্তত্রাশ্মদীয়বিমৃশেন কিয়দ্বিহার্থঃ॥

(ভা ৩।১৬।৩৭)

অতএব যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ আদিপুরুষ, যাঁহার শক্তি যোগমায়াকে যোগেশ্বরগণও অতিক্রম করিতে পারেন না, সেই ত্রিগুণের অধীশ্বর ভগবান্ শ্রীহরি স্বয়ং আমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন, তদ্বিষয়ে আমাদের চিন্তার কোন ফল নাই।

আত্মনিক্ষেপ

'আমি পরিচালিত, আমি পরিচালক নহি; আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী; আমার নিয়ামক আমার হৃদয়ে অবস্থান করিয়া আমাকে যেরূপভাবে নিয়মিত করিতেছেন, আমি সেইরূপই করিতেছি'—এইরূপ অকপট অনুভবের সহিত সর্ব্বপ্রকার স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ। শ্রীপদ্মপুরাণে অষ্টাক্ষর-মন্ত্রের 'নমঃ'-শব্দের ব্যাখ্যায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

অহঙ্কৃতির্ম্মকারঃ স্যান্নকারস্তন্নিষেধকঃ।
তস্মান্ন নমসা কেন্দ্রি-স্বাতন্ত্র্যং প্রতিষিধ্যতে॥
ভগবৎপরতন্ত্রোঽসৌ তদায়ত্তাত্মজীবনঃ।
তস্মাৎ স সামর্থ্যবিধিং ত্যজেৎ সর্ব্বমশেষতঃ॥
ঈশ্বরস্তু সামর্থ্যাল্লভ্যঃ তস্য বিদুষে।
তস্মিন্নাস্তভরঃ শেতে তৎকর্ত্তৈব সমাচরেৎ।

(ভ স, ২৩৬ অনুচ্ছেদ-ধৃত উক্ত পুরাণ-বাক্য)

'নমস্'-শব্দের ম-কার—অহঙ্কার-বাচক এবং ন কার—তাহার নিষেধক; সুতরাং 'নমস্'-শব্দের দ্বারা জীবের স্বাতন্ত্র্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। জীব সর্ব্বতোভাবে ভগবানের অধীন এবং তদধীন জীবন-বিশিষ্ট; সুতরাং নিঃশেষরূপে স্বকীয় সামর্থ্যবিধি পরিত্যাগ করিবে। ঈশ্বরের সামর্থ্যে জীবের কিছুই অলভ্য থাকে না। শ্রীভগবানে নির্ভরতা রাখিয়া চলিবে এবং তাঁহারই সুখকর কর্ম্ম করিবে।

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে উক্ত হইয়াছে,—

অহঙ্কার-নিবৃত্তানাং কেশবো ন হি দূরগঃ।
অহঙ্কারযুতানাং হি মধ্যে পর্ব্বতরাশয়ঃ॥

(ভ স, ২৩৬ অনুচ্ছেদ-ধৃত উক্ত পুরাণ-বাক্য)

শ্রীকেশব অহঙ্কারবিহীন ব্যক্তিগণের নিকট হইতে দূরে নহেন। কিন্তু, শ্রীকেশব ও অহঙ্কারযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে পর্ব্বতরাশির ব্যবধান। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীব্রহ্মকৃত শ্রীনারায়ণ-স্তবে স্বাতন্ত্র্যাভিমানী জীবেরই সংসারের কথা শুনা যায়। স্বতন্ত্রতাই সংসার, আর শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যই ভক্তি। স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগেরই নামান্তর 'আত্মনিক্ষেপ'। শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারায়ণকে স্তব করিয়া বলিতেছেন,—

যাবৎ পৃথক্ত্বমিদমাত্মন ইন্দ্রিয়ার্থ-
মায়াবলং ভগবতো জন ঈশ পশ্যেৎ।
তাবন্ন সংসৃতিরসৌ প্রতিসংক্রমেত
ব্যর্থাপি দুঃখনিবহং বহতী ক্রিয়ার্থা॥

(ভা ৩।৯।৯)

হে পরমেশ্বর, মানব যে কাল-পর্য্যন্ত নিজ দেহাদির সহিত শ্রীভগবান্ হইতে পৃথক্ বলিয়া অভিমান করে, অর্থাৎ 'নিজের বলেই তাহার ইন্দ্রিয়াদি-চালনা হয়' মনে করে, তাহার সম্বন্ধে সে-কাল-পর্য্যন্ত এই সংসার অবাস্তব হইলেও নিবৃত্ত হয় না। সেই ব্যক্তি সংসার-নিবৃত্তির জন্য যাহা করে, সেই সমস্ত ক্রিয়াদ্বারা দুঃখরাশিই ভোগ করিয়া থাকে।

কার্পণ্য

'কার্পণ্য'-শব্দের অর্থ দীনতা বা নিজের অযোগ্যতার তীব্র অনুভূতি হইতে জাত আত্মদৈন্য। আপনাকে অযোগ্যতম, শোচ্যতম, সর্ব্বদোষাকর ও অত্যন্ত অপরাধী অনুভব করিয়া সকাতরে অশ্রুজলাপ্লুত হৃদয়ে নিজের যে অযোগ্যতা অভীষ্টদেবের নিকট জ্ঞাপন, তাহাই 'কার্পণ্য'। যাঁহার যত অযোগ্যতার অনুভূতি তীব্র হয়, প্রণতকরুণ প্রপন্নবৎসল অভীষ্ট-বস্তুকে তিনি তত আকর্ষণ করিতে পারেন। উত্তমোত্তম মহাভাগবতগণ—অভিমর্ত্ত্য দৈন্যের মূর্ত্তি।

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।

(চৈ চ, অ ২০।২২)

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হ'বে নিরভিমান।

(ঐ, ২৫)

প্রেমের স্বভাব, যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে,—'কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ'॥

(ঐ, ২৮)

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি পাই,
'তোমার' করুণা সার।
করুণা না হ'লে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
প্রাণ না রাখিব আর॥

শ্রীযামুনাচার্য্য তাঁহার 'স্তোত্ররত্নে' বলিতেছেন,—

পরমকারুণিকো ন ভবৎপরঃ পরমলোচ্যতমো ন চ মৎপরঃ।
ইতি বিচিন্ত্য হরে ময়ি পামরে, যদুচিতং যদুনাথ তদাচর॥
(স্তবাবলী ৬৪)

গোপ্তৃত্বে বরণ

শ্রীবিষ্ণুকেই গোপ্তা বা পালনকর্ত্তা বলিয়া বরণ। বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ নিজের বিদ্যাবুদ্ধি-পাণ্ডিত্য-ধন-জন-যৌবন-প্রভৃতিকে পালক বলিয়া বরণ করিয়া রাখিয়াছে। তাহারা বিশ্বম্ভর শ্রীবিষ্ণুকে পালনকর্ত্তা বা ভরণপোষণকারী না জানিয়া গচ্ছিত অর্থ, জীবনবীমা, কোম্পানীর কাগজ, স্বর্ণ, ভূমি, পশু ও স্ত্রী-পুত্রাদি পরিজনকে পালনকর্ত্তা অর্থাৎ বিষ্ণুপদে বরণ করিয়াছে। কিন্তু ঐ সকল নশ্বর ও প্রকৃতিজাত বস্তু কখনই মায়াধীশ সর্ব্বপালক শ্রীবিষ্ণু বা বিশ্বম্ভর হইতে পারে না। দেবদেব শ্রীজনার্দ্দনই একমাত্র নিত্যপালক। শ্রীনৃসিংহ-পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি শরণং দেবদেবং জনার্দ্দনম্।
ইতি যঃ শরণং প্রাপ্তস্তং ক্লেশাদুদ্ধরাম্যহম্॥

'হে ভগবন্, দেবদেব শ্রীজনার্দ্দনরূপী আপনাতে আমি শরণাগত হইলাম'—এইরূপে যিনি আমার শরণাগত হন, আমি তাঁহাকে সমস্ত-ক্লেশ হইতে উদ্ধার করি। এই গোপ্তৃত্বে বরণ বা শরণাগতি—দৈহিক, মানসিক ও বাচিক-ভেদে ত্রিবিধ। শ্রীব্রহ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

কর্ম্মণা মনসা বাচা যেঽচ্যুতং শরণং গতাঃ।
ন সমর্থো যমস্তেষাং তে মুক্তিফলভাগিনঃ॥

যাঁহারা কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা শ্রীঅচ্যুতের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, যম তাঁহাদিগের শাসনে সমর্থ হন না, এবং তাঁহারা অনায়াসে মুক্তিফল-ভাগী হইয়া থাকেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উক্ত হইয়াছে,—

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তথা মোদতে শরণাগতঃ॥
(ঐ, ১১শ বিলাস-ধৃত শ্রীবৈষ্ণবতন্ত্র-বাক্য)

শরণাগত পুরুষ বাক্যদ্বারা 'হে ভগবন্ আমি তোমার' —এইরূপ বলিয়া, মনের দ্বারাও সেইরূপ জানিয়া এবং শরীরের দ্বারা শ্রীভগবানের লীলাস্থানাদি আশ্রয় করিয়া আনন্দিত হন।

গোপ্তৃত্বে বরণের আভাসেই মুক্তি অর্থাৎ মায়াবন্ধ হইতে মোচন হয়—

কৃষ্ণ, তোমার হও যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তা'রে করে পার॥
(চৈ চ, ম ২২।৩১)

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম॥
(রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড ১৮।৩৩)

এইরূপ যাঁহার শরণাগতি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না, তাঁহার অতি শীঘ্রই সম্পূর্ণ ফললাভ হয়। আর, যাঁহাদের শরণাগতি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না হয় নাই, তাঁহাদের শরণাগতির পূর্ণতার তারতম্যানুসারে ফলপ্রাপ্তিরও তারতম্য হইবে। যে-সকল সাধক বহু সাধন করিয়াও সিদ্ধি লাভ করিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদের ফললাভ-বিষয়ে বিলম্বের কারণ শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভুও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্ণভাবে ষড়ঙ্গশরণা-গতি উদিত হইলে অবিলম্বেই সিদ্ধি অর্থাৎ প্রেমভক্তি লাভ হয়। আমাদের শরণাগতি হইতেছে না বলিয়াই ফল লাভে এত বিলম্ব হইতেছে। আমরা নানাপ্রকার অনর্থরাশির দ্বারা অভিভূত হইতেছি। শ্রীগুরুকৃপায় কায়-মনোবাক্যে ষড়ঙ্গ শরণাগতির পূর্ণতা যে সাধকের আবির্ভূত হইয়াছে, তাঁহার সিদ্ধি-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু, কোথায়ও শরণাগতির ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা থাকিলে ফল লাভ অবশ্যই বাধিত হইবে। যিনি যতটা শরণাগত হইবেন, তিনি ততটা ফল লাভ করিবেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

ষড়ঙ্গ-শরণাগতি হইবে যাঁহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার॥

শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে এই শরণাগতির অশেষ মাহাত্ম্যের কথা জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছেন,—

ত্বাপন্নয়োপাদিহতস্য ঘোরে, সম্পদ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ।
পশ্যামি নান্যচ্ছরণং তবাঙ্ঘ্রি-দ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ॥
(ভা ১১।১৯।১৯)

হে ঈশ, ঘোর সংসারবর্ত্মে ত্রিতাপোদ্ভিকৃত ও সন্তাপগ্রস্ত

মাদৃশ জীবের তৎকীয় অমৃতবর্ষী পাদপদ্মছত্র-ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় দেখিতে পাইতেছি না। শরণাগতি-ব্যতীত বৈকুণ্ঠবরই সিদ্ধ হয় না, বলিয়া ইহার অপূর্ব মাহাত্ম্য জানিতে হইবে,—

শরণং তং প্রপন্না যে ধ্যান-যোগ-বিবর্জিতাঃ।
তে বৈ মৃত্যুমতিক্রম্য যান্তি তদ্বৈষ্ণবং পদম্॥
(ভ স, ২।১৭ অনুচ্ছেদ-ধৃত পাদ্মোত্তর-বচন)

যাঁহারা সেই শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা পরমাত্মোপাসনরূপ ধ্যানযোগ-ব্যতীতও মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বৈষ্ণবপদ শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন করেন।

শরণাগতি ও আত্ম-নিবেদন

'শরণাগতি' ও 'আত্মনিবেদনে'র মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। ষড়ঙ্গা শরণাগতির অন্যতম অঙ্গ যে আত্মনিক্ষেপ, তাহা হইতেও নবধা ভক্তির অন্যতম আত্মনিবেদনাখ্যা ভক্তির বৈশিষ্ট্য আছে। আবার, 'শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ' (ভা ৭।৫।২৩) ইত্যাদি শ্লোকে 'ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তি-শ্চেন্নবলক্ষণা' বাক্যে 'পুংসার্পিতা' নবধা ভক্তি অর্থাৎ পুরুষ বা সাধক-কর্তৃক সর্বাগ্রে শ্রীবিষ্ণুতে অর্পিতা বা তৎসুখার্থ ভাবিতা হইয়া যে নবলক্ষণা ভক্তিক্রিয়া, তাহার সহিতও আত্মনিবেদন ও আত্মনিক্ষেপের বৈশিষ্ট্য আছে। শরণাগতি-দ্বারা মুক্তি ও প্রেম পর্যন্ত লাভ হয়। কিন্তু প্রেমের মধ্যে যে আবার বৈশিষ্ট্য বা চমৎকারিতা অর্থাৎ প্রেমের মধ্যে যে পরিমাণগত ও স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য বা মাধুর্যানুভব, যেমন —স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব বা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুরাদি সম্বন্ধময় অভিমান—তাহা আত্ম-নিবেদনের দ্বারাই উদিত হয়, যদি সেই আত্মনিবেদনটি অর্থাৎ দেহ হইতে দেহী (নিজদেহ) পর্যন্ত নিবেদনটি শ্রীগুরুকে ভাবের সহিত অর্থাৎ সম্বন্ধময় অভিমানের সহিত ও অভীষ্টবস্তুর সুখানুসন্ধানময় আবেশমূলে সম্পাদিত হয়। আত্মনিবেদনটি শ্রীবিষ্ণুতে অর্পিতা অর্থাৎ ধারিতঃ (ধারণা বা আবেশের সহিত কৃতা) বা শ্রীভগবানেরই সুখানুসন্ধান-মূলে কোন বিশেষ সম্বন্ধ বা কোন বিশেষ অভিমানের সহিত সম্পাদিত হইলেই তাহা ঐরূপ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। আত্মনিবেদনে (১) নিজের জন্য সম্পূর্ণ চেষ্টারাহিত্য ও (২) বিক্রীত পশুবৎ নিজের ভরণ-পালন-চিন্তারাহিত্য —এই লক্ষণদ্বয় প্রকাশিত থাকিবে। গাভী বা অশ্বকে কেহ বিক্রয় করিয়া দিলে যেরূপ ক্রেতাই উহাদিগকে নিজের কার্যে নিযুক্ত করে, উহারা আর বিক্রেতার কার্যে নিযুক্ত হয় না, তদ্রূপ যে দেহ-ইন্দ্রিয়াদির সহিত দেহীকে (আত্মাকে) আত্মনিবেদনের দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মে চিরবিক্রয় করা হয়, সেই দেহ-ইন্দ্রিয়াদি বা দেহী আত্মাকে নিজ নিজের সুখানুসন্ধানমূলক কোন কার্যে নিযুক্ত করেন না অর্থাৎ ধর্মার্থ-কাম-কামনারূপ দেহগত সুখানুসন্ধানে ও মোক্ষকামনারূপ দেহিগত সুখানুসন্ধানে নিযুক্ত করেন না এবং বিক্রীত গো-অশ্ব-প্রভৃতির ভরণ পোষণের জন্য যেরূপ বিক্রেতা কখনও চিন্তা করে না, ক্রেতাই চিন্তা করিয়া থাকে, সেইরূপ আত্মনিবেদনকারী ব্যক্তিও নিজের ভরণ-পোষণের জন্য বিন্দুমাত্রও চিন্তা করেন না।

এই আত্মনিবেদন—ভাব (অভিমান বা রাগ)-শূন্যরূপে একপ্রকার ও ভাব বিশেষ বা সম্বন্ধাভিমানের সহিত আর একপ্রকার। ভাব বা অভিমান-ব্যতীত আত্মনিবেদন সুখৈশ্বর্যোত্তর মুক্তি প্রদান করিতে পারে, কিন্তু তাহা প্রেম দান করিবে না। এই আত্মনিবেদনের মধ্যে যে 'আত্ম'-শব্দ, তাহা ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদ্বাচক অর্থাৎ আত্মার বা ব্রহ্মে নিবেদন, পরমাত্মায় নিবেদন ও শ্রীভগবানে নিবেদন বা অর্পণ বলিতে যে আত্মনিবেদন, তাহা ভাব বা অভিমান ব্যতীত আত্মার্পণ। তাহার ফলে সার্ষ্টি মুক্তি প্রভৃতির লাভ হয়; যথা,—

মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্মা, নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো, ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥
(ভা ১১।২৯।৩৪)

মরণধর্মা মানুষ যখন সমস্ত কর্মফল-কামনা-পরিত্যাগ-পূর্বক আমাতে (ব্রহ্মে, পরমাত্মায় বা ভগবানে) আত্ম-সমর্পণ করে, তখন সেই ব্রহ্মে, পরমাত্মায় বা ভগবানে আত্মসমর্পণকারীর জন্য আমার মনে বিশেষ কিছু করিবার ইচ্ছা হয়, তৎফলে সেই ভক্ত আমার পার্ষদদেহ লাভ করিয়া সার্ষ্টি-প্রভৃতি মুক্তি-লাভের যোগ্য হয়।

শ্রীবিষ্ণুর সমান-ঐশ্বর্য-লাভ বলিতে অণিমাদি ঐশ্বর্যের আংশিক প্রাপ্তিই যুক্তিযুক্ত কারণ, শ্রীভগবানের সমগ্র—সমান ঐশ্বর্য অন্য কাহারও অর্থাৎ কোন মুক্ত জীবের সম্ভব হইতে পারে না। বেদান্তের 'জগদ্ব্যাপারবর্জ্য'-প্রকরণে

(ব্র সূ ২।৩।১৭) নিখিলচিদ্‌চিৎ-সৃষ্টি-স্থিতি-নিয়মনরূপ জগদ্ব্যাপার বা ষড়ৈশ্বর্য্য—একমাত্র ব্রহ্মেই সম্ভব, মুক্ত-জীবের তাহাতে উল্লেখ নাই।

আত্মনিবেদন-ব্যাপারটি পূর্ব্বে অর্পিত অর্থাৎ শ্রীভগবানের সুখানুসন্ধান-আবেশের সহিত কৃত হইলেই, তাহা 'সাক্ষাদ্‌ ভক্তি' হইবে, নতুবা তচ্ছব্দবাচ্য নহে অর্থাৎ কর্ম্মাদি অর্পণ-রূপা পারম্পরিকী বা আরোপসিদ্ধ ভক্তি অর্থাৎ কর্ম্মার্পণ-মাত্র হইয়া থাকে। শ্রীবামনদেবে শ্রীবলির যে অর্পণ, তাহা প্রথমে কর্ম্মার্পণমূলক হইয়াছিল, পরে শ্রীবামনদেবের পাদ-স্পর্শে তাহা সাক্ষাদ্ভক্তিরূপে প্রকাশিত হয়।

"তদানীং সাক্ষাদ্ভক্তেরজাতত্বাৎ শ্রীত্রিবিক্রম-পাদস্পর্শা-নন্তরমেব চ জাতত্বাৎ ন বিরোধঃ।" (শ্রী স. ১৮২ অনু)

শ্রীপ্রহ্লাদ আত্মনিবেদন-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—(ভা ৭।৬।২৬) ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—ইহারা 'ত্রিবর্গ' বলিয়া অভিহিত। ঈক্ষা অর্থাৎ আত্মবিদ্যা, ত্রয়ী অর্থাৎ কর্ম্মবিদ্যা, নয় ও দম অর্থাৎ তর্ক ও দণ্ডনীতি এবং কৃষি-প্রভৃতিরূপা বিবিধ জীবিকা—এই সমস্তই ত্রিগুণাত্মক বেদের প্রতি-পাদ্য; অতএব ইহাদিগকে 'অসত্য' বলিয়াই মনে করি। কিন্তু যদি ইহারা, অন্তর্যামী পুরুষোত্তমে যে আত্মনিবেদন-রূপ ফল, তাহার সাধনভূত হয়, তবেই সার্থক হইতে পারে; নতুবা সমস্তই নিরর্থক।

ভাব, অভিমান বা রাগের পূর্ব্বে রাগানুগা সাধনাবস্থায় ও পরে সাধ্যাবস্থায় আত্মনিবেদন-ভেদে বিবিধ-ভাবযুক্ত আত্মনিবেদন হইয়া থাকে। শ্রীরুক্মিণীদেবীর বাক্যে "আত্মা-র্পিতশ্চ ভবতঃ" (ভা ১০।৫২।৩৯) যে আত্মার্পণের কথা আছে, তাহা আবেশময় ও সম্বন্ধময় অভিমানের সহিত রতির পরে আত্মনিবেদন, ইহার ফল—ভগবন্মাধুর্য্যানুভবরূপ প্রেম-লাভ।

আত্মনিবেদনটি আগে অর্পিতা অর্থাৎ 'তদর্থমেবেদমিতি ভাবিতা' অর্থাৎ 'ইহা অভীষ্টের সুখের জন্য',—এইরূপ অনুসন্ধান বা চিন্তা বা ধ্যানের সহিত এবং সম্বন্ধ বা ভাব-বিশেষের সহিত কৃত হইলেই, তাহা প্রেমের পরিমাণগত ও স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করে। তাহা কেবল বৈধী শরণাগতির দ্বারা হয় না।

মহতের শ্রীপাদপদ্মে তাঁহার সুখানুসন্ধানমূলে আত্ম-নিবেদন, সুখানুসন্ধানাবেশ ও সম্বন্ধাভিমানের সহিত প্রণত-রূপা ও পরিচর্য্যারূপা উপাসনার দ্বারা ভগবন্মাধুর্য্যানুভবরূপ প্রেমলাভ হয়। 'আগে অর্পিতা' বাক্যাংশের দ্বারা পূর্ব্বে সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি ও পরে নবধা-ভক্তির আকার-বিশিষ্ট ক্রিয়া বুঝায়। যে স্থানে ভক্তির আকার-মাত্র আছে, কিন্তু সুখানুসন্ধানাবেশ নাই, তাহা কখনও কর্ম্মকাণ্ড, কখনও বা শাস্ত্রোক্ত আদেশ-পালন-মূলে অনুষ্ঠিত হইলে শ্রীনামাভাস-রূপ কর্ম্মার্পণ হইতে পারে। শরণাগতিটি—মানসিক ব্যাপার, আর আত্মনিবেদনটি – ইঙ্গিত হইতে আরম্ভ করিয়া সিদ্ধদেহ-পর্য্যন্ত শ্রীভগবানে নিবেদন। আত্মনিক্ষেপ দ্বারা—যাহা বৈধী শরণাগতির একতম অঙ্গ, স্বতন্ত্রতা-পরিত্যাগ অর্থাৎ 'আমি অধীন, আমি পরিচালিত, শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণব আমার প্রভু—নিয়ামক, আমি নিত্য বশ্য – নিয়ম্য' এইরূপ মানসিক-ভাব উদিত হয়। শরণাগতির একতম অঙ্গরূপ স্বতন্ত্রতা-মাত্র-পরিহারের দ্বারা মাধুর্য্যানুভব হয় না, তদ্দ্বারা চিত্তশুদ্ধি বা সংসারমুক্তি পর্য্যন্ত হইতে পারে, কিন্তু কোন বিশেষ-সম্বন্ধ বা বিশেষ অভিমানযুক্ত হইয়া অভীষ্ট-বস্তুর সুখানু-সন্ধান মূলে রুচির সহিত যে আত্মনিবেদন, তদ্দ্বারা মাধুর্য্যানু-ভব হয়। কর্ম্মার্পণ বা আরোপসিদ্ধা ভক্তিতে চিত্তশুদ্ধি, সঙ্গসিদ্ধা ভক্তিতে মুক্তি ও ভক্তিমাত্র-কামা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তির শেষ ফল—ধ্রুবানুস্মৃতীহময়ী স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি অথবা আত্ম-নিবেদন, তৎফলে প্রেম ও প্রেমবৈশিষ্ট্য লাভ হয়।

শ্রীগীতার পরতত্ত্বে শরণাগতি পর্য্যন্ত চরম উপদেশ আছে, কিন্তু তাহাতে সাধু হইতে শ্রীগুরুসেবার বৈশিষ্ট্য ও অনন্যভাবা ভক্তির মাহাত্ম্য স্পষ্টভাবে কীর্ত্তিত হয় নাই; একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতেই মহতের পরিচর্য্যা ও সঙ্গরূপা উপাসনার বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীভাগবত-মহতের সেবা ব্যতীত মাধুর্য্যানুভব-বৈশিষ্ট্যের অর্থাৎ প্রেম-ভক্তির স্বরূপগত ও পরিমাণগত বৈশিষ্ট্যের উপলব্ধি হয় না। এজন্য সাধু ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের সুখানুসন্ধান-স্মৃতিময় ভাব, অভিমান বা রাগযুক্ত আত্মনিবেদনরূপ সঙ্গের মাহাত্ম্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

কেহ মস্তিষ্কের বিচারের দ্বারা বুঝা-পড়া করিয়া শরণাগত হইতে পারে না। 'আমার এই পরিমাণ অর্থ গচ্ছিত আছে, অত টাকার জীবন-বীমা আছে, অতটা খাওয়া-পরার সংস্থান বা আখেরের ব্যবস্থা আছে, বা আমার ততটা নাই, আমার অনেক পোষ্য আছে, আমার শরীর অত্যন্ত অপটু বা পটু,

সুতরাং আমি শরণাগত হইতে পারিব না, বা পারিব'—এইভাবে মস্তিষ্কের দ্বারা বিচার করিয়া কেহ কোনদিন শরণাগত হইতে পারে নাই। যাহার তিল তুলে কেহ নাই, যাহার জাগতিক কোনপ্রকার অভাব-অসুবিধা নাই—এইরূপ ব্যক্তিও মস্তিষ্কের দ্বারা বিচার করিয়া শরণাগত হইতে পারেন নাই। আবার যাঁহার অসংখ্য জাগতিক প্রতিবন্ধক আছে, সেরূপ ব্যক্তিও হৃদয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণে স্বরূপশক্তির কৃপাবিশেষে সঞ্চারিত হইয়া অনায়াসে শরণাগত হইয়াছেন। শরণাগতি বৈধী ভক্তি হইলেও উহা মস্তিষ্কের দ্বারা চালিত হইয়া কেহ হৃদয়ে উদয় করাইতে পারে না। শাস্ত্র অশরণাগতকে ভয় ও শরণাগতকে অভয় প্রদান করিয়া জীবকে শরণাগত হইতে প্রলোভিত করেন বটে, কিন্তু স্বরূপশক্তির কৃপাবিশেষের দ্বারা হৃদয় আকৃষ্ট না হইলে কেহ শরণাগত হইতে পারেন না। পৃথিবীর বহির্মুখ ব্যক্তি-মাত্রকেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা কামাদি রিপুর তাড়নায় তাড়িত ও ত্রিতাপের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়াও কামাদি রিপুবর্গেরই আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু একমাত্র শরণ্য পরতত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহে না। ইহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্তে জলন্তরূপে দৃষ্ট হইতেছে। আবার, স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গ ত্যাগ, বিলাস-ত্যাগ, ভূমিশয্যাকাঞ্চন-ত্যাগাদি করিবার অভিনয় করিলেই তাহাকে শরণাগত বলা যায় না, যতক্ষণ না জীব স্বরূপশক্তির কৃপাশক্তি-কৃপান্বিত হইয়া শ্রীহরিকে নিত্য পালনকর্ত্তৃরূপে বরণ করে। অতএব শরণ্য পরতত্ত্বের স্বরূপশক্তির কৃপাবিশেষ যখন হৃদয়ে অবতীর্ণ হন, তখনই জীব সেই কৃপাসঞ্চারিত হইয়া অদ্বিতীয় শরণ্য পরতত্ত্বের শরণ গ্রহণ করে। তাই, শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'শরণাগতি'-গ্রন্থের আরম্ভে গাহিয়াছেন,—

রূপ-সনাতন-পদে দন্তে তৃণ করি'।
ভকতিবিনোদ পড়ে দুই-পদ ধরি'॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে —আমি ত' অধম।
শিখাহে শরণাগতি, করহে উত্তম॥

কর্ম্মকাণ্ড ও কর্ম্মযোগ

কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম

শাস্ত্রবিহিত আচরণকেই 'কর্ম্ম' বলে—'কর্ম্ম খলু শাস্ত্র বিহিতাচরণম্'। শাস্ত্র বিহিত কর্ত্তব্যের অকরণকে 'অকর্ম্ম' বলে—'অকর্ম্ম শাস্ত্র-বিহিতানাচরণম্।' আর, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্যের আচরণকে 'বিকর্ম্ম' বলে—'বিকর্ম্ম তু শাস্ত্র-নিষিদ্ধাচরণম্' ('সারার্থদর্শিনী' ১১।৩।৪৩)।

কর্ম্ম সাধারণতঃ নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য-ভেদে ত্রিবিধ। বেদবিহিত সন্ধ্যা-বন্দনাদি প্রাত্যহিক কর্ত্তব্যকে নিত্যকর্ম্ম (যেমন, 'অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত'—প্রত্যহ যা নিত্য সন্ধ্যার উপাসনা করিবে); পুত্রজন্ম-পিতৃবিয়োগাদি অথবা পাপাদিরূপ নিমিত্ত বা প্রয়োজনার্থ শ্রাদ্ধাদি বা প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ত্তব্যকে নৈমিত্তিক কর্ম্ম, গ্রহণাদি-উপলক্ষে স্নান দানাদিও নৈমিত্তিক কর্ম্ম; পুত্রকামনা, স্বর্গকামনা-প্রভৃতি কামনামূলে যজ্ঞাদি কর্ত্তব্যকর্ম্মকে 'কাম্যকর্ম্ম' বলে (যথা—'স্বর্গকামো যজেত'—স্বর্গকামী যজ্ঞ করিবেন)।

কর্ম্মকাণ্ড কি ?

জীব যখন এই কর্ম্মের ফল স্বয়ং আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করে, তখনই তাহা কর্ম্মবন্ধ বা কর্ম্মকাণ্ডে পরিণত হয়; বেদবিহিত সৎকর্ম্মও তখন বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে। বেদ 'পুত্রকামো যজেত', 'স্বর্গকামো যজেত', অর্থাৎ 'পুত্রাভিলাষী ব্যক্তি যজ্ঞ করিবে, স্বর্গাভিলাষী যজ্ঞ করিবে' প্রভৃতি মন্ত্রে যে কাম্যকর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন, তাহা কেবল 'বিকর্ম্ম' অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধাচরণ ও 'অকর্ম্ম' অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনাচরণ হইতে রক্ষা করিয়া বহির্ম্মুখ জীবকে শাস্ত্র-বিহিত কর্ত্তব্যাচরণে নিয়োগের প্রয়োচনামাত্র। লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা, নিত্যা হি জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা। ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ-সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥

(ভা ১১।৫।১১)

জগতে স্ত্রী সঙ্গ, আমিষ-ভক্ষণ ও মদ্যপান প্রাণিমাত্রের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া এ-বিষয়ে শাস্ত্র-বিধানের আবশ্যক

নাই ; তবে যে 'যথাকালে স্বর্গাদি উপগত হইবে', 'যজ্ঞেশ ভক্ষণ করিবে' ইত্যাদি শাস্ত্রবিধি দেখা যায়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহারা স্ত্রী, মাংস, মদ্যাদি-ব্যতীত অবস্থান করিতে পারে না, তাহাদের জন্যই বৈধ-বিবাহের দ্বারা স্ত্রী-সঙ্গ, যজ্ঞদ্বারা আমিক্ষ-ভক্ষণ ও সৌত্রামণি-যাগের দ্বারা মদ্য-পানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ; তদ্ভিন্ন ঐ সকল বিষয় হইতে সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্তিই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বেদে কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা

বেদের শিরোভাগ উপনিষদে কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দাই শ্রুত হয়,—

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা, অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া, জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি॥
(মুণ্ডক ১।২।৭)

যজ্ঞরূপ প্লব (তরণী) ভবসমুদ্র-উত্তরণের নিমিত্ত দৃঢ় নহে। কেন না, ঐ-সকল যজ্ঞমধ্যে অষ্টাদশ-প্রকারোক্ত কর্ম্ম ভগবদুদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া উহা অপকৃষ্ট। যে-সকল অবিবেকি-ব্যক্তি উহাকেই চরম কল্যাণলাভের উপায় মনে করিয়া উহাতেই আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ, স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া, অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥
(ঐ ১।২।৮)

যাহারা অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া আপনাদিগকে বিবেকী ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই সকল বিপথগামী অজ্ঞ ব্যক্তি অন্ধ-দ্বারা পরিচালিত অপর অন্ধের ন্যায় বিপন্ন হইয়া থাকে।

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে॥ (ঐ. ১।২।৯)

অজ্ঞ ব্যক্তিগণ বহু-প্রকারে অবিদ্যার মধ্যে থাকিয়াই 'আমরা কৃতার্থ হইয়াছি'—এইরূপ অভিমান করে ; যেহেতু তাহারা কর্ম্মী, কর্ম্মে অনুরাগ-বশতঃ প্রকৃত তত্ত্বে অনভিজ্ঞ। এইজন্যই তাহারা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া কর্ম্মফলে যে স্বর্গাদি-লোক লাভ করে, পুণ্য-ক্ষয় হইলে সেই স্থান হইতে চ্যুত হয়।

কেবল-কর্ম্মের নিষ্ফলতা

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু বলেন,—"যজ্ঞতপস্তপস্ত্রিষ্ণ্রে" (ভা ৮।১৩.১৬) ইত্যাদি-শ্লোকের "মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ" ইত্যাদ্যুক্তিন্যায়ের চ কর্ম্মণা তদ্বহির্ম্মুখানাং তু তত্তদপায় এব স্যাদিত্যর্থঃ ; যথা স্মার্ত্তে—"বিষ্ণুভক্তি-বিহীনানাং শ্রৌতাঃ স্মার্ত্তাস্তু যাঃ ক্রিয়াঃ। কায়ক্লেশঃ ফলং তাসাং বৈধিনী-ব্যভিচারবৎ॥" (ভ প, ৯১ অনু)

কর্ম্মানুষ্ঠানে মন্ত্রগত ও সাধনগত বহু ত্রুটী উপস্থিত হয় (ভক্তি. ৮।২৩।১৬) বলিয়া এবং (ভা ১১।৫।২-৩) 'মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ'—এই শ্লোকে শ্রীভগবদ্ভজনের নিত্যত্ব বিধান করা হইয়াছে বলিয়া, শ্রীভগবদ্বহির্ম্মুখ জনগণ কখনও স্বর্গাদি-সুখ বা কোনপ্রকার পুরুষার্থ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। স্কন্দপুরাণে কথিত হইয়াছে যে,—বেদোক্তগণের ব্যভিচার যেমন কায়িক ক্লেশেই পর্য্যবসিত হয়, সেইরূপ শ্রীবিষ্ণুতে ভক্তিহীন জনগণ যে-সমস্ত বেদোক্ত কিংবা স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তৎসমুদয় কেবল কায়িক ক্লেশেই পর্য্যবসিত হয়। ভক্তির সাহায্য-ব্যতীত কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হয় না। কেবল কর্ম্মানুষ্ঠানের পরিশ্রমই তাহাদের সার হইয়া থাকে।

কর্ম্মকাণ্ডের ফলের অনিশ্চয়তা, বৈগুণ্য-বাহুল্য ও ক্লেশের কথা শাস্ত্রে সর্ব্বত্র শ্রুত হয়। শ্রীনৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ শ্রীসূত গোস্বামীকে বলিতেছেন,—

কর্ম্মণ্যস্মিন্নধ্বরাখ্যে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
• • • • (ভা ১।১৮।১২)

"অস্মিন্ 'কর্ম্মণি'—সত্রে, 'অধ্বরাখ্যে'—অবিধ্বসনীয়ে, বৈগুণ্য-বাহুল্যেন দুষিতং ফলনিশ্চয়াভাবাৎ।"

(ভ প, ৯৮ অনু)

হে মুনিবর ! অনিশ্চয়ফল-জনক এই যজ্ঞানুষ্ঠানরূপ কর্ম্মকাণ্ডের ধূমরাশিতে আমাদের দেহ ধূম্রবর্ণ অর্থাৎ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই কর্ম্ম অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠান—অবিশ্বাস্য ; ইহাতে বহু বিঘ্ন আছে। ভূমিতে বীজাদি রোপণ করিলেই যে অবশ্য ফল-লাভ হইবে, এ-কথা বলা যায় না ; কারণ, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, প্রাণি-গণের উপদ্রব ও নানাপ্রকার দৈব-দুর্ব্বিপাক সর্ব্বক্ষণই ফল-লাভ হইতে কৃষককে বঞ্চিত করিতে পারে ; তদ্রূপ, যজ্ঞ করিলেই যে যজ্ঞের ফল-লাভ হইবে, সে-বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নাই।

কর্ম্মকুশল যাজ্ঞিক বিপ্রগণ তাঁহাদের পত্নীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বাভাবিকী প্রীতি-দর্শনে নিজদিগকে ধিক্কার প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন,—

বিদুষস্ত নস্ত্রিবৃদ্বর্ত্তদ্বিগ্‌ভৃতঃ বিগ্‌বহজ্ঞতাম্ ।
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে ॥

(ভা ১০।২৩।৩৭)

যাহারা শ্রীবিষ্ণুতে বিমুখ, তাহাদের শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ্যজন্ম, তাহাদের ব্রহ্মচর্য্য, তাহাদের বহুদর্শিতায়, তাহাদের কুলে, তাহাদের কর্ম্মে ও দক্ষতায় ধিক্ ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

কর্ম্মত্যাগ, কর্ম্মনিন্দা সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ।
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে ॥

(চৈ চ, ম ৮।২৬৩)

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় গাহিয়াছেন,—

কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায় ।
নানা-যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥

কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবস্থার তাৎপর্য্য

প্রশ্ন হইতে পারে, তাহা হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রকার মহাজনগণ বিপুল কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবস্থা দিলেন কেন ? এরূপ 'মহাজন'-নামে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ দৈবী মায়ার দ্বারাই বিমোহিত । ইহাই ধর্ম্মাচার্য্য শ্রীযম বলিতেছেন,—

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্ ।
ত্বন্মায়য়া জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ ॥

(ভা ৬।৩।২৪)

মনু-প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতৃগণের মতি শ্রীবিষ্ণুর মায়ায় নিশ্চয়ই মোহিত ; সেজন্য তাঁহারা অভিগুহ্য ভাগবতধর্ম্ম জানিতে পারেন নাই । যে-সকল বৈদ্য মৃতসঞ্জীবনী-মহৌষধের কথা জানেন না, তাঁহারাই রোগ-নিবারণের জন্য ত্রিকটুক-নিম্বাদি চিন্তা করিয়া থাকেন ; তদ্রূপ স্বয়ম্ভু-মনু-প্রমুখ যাদব শ্রীভাগবত-ধর্ম্মবেত্তা ও তাঁহাদের অনুসৃহীত সম্প্রদায়ান্তর্গত শ্রৌতপথের অনুসরণকারী ব্যক্তি-ব্যতীত ভার্গবীয় মনু প্রভৃতি মহাজনগণ অতি গুহ্য এই ভাগবতধর্ম্ম না জানিয়া যাদব-যাজিক ব্রতাদি * প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন । পুষ্পস্থানীয় অর্থবাদ-প্রপঞ্চসমূহের দ্বারা মনোহর ত্রয়ীর (ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের) কর্ম্মকাণ্ডে তাঁহাদের মতি অভিনিবিষ্ট হইয়াছে ; অতএব তাঁহারা অগ্নিষ্টোমাদি আড়ম্বরপূর্ণ কর্ম্মকাণ্ডেই শ্রদ্ধার সহিত প্রবৃত্ত হইয়াছেন, শ্রীনাম-কীর্ত্তনাদি শ্রীভাগবতধর্ম্মকে আড়ম্বরহীন অতি সামান্য ক্রিয়াজ্ঞানে তাঁহাদের তৎপ্রতি শ্রদ্ধা হয় নাই । এই পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাকৃত লোকের আড়ম্বরপূর্ণ ব্যাপারেই শ্রদ্ধা হয়, সূক্ষ্মবিষয়ে অশ্রদ্ধা হইয়া থাকে ; এজন্য শ্রীনাম-কীর্ত্তনাদি শ্রীভাগবতধর্ম্মের গ্রাহক জগতে অত্যন্ত দুর্লভ । এ-কারণেই মন্বাদি শাস্ত্র-কর্তৃগণের দ্বারাও শ্রীভাগবতধর্ম্ম উক্ত হয় নাই । যাহার গ্রাহক বেশী, তাহার কথাই তাঁহারা বলিয়াছেন ।

কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তিযোগ

শ্রীভগবান্ মনুষ্যগণের শ্রেয়োবিধান-কামনায় কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—এই ত্রিবিধ যোগের কথা বলিয়াছেন ; তন্মধ্যে কে কোন্ যোগের অধিকারী, তাহাও নির্ণয় করিয়াছেন । (ভ গী, ১১০-১১১ অনু)

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া ।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥

(ভা ১১।২০।৬)

"যোগা উপায়াঃ ; ময়া শাস্ত্রযোনিনা শ্রেয়াংসি মুক্তি-ত্রিবর্গশ্রেয়াংসি, অনেন ভক্তেঃ কর্ম্মত্বঞ্চ ব্যাবৃত্তম্ ।"

• • • •

তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্ ॥

(ভা ১১।২০।৭)

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—শাস্ত্রযোনি আমাদ্বারা মনুষ্যগণের মঙ্গল অর্থাৎ মুক্তিরূপ মঙ্গল, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম—এই ত্রিবর্গ-লাভরূপ মঙ্গল ও ভগবৎপ্রীতিরূপ মঙ্গলের বিধান-কামনায় যথাক্রমে জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগরূপ ত্রিবিধ যোগ কথিত হইয়াছে । ইহা ব্যতীত মঙ্গলের অন্য কোন উপায়

---

* যাদবযাজিকব্রতম্ ; (ব্রাহ্মণহত্যাকারী ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্তবিশেষ ।) যথা, স্মৃতিঃ—'ব্রহ্মহা দ্বাদশাব্দানি কুটীং কৃত্বা বনে বসেৎ । ভৈক্ষাশ্যাত্মবিশুদ্ধ্যর্থং কৃত্বা শবশিরোধ্বজম্ । ভিক্ষাশী বিচরেদ্গ্রামং ষড়্ভির্যদি ন জীর্য্যতি ॥'

নাই। ভক্তি ক্রিয়ারূপা হইলেও কর্ম্মের পৃথগ্‌রূপে উল্লেখ থাকায় ভক্তির কর্ম্মত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে।

'যোগ'-শব্দের তাৎপর্য্য

কেবল জ্ঞান বা কেবল কর্ম্ম বা কেবল ভক্তি না বলিয়া উহাদের সহিত যোগ-শব্দ * সংযুক্ত হইয়াছে। 'যোগ'-শব্দের তাৎপর্য্য শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—

এতাবান্ যোগ আদিষ্টো মচ্ছিষ্যৈঃ সনকাদিভিঃ।
সর্ব্বতো মন আকৃষ্য ময্যদ্ধাবেশ্যতে যথা॥

(ভা ১১।১৩।১৪)

সর্ব্ব-বিষয় হইতে মন আকর্ষণ-পূর্ব্বক অদ্বয় পরতত্ত্ববস্তু আমাতে যথাযথভাবে সাক্ষাদ্রূপে যে আবেশ (স্থিতি), তাহাকেই সনকাদি আমার শিষ্যগণ 'যোগ' বলিয়াছেন। বস্তুতঃ অন্তরে বাহিরে, সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা পরতত্ত্বের স্ফূর্তিই—যোগ।

কেবল কর্ম্মকাণ্ড বা ক্রিয়ার দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত যোগ হয় না। তদ্দ্বারা চিত্ত অধিকতর বিক্ষিপ্ত হয়; তাহাতে পরতত্ত্বের কামনাপূর্ত্তিমাত্রের স্ফূর্তি বা অনুসন্ধান নাই; তাহা নিজের অপস্বার্থ-পূরণের জন্যই কল্পিত, এজন্য চিত্তকে বহির্মুখী করিয়া থাকে; কারণ, জগতের বিষয় বহু; কিন্তু পরতত্ত্ব—অদ্বয়জ্ঞান। এজন্য কর্ম্মকাণ্ডকে সমস্ত শাস্ত্র সমস্বরে নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু কর্ম্মযোগ বা ক্রিয়াযোগ হইতে ভগবৎ-শ্রীত্যাভাসের অনুসন্ধান আরম্ভ হয় বলিয়া তথা হইতে ভাগবত-ধর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছে। সমস্ত বেদ, পুরাণ, পঞ্চরাত্র নৈসর্গিক-কর্ম্মী জীবকে কর্ম্মযোগ বা কর্ম্মার্পণের উপদেশ করিয়াছেন। এই কর্ম্মযোগ—সাক্ষাৎ-সাম্মুখ্য জ্ঞান ও ভক্তির দ্বার। নির্ব্বিশেষ সাক্ষাৎ-সাম্মুখ্যই জ্ঞান, আর সবিশেষ সাক্ষাৎ-সাম্মুখ্যই 'ধ্যানযোগ' ও 'ভক্তিযোগ'-নামে খ্যাত। অতএব, কর্ম্মযোগের দ্বারা গৌণভাবে বা পরম্পরা-ক্রমে শ্রীভগবানের সহিত যোগ হয়। শ্রীগীতায় (২।৪৮) শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥

শ্রীধর-টীকা—"যোগঃ—পরমেশ্বরৈকপরতা, তত্র স্থিতঃ কর্ম্মাণি কুরু, তথা সঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা কেবল-ঈশ্বরাশ্রয়েণৈব কুরু, তৎফলস্য জ্ঞানস্যাপি সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা কেবলমীশ্বরার্পণেনৈব কুরু, যত এবম্ভূতং সমত্বমেব যোগ উচ্যতে সন্দিগ্ধেতরসমাধানরূপত্বাৎ।"

যোগ—পরমেশ্বরৈকপরতা, তাহাতে অবস্থিত হইয়া কর্ম্ম-সমূহ অনুষ্ঠান কর। কিরূপে? সঙ্গ—কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ-ত্যাগপূর্ব্বক অর্থাৎ কেবল পরমেশ্বরের আশ্রয়যুক্ত হইয়াই কর্ম্ম কর। কর্ম্ম ও জ্ঞানফলের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সম হইয়া কেবল ঈশ্বরার্পণ-দ্বারাই কর্ম্ম কর; যেহেতু এবম্বিধ সমত্বকেই সাধুগণ 'যোগ' বলেন; কারণ, উহার দ্বারাই চিত্ত-সমাধান হয়।

"তত্র পরতত্ত্বস্য বৈমুখ্য-পরিহারায় যথাকথঞ্চিৎ সাম্মুখ্য-মাত্রং কর্ত্তব্যত্বেন লভ্যতে। তচ্চ ত্রিধা; (১) নির্ব্বিশেষরূপস্য তদীয়-ব্রহ্মাখ্যাবির্ভাবস্য জ্ঞানরূপম্, (২) সবিশেষরূপস্য চ তদীয়-ভগবদাখ্যাবির্ভাবস্য ভক্তিরূপমিতি দ্বয়ম্; (৩) তৃতীয়ঞ্চ তত্র দ্বয়স্যৈব দ্বারং কর্ম্মার্পণরূপমিতি।"

(ভ স, ১৭০ অনু)

কর্ম্মার্পণ বা কর্ম্মযোগ সাক্ষাৎ-সাম্মুখ্য নহে; তাহা পর-তত্ত্বের দিকে ঘাড়-ফিরান বা মুখ-ফিরান-মাত্র।

কর্ম্মযোগের অধিকারী

এখন কর্ম্মযোগের অধিকারী নির্ণয় করিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

"তেষ্বনির্ব্বিণ্নচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্।"

(ভা ১১।২০।৭)

'যাহারা কামী অর্থাৎ গৃহাশ্রমের কর্ম্মসমূহ পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ এবং দেহ-গেহ-স্ত্রী পুত্রাদিতে অতিশয় আসক্ত, সেইরূপ বিষয়ানুরাগী ব্যক্তিগণের পক্ষে কর্ম্মযোগই (কর্ম্মার্পণই) সিদ্ধিপ্রদ।'

যাহারা এইরূপ কর্ম্মফল-কামী, সেইরূপ অজ্ঞ ব্যক্তি-গণকে কখনও কর্ম্মত্যাগের উপদেশ দেওয়া উচিত নহে; এবং তাহারা যাহাতে বিহিত কর্ম্মের আচরণ করিয়া তাহার ফল শ্রীভগবানে সমর্পণের দ্বারা কর্ম্মযোগী হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে উপদেশ করা কর্ত্তব্য।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥

(গী ৩।২৬)

---

* 'জ্ঞান' ও 'জ্ঞানযোগ' এবং 'ভক্তি' ও 'ভক্তিযোগ'-শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে জ্ঞান ও জ্ঞানযোগ এবং ভক্তি ও ভক্তি-যোগের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য, তাহা বিবৃত হইবে।

অজ্ঞ—অতএব কর্ম্মাসক্তদিগের কর্ম্ম হইতে বুদ্ধিচালনা অর্থাৎ তাহাদের কর্ম্মত্যাগে প্রবৃত্তির উদয় করাইবে না। পরন্তু নিষিদ্ধ হইয়া স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক তাহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে। অজ্ঞগণের বুদ্ধিতে বিচলিত করিলে কর্ম্ম-সমূহে শ্রদ্ধা হ্রাস পাইবে, আবার জ্ঞানেরও উৎপত্তি হইবে না, অতএব উভয়তঃ তাহারা ভ্রষ্ট হইবে।

শ্রীআবির্হোত্র শ্রীনিমি-মহারাজকে বলিতেছেন,—

কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাত্তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ॥
পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥
নাচরেদ্যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিকর্ম্মণা হ্যধর্ম্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ॥
বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥

(ভা ১১।৩।৪৩-৪৬)

কর্ম্ম (শাস্ত্রবিহিত আচরণ), অকর্ম্ম (শাস্ত্রবিহিত অনাচরণ) ও বিকর্ম্ম (শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণ)—এই তিনটির স্বরূপই বেদৈকগম্য; ইহা লোকবাদ নহে অর্থাৎ লোকের মতবাদ বা মনীষা দ্বারা বুঝা যায় না। বেদশাস্ত্র অপৌরুষেয় বলিয়া পণ্ডিতগণও তদ্বিষয়ে মোহগ্রস্ত হন। যে-স্থানে অজ্ঞ উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত বিষয় সংগোপনার্থ অন্য প্রকার করিয়া বলা হয়, তাহাকে 'পরোক্ষবাদ' বলে। পরোক্ষভাবে প্রসঙ্গ করাই বেদের স্বভাব। বেদ কর্ম্মাসক্তি ত্যাগ করাইবার জন্যই কর্ম্মের ব্যবস্থা দিয়াছেন। সন্দেহ হইতে পারে—'বেদ স্বর্গাদি ফলপ্রাপ্তির জন্যই রাশি রাশি কর্ম্ম করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, কর্ম্মাসক্তি ত্যাগ করিবার জন্য ত' আদেশ করেন নাই?' এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য শ্রীআবির্হোত্র বলিতেছেন,—'পিতা যেমন বালককে ঔষধ সেবন করাইবার জন্য মিছরি-প্রভৃতি দ্রব্যদ্বারা প্রলোভিত করিয়া ঔষধ সেবন করান এবং বালককে মিছরি, লড্ডুক-প্রভৃতি দিয়াও থাকেন, বস্তুতঃ তাহার দ্বারাই ঔষধ-পানের প্রয়োজনসিদ্ধি হয় না, কিন্তু আরোগ্যই প্রয়োজন অর্থাৎ মিছরি ও লড্ডুক-দান কিংবা ঔষধ সেবন করানই পিতার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে; ব্যাধি হইতে সম্পূর্ণভাবে নির্ম্মুক্ত করাই পিতার মুখ্য উদ্দেশ্য; তেমনই, বেদও আনুষঙ্গিক ফল-সমূহের কথা উল্লেখ করিয়া প্রলোভনের দ্বারা **কর্ম্মাসক্তি ত্যাগ করাইবার অভিপ্রায়েই কর্ম্ম** করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন।' ইহাতে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কর্ম্মত্যাগই যদি মুখ্য উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে প্রথম হইতেই কর্ম্ম ত্যাগ করুক না কেন? ইহারই উত্তরে শ্রীআবির্হোত্র বলিতেছেন,—'জীব যতদিন পর্য্যন্ত **'অজ্ঞ'** থাকিবে, অর্থাৎ শ্রীভগবানের কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে **'জ্ঞা'** অর্থাৎ **'শ্রদ্ধা'**, বা দৃঢ় বিশ্বাস লাভ না করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে কর্ম্ম করিতে হইবে। যাহার **'জ্ঞা'** অর্থাৎ **শ্রীহরিকথায় দৃঢ় বিশ্বাস নাই,** সে ব্যক্তিই **'অজ্ঞ'**। সেইরূপ যে-ব্যক্তি অজিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ যে-ব্যক্তি ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া ব্রহ্মার (পরমেষ্ঠীর) সুখ-পর্য্যন্ত ভোগে বিরক্ত নহে, তাহাকেও অবশ্যই কর্ম্ম করিতে হইবে। তাই, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

(ভা ১১।২০।৯)

হে উদ্ধব, যে-কাল পর্য্যন্ত জ্ঞানীর পারমেষ্ঠ্য সুখাদিতে নির্ব্বেদ অর্থাৎ অকিঞ্চিৎকর-বুদ্ধির উদয় না হয়, সে-কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর কর্ম্ম করিতে হইবে; আর, আমার কথার প্রতি যে-কাল পর্য্যন্ত আকস্মিক মহৎকৃপাজনিত-শ্রদ্ধা উদিত না হয়, অর্থাৎ **'ভগবৎ-কথাশ্রবণাদি-দ্বারাই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে'—এই দৃঢ় বিশ্বাস যে-কাল পর্য্যন্ত জীবের না হয়, সে-কাল পর্য্যন্তও কর্ম্ম করিতে হইবে।**

শ্রদ্ধা ও বিরক্তি

শ্রদ্ধা ও বিরক্তি—দুইটি পরস্পর নিরপেক্ষা; শ্রদ্ধা বিরক্তির অপেক্ষা করে না, বিরক্তিও শ্রদ্ধার অপেক্ষা করে না। ঐহিক ও পারলৌকিক সমস্ত সুখে বিরক্তির উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞানাভিলাষী অজিতেন্দ্রিয়কে কর্ম্ম করিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে; আর শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে দৃঢ় বিশ্বাস না হওয়া পর্য্যন্ত অজ্ঞকেও কর্ম্ম করিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। পৃথিবীর বহির্ম্মুখ মানবমাত্রই হয় অজিতেন্দ্রিয়, না হয় অজ্ঞ—এই দুইশ্রেণীর মধ্যে পড়িবেই। এই দুই অধিকারী যদি সেই লক্ষণপ্রাপ্ত না হইয়া অর্থাৎ জ্ঞানী ঐহিক ও পারলৌকিক সর্ব্ববিধ সুখ-ভোগে বিরক্তি-পূর্ব্বক

ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত না হইয়া কর্ম্ম ত্যাগ করেন এবং কেহ শুদ্ধচিত্ত অধিকারের অভিমান করিয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে দৃঢ়-শ্রদ্ধার সহিত প্রবৃত্ত না হইয়া কর্ম্ম ত্যাগ করেন, তাহা হইলে বেদবিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠান-হেতু বিকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সেই ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ মৃত্যু ও যাতনা প্রাপ্ত হইবেন। অতএব কর্ম্মত্যাগে অনধিকারী ব্যক্তি-সকলের বেদ-বিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে কোন প্রকারে নিস্তার নাই। যে-কর্ম্মের প্রবোধক-কর্ত্তা—(প্রবর্ত্তক) ঈশ্বর, সেই কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া অনুষ্ঠান করিলেই যথার্থ অনুষ্ঠান করা হয়। অতএব শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন,—'বেদোক্ত কর্ম্ম করিবে, কখনও বেদনিষিদ্ধ কর্ম্ম করিবে না এবং সেই বেদবিহিত কর্ম্মও শ্রীভগবানে তৎফলার্পণ-পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিলে কর্ম্মবন্ধনমুক্ত ঐহিক ও পারত্রিক ভোগে বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্য জন্মিবে।'

আশঙ্কার উত্তর

ইহাতে হৃদয়ে একটি আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে যে, কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কর্ম্মের আসক্তি অবশ্য হইবে এবং সেই কর্ম্মানুষ্ঠান-জনিত একটি ফল-লাভও অবশ্যই ঘটিবে; তাহা হইলে কর্ম্মবন্ধনশূন্য বৈরাগ্য-লাভ হইতে পারে না। এই আশঙ্কার উত্তরে শ্রীব্যাসদেব বলিতেছেন,—'নিঃসঙ্গ' অর্থাৎ অভিনিবেশশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিবে এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা-পালনার্থই ঈশ্বরে কর্ম্ম অর্পণ করিয়া কর্ম্ম করিবে।* অন্য কোনও ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিবে না। ইহাতে একটি প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, শাস্ত্রে যে কর্ম্মের ফলের কথা শুনা যায়, সেই নির্দ্দিষ্ট ফল কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে অবশ্যই ঘটিবে। তাহারই উত্তরে বলিতেছেন,—'না'; একমাত্র ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনের জন্যই অন্য ফলের উদ্দেশ্য-রহিত হইয়া কর্ম্ম করিলে ফলের দ্বারা অভিভূত হইতে হইবে না। তবে যে, শাস্ত্রে ফলের কথা শুনা যায়, তাহা কেবল অন্য ব্যক্তিগণের কর্ম্মে রুচি-উৎপাদনের জন্য, ঔষধ-পান-কালে নির্ব্বোধ বালকদিগকে মিছরি, লাড্ডু-লজেন্স্ (lozenges) প্রভৃতির লোভ-প্রদর্শনের মত বুঝিতে হইবে। তাহার পর, বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকারের উদয় হইলে তাহারা বেদের তাৎপর্য্য সম্যক্ বিচার করিতে পারে। তখনই এই-সকল শ্রুতি আলোচনার বিষয় হইয়া পড়ে—'হে গার্গি! যে-ব্যক্তি এই অক্ষর-ব্রহ্মকে অনুভব না করিয়া এই জগৎ ত্যাগ করে, সে ব্যক্তি কৃপণ।' এই মন্ত্রের দ্বারা অব্রহ্মজ্ঞেরই কৃপণতার কথা শ্রুত হয়। 'সেই এই ব্রহ্মকে ব্রাহ্মণগণ বেদানুবচন-দ্বারা জানিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া থাকেন।' এই সকল শ্রুতির বিচার করিয়া তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন যে, যজ্ঞাদি কর্ম্মের ব্রহ্মজ্ঞানেই পর্য্যবসান বা পরিসমাপ্তি হয়। ইহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া পরতত্ত্বে অর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মেই তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে। এই বিচার হইতে জানা যায় 'স্বর্গকামো যজেত' অর্থাৎ স্বর্গাভিলাষী যজ্ঞ করিবে—ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা স্বর্গগমনার কথা যে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য—যে ব্যক্তি স্বর্গাদি ফল-কামনা করিয়া কর্ম্মার্পণ-পূর্ব্বক কর্ম্ম করেন, তাঁহারই স্বর্গাদি-প্রাপ্তি ফলরূপে উপস্থিত হইবে। "যথাকথঞ্চিৎ কৃতস্য কামনয়াপার্পণে তৎকামস্যাবশ্যকপ্রাপ্তিঃ" (ভ স, ২১৮ অনু)—অর্থাৎ যে-কোনওরূপে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম কামনা-সহকারেও অর্পিত হইলে কামনানুযায়ী ফলের অবশ্য প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তির হৃদয়ে ফলকামনা নাই, কিন্তু ঈশ্বরে ফলার্পণ আছে, তাহার স্বর্গাদি-লাভ ফলরূপে উপস্থিত হইবে না; ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ-সুখে বিতৃষ্ণা, বৈরাগ্য বা নির্ব্বেদময় নিষ্কাম ভাবই তাহাতে স্বতঃই উদিত হইবে। যদি নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠাতাই নৈষ্কর্ম্ম-সিদ্ধি অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ-সুখে নির্ব্বেদ লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে সর্ব্বশক্তিযুক্ত শ্রীভগবানে নিখিলকর্ম্ম-সমর্পণ-দ্বারা শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হইলে যে নিষ্কামভাব লাভ করিতে পারিবেন, এই বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

শুদ্ধ বা কেবলার্চ্চন

নিষ্কামভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা পারলৌকিক ভোগসুখে যে নির্ব্বেদ লাভ করে, তাহা কিন্তু বহুকাল বিলম্বে ঘটিয়া থাকে; পরন্তু যে ব্যক্তি অতি সত্বর সর্ব্ববর্ণাশ্রম ও তদুপলক্ষিত জ্ঞানের পরিণাম-ফল-লাভের চরমফল-স্বরূপ হৃদয়-গ্রন্থি ছেদন ইচ্ছা করেন, তিনি অন্য সমস্ত কর্ম্মই স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চরাত্র-কথিত ও বেদোক্তবিধি অনুসারে শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার সহিত শ্রীকেশবদেবের অর্থাৎ চতুর্ভুজ মহাবিষ্ণুর কেবল অর্চ্চন করিবেন; যাঁহারা শুদ্ধ বা কেবল অর্চ্চনে অধিকারী নহেন, তাঁহারা কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চন করিবেন।

* ভা ১।৫।৩২-৩৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

যাঁহারা একান্তভাবে নিরপেক্ষ অর্থাৎ নিষ্কাম, ফলাকাঙ্ক্ষা-কামনাহীন ও বর্ণাশ্রমের কর্ম্মসমূহ স্বরূপতঃ পরিত্যাগকারী —শাস্ত্রীয় নির্ত্তি-শ্রদ্ধাযুক্ত, তাঁহারাই চতুর্ভুজ মহাপুরুষের শুদ্ধ অর্চ্চনের অধিকারী, কিন্তু যাঁহাদের প্রতিশ্রুত ব্যবহার-চেষ্টা আছে অর্থাৎ যাঁহারা স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-বন্ধু-সমাজ-প্রভৃতির সহিত ব্যবহারিকতায় আসক্ত, আচার-প্রচার বিবাদ (ব্যবহার)—অপলাপাদি বিষয়রক্ষণ-কৌশল বা মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতির দ্বারা বিষয়-রক্ষায় নিপুণ এবং যাঁহারা স্বেচ্ছাচারযুক্ত লোকপরম্পরাগত শ্রদ্ধাযুক্ত অর্থাৎ অন্যলোকের দেখাদেখি যাঁহাদের শ্রীভগবানে লৌকিক আদরমাত্র আছে, বস্তুতঃ তাঁহারা ভক্তি-ভক্ত-মহিম-জ্ঞানহীন এবং সবে মাত্র ভক্তিতে প্রবৃত্ত—এইরূপ বর্ণাশ্রমধর্ম্মরত লৌকিক-শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তিতে কনিষ্ঠাধিকারী স্ত্রী-পুরুষগণের পক্ষে কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চনই ক্রমিকমঙ্গলের উপায়। এইরূপ কর্ম্মমিশ্র বিষ্ণুর্চ্চনের দ্বারা তাঁহারা নিষ্কাম বেদবিহিত কর্ম্মাচরণকারী অপেক্ষাও অধিক শীঘ্র নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি অর্থাৎ কর্ম্মবন্ধন-শূন্য ঐহিক-পারত্রিক ভোগে বৈরাগ্য লাভ করিতে পারিবেন।

কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চন ও তৎফল

সকল বর্ণাশ্রমী স্ত্রী-পুরুষের পক্ষেই শ্রীবিষ্ণুর ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ-কামনামূলক কর্ম্ম-মিশ্র অর্চ্চনের বিধি। ইহার শেষফল—মুক্তি। আর শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধাযুক্ত এবং ফলতঃ ও স্বরূপতঃ যাঁহারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, এইরূপ সাধকের পক্ষে শ্রীবিষ্ণুর শুদ্ধ অর্চ্চনের ব্যবস্থা। এই শুদ্ধ বা কেবল অর্চ্চন অহৈতুক-ভক্তিমূলক। ইহার ফল—বিমুক্তি বা প্রীতি। যাঁহারা ভক্তি-চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন, এইরূপ কনিষ্ঠাধিকারী প্রাকৃত (সবেমাত্র ভক্তি-প্রকৃতি বা স্বভাব আরব্ধ) ভক্ত ও লৌকিক-শ্রদ্ধাযুক্ত স্ত্রী-পুরুষগণের অধিকারে যে কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চন (যাহার ফল—নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি বা সংসারমুক্তিলাভ) তাহা ত্রিবিধ; (১) বৈদিক—যে অর্চ্চনে মন্ত্র ও অর্চ্চনাঙ্গসমূহ বৈদিক (যথা—প্রণবপুটিত মন্ত্র); (২) তান্ত্রিক—যে অর্চ্চনে মন্ত্র ও অর্চ্চনাঙ্গসমূহ তান্ত্রিক (যথা—বীজপুটিত মন্ত্র); (৩) মিশ্র—প্রণব ও বীজ—উভয়-পুটিত (যথা—অষ্টাক্ষর শ্রীনারায়ণ-মন্ত্র)। বৈদিক অর্চ্চনে কেবলমাত্র দ্বিজাতিরই অধিকার এবং তান্ত্রিক ও মিশ্র অর্চ্চনে সকল বর্ণাশ্রমীরই অধিকার। এই তান্ত্রিক অর্চ্চনকে "ক্রিয়াযোগ"ও বলা হয়। সর্ব্বভূতে সম্মান ও আদরযুক্ত হইয়া হৃদয়ে শ্রীবিষ্ণুর প্রীতিকামনা লইয়া সর্ব্ববিধ অর্চ্চনই অত্যাবশ্যক, তবেই নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি ও সংসার-মুক্তি সম্ভব। অন্তর্যামি-দৃষ্টিতে সর্ব্বভূতাদর না থাকিলে অর্থাৎ 'শ্রীবিষ্ণুই প্রত্যেক জীবের জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির পরিচালক হইয়া জীবের অন্তরে বাস করিতেছেন'—এই বিচারে যথাশক্তি ও যথাযথ সকল-ভূতকেই অর্চ্চনকারী ব্যক্তি আদর করিবেন, তবেই তাঁহার অর্চ্চন বা ক্রিয়াযোগের দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি বা সংসারমুক্তি হইবে।

'আমি ও আমার'-বুদ্ধি যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ উক্ত কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চন করিতেই হইবে এবং 'সমস্তই শ্রীবিষ্ণুর জীব ও শ্রীবিষ্ণু-কর্ত্তৃক চালিত হইয়াই আমার নিকট আসিয়াছে' —এই বুদ্ধি থাকিবে। চেতনের বিকাশানুযায়ী সকলকেই মান ও দান দিতে হইবে এবং ইহার ফল—মুক্তি। প্রাণীর মধ্যে মনুষ্য, ব্রাহ্মণ, জ্ঞানী, ভক্ত বা পরমহংস উত্তরোত্তর মান ও দানের শ্রেষ্ঠ পাত্র। পরমহংসের মধ্যে ব্রহ্মানুভবীই —আদি-পরমহংস, আর ভগবদনুভবীই—অন্ত্য-পরমহংস। সুদুর্লভ ভাগ্যক্রমে ইহাকে প্রাপ্ত হইলে নিজের কোন 'স্বত্বগ্রহ' (ভা ৭।১৪।১১) না রাখিয়া সব ছাড়িয়া দিতে হইবে। এইরূপ অধিকারে শ্রীবিগ্রহ শ্রীগিরিধারি-রূপী হইলেও বস্তুতঃ শ্রীগিরিধারীর পূজা হইবে না—শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণেরই অর্চ্চন হইবে। 'শ্রীনারায়ণ ও তদ্ভাবভাবীর আমি দাস'—এই বুদ্ধিতে শ্রীনারায়ণের অর্চ্চন করিতে হইবে; এই অনুষ্ঠানটি শ্রীবিষ্ণুর সম্বোধবিধানমূলক চিন্তাযুক্ত হওয়ায় ইহা শুধু ক্রিয়া নহে—ক্রিয়াযোগ। শ্রীবিষ্ণুপ্রীত্যর্থ-কামনাহেতু এস্থানে মঙ্গলোদয় হয়। কেন-না, কামনা-বাসনা একমাত্র শ্রীবিষ্ণুরই থাকিবে; তিনিই একমাত্র ইচ্ছাময়। জীব স্বতন্ত্রভাবে কামনা, বাসনা বা ইচ্ছা করিলে জীবের অমঙ্গল অনিবার্য্য। তজ্জন্য প্রথমেই নিজ বাসনা ত্যাগ করিয়া কামদেব শ্রীভগবানের সুখ-কামনার চিন্তা বা অনুসন্ধান আবশ্যক। এই কর্ম্মফলত্যাগই—সন্ন্যাস। ইহাই কর্ম্মযোগ, কর্ম্মার্পণ বা সাত্ত্বিকী ভক্তি। কর্ম্মার্পণ ও সাংখ্য-যোগের একই তাৎপর্য্য। কর্ম্মফল-ত্যাগের দ্বারা আসক্তি-ত্যাগ বা চিত্তশুদ্ধি হয়। সাংখ্যযোগের (আত্মানাত্মবিবেকের) দ্বারাও তাহাই হয়।

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ (গী ৫।৫)

শ্রীধরঃ—"সাংখ্যৈঃ জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সন্ন্যাসিভিঃ যৎ স্থানং মোক্ষাখ্যং প্রকর্ষেণ সাক্ষাদবাপ্যতে, তেন কর্ম্মযোগিভিরপি তদেব জ্ঞানদ্বারেণ মুখ্যতোঽবাপ্যত ইত্যর্থঃ; অতঃ সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চৈককলত্বেনৈকং যঃ পশ্যতি, স এব সম্যক্ পশ্যতি।"

সাংখ্যগণকর্ত্তৃক অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণকর্ত্তৃক যে 'মোক্ষ'-নামক পদ প্রকৃষ্টভাবে সাক্ষাৎ লব্ধ হয়, কর্ম্মযোগিগণ জ্ঞানদ্বারে তাহাই লাভ করেন, অতএব সাংখ্য ও যোগকে একফল-দায়ক বলিয়া যে ব্যক্তি একরূপ দর্শন করেন, তিনিই সম্যগ্ দর্শন করেন।

গৃহস্থের ক্রিয়াযোগ

গৃহস্থগণের ক্রিয়াযোগ-সম্বন্ধে শ্রীনারদ শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজকে উপলক্ষ্য করিয়া 'গৃহমূঢ়ধী' ব্যক্তিগণকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যাহারা এই আদেশ পালন না করিবে, তাহারা দেহ-গেহে আসক্ত হইয়া কেবল পুনঃ পুনঃ সংসার-ক্লেশ ভোগ করিতে থাকিবে। শ্রীনারদের উপদেশ এই,—

গৃহেষ্বেবংবিধো রাজন্ ক্রিয়াঃ কুর্ব্বন্ যথোচিতাঃ।
বাসুদেবার্পণং সাক্ষাদুপাসীত মহামুনীন্॥
শৃণন্ ভগবতোঽভীক্ষ্ণমবতার-কথামৃতম্।
শ্রদ্দধানো যথাকালমুপশান্তজনাবৃতঃ॥
সৎসঙ্গাচ্ছনকৈঃ সঙ্গমাত্মজায়াত্মজাদিষু।
বিমুঞ্চেন্মুচ্যমানেষু স্বয়ং স্বপ্নবদুত্থিতঃ॥
যাবদ্বিরেত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি॥
মৃগোষ্ট্রখরমর্কাখু-সরীসৃপখগমক্ষিকাঃ।
আত্মনঃ পুত্রবৎ পশ্যেৎ তৈরেষামন্তরং কিয়ৎ॥
আধাবাদ্যেঽবদায়িভ্যঃ কামান্ সংবিভজেদ্যথা।
অপোকাধাত্মনো দায়াং নৃণাং অন্যগ্রহো যতঃ॥
মহাদ্বধর্থে স্বান্ প্রাণান্ হত্বাত্মু পিতরং গুরুম্।
তত্যাং স্বয়ং ক্রিয়াং মহাদ্বত্তেন হবিষো জিতঃ॥
তস্মাদ্ব্রাহ্মণদেবেষু মর্ত্ত্যাদিষু যথার্হতঃ।
তৈস্তৈঃ কামৈর্যজেবৈনং ক্ষেত্রজ্ঞং ব্রাহ্মণান্নু॥

(ভা ৭।১৪।২ ৪, ৮-৯, ১১-১২, ১৮)

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! গৃহে অবস্থিত হইয়া গৃহস্থ গৃহোচিত যাবতীয়-ক্রিয়াকে ফলসংকল্পরহিত শ্রীবাসুদেবার্পণ যাহাতে হয়, সেইভাবে অনুষ্ঠান করিয়া মহাভাগবতগণকে উপাসনা করিবেন। অপরাহ্ণাদি-কালে অন্যাভিলাষহীন ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সৎসঙ্গ হইতে অমৃতস্বরূপ শ্রীভগবদবতারের কথা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রবণ করিতে করিতে জাগরিত পুরুষ যেরূপ স্বপ্নদৃষ্ট পুত্রাদির সঙ্গ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ স্বয়ং মুচ্যমান দেহ-কলত্র-পুত্রাদিতে ধীরে ধীরে সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। মাত্র যে-পরিমাণ অর্থাদি-দ্বারা উদরপূরণ হয়, ততটুকু অর্থাদিতেই শরীরিগণের অধিকার। ইহা অপেক্ষা অধিক আকাঙ্ক্ষাকারী ব্যক্তি চোর, অতএব দণ্ডার্হ। মৃগ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, মর্কট, মূষিক, সর্প, পক্ষী ও মক্ষিকা-প্রভৃতিকে নিজের পুত্রতুল্য দর্শন করিবে অর্থাৎ যেরূপ পুত্রগণকে ভোজ্যবস্তু ভাগ করিয়া দেওয়া হয়, সেইরূপ ইহাদিগকেও যথোচিত বস্তু ভাগ করিয়া দিবে; যেহেতু পুত্রাদি হইতে ঐ সকল প্রাণীর কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। কুক্কুর, পতিতব্যক্তি ও চণ্ডালাদিকেও যথাযোগ্য ভোগ্যবস্তু বিভাগ করিয়া দিবে। মমতাস্পদ একমাত্র ভার্য্যাকে আত্মসেবায় উপেক্ষা করিয়াও অতিথি-সেবায় নিযুক্ত করিবে। যাহার জন্য পুরুষ আপন প্রাণ পরিত্যাগ করে এবং পিতা ও গুরুকেও হত্যা করে, যে ব্যক্তি সেই স্ত্রীতে স্বত্ব পরিত্যাগ করে, তাহা-কর্ত্তৃক অর্চ্চিত ঈশ্বরও বিজিত হন। অতএব ব্রাহ্মণ, দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের পরে মনুষ্য ও পশু-প্রভৃতি প্রাণীতে যথাশক্তি দ্রব্যাদির দ্বারা সর্ব্বান্তর্যামীর অর্চ্চন করিবেন।

কর্ম্মযোগ, কর্ম্মার্পণ, কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি

পঞ্চরাত্র বা আগম এই ক্রিয়াযোগ বা কর্ম্মযোগের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। বামনাদি পঞ্চরাত্র শ্রীবিষ্ণুর উচ্ছিষ্টের দ্বারা দেবতা, পিতৃ ও ভূতাদির আদরের ব্যবস্থা দিয়াছেন, আর শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রাদি অন্তর্যামিদৃষ্টিতে ভূতাদির প্রতি আদর শিক্ষা দিয়াছেন। এই অন্তর্যামিদৃষ্টিই কর্ম্মের বন্ধন-দোষ নষ্ট করে। এই কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চনরূপ ক্রিয়াযোগই (ক্রিয়া=কর্ম্ম, যোগ=বিষ্ণুভক্তি—শ্রীবিষ্ণুতে কর্ম্মার্পণের দ্বারা যে তাঁহার স্মৃতিযুক্ত হইবার চেষ্টা) কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি। দ্রব্যাদ্যা অর্চ্চন বা মিশ্র-অর্চ্চন সাত্ত্বিকী ভক্তি। ইহার ফলই সংসার-মুক্তি।

কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্।
যজেদ্যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ॥

(ভা ১১।২৫।১০)

কর্ম্ম-পরিহার অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য লইয়া যে ব্যক্তি পরমেশ্বরে কর্ম্মার্পণ করে, অথবা যে ব্যক্তি নিত্য-নৈমিত্তিক যজ্ঞাদি সকল কর্ম্মই নিত্যবিধি-প্রাপ্ত বলিয়া 'পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালনরূপ পরমেশ্বরের পূজা করা কর্ত্তব্য' —এই বুদ্ধিতে পরমেশ্বরকে পূজা করে, কিন্তু ভক্তিতত্ত্ব-জ্ঞানের দ্বারা পরমেশ্বরের পূজা করে না, সেই ব্যক্তি ভক্তি হইতে মোক্ষকেই পৃথগ্ভাবে পুরুষার্থ বলিয়া কল্পনা করায় সেই ব্যক্তি 'সাত্ত্বিক'-নামে কথিত হন। ইহা সগুণা ভক্তি।

কর্ম্মমিশ্র-অর্চ্চনে বর্ণাশ্রমিমাত্রেরই অধিকার আছে,—

এতাবৎ সর্ব্ববর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ সম্মতম্।
স্ত্রীশূদ্রাণাময়ং মন্ত্রো দ্বিজাদীনাং ন তু ক্বচিৎ॥

(ভা ১১।২৭।৫)

হে ভক্তজন-মানস, এই অর্চ্চন বৈদর্ণিকের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের; সর্ব্বাশ্রমীর অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর; এমন কি, স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষেও সর্ব্ববিধ মঙ্গল-সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। শ্রীবিষ্ণুর কর্ম্মমিশ্র-অর্চ্চনের দ্বারা জীবের মঙ্গল (মোক্ষ-লাভ) বা সংসার ধ্বংস হয়; কিন্তু শ্রীবিষ্ণু-ব্যতীত স্বতন্ত্র-পূজা-বুদ্ধিতে অন্যান্য দেবতার অর্চ্চন—কর্ম্মকাণ্ড, তাহা মহাজনগণ নিষেধ করিয়াছেন; কারণ, তদ্দ্বারা সংসার নিবৃত্তি হয় না।

কর্ম্মকাণ্ডীয় দেবতান্তর-ভজন

"কর্ম্মবিশেষরূপং দেবতান্তরভজনমপি (ভা ১১।২।৫) ন কর্ত্তব্যমিত্যাহ—পন্থানঃ। তত্রাপ্যেষাং কা বার্ত্তা, সত্যপি শ্রীভগবত এব গুণাবতারত্বে শ্রীবিষ্ণুবৎ সাক্ষাৎ পরব্রহ্মত্বাভাবাৎ সত্ত্বমাত্রোপকারকত্বাভাবাচ্চ, প্রত্যুত রজস্তমোপকৃষ্টত্বাচ্চ ব্রহ্ম-শিবাবপি শ্রেয়োঽর্থিভির্নোপাস্যাবিত্যত্র যৌ শ্লোকৌ 'পরমাত্মসন্দর্ভে' এবোদাহৃতৌ (ভা ১১।২৩-২৪)—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাস্তৈ-
র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥

শার্ষিণ্যাকাশতো যদ্বত্তমসাপ্তমিতস্ততঃ।
তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যত্ত্রৈকবর্ণকম্॥

সত্ত্বতনোঃ সত্ত্বশক্তেঃ; সত্ত্বাবতারস্য-কর্ম্মপটুত্বং; দারু-স্থানীয়ং তমঃ; ঘৃতস্থানীয়ং রজঃ; অগ্নিস্থানীয়ং সত্ত্বম্; তস্যাক্ত-কর্ম্মস্থানীয়ং ব্রহ্ম; তস্যাকর্ত্তৃ সদাচারস্য সাক্ষাৎ প্রবর্ত্তকঃ, নাস্যতোঽন্যৎ পরব্রহ্মভূতো ভগবানপি সত্ত্ব এবে-ত্যর্থঃ। দেবতান্তর-পরিত্যাগেনাপি ভগবদ্ভক্তৌ সদাচারং প্রমাণয়তি (ভা ১১।২।৫)—

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥

অথ অতো যোগাৎ; অগ্রে পুরা; সন্ত্ব বিশুদ্ধং বিশুদ্ধ-সত্ত্বাত্মমূর্ত্তিং ভগবন্তং প্রাকৃত সত্ত্বাতীতত্বঞ্চ; তত্র বিবৃতং 'ভগবৎসন্দর্ভে' সপ্তদশাধিক-শততমবাক্যাবধৃতং (ভা ১।২।২৪) দ্রষ্টব্যম্। অতো যে ভানমুধর্ত্তয়ন্তে, তে ইহ সংসারে ক্ষেমায় কল্পন্তে।"—(ভ সং, ১৮ অনু)

কর্ম্মবিশেষরূপ দেবতান্তরভজনও যে কর্ত্তব্য নহে, ইহা শ্রীযুত গোস্বামী সাতটি শ্লোকের দ্বারা বলিতেছেন। সেই দেবতান্তরের উপাসনার মধ্যে ইন্দ্রাদি দেবতাগণের উপাসনার কথা দূরে থাকুক, শ্রীভগবানেরই গুণাবতার হইলেও শ্রীবিষ্ণুর মত সাক্ষাৎ পরব্রহ্মের অভাব-হেতু এবং সাত্ত্বিধ্য-মাত্রে সত্ত্বগুণের উপকারকত্ব না থাকায়, প্রত্যুত রজস্তমোগুণের দ্বারা আবৃত হওয়ায় ব্রহ্মা বা শিবও শ্রেয়োঽর্থিগণের উপাস্য নহেন,—এই বিষয়ে পরমাত্মসন্দর্ভেই দুইটী শ্লোকের উল্লেখ করা হইয়াছে,—

'সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি প্রকৃতির গুণ; একই পরমপুরুষ সেই তিনটি গুণযুক্ত হইয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের জন্য রজোগুণে 'ব্রহ্মা', সত্ত্বগুণে 'হরি' ও তমোগুণে 'হর'-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে সত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীহরি হইতেই মানবগণের পরমকল্যাণ লাভ হয়। যেমন, পৃথিবী-বিকার কাষ্ঠ হইতে ধূম, তাহা হইতে উত্থিত অগ্নি, সেই অগ্নিতেই যজ্ঞ-কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে; তেমনই, কাষ্ঠস্থানীয়রূপে তমোগুণ, ধূমস্থানীয়রূপে রজোগুণ, অগ্নি-স্থানীয়রূপে সত্ত্বগুণ, যেহেতু কর্ম্মস্থানীয় ব্রহ্মরূপে উপস্থিত, কাষ্ঠ-অবস্থায় ও ধূমাবস্থায় যেমন যজ্ঞকার্য্য হইতে পারে না, কিন্তু প্রকাশবহুল অগ্নিতেই সাক্ষাৎ যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন হয়, তেমনই কাষ্ঠস্থানীয় তমোগুণে আবৃত শিব হইতে

এবং ধূমস্থানীয় রজোগুণে আবৃত ব্রহ্মা হইতে মানবের পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকাররূপ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। কিন্তু প্রকাশ-বহুল, নাস্তিবামাত্রে সত্ত্বগুণের উপকারক শ্রীবিষ্ণু হইতেই পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকাররূপ পরমকল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে।' 'দেবতান্তর পরিত্যাগ করিয়াও শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি করা কর্ত্তব্য'—এ বিষয়ে নানাচার দেখাইতেছেন —অতএব পূর্ব্বমুনিগণ বিষ্ণুমূর্ত্তি অধোক্ষজ শ্রীবিষ্ণুকেই ভজন করিয়াছিলেন; যাঁহারা সেই সকল মুনিগণের অনুসৃত হইয়া দেবতান্তরের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি করেন, তাঁহারাই পরমকল্যাণ অর্থাৎ ভগবৎ-সাক্ষাৎকাররূপ মঙ্গল-লাভে অধিকারী হইয়া থাকেন।

শ্রীগীতাও (৯।২৩) শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যে-সকল লোক যজ্ঞে ইন্দ্রাদি অপর দেবতার যজন করে, তাহারাও আমারই সেবা করে, ইহা সত্য; কিন্তু যেহেতু, অবিধির সহিত—মোক্ষের প্রাপক বিধি ছাড়িয়া যজ্ঞ করে, এই জন্য তাহারা পুনর্বার সংসার-দশা লাভ করে। অতএব স্বতন্ত্র-ঈশ্বর-বুদ্ধিতে দেবতান্তরের পূজা বা অর্চ্চন কর্ম্মকাণ্ড, তাহা কর্ম্মযোগ নহে।

কর্ম্মকাণ্ডে স্বতন্ত্রভাবে দেবতাদিগকে যে বলি বা উপচাররূপ উৎকোচ প্রদান করা হয়, তাহাতে কর্ম্মবন্ধনই বৃদ্ধি হয়। চৌকিদার বা কালেক্টরের হস্তে যে রাজস্ব দেওয়া হয়, তাহা রাজা বা সম্রাটের তহবিলেই জমা দিবার জন্য, তাহা রাজারই ধন। যাঁহারা সর্ব্বেশ্বর সম্রাট্ শ্রীবিষ্ণুর কার্য্যসচিব দেবতাগণকে ইহা জানাইয়া তাঁহাদিগকে বলি প্রদান করেন, অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর প্রীত্যর্থে অন্যান্য দেবতার হস্তে উপহার প্রদান করেন, তাঁহাদিগের উপহার দেবতাগণ আত্মসাৎ করিতে পারেন না। যাহারা কেবল দেবতাদিগকে 'ঘুষ' প্রদান করে, দেবতারা পুনঃ পুনঃ ঘুষ পাওয়ার লোভে সেই সকল বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের সংসারকে চিরস্থায়ী করিয়া রাখে, সুতরাং তাহাদের বন্ধন ঘুচে না। ইহাই কর্ম্মকাণ্ডে দেবতারাধনা। কর্ম্মকাণ্ডীয় বর্ণাশ্রমে কর্ম্মার্পণেরই প্রয়োজন; আর, বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়া শ্রীবিষ্ণুতে ফলার্পণ অর্থাৎ ফলকামনা-ত্যাগে প্রয়োজনরূপে মুক্তিলাভ হয়। কর্ম্মার্পণে কামনাত্যাগ ও পাপত্যাগ আছে; কর্ম্মার্পণে যে বিষ্ণুর সন্তোষবিধানের চেষ্টা, তদ্দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। কর্ম্মার্পণের দ্বারা জ্ঞানের অধিকার হয়, ভক্তির অধিকার হয় না; একমাত্র ভক্তের কৃপায় ভক্তি-লাভ হয়। কর্ম্মার্পণ সত্ত্বগুণকে উন্নত করায়; সত্ত্বগুণ ব্রহ্মজ্ঞানের সোপান।

শ্রীবিষ্ণুতে স্বত্ব-ত্যাগকেই 'কর্ম্মার্পণ' বলে; ইহার ফল —মুক্তি। কর্ম্মের ফল আত্মসাৎ করিতে গেলে কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী বিষক্রিয়ায় জীবকে জর্জ্জরিত হইতে হইবে। কিন্তু শ্রীবিষ্ণুতে কর্ম্ম অর্পণ করিলে বা তাহা ক্রিয়াযোগরূপ কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি হইলে কর্ম্মের দ্বারা যে বিষের ক্রিয়া হয়, তাহার নিবৃত্তি হইবে। কর্ম্মকাণ্ড-প্রতিপাদক বেদের শেষ কথা—নৈষ্কর্ম্ম্য বা কর্ম্ম-সন্ন্যাস।

কর্ম্মার্পণ

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে,—কর্ম্মার্পণ বা কর্ম্মযোগ—জ্ঞান ও ভক্তির দ্বার। জ্ঞানি-মহতের কৃপা-লাভ হইলে নির্ভেদ-জ্ঞান; আর, ভক্ত-মহতের কৃপায় দিব্যদৃষ্টি লাভ হইলে কেবলা ভক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে। অতএব **কর্ম্মফলের অর্পণ বা কর্ম্মযোগ নির্গুণা ভক্তির সাক্ষাৎ কারণ নহে; মহতের সঙ্গ বা কৃপাই নির্গুণা ভক্তির এক-মাত্র কারণ।** কর্ম্মার্পণকে 'আরোপসিদ্ধা ভক্তি' বলা যায়। আরোপসিদ্ধা ভক্তির দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়; আরোপ-সিদ্ধা ভক্তি লৌকিকী শ্রদ্ধা হইতে আরম্ভ হয়; এইজন্য ইহা সগুণা।

যে-স্থানে ফলত্যাগ, সে-স্থান হইতেই শ্রীভগবানের কৃপার আভাস আরম্ভ হইল। এই জন্য কর্ম্মার্পণ হইতেই ভাগবত-ধর্ম্মের আরম্ভ। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৩।৮।৮) শ্রীপরাশর বলিতেছেন,—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তোষকারণম্॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু—এই চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের আচার-পালনপর পুরুষের দ্বারা পুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণু আরাধিত হন। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-বিরোধী অন্য কোন পথই সেই শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির কারণ হয় না।

বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়া যে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনার কথা বলা হইয়াছে, তাহা বিষ্ণুর আরাধনাভাস বা প্রীতির আভাস;

মুখ্য বা সাক্ষাৎ আরাধনা বা প্রীতি নহে। এই স্থান হইতেই শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম আরম্ভ হইল। এইজন্য শ্রীশ্রীগৌর-রামানন্দ-সংবাদে ইহাই সাধন বা অভিধেয়ের সর্ব্বপ্রথম স্তর। এই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, কর্ম্মার্পণ, কর্ম্মমিশ্র বিষ্ণুস্মরণ বা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি হইতেই সেবন সদাচারণের আরম্ভ।

শঙ্করাচার্য্যই কর্ম্মার্পণ বা আরোপসিদ্ধা ভক্তি বা ক্রিয়াযোগের কথা আছে। শঙ্করমতে অহৈতনা ভক্তির কথা দূরে কথাই আছে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু 'শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভে' শ্রীমদ্ভাগবতের (১।৩৮) নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

কৃতীয়ং তদ্বিদর্গায় নৈষ্কর্ম্ম্যায়েত্যপেতা যঃ।
তত্র সাত্বততন্ত্রত্বাচ্চ নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মণাং যতঃ॥

তদ্বিসর্গমুপেত্য, তত্রাপি সেবাধিকারায়ত্বমুপেত্য ; সাত্বতং বৈষ্ণবং তন্ত্রং পঞ্চরাত্রাগমম্ ; কর্ম্মণাং **কর্ম্মাকারেণাপি** সতাং শ্রীভগবদ্বন্ধনার্থানাং, যতস্তন্ত্রান্তরৈর্ম্মাং কর্ম্মবন্ধমোচকত্বেন কর্ম্মভ্যো নির্ণীতত্বং, তেভ্যো **ভিন্নত্বং প্রতীয়তে** ইতি শেষঃ।"

(ক্র স, ৯ অনু)

সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় অবতারে ঋষিগণের মধ্যে শ্রীনরনারায়ণরূপে আবির্ভূত হইয়া কর্ম্মসমূহের নৈষ্কর্ম্ম্য-বিধানের জন্য সাত্বততন্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সাত্বত—বৈষ্ণবতন্ত্র—পঞ্চরাত্রাগম আগম। কর্ম্ম হইতে জীবের সংসার-বন্ধন হইয়া থাকে ; কিন্তু **শ্রীভগবদ্ধর্ম্মের কর্ম্মের ন্যায় আকার** থাকিলেও তাহা কর্ম্মবন্ধন-মোচক বলিয়া কর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র ; শ্রীনারদ সাত্বততন্ত্রে ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

সকাম দূরে থাকুক, নিষ্কাম কর্ম্মও ভগবদর্পিত না হইলে জীবের সংসার ধ্বংস করিতে পারে না ; এইজন্য শাস্ত্রে সকাম ও নিষ্কাম উভয় কর্ম্মেরই নিন্দা শ্রুত হয়। নিষ্কাম কর্ম্মও সকাম কর্ম্মের ন্যায় ভগবদ্বৈমুখ্যবিশেষ *। ত্যাগও ভোগের ন্যায়ই বিমুখতা, যদি তাহা কৃষ্ণপ্রীতির জন্য না হয়। নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাববর্জ্জিতং, ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্। কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে, ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥

(ভা ১।৫।১২)

শ্রীধরটীকা চ—"নিষ্কর্ম্ম ব্রহ্ম, তদেকাকারত্বান্নিষ্কর্ম্মতারূপং

---

* "সকাম-নিষ্কাময়োর্দ্বয়োরপি কর্ম্মণো নিন্দা, ভগবদ্-বৈমুখ্যবিশেষত্বাৎ"—(ভ স, ২১৭ অনু)

নৈষ্কর্ম্ম্যম্। অজ্ঞাতে জ্ঞানেত্যজ্ঞনমুপাধিস্তন্নিবর্ত্তকং নিরঞ্জনম্ ; এতদুভয়মপি জ্ঞানমচ্যুতে ভাবো ভক্তিস্তদ্বর্জ্জিতং **তেজনমত্যর্থং** ন শোভতে, সম্যক্ অপরোক্ষায় ন কল্পত ইত্যর্থঃ। তদা শশ্বৎ সাধনকালে ফলকালে চ অভদ্রং দুঃখরূপং যৎ কাম্যং কর্ম্ম, যদপ্যকারণমকাম্যং তচ্চোক্তি চকারত্বাদ্যঃ, তদপি কর্ম্ম, ঈশ্বরে নার্পিতঞ্চেৎ, কুতঃ পুনঃ শোভতে ? বহির্মুখত্বেন সত্ত্বশোধকত্বাভাবাৎ।" (ভ স, ২৩ অনু)

"নৈষ্কর্ম্ম্য ও নিরঞ্জন জ্ঞানও যদি শ্রীঅচ্যুতে ভক্তি-(ভাগবতাদি অভিমান) শূন্য হয়, তাহা হইলেই সেই জ্ঞানও অতিশয় শোভা পায় না অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে মোক্ষের কারণ হয় না ; সুতরাং ফলকালে ও সাধনকালে সকল-সময়েই দুঃখময় যে কর্ম্ম, তাহা সকাম হউক, আর নিষ্কাম হউক, যদি শ্রীভগবানে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে তাহা যে মুক্তির কারণ হইবে না, ইহাতে আর সন্দেহ কি ?

নিষ্কর্ম—ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মের সহিত একাকারতা-প্রাপ্ত বলিয়া নিষ্কর্ম্মতারূপ যে জ্ঞান, তাহা নৈষ্কর্ম্ম্য-জ্ঞান, আর অজ্ঞাত অর্থাৎ লিপ্ত হয় ইহার দ্বারা এই ব্যুৎপত্তিতে 'অঞ্জন'-শব্দের অর্থ উপাধি, সেই উপাধি-শূন্য জ্ঞানই 'নিরঞ্জন'। ব্রহ্মের সহিত একাকারতাপ্রাপ্ত ও উপাধিরহিত জ্ঞানও যদি শ্রীঅচ্যুতে ভক্তিশূন্য হয়, তাহা হইলে সম্যক্ অপরোক্ষ-অনুভবের যোগ্যতালাভ করে না। ভক্তিহীন নিরুপাধিক জ্ঞানেরই যখন এইরূপ দুরবস্থা, তাহা হইলে সাধনকালে ও ফলকালে অনুক্ষণ দুঃখরূপ যে কাম্যকর্ম্ম, এমন-কি নিষ্কাম কর্ম্ম, সেই কর্ম্মও যদি ঈশ্বরে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে সেই কর্ম্ম কেমন করিয়া উহার বহির্ম্মুখতা-হেতু সত্ত্বশুদ্ধি করিতে না পারায় শোভা পাইতে পারে ? কাম্য ও নিষ্কাম উভয়বিধ কর্ম্মই যদি পরমেশ্বরে অর্পিত না হয়, তাহা ভগবদ্বহির্ম্মুখতা-দোষদুষ্ট বলিয়া কখনও চিত্ত শোধন করিতে পারে না—ঐহিক ও পারলৌকিক সুখভোগে বিতৃষ্ণা উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না ; অতএব সকাম কর্ম্মই হউক, আর নিষ্কাম কর্ম্মই হউক, যদি শ্রীবিষ্ণুতে তাহা অর্পিত না হয়, তাহা হইলে উভয় কর্ম্মই ভগবদ্বিমুখ। সেইরূপ অর্পিত অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর সহিত যোগ রহিত নিষ্কাম কর্ম্মকেও কর্ম্মযোগ বা ভাগবত-ধর্ম্ম বলা যাইবে না।

অপর পক্ষে বেদবিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম দূরে থাকুক, দৈহিক ও ব্যবহারিক চেষ্টা-সমূহও যদি শ্রীভগবানে অর্পিত

(অর্পণের দ্বারা শ্রীভগবৎপাদপদ্মের যুক্ত) হয়, তাহা হইলে তাহাও কর্ম্মযোগ বা ভাগবতধর্ম্ম হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা, বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ, নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ॥
(ভা ১১।২।৩৬)

শ্রীকবি বলিতেছেন,—'হে রাজন্! জীব জন্মপরম্পরাগত স্বভাবানুসারে কায়, বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, বুদ্ধি ও চিত্তের দ্বারা দৈহিক ও ব্যবহারিক যে সকল কর্ম্মের আচরণ করে, তৎসমস্তই পরমেশ্বর নারায়ণের সেবার উদ্দেশ্যে সমর্পণ করিবে।' যেরূপ বিধিগণ প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মলমূত্র-ত্যাগ, মুখ-প্রক্ষালন, দন্ত-ধাবন, স্নান, দর্শন, শ্রবণ, কথনাদি ব্যাপার-সমূহ বিষয়সুখ-ভোগের জন্যই করে এবং কর্ম্মিগণ যেরূপ সেই-সকল দৈহিক ও ব্যবহারিক কার্য্য দেব-পিত্রাদি-পূজার জন্যই করেন; সেইরূপ, সেই-সকল দৈহিক ও ব্যবহারিক কার্য্য ভগবৎ-সেবার উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হইলে তাহা ভক্তির অঙ্গ হয়। অতএব কেবল যে, শাস্ত্র-বিধি-অনুযায়ী কৃত কর্ম্মই শ্রীনারায়ণে সমর্পণ করিতে হইবে, এইরূপ নিয়ম নহে, স্বভাব-অনুসারে কৃত লৌকিক কর্ম্মও শ্রীভগবানে সমর্পণ করিতে হইবে এবং সেই লৌকিক কর্ম্মও শ্রীভগবানে সমর্পিত হইলে তাহা কর্ম্মার্পণ, কর্ম্মযোগ বা নিম্নস্তর ভাগবতধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইবে।

"লৌকিকস্যাপি কর্ম্মণো ভগবদর্পণাদ্ভাগবতধর্ম্মত্বং দিশতি।"
(ভ স, ৯০ অনু)

কেহ যদি শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির জন্য আমিষভোজন, তাম্র-কূট-সেবন, মাদক-দ্রব্যাদির ব্যবহারাদি লৌকিক স্বভাবগত কার্য্যও পরিত্যাগ করেন, তথাপি তাহাও প্রাথমিক স্তরের ভাগবতধর্ম্ম হইবে।

শ্রীগীতায়ও (৯।২৭) উক্ত হইয়াছে,—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥

স্বভাব-অনুসারে বা শাস্ত্রবিধান-মতে যে-কিছু কর্ম্ম সম্পাদন কর, যাহা ভোজন কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যে তপস্যা বা ব্রতাদি কর, সেই সমস্তই যাহাতে আমাতে অর্পিত হয়, সেইরূপ ভাবেই আচরণ কর।

এইরূপ লৌকিক ও ব্যবহারিক কর্ম্ম শ্রীভগবানে অর্পণের দ্বারা যে ফল-লাভ হয়, তাহা শ্রীভগবান্ বলিতেছেন (গী ৯।২৮),—

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥

এইরূপ আচরণ করিলে কর্ম্ম-নিমিত্ত ইষ্ট বা অনিষ্ট হইতে মুক্ত হইবে, তুমি আমাতে কর্ম্ম সমর্পণ করায় উহার ফলের সহিত তোমার সম্বন্ধ থাকিবে না। অতএব সেই কর্ম্মফল হইতে মুক্ত হইয়া সন্ন্যাসযোগ-যুক্তাত্মা অর্থাৎ আমাতে কর্ম্মের অর্পণরূপ যোগে যুক্তাত্মা—যুক্তচিত্ত হওয়ায় আমাকেই পাইবে।

"ইতঃ পুমান্ প্রাপ্য বুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতঃ" (ভ স, ২১৭ অনু) ইত্যাদি মতেও লৌকিক ও বৈদিক উভয় বিধ কর্ম্মই শ্রীভগবানে সমর্পণ করিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়।

নৈসর্গিক কর্ম্মের অর্পণে নৈসর্গিক দুষ্কৃতের দুইপ্রকার গতি;—(১) অজ্ঞেতরজ্ঞানে-কামীর দুষ্কৃত ও সুকৃত উভয়বিধ কর্ম্মের সমর্পণে ফলের কোন পার্থক্য নাই; জ্ঞানীর পক্ষে পাপ ও পুণ্য উভয়-বিধ কর্ম্মের অর্পণের ফল—সমান; কারণ, তাঁহারা বলেন,—'আমি কর্ম্মের কর্ত্তাও নই, কর্ম্ম-ফলের ভোক্তাও নই; দেহ ও ইন্দ্রিয়ই কর্ম্ম করে এবং উহারাই তাহার ফল ভোগ করে; আমি দেহেন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ নিত্যসিদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত-স্বভাব চৈতন্যস্বরূপ'—এই ভাবনায় তাঁহারা কর্ম্মসমর্পণ করেন বলিয়া, তাঁহাদের পুণ্য ও পাপ-কর্ম্মার্পণের ফল, উভয়-বিধই সমান। আর, যাঁহারা ভক্তি ইচ্ছা করেন, সেইরূপ সাধকগণ বিচার করেন,—'আমার এই দুর্ব্বাসনা-দুঃখ-দর্শনে সেই করুণাময় ভগবান্ আমার প্রতি করুণা করুন, তিনি স্বয়ং কৃপা করিয়া যদি আমার দুর্ব্বাসনা-জনিত দুঃখ দূর না করেন, তাহা হইলে আমার নিজের শক্তিতে উহা দূর করিবার কোনই উপায় নাই।' অথবা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদ-কর্ত্তৃক কথিত,—'অবিবেকী ব্যক্তির বিষয়ের প্রতি যে দৃঢ় প্রীতি, আপনার স্মরণকালে আমার হৃদয় হইতে সেইরূপ প্রীতি যেন কখনও দূরীভূত না হয়।' অথবা শ্রীপদ্মপুরাণে কথিত,—'যুবতীগণের যুবকের প্রতি অথবা যুবকগণের যুবতীর প্রতি চিত্ত যেরূপ আসক্ত হয়, আমার মনও আপনার প্রতি যেন সর্ব্বদা তেমনই অভিরমিত হয়।' অতএব আমার সুকৃত ও

দুষ্কর্ম্মে যে অনুরাগ বর্ত্তমান আছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্বিষয়েই প্রযুক্ত হউক। সকাম মানবের কিন্তু সর্ব্ব-প্রকারেই সর্ব্ব-দুষ্কর্ম্মই সমর্পণ করা কর্ত্তব্য।

বেদবিহিত কর্ম্ম যে ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বেই শ্রীঋষিদেবের উক্তি হইতে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে দেবতাগণ শ্রীঅজিত ভগবানকে স্তব করিয়া বৈদিক কর্ম্মার্পণের প্রশংসাপূর্ব্বক বলিতেছেন,—

ক্লেশদুর্য্যয়দানাদি কর্ম্মাণি বিফলানি বা।
দেহিনাং বিষয়ার্ত্তানাং ন তথৈবার্পিতং ত্বয়ি॥

(ভা ৮।৪।৪৭)

বিষয়ার্ত্তানাং কর্ম্মাণি ক্বচিৎ ক্লেশদুষ্টি যেষু তথাপ্রাপ্তং ফলং যেষু তথাভূতানি ভবন্তি, ক্বচিৎ ক্লেশাদিহং বিফলানি বা ভবন্তি। ত্বয়ার্পিতং কর্ম্মতু ন তথা; কিন্তু ক্লেশং বিনা যথা-কথঞ্চিৎ কৃতস্য কামনয়ার্পণে তৎকামনাবশ্যক-প্রাপ্তিঃ। সা চ সর্ব্বতঃ উৎকৃষ্টা ভবতি। তথা তন্মাত্রফলেন চ পর্য্যাপ্তির্ন ভবতি। সংসার বিধ্বংসাদি-ফলত্বাদিত্যর্থঃ। তদুক্তম্,—

যদনায়াদ মরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কহিচিৎ।
ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥

(ভা ১১।২।৩৪)

ইতি, 'সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাম্' (ভা ৫।১৯।২৬) ইত্যাদি চ,—যতএব নাস্তিঃ শ্রীধ্রুবদেবরূপং ভগবন্তং পুত্র-ত্বেনাপি লেভে।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ (গী ২।৪০)

(ক্র স, ২১৮ অনু দ্রষ্টব্য)

'বিষয়-পীড়িত দেহাভিমানী জীবগণের কর্ম্মসমূহ প্রচুর-ক্লেশ-সাধ্য অথচ অতিঅল্প-ফলযুক্ত, আবার উহা কখনও কখনও কৃষিকার্য্যের মত সম্পূর্ণ বিফলও হইয়া থাকে; কিন্তু হে নাথ! যে কর্ম্ম আপনাতে অর্পিত হয়, সেই কর্ম্ম কিন্তু সেই-প্রকার কষ্টসাধ্য বা বিফল হয় না। পরন্তু, অনায়াসে যে-কোনরূপে অনুষ্ঠিত ঐ কর্ম্ম যদি কামনা-সহ-কারেও আপনাতে অর্পিত হয়, তথাপি সেই কামনানুযায়ী ফলের প্রাপ্তি অবশ্যই হইয়া থাকে। আর, ঐ প্রাপ্তি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপই হয়; বিশেষতঃ কামনানুযায়ী ফল প্রাপ্তিতেই সেই কর্ম্মের পর্য্যাপ্তদান নহে; উহার সংসার-বিধ্বংসাদিরূপ ফলসমূহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।' পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণুতে কর্ম্মার্পণরূপ ভাগবত-ধর্ম্মের দ্বারা সংসার-ধ্বংস-ফল লাভ হয়। এই জন্যই শ্রীকবি বলিয়াছেন,—'হে রাজন্, ভাগবত-ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে মনুষ্য কখনও বিপন্ন হয় না; ক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া এবং শ্রুতি-জ্ঞান ও স্মৃতিজ্ঞানরূপ দুইটী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধাবিত হইলেও তাহার স্খলন বা পতন হয় না।

মনুষ্য কোন বস্তু কামনা করিয়াও শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিলে শ্রীভগবান্ প্রার্থিত বস্তু ত' অবশ্য দান করেনই, বিশেষতঃ প্রাকৃত কাদুক অপ্রাকৃত রসময় শ্রীভগবৎপাদ-পদ্মের আস্বাদ না পাইয়া যে ইতর বস্তুর কামনা করিয়াছিল, সর্ব্বকামনা-পরিপূরক সেই নিজ শ্রীপাদপদ্মবয়ও প্রদান করিয়া থাকেন,—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং, নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা,-মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥

(ভা ৫।১৯।২৬)

সেই-সকল সকাম ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুর নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে শ্রীভগবান্ তাহাদের প্রার্থিত বিষয় প্রদান করিয়া থাকেন সত্য; কিন্তু যে অর্থ হইতে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনার উদয় হয়, সেই অর্থ দান করেন না। যাঁহারা কামনাশান্তি-কারী তাঁহার সেই শ্রীপাদপদ্মবয়ই পাইবার ইচ্ছা না করিয়াও ভজন করেন, তাঁহাদিগকেও তিনি স্বয়ং সেই শ্রীপাদপদ্মবয়ই দিয়া থাকেন। শ্রীমান্ মহারাজ এইরূপেই শ্রীধ্রুবদেব-ভগবান্‌কে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন (ভা ৪।৩।২০ দ্রষ্টব্য)। শ্রীগীতাতে উক্ত হইয়াছে,—'পরমেশ্বরে অর্পিত এই নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের প্রারম্ভেরও নিষ্ফলত্ব নাই। ঈশ্বরোদ্দিষ্ট বলিয়া বিঘ্ন ও বৈগুণ্যাদির অসম্ভবত্বহেতু ইহাতে প্রত্যবায়ও নাই। আরও, ঈশ্বরারাধনার্থ কর্ম্মযোগের স্বল্পও অর্থাৎ আরম্ভমাত্রও সংসাররূপ মহাভয় হইতে রক্ষা করে; কিন্তু কাম্যকর্ম্মের ন্যায় কিছুমাত্র অঙ্গহানি-দ্বারা ইহার নিষ্ফলতা হয় না।

তপস্বিগণ, দানিগণ, মনস্বিগণ, মন্ত্রবিদ্‌গণ, মন্ত্রবিদ্‌-গণ, দানিগণ, মানিগণ, সদাচারিগণ ও কদাচারিগণ—কেহই কর্ম্মার্পণ অর্থাৎ নিজ-স্বাভিমান-পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুতে কর্ম্মার্পণ-ব্যতীত মঙ্গল লাভ করিতে পারে না।

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো, মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং, তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥

(ভা ২।৪।১৭)

গবেষক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক—কেহই তাঁহাদের কর্ম্মের স্বত্বাভিমান-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুতে তত্তৎকর্ম্ম অর্পণ ব্যতীত মঙ্গল-লাভ অর্থাৎ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না।

এই কর্ম্মার্পণের সম্বন্ধে দেবর্ষি শ্রীনারদ তিনটী শ্লোকে বলিতেছেন,—

"এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্॥

(ভা ১।৫।৩৫)

ব্রহ্মন্, হে বেদব্যাস! এতৎ তাপত্রয়স্য চিকিৎসিতং চিকিৎসা তৈস্তাতুর্দ্ধান্তবাসিভিঃ পরমর্ষিভিঃ সুচিতম্; কিমুত? ভগবতি কর্ম্ম যৎ সমর্পিতং ভবতি, তত্র কর্ম্মসমর্পণমেবেত্যর্থঃ; কথম্ভূতে? স্বয়ং ভগবতি—পূর্ণস্বরূপৈশ্বর্য্যাদিস্বরূপা সর্ব্বাংশিন্যেব, কেনচিদংশেন জীবাদিনিষ্ঠত্বেন ঈশ্বরে পরমাত্ম-শব্দবাচ্যে, স্বরূপভূত-বিশেষেণ বিনা কেবলচিন্মাত্র-তয়া প্রতিপাদ্যমানে ব্রহ্মণি—তদ্ধর্ম্ম-বাচ্যে। নন্ন উৎপত্ত্যাদ্যৈ তত্তৎ-সম্বন্ধেন বিহিতত্বাৎ সংসারহেতোঃ কর্ম্মণঃ কথং তাপত্রয়-নিবর্ত্তকত্বম্? উচ্যতে— সামগ্রীভেদেন ঘটত ইতি; যথা—

আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্॥

(ভা ১।৫।৩৩)

হে সুব্রত, যে আময়ো রোগো যেন ঘৃতাদিনা জায়তে, তদেব কেবলমাময়কারণং দ্রব্যং তমাময়ং ন নিবর্ত্তয়তি, কিন্তু চিকিৎসিতং দ্রব্যান্তরৈর্ভাবিতং সৎ নিবর্ত্তয়ত্যেব।

এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে॥

(ভা ১।৫।৩৪)

'পরে' ভগবতি, 'কল্পিতাঃ' কামনয়ার্পিতাঃ সন্তঃ সংসার-ধ্বংসপর্য্যন্তফলত্বাৎ 'আত্মবিনাশায়' কর্ম্মনিবৃত্তয়ে কল্পন্তে।" (ভ স, ২১২-২১ অনু)

হে ব্রহ্মন্! হে বেদব্যাস! আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক—এই তাপত্রয়ের চিকিৎসারূপে সেই চাতুর্ব্বাস্য-বাসী পরমহংসগণ এইরূপ বলিয়াছেন,—সেই চিকিৎসাটি কি? শ্রীভগবানে যে কর্ম্ম সমর্পিত হয়, সেই কর্ম্ম-সমর্পণই ভবরোগের চিকিৎসা। সেই ভগবান্ কি-প্রকার? যিনি স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ পূর্ণস্বরূপ-ঐশ্বর্য্যাদিযুক্ত বলিয়া সকলের অংশী; অংশবিশেষের দ্বারা জীব ও প্রকৃতির নিয়ন্তা বলিয়া 'ঈশ্বর' অর্থাৎ পরমাত্ম-শব্দবাচ্য এবং কোন স্বরূপভূত বিশেষের অভিব্যক্তি না থাকায় যিনি কেবল চিন্মাত্ররূপে প্রতিপাদিত হন বলিয়া 'ব্রহ্ম'-শব্দবাচ্য; ভগবান্, পরমাত্মা ও ব্রহ্ম—এই ত্রিবিধ-প্রতীতিযুক্ত পরতত্ত্বে কর্ম্ম-সমর্পণই ত্রিতাপের চিকিৎসা।

এখানে সংশয় এই যে, সঙ্গল্প বা অভীষ্টসুখ-কামনা-ভিন্ন কর্ম্মপ্রবৃত্তির উদয় হয় না, সংসারের হেতুরূপ সেই কর্ম্মসমূহ কিরূপে ত্রিতাপের নিবৃত্তি করিবে? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন,—সামগ্রী-বিশেষের গুণে তাহা সম্ভবপর হইতে পারে। ঘৃতাদি বস্তুর ভোজনে যে রোগের উৎপত্তি হয়, সেই রোগের জন্মের কারণ স্বরূপ কেবল সেই ঘৃতাদি-দ্রব্যই কখনও উক্ত রোগকে নিবারণ করিতে পারে না; কিন্তু সেই ঘৃতাদি কোন দ্রব্যান্তরের দ্বারা ভাবিত বা শোধিত হইলে সেই রোগ বিনাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ মানবগণের অনুষ্ঠিত সমস্ত ক্রিয়া সংসার-বন্ধনের কারণ-স্বরূপ; আবার সেই-সকল ক্রিয়াযোগই যদি কামনামূলেও শ্রীভগবানে অর্পিত হয়, তাহা হইলে সংসার-ধ্বংস-পর্য্যন্ত ফলপ্রদ বলিয়া কর্ম্ম-নিবৃত্তির কারণ হইয়া থাকে।

কর্ম্মের ফল—বস্তুতঃ ভগবদাশ্রিত; কর্ম্মফলের প্রতি কোন জীবের কোন অধিকার নাই। শ্রীগীতায় (২।৪৭) শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥

হে অর্জ্জুন! তত্ত্বজ্ঞানার্থী তোমার কর্ম্মেই অধিকার থাকুক, বন্ধনের কারণ সেই-সকল কর্ম্মফলে কামনা যেন না হয়।

দুর্ব্বুদ্ধি মানবই কর্ম্মফল আত্মসাৎ করিয়া নিজে ভোগ করিবার চেষ্টা করে বলিয়া তাহার তুচ্ছ-ফল-প্রাপ্তি ও সংসার দুঃখ লাভ হয়। সুধী ব্যক্তিগণ সাক্ষাৎ শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম করেন বলিয়া তাঁহারা কর্ম্মের ফল ও সংসার-মুক্ত, উভয়ই লাভ করিয়া থাকেন। অতএব নিজে ফল আত্মসাৎ না করিয়া পরমেশ্বরে কর্ম্মার্পণকেই কর্ম্মযোগ বা সংসার-মুক্তির কারণ বলা হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয় যে, শ্রীভগবৎকথায় দৃঢ়শ্রদ্ধ নিষ্কাম শুদ্ধভক্ত্যধিকারী মহাভাগবতবর শ্রীভরত যজ্ঞাদি-

কর্ম করিয়াছেন। শ্রীঅম্বরীষাদি মহাভাগবতগণও তাঁহার পিতৃপিতামহগণ যে সকল বেদবিহিত সদাচার পালন বা যজ্ঞাদি-কর্মের অনুষ্ঠান করিতেন, সেইসকল বেদবিহিত কর্মের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। ইহারা কিরূপভাবে বেদ-বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করিতেন?

অঙ্গক্রিয়ানুষ্ঠানের পর বিধিবৎ যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইলে 'স্বর্গ'-নামক যে অপূর্ব্বের উদয় হয়, তাহাই ঐ যজ্ঞাদি ক্রিয়ার ফল। মহারাজ শ্রীভরত—'ঐ-সকল ক্রিয়াফল সাক্ষাৎ-কর্ত্তা পরদেবতা ভগবান্ শ্রীবাসুদেবেই সমর্পিত হইল, উহা শ্রীবাসুদেবেরই প্রীতির নিমিত্ত, যেহেতু শ্রীবাসুদেবই তত্তৎ-দেবতা-প্রকাশক মন্ত্রসমূহের প্রতিপাদ্য ইন্দ্রাদিদেবগণের নিয়ামক'—এইরূপ চিন্তা করিতেন। এইপ্রকার চিন্তারূপ আত্মকৌশলের দ্বারা তাঁহার রাগাদি কষায় ক্ষীণ হইল। যাজ্ঞিক পুরোহিতগণ আহুতি-প্রদানার্থ হবিঃ (অর্থাৎ যজ্ঞ-দ্রব্য) গ্রহণ করিলে ভগবান শ্রীভরত যজ্ঞভাগ-ভাজন ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের চক্ষুঃ, বাহু প্রভৃতি অবয়বরূপে ধ্যান করিতেন; অর্থাৎ, 'ইন্দ্রায় স্বাহা'—এই মন্ত্রে আমি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর বাহু পূজা করিতেছি, 'সূর্য্যায় স্বাহা'—এই মন্ত্রে আমি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর চক্ষুঃ পূজা করিতেছি, এইরূপ চিন্তা করিতেন। (ভা ৫।৭।৮)

'যতদিন আমার কর্ম্মে শ্রদ্ধা অথবা বৈরাগ্যের উদয় না হয়, ততদিন কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য'—শ্রীভগবানের এই বাক্যানুসারে শ্রীভগবৎকর্ম্মার দৃঢ়ব্রত শ্রীভরতের কর্ম্মকর্ত্তৃত্ব ও ফলভোক্তৃত্ব কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? সেইজন্য বলিতেছেন,—'অঙ্গক্রিয়া-অনুষ্ঠানের পর বিধিবৎ যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইলে যে স্বর্গ-নামক 'অপূর্ব্বে'র উদয় হয়, তাহা শ্রীবাসু-দেবেই বর্ত্তমান। ঐ-সকল কর্ম্মের ফলে আমার আসক্তি নাই; উহা শ্রীবাসুদেবের প্রীতির নিমিত্ত শ্রীবাসুদেবেই সমর্পিত হইল'—এইরূপ ভাবনা করিতেন। মীমাংসক-গণের মতে কর্ম্মের ফল যে 'অপূর্ব্ব', তাহা কর্ত্তৃনিষ্ঠ অর্থাৎ তাহা কর্ত্তার উদ্দেশেই ফল প্রদান করে; আর দেবতার আরাধনার নিমিত্ত যে-সকল কর্ম্মের প্রবর্ত্তন হয়, তাহা দেবতানিষ্ঠ। শ্রীভরতের কোন কামনা ছিল না, সুতরাং তাঁহার যজ্ঞাদি কর্ম্ম দেবতা-নিষ্ঠ। সূর্য্য-চন্দ্রাদি-ভেদে বহু দেবতা থাকিলেও মহারাজ শ্রীভরত একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ শ্রীবাসুদেবেই কর্ম্মফল সমর্পণ করিতেন; তাহার কারণ কি? গুরুস্তরে বলিতেছেন,—শ্রীবাসুদেবই একমাত্র যজ্ঞফল-ভোক্তা এবং তিনিই সেই সেই দেবতা-প্রকাশক মন্ত্রের উক্তির অর্থ যে ইন্দ্রাদি দেবতা, তাহাদের নিয়ামক। যজ্ঞাদিতেও শ্রীভরতের কর্ত্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব ছিল না, যেহেতু অন্তর্যামী শ্রীবাসুদেবই সর্ব্বযজ্ঞের প্রবর্ত্তক, সাক্ষাৎ কর্ত্তা ও স্বতন্ত্র পুরুষ। অবশ্য প্রযোজ্যকর্ত্তা যজমানের সাক্ষাৎকর্ত্তৃত্ব নাই*। শ্রীমহাভারতের শান্তিপর্ব্বে শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্রে "যজ্ঞভৃদ্‌যজ্ঞকৃদ্‌যজ্ঞঃ" অর্থাৎ যজ্ঞভৃৎ, যজ্ঞকৃৎ ও যজ্ঞ-প্রভৃতি-শব্দে শ্রীভগবন্নামের উল্লেখ আছে। শ্রীভগবান্ স্বতন্ত্র কর্ত্তা হইলেও জীবের অজ্ঞানবশতই 'আমিই স্বতন্ত্র কর্ত্তা'—এইরূপ মনে হয়, উহাকেই কর্ম্মবন্ধনের কারণ বলিয়া জানিতে হইবে। **কর্ত্তৃত্বাদি-অভিমানশূন্য, কর্ম্ম-ফলত্যাগী ভক্তদিগের প্রতিনিধিদ্বারা সম্পাদিত কর্ম্মকে প্রধানাঙ্গিত্ব-হেতু অকর্ম্ম বা কর্ম্মের**

*প্রযোজক ও প্রযোজ্যকর্ত্তা—প্রযোজক কর্ত্তা অর্থাৎ যিনি মূল কর্ত্তা বা প্রবর্ত্তকরূপে সকল বিষয় যোজনা ও সংঘটন করেন; ক্রিয়ার মূল প্রেরক বা প্রবর্ত্তক। আর মূল প্রবর্ত্তক বা প্রেরকের দ্বারা যিনি প্রযুক্ত হন অর্থাৎ যাহাকে প্রযোগ করা হয়, তিনি প্রযোজ্য কর্ত্তা। মহাবিষ্ণুই মূল-প্রবর্ত্তক—প্রেরক বা প্রযোজক-কর্ত্তা। আধিকারিক দেবতাগণ বা ভগবদ্বিভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ প্রযোজ্য কর্ত্তা। যে যন্ত্র হইতে মূল বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপত্তি হয়, তাহাই কোন মহাসভার বিভিন্ন গৃহে অবস্থিত বৈদ্যুতিক আলোক ও পাখন-যন্ত্রাদির প্রযোজক-কর্ত্তার দৃষ্টান্ত। যদিও মহাসভাস্থলে কোন গৃহবিশেষে 'সুইচ্' (Switch) টিপিবামাত্র আলোকের প্রকাশ হয় দেখিয়া কেহ কেহ সুইচ্‌টিকেই অব্যবহিত আলোকের প্রেরক মনে করিতে পারেন; বস্তুতঃ যেমন পাওয়ার-হাউসের বৈদ্যুতিক শক্তিই মূল প্রেরক; গৃহের সুইচ্‌টি উক্ত মূল-প্রেরকের দ্বারা প্রযুক্ত মাত্র হইয়াই আলোক প্রকাশ করিতে সমর্থ, তদ্রূপ দেবতাগণও বিষ্ণুর দ্বারা প্রেরিত হইয়াই কর্ম্মফল দানে সমর্থ। কিন্তু সূর্য্যাগ্নিবরুণ সাক্ষাদ্ভাবে দেবতাগণকে ফল-প্রদাতৃরূপে দেখিয়া অজ্ঞাদিকেই ফলদাতা মনে হয়। এইজন্যই শ্রীভাগবতের "যথা তরোর্মূলনিষেচনেন" (ভা ৪।৩১।১৪) শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি বিবরণ বলিয়াছেন, "পাষাণকাষ্ঠাদিস্থদেবতা-শ্রীতিনিমিত্তাপি ফলাদি হরিপ্রীত্যা ভবতি। যেন্তঃ তত্তৎ-দেবতারাধনেন হরিরেবারাধিতো ভবতীতি"—যাগ-কর্ম্মদ্বারা তত্তদ্দেবতার প্রীতি উদ্দেশক ফলসমূহ সাধিত হইলেও তৎসমূহও হরিপ্রীতিদ্বারাই সফল হয়। বিষ্ণুর উপাসনা না করিয়া কেবল স্বতন্ত্রভাবে যজ্ঞ দেবোপাসনার কিছুই ফলই লাভ হয় না। এজন্য দেবাদির তৃপ্তি-সাধনার্থ তাৎপর্য্য ও পৃথক্ পৃথক্‌রূপে তাঁহাদের আরাধনা করা কর্ত্তব্য নহে, উহা কর্ম্মজড়। শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষার্থ না হইলে কোনও কর্ম্মই ফলদান করে না। এবিষয়ে তত্তদ্দেবতার উপনিষদের আখ্যায়িকাও প্রমাণ।

করণই জানিতে হইবে। শ্রীগীতায় (১৭।২৮) কথিত হইয়াছে যে, শ্রদ্ধা-রাহিত্যে যে যজ্ঞ, দান, তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা অসৎ। সে-সকল ক্রিয়া ইহকাল ও পরকাল, কোনকালেই উপকার করে না। অতএব শ্রীঅম্বরীষাদি শুদ্ধ-ভগবদ্ভক্তগণ ভগবানের সেবাতেই আত্মকাল যাপন করিতেন, অথচ নিত্য-নিত্তিরহগণ যে সকল সদাচার-পালন ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন, সেই যজ্ঞাদি কর্ম্ম তাঁহারা প্রতিনিধি-দ্বারাই করাইতেন, এইরূপ শ্রবণ করা যায়। অতএব শুদ্ধভক্তগণের প্রতিনিধি-দ্বারা কর্ম্ম-সম্পাদন দূষণীয় নহে।

মহাভাগবতবর শ্রীঅম্বরীষ সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা নবলাভক্তির সকল অঙ্গ যাজন করিয়াও বাজোচিত বেদবিহিত যজ্ঞাদি-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেন। যথা,—(ভা ৯।৪।১৮) এবং সদা কর্ম্মকলাপমাত্মনঃ, পরেঽধিযজ্ঞে ভগবত্যধোক্ষজে। সর্ব্বাত্মভাবং বিদধদ্মহীমিমাং, তন্নিষ্ঠবিপ্রাভিহিতঃ শশাস হ॥

মহারাজ শ্রীঅম্বরীষ সর্ব্বত্র ভগবদ্ভাবযুক্ত স্মরণ-কীর্ত্তন-বন্দন-মার্জ্জনাদি নিজকর্ম্মসমূহ সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা পরতত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণপূর্ব্বক ভগবন্নিষ্ঠ বিপ্রগণের উপদেশানুসারে পৃথিবী পালন করিতেন। যথা,—(ভা ৯।৪।১৭), ইজ্যেঽথযজ্ঞৈরবিভগ্নযোগৈঃ, মহাবিভূত্যোপচিতাঙ্গদক্ষিণৈঃ। তন্তৈর্বসিষ্ঠাসিতগোতমাদিভি,-র্ধন্বক্তিমৎস্রোতমনৌ সরস্বতীম্॥

মহারাজ শ্রীঅম্বরীষ মরুপ্রদেশে সরস্বতী-প্রবাহযুক্ত প্রদেশে অশ্বমেধযজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির আরাধনা করিতেন। ঐ যজ্ঞের অন্ন ও দক্ষিণা মহৎ ঐশ্বর্য্যের দ্বারা রচিত হইত। বসিষ্ঠ, অসিত, গৌতম-প্রভৃতি প্রতিনিধিগণ ঐ যজ্ঞের বিস্তার করিতেন অর্থাৎ মহারাজ শ্রীঅম্বরীষ যজ্ঞাদি-ব্যাপারে আসক্ত না হইয়া স্বয়ং শ্রীহরিভজনে নিযুক্ত থাকিতেন এবং প্রতিনিধি দ্বারা ঐ সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেন।

শ্রীইক্ষ্বাকুর পুত্র শ্রীনৃগ-মহারাজ ও শ্রীঅম্বরীষ-মহারাজের যজ্ঞ দানাদি কর্ম্মের মধ্যে বাহ্য সাম্য থাকিলেও অন্তরনিষ্ঠার ভেদ থাকায় উভয়ের ফল ভিন্ন হইয়াছিল। নৃগ-মহারাজের প্রদত্ত কোন এক ব্রাহ্মণের একটী গাভী পলায়ন-পূর্ব্বক রাজার গরুর পালে মিলিত হইলে তাহা তিনি জানিতে না পারিয়া ঐ গাভীটীকে পুনর্ব্বার অন্য এক ব্রাহ্মণকে দান করেন। দাতার অবিদ্যমান উপস্থিত হইলে নৃগ-মহারাজ ব্রহ্মস্বাপহরণ-পাপফলে যমদূতের দ্বারা যমসদনে নীত হন। যমরাজ নৃগ-মহারাজকে তাঁহার পাপ ও পুণ্যের ফলের মধ্যে কোন্‌টী প্রথম ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে নৃগ তাঁহার পাপফল অত্যল্প জানিয়া উহাই প্রথমে ভোগ করিতে ইচ্ছা করিলে দ্রুতের কোনও উপবনে এক কূপমধ্যে কৃকলাস-যোনি লাভ করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাস্পর্শে কৃকলাস দেহত্যাগ লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি ব্রহ্মণ্যদেবশীল আপনার কর্ম্মনাশী দাস, আমার পূর্ব্বস্মৃতি অদ্যাবধি বিনষ্ট হয় নাই।"

এস্থানে নৃগ ব্রহ্মণ্য ও বদান্যত্ব-অংশে আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের অনুগত বলিয়া অভিমান করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সেবাই তাঁহার একমাত্র পুরুষার্থ হয় নাই। নৃগ শ্রীকৃষ্ণের পরম-ব্রহ্মণ্যত্ব ও বদান্যত্ব শ্রবণ করিয়া তাঁহার দর্শন-বিষয়ে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বিধিত অনুরাগী হন নাই। আপনাতে সেই দুইটী গুণের বিদ্যমানের দ্বারা নৃগে তদংশের প্রকাশিত হইয়াছে এবং নৃগের অন্ত-গতি-প্রাপ্তি হইয়াছে। নৃগের সাধক-দশাতেও শ্রীমদ্-অম্বরীষের ন্যায় সেবাবিরূপ সাক্ষাৎ-ভক্তি আশ্রিত হয় নাই বলিয়া তাঁহার বিঘ্ন উৎপন্ন হইয়াছিল।

নৃগ বহু পুণ্য করিয়াও যমদূতের দ্বারা যমসদনে নীত হইয়াছিলেন; কিন্তু অজামিল বহু পাপের অনুষ্ঠান করিয়াও এক নামাভাসের ফলে যমদূতগণের দ্বারা যমলোকে নীত হন নাই। অতএব কর্ম্মাগ্রহ-ভক্ত অনেক সময় শ্রীভক্তি-দেবীর প্রতি অপরাধ হওয়ায় ভক্তি শুদ্ধ হয় শ্রীঅম্বরীষাদি কিন্তু শ্রীহরি সেবাগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া দান-কর্ম্মাদিতে আগ্রহ-বিশিষ্ট হন নাই। নৃগ সেবাগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া দান-কর্ম্মাদিতে আগ্রহবিশিষ্ট হওয়ায় তাহার বিঘ্ন হইয়াছিল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,—যে ঘৃতাদি দ্রব্য ব্যাধির সৃষ্টি করে, সেই ঘৃতাদি দ্রব্যই যদি দ্রব্যান্তরের সহিত ভাবনাদ্বারা শোধিত হয়, তাহা হইলে সেই ঘৃতাদি দ্রব্যই আবার ব্যাধি-নিবর্ত্তক হইয়া থাকে; তেমনই যে কর্ম্মদ্বারা জীব সংসারে আবদ্ধ হয়, সেই কর্ম্মই শ্রীভগবানে অর্পিত হইলে বিশুদ্ধিতা লাভ করে এবং তাহাতে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। সেই বিশুদ্ধ-চিত্ত মানবের হৃদয়ে শ্রদ্ধাযুক্ত-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিলক্ষণা ভক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। কখন? ভগবান্-শ্রীবাসুদেব—যিনি স্বরূপ ও লীলা-বিলাসে সর্ব্বথা পরিপূর্ণ এবং নিখিল

পাল ও পালয়িতা বিষ্ণুর কারণে বলিয়াও 'শ্রীবাসুদেব'-নামে খ্যাত, যিনি অন্তর্হৃদয়ে যে আকাশ আছে, সেই আকাশেই যে শ্রীভগবানের আবির্ভাব-বিশেষের শব্দের অর্থাৎ অধিষ্ঠান-স্বরূপ, সেই 'শব্দব্রহ্ম'-সংজ্ঞক অন্তর্যামি-স্বরূপে ও নির্বিশেষ-রূপে আবির্ভূত হন বলিয়া যাঁহার চিন্ময়সত্তা 'ব্রহ্ম'-নামে বিখ্যাত, সেই ভগবান্ শ্রীবাসুদেব-স্বরূপে কর্মফলসমর্পণের দ্বারা অধিকতর ভক্তির আবির্ভাব হয়।

কর্ম্মার্পণের প্রকার ও উদ্দেশ্য

সেই পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মার্পণ—দুইপ্রকার (১) ভগবৎশ্রীচরণ-রূপ এবং (২) ভগবানে ত্যাগরূপ। শ্রীকূর্ম্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

শ্রীণাতু ভগবানীশঃ কর্ম্মণানেন শাশ্বতঃ।
করোতি সততং বুদ্ধ্যা কর্ম্মার্পণমিদং পরম্॥

অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান্ এই কর্ম্মের দ্বারা প্রীতি লাভ করুন—এই বুদ্ধিতে যে কর্ম্ম কৃত হয়, সেইটি শ্রেষ্ঠ কর্ম্মার্পণ। অথবা—

যদ্বা ফলানাং সন্ন্যাসঃ প্রকুর্য্যাৎ পরমেশ্বরে।
কর্ম্মণাংতেন্যাহুঃ কর্ম্মার্পণমনুত্তমম্॥

লোক যে পরমেশ্বরে সমস্ত কর্ম্মফল সমর্পণ করে, এই কর্ম্মার্পণ—শ্রেষ্ঠ কর্ম্মফল-সমর্পণ।

সেই কর্ম্মার্পণেরও তিনটি নিমিত্ত অর্থাৎ উদ্দেশ্য বা ফল আছে; প্রথম—কামনা-পূরণ, দ্বিতীয়—নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ কর্ম্মফলত্যাগ বা সন্ন্যাস, তৃতীয়—ভক্তিমাত্র। নিষ্কাম হইয়া কামনামূলক কর্ম্মানুষ্ঠান অসম্ভব। প্রাণীমাত্রে যাহা যাহা করে, তাহা তাহা কামনারই চেষ্টা। এই পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার উদ্দেশ্যের মধ্যে কামনাপূরণ ও নৈষ্কর্ম্ম্যের কর্ম্মার্পণ প্রায়শঃই কাম্য-কর্ম্মত্যাগ; তথায় উভয়ের কর্ম্মার্পণরূপ ভগবৎশ্রীচরণ—সম্বোধের আভাসমাত্র; যেহেতু কামনাপূরণ ও নৈষ্কর্ম্ম্যের ভিতরে স্বার্থপরতা আছে; ভগবৎপ্রীতি বা ভক্তির কিন্তু ভগবৎশ্রীচরণই মুখ্য তাৎপর্য্য; যেহেতু ভক্তির ভগবৎসন্তোষই একমাত্র জীবন। (১) কামনাপ্রাপ্তিতাৎপর্য্যে—ক্লেশ প্রচুর, সাধ্য অল্প অর্থাৎ ফল অল্প অথবা ক্লেশমাত্রই সার হয়, ফল-লাভ হয় না; যেমন কর্দ্দমপ্রজাপতি-অঙ্গ-মহারাজের পুত্রপ্রাপ্তি-কামনায় অনুষ্ঠিত যজ্ঞের ফলে অসৎপুত্র বেণ জন্ম গ্রহণ করায় পৃথা ভ্রম বা অন্ধতার ফল ও ক্লেশ অর্থাৎ অত্যন্ত উদ্বেগই লাভ হইয়াছিল, এইপ্রকার সকাম-কর্ম্মে প্রায়শঃ ফলবৈপরীত্যই ঘটিয়া থাকে; (২) নৈষ্কর্ম্ম্য-নিমিত্তক কর্ম্মের ফল যথা (ভাঃ ১১।৩।৪৬)—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয়্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

'নিষ্কামভাবে যে সব কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরে সমর্পণ করে, সেই জন নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।' অনন্তর নিষ্কামভাবে শ্রীভগবানে কর্ম্ম অর্পণ করিয়া অনুষ্ঠান করার ফলে, যেমন করিয়া ভক্তিলাভ হয়, তাহা শ্রীধ্রুবের দৃষ্টান্তে পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। (ভাঃ ১।৪।৩৫),—

যদ্যত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্॥

অর্থাৎ 'ভগবৎসন্তোষার্থ যে কর্ম্মার্পণ করা হয়, সেই কর্ম্মার্পণের ফলরূপে ভক্তিযোগের অবয়ব-স্বরূপ ও অন্তর্গত-রূপে ভগবজ্জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।' এস্থানে 'জ্ঞান'-শব্দে ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানই বুঝিতে হইবে; যেহেতু যে-জ্ঞানটি—ভক্তিযোগের অবয়ব, সন্ধান অর্থাৎ আশ্রিত, অনুগত বা অন্তর, সেটি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান হইতে পারে না; অতএব এই জ্ঞান—ভগবজ্জ্ঞান। পরমভক্তগণ কিন্তু ভগবৎসুখবিধানরূপ শ্রীত্বুৎপাদনই প্রার্থনা করিয়া থাকেন, যেমন শ্রীপ্রচেতোগণ অষ্টভুজ শ্রীভগবান্‌কে স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন (ভাঃ ৪।৩০।৩৯-৪০),—

যদ্যঃ স্বধীতং গুরবঃ প্রসাদিতা, বিপ্রাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ সদানুবৃত্ত্যা।
আর্য্যা নতাঃ সুহৃদো ভ্রাতরশ্চ, সর্ব্বাণি ভূতান্যনসূয়য়ৈব॥
যদ্যঃ সুতপ্তং তপ এতদীশ, নিয়ন্ধসাং কালমদভ্রমন্যু।
সর্ব্বং তদেতৎ পুরুষস্য ভূম্নো, বৃণীমহে তে পরিতোষণায়॥

হে প্রভো! আমরা যে উত্তমরূপে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, অনুকূল-বৃত্তি-দ্বারা গুরু, বিপ্র ও বৃদ্ধগণকে প্রসন্ন করিয়াছি, মান্যলোক, সুহৃজ্জন ও ভ্রাতৃগণকে যে নমস্কার করিয়াছি, সকল প্রাণীতে অসূয়া পরিত্যাগ করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত জলমধ্যে যে তপস্যাসমূহ করিয়াছি, সেইসমস্ত কর্ম্ম তোমার সন্তোষের নিমিত্ত হউক। হে প্রভো! তুমি—পরম-পুরুষ, তোমার সন্তোষই আমাদের প্রার্থনীয়, তাহাই আমরা প্রার্থনা করি। (ভাঃ স, ২২৪ অনু)

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, জ্ঞানী ও ভক্তের কর্ম্মকাণ্ডে অধিকার নাই; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা

যাবৎ জায়তে।" জ্ঞানী ততদিন পর্য্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবেন, যতদিন পর্য্যন্ত ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ-ভোগে নির্ব্বেদ উপস্থিত না হইবে। সাধক ততদিন পর্য্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবে, যতদিন পর্য্যন্ত আমার কথার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে দৃঢ়বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধার উদয় না হইবে। তবে যে—

শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে।
আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ॥

'শ্রুতি ও স্মৃতি—আমারই আজ্ঞা। যে ব্যক্তি সেই দুই প্রকার আজ্ঞার কোনও একটীকে লঙ্ঘন করে, সেই ব্যক্তি আমার আজ্ঞাচ্ছেদী ও বিদ্বেষী, অতএব আমাতে ভক্তি করিবার অভিনয় করিলেও সে 'বৈষ্ণব' নহে।' শ্রীভগবানের এইরূপ উক্তিতে কর্ম্মত্যাগ জন্য দোষ দুই হয়? তদুত্তরে সিদ্ধান্ত এই যে, সেই দোষ পূর্ব্বোক্ত অধিকারীর পক্ষে ঘটিতে পারে না, যেহেতু "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত"—এই বাক্যটিও শ্রীভগবানেরই সাক্ষাৎ আজ্ঞা। প্রত্যুত যাহাদের নির্ব্বেদ ও শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলেই শ্রীভগবানের আজ্ঞা-লঙ্ঘন হয়। শ্রীধর-স্বামিপাদ "আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্" শ্রীভগবদুক্ত এই শ্লোকের টীকাতে যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতেও তিনি বলিয়াছেন,—"ভক্তিদার্ঢ্যেন নিবৃত্তাধিকারস্তয়া সন্ন্যস্য"—অর্থাৎ নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করিলে চিত্তশুদ্ধিরূপ গুণ এবং অকরণ-জন্য দোষ হইবে জানিয়াও যিনি 'ভক্তিতে দৃঢ়তা-জন্য কর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকারিতা নাই'—এই বোধে সকল নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম সম্যক্ ত্যাগ করিয়া আমাকে ভজন করেন, তিনিও সন্তম অর্থাৎ সাধুশ্রেষ্ঠ। এস্থানে শ্রীধরস্বামিপাদোক্ত নিবৃত্তাধিকার কোন্ অবস্থায় ঘটে, তাহাও শ্রীধরভজন ঋষি শ্রীনিমিমহারাজকে বলিয়াছেন (ভা ১১।৪।৩১),—

দেবর্ষি-ভূতাপ্ত-নৃণাং পিতৃণাং, ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং, গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥

হে রাজন্! যে ব্যক্তি সমস্ত কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে প্রপন্ন-পালক শ্রীমুকুন্দের শরণ গ্রহণ করেন, তিনি দেব, ঋষি, প্রাণী, আপ্তীয়, স্বজন ও পিতৃগণের কিঙ্করও নহেন এবং কাহারও নিকটে ঋণীও নহেন।

এ-স্থানে শ্লোকস্থ 'কর্ত্ত'-পদের অর্থ—কৃত্য অথবা 'কর্ত্ত'-শব্দের অর্থ—'ভেত্ত'; এই অর্থে শ্রীভগবান্ হইতে দেবতা-প্রভৃতির যে স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি, তাহা ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ স্বতন্ত্রবোধে সেই দেবগণের প্রতি আরাধ্যবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি শ্রীমুকুন্দের চরণে একান্তভাবে শরণাগত হইয়াছেন, তাঁহার অন্য কিছু করিবার আবশ্যক নাই—এই অবস্থাকেই নিবৃত্তাধিকার বুঝিতে হইবে; তিনি দেবতা ও ঋষিগণের কিঙ্কর নহেন, কিন্তু একমাত্র শ্রীভগবানেরই কিঙ্কর। শ্রীগরুড়-পুরাণেও এইপ্রকার উল্লেখই দেখিতে পাওয়া যায়।

অয়ং দেবো মুনির্বিদ্বান্ এষ ব্রহ্মা বৃহস্পতিঃ।
ইত্যাখ্যা জায়তে তাবৎ যাবন্নার্চ্চয়তে হরিম্॥

'ইনি দেবতা, ইনি মুনি, ইনি ব্রহ্মা, ইনি বৃহস্পতি, অতএব ইহারা সকলেই আমার বন্দনীয়'—এই প্রকার সংজ্ঞা ততদিন পর্য্যন্তই হইয়া থাকে, যতদিন-পর্য্যন্ত মনুষ্য শ্রীবিষ্ণুকে অর্চ্চন না করে। আরও বিশেষ প্রণিধানের বিষয় এই যে, যদি কোনওপ্রকারে বিকর্ম্ম (শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্যের আচরণ) উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও শরণাগতের প্রায়শ্চিত্তরূপ কর্ম্মান্তর অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু শ্রীমুকুন্দে শরণাগত ব্যক্তির বিকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মিতেই পারে না। যদি কোনওপ্রকারে দৈবাৎ বিকর্ম্ম উপস্থিত হয়, তাহা হইলে শ্রীভগবানের অনুক্ষণ স্মরণ-প্রভাবেই আনুষঙ্গিকভাবে প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধ হইয়া থাকে; কারণ, শ্রীকরভাজনই বলিয়াছেন (ভা ১১।৫।৪২),—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য, ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ, ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥

"যে ব্যক্তি অন্যদেবতার প্রতি ভাবশূন্য হৃদয়ে একমাত্র শ্রীভগবানেই ভক্তিযুক্ত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর পাদমূল ভজন করেন, শ্রীহরি তাঁহার ভক্তকে অত্যন্ত প্রীতি করেন বলিয়া সেই ভক্তের অসাবধানতায়, অনিচ্ছায় কৃত অবশে (প্রকৃতির বশে) যদি বিকর্ম্ম উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও চিত্তাপথে উদিত শ্রীহরিই তাঁহার ভক্তের বিকর্ম্ম বিধূনিত করিয়া থাকেন।

শ্রদ্ধা ও শরণাগতি

যতদিন পর্য্যন্ত শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে শ্রদ্ধার উদয় না হয়, ততদিন পর্য্যন্তই নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবে অর্থাৎ শ্রদ্ধার উদয় হইলে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম ত্যাগ করিবে। এ স্থানেও শ্রদ্ধাকেই কর্ম্মত্যাগের হেতুরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে; আবার "সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যম্"—এই

শ্লোকেও একান্তভাবে শ্রীহরিচরণে শরণাগত ভক্তের পক্ষে কর্মত্যাগের বিধান করা হইয়াছে। অতএব 'শরণাগতি' ও 'ভক্তি'কে একই কার্য্য বলিয়া 'ভক্তি' ও 'শরণাগতি'র এক-তাৎপর্য্যেই বুঝিতে হইবে। 'ভক্তি' ও 'শরণাগতি'র একই অর্থ হওয়া যুক্তিযুক্তই, যেহেতু শাস্ত্রার্থে দৃঢ়বিশ্বাসের নামই 'ভক্তি'। শাস্ত্রও শ্রীভগবানে শরণাগত জনের অভয় ও অশরণাগত জনের ভয় উপদেশ করেন। অতএব শরণাগতির দ্বারাই ভক্তির পরিচয় হইয়া থাকে।

এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, সমস্ত কর্ম ত্যাগ করার পর যদি মধ্যে কোনও অনিবার্য্য বিঘ্নে ভক্তি শুষ্ক হয়, তাহা হইলে একদিকে বিহিত-কর্ম-ত্যাগজন্য অকর্ম উপস্থিত হইল, আর একদিকে ভক্তিও হইল না, তাহা হইলে ত' 'ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ' হইতে হইবে? বস্তুতঃ, এরূপ আশঙ্কাও যুক্তিযুক্ত নহে যেহেতু "ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরে-র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি" (ভা ১।৫।১৭) শ্লোকে স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরির শ্রীচরণকমল ভজন করিতে করিতে অপক্কাবস্থায় সেই ভজন হইতে যদি পতন হয়, তাহা হইলেও ভক্তের অমঙ্গল হইতে পারে না—এইরূপ উল্লেখ থাকায় কর্মত্যাগ-জন্য অনুতাপ যুক্তিযুক্ত নহে।

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য" (গী ১৮।৬৬) এবং "দেবর্ষি-ভূতাপ্ত-নৃণাং"—এই দুই শ্লোকেই শ্রীভগবানের শ্রীচরণে শরণাগত ব্যক্তির সর্বকর্মত্যাগের উপদেশ একইপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ভক্তির আরম্ভেই স্বরূপতঃই কর্মত্যাগ কর্তব্য। "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য" ইত্যাদি শ্লোকের 'পরি'-শব্দের স্বরূপতঃ কর্মত্যাগ-অর্থই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শ্রীগৌতমীয়েও দেখা যায়,—

ন রূপং নার্চনং নৈব ধ্যানং নাপি বিধিক্রমঃ।
কেবলং সততং কৃষ্ণচরণাম্ভোজ-ভাবিনাম্॥

যাঁহারা সতত শ্রীকৃষ্ণচরণকমল চিন্তা করেন, তাঁহাদের পক্ষে রূপ, অর্চন, ধ্যান ও বিধিক্রমের কোনও অপেক্ষা নাই। শ্রীভগবদ্গীতায় (১৮।৬৫) 'হে অর্জুন, তুমি আমাতে চিত্তসমর্পণ কর, আমার ভক্ত ও আমার ভজন-পরায়ণ হও এবং আমাকে নমস্কার কর'—ইত্যাদি শ্লোকেও শ্রীভগবান্ অনন্য ভক্তিই উপদেশ করিয়াছেন। সেই প্রকার শ্রীবিষ্ণু-পুরাণেও ঔর্ব্বমুনিকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীপরাশর শ্রীমৈত্রেয় ঋষিকে বলিয়াছেন,—"হে মৈত্রেয়! সেই শ্রীভগবান্ যজ্ঞেশ, অচ্যুত, গোবিন্দ, মাধব, অনন্ত, কেশব, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, হৃষীকেশ —কেবল এই-সকল নাম উচ্চারণ করিলেন, অন্যান্যেও অন্য কিছুই বলিতেন না।'

এই প্রমাণে অন্য কোনও বচনান্তরের অবকাশই ছিল না; সুতরাং সেই-সেই বচনদ্বয়ে কর্মান্তরপরিত্যাগ স্বতঃই স্বীকৃত হইয়াছে। সেই রাজর্ষি কোনওপ্রকারে কিছু করিলেও শ্রীনামের সহিতই করিতেন; সকল একমাত্র শ্রীনাম ও শ্রীনামীর প্রতি দৃষ্টি বা অনুসন্ধান-নিবন্ধন শুদ্ধ-ভক্তিই স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীপদ্মপুরাণেও কথিত হইয়াছে,—

সর্বধর্মোজ্ঝিতা বিষ্ণোর্নামধ্যাত্রৈকজল্পকাঃ।
সুখেন যান্তি পরমং যান্তি ন তাং সর্বেঽপি ধার্মিকাঃ॥

সর্বধর্ম ত্যাগ করিয়া যাঁহারা কেবলমাত্র শ্রীনামই উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সুখে যে গতি লাভ করেন, সকল ধার্মিকগণও সেই গতি লাভ করিতে পারেন না।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥
(গী ৩।২৬)

"বিদ্বান্ ব্যক্তি 'যাহারা কর্মে ও কর্মফলে আসক্ত' এবং অজ্ঞ (অপ্রজ্ঞান্) এইরূপ অনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিগণের বুদ্ধি-ভেদ জন্মাইবে না, অর্থাৎ কর্মত্যাগের প্রবৃত্তি উৎপাদন করিবে না; বরঞ্চ, নিজে কর্ম আচরণ করিয়া তাহাদিগের কর্ম করিবার প্রবৃত্তি জন্মাইবে"—এই বাক্যে শ্রীভগবান্ যে কর্ম করিবার আদেশ করিয়াছেন, সেটি অধিকন্তু ভক্তিতে শ্রদ্ধাহীনতা-দোষে কর্মত্যাগে অনধিকারীর প্রতি বুঝিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৪।১৫) শ্রীনারদ তাঁহার শিষ্য শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের প্রতিও এই প্রকারই উপদেশ করিয়াছেন—"হে মুনিবর! শ্রীহরির গুণ-বর্ণন-ব্যতীত মহাভারতাদিতে তুমি যে ধর্মাদি বর্ণন করিয়াছ, তাহাতে মানবের কোনই ফল-লাভ হইতে পারে না; যেহেতু স্বভাবতঃ নিন্দিত কাম্যকর্মাদিতে অনুরক্ত মনুষ্যের প্রতি ধর্মানুষ্ঠানের জন্য অনুশাসন করা তোমার অত্যন্ত অন্যায়ই হইয়াছে; কারণ, যে নিন্দিত কাম্য কর্মে মানবের রুচি স্বভাবতঃই বর্তমান আছে, তাহার জন্য আবার উপদেশ করা অন্যায় নহে কি? বিশেষতঃ যাঁহার উপদেশ-বাক্যে প্রাকৃত ব্যক্তিগণ 'এইটিই মুখ্যধর্ম'—এই ভাবেই নিশ্চয় করে, তাঁহার উপদেশবাক্যে অন্য কোনও বিজ্ঞ

ব্যক্তি কাম্যকর্ম্মের দোষ প্রদর্শন করিয়া নিষেধ করিলেও অন্তে মানিবে না। ইহাতে তোমার উপদেশে জগতের প্রতি যে কত বড় অন্যায় হইয়াছে, তাহা আর কি বলিব ?"

ভগবান্ শ্রীঅত্রিদেব যে উপদেশ (ভা ৯।৯।৪৯) করিয়াছেন, তাহাও কর্ম্মপরিত্যাগের অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে;—"বিজ্ঞ ব্যক্তি বুঝিতে পারেন যে, 'কর্ম্মাসক্তিই জীবের অনর্থের মূলকারণ এবং কর্ম্মাসক্তি-ত্যাগই শান্তির নিদান' ইহা জানিয়া বিজ্ঞব্যক্তি অজ্ঞব্যক্তিকে কখনও কর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ করেন না,—যেমন, উত্তম বৈদ্য কখনও রোগীর ইচ্ছানুরূপ অপথ্য বা কুপথ্য প্রদান করেন না।"

যতদিন পর্য্যন্ত ভক্তিতে দৃঢ়শ্রদ্ধার উদয় না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার জন্য শ্রীভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত সমস্বরে উপদেশ করিতেছেন। তাহা হইলে—"বিজ্ঞ ব্যক্তি অজ্ঞ ব্যক্তিকে কর্ম্ম করিতে উপদেশ করিবেন না।"—ভগবান্ শ্রীঅত্রিদেবের এই বাক্যের সহিত শ্রীগীতার বাক্যের সঙ্গতি কিরূপে রক্ষিত হয় ? ইহারই সমাধান করিয়া বলিতেছেন,—

শ্রীঅত্রিদেবের বাক্যে যে 'অজ্ঞ'-পদ উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য—'ঐ ব্যক্তি যদিও তৎকালে ভক্তি-মাহাত্ম্য-বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তথাপি তাঁহার পূর্ব্বজন্মের ভক্তি-সংস্কার আছে, বিজ্ঞ-ব্যক্তিগণ তাহা অনুমান করিয়াই কর্ম্মত্যাগের জন্য উপদেশ করেন।'—এইরূপ সিদ্ধান্তে শ্রীগীতা (৩।২৬) ও শ্রীমদ্ভাগবতের (৯।৯।৪৯) বাক্যের সঙ্গতি রক্ষা হইতে পারে। তাহা না হইলে অশ্রদ্ধান ব্যক্তিকে অনন্যভক্তি অনুষ্ঠানের জন্য উপদেশকারীরই দোষ ঘটে; যেহেতু অশ্রদ্ধান, বিমুখ ও অশ্রবণকারীকে ভক্তির কথা উপদেশ করা নামাপরাধবিশেষ।

পরধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীসূত গোস্বামীর নিকট 'জীবগণের সর্ব্বশাস্ত্রসার ঐকান্তিক মঙ্গল কি ?'—এইরূপ যে একটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, উহারই উত্তরে শ্রীসূত গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছিলেন,—যে ধর্ম্ম হইতে অধোক্ষজে (অক্ষ অর্থাৎ শকটাক্ষরন্ধ্রী শকটের অধোভাগে পুনরায় আত্মরূপে প্রতীয়মান, অথবা ভারবাহিতার প্রতীক শকটাসুরকে অধঃকৃত বা তিরস্কৃত করিয়াছেন যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণে) ভক্তি অর্থাৎ তাঁহার কথা-শ্রবণাদিতে রুচি লক্ষণা ভক্তির উদয় হয়, তাহা জীব-মাত্রেরই পরমতোভাবে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম হইতে যদি শ্রীহরিকথায় রুচি উৎপাদন না করে, তবে তাহা শ্রম-মাত্র—এইরূপ নিষেধমুখে এবং সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের মুখ্য ফলই শ্রীহরিসন্তোষ—এইরূপ বিধিমুখে শ্রীভগবানের সন্তোষের জন্য অনুষ্ঠিত ধর্ম্মই —সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া তাহাকে 'পরধর্ম্ম' বলা হইয়াছে। যে ধর্ম্মের নিবৃত্তি বা ত্যাগই একমাত্র লক্ষ্য, তাহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হইতে পারে না; যাহা ভগবানের সন্তোষার্থ নহে, তাহাতে নিবৃত্তি বা ত্যাগরূপ লক্ষ্য থাকিলেও তাহা প্রবৃত্তি-ধর্ম্ম বা ভোগরূপ ভগবদ্বিমুখতারই সমান। অতএব শ্রীভগবানের সন্তোষার্থ (সংস্কারাভাস) তাঁহাতে সমর্পিত কর্ম্ম বা কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণরূপ প্রাথমিক ভাগবতধর্ম্মে যে শুদ্ধভক্তির পূর্ব্বাঙ্গরূপ সাধুসঙ্গ, তাহাকেই 'পরধর্ম্ম' বলা হইয়াছে; কারণ, সাধুসঙ্গ হইতেই শ্রীভগবানের কথা-শ্রবণাদিতে রুচি-লক্ষণা ভক্তির উদয়ারম্ভ হয়।

শ্রীভগবানে লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মার্পণে চিত্তশুদ্ধি হয়। কর্ম্মার্পণকারীর যদি ভক্তভাগবতের কোনরূপ সঙ্গ হয়, তবে তাহার পূর্ব্বাঙ্গরূপ সেই ভাগবতসঙ্গফলে বিশ্বাসের সহিত পরাঙ্গ-রূপ শুদ্ধসেবা হইতে আরম্ভ করিয়া সাধুসেবা, শরণাগতি ও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ভক্তিরূপা একাদশ-প্রকার স্বরূপসিদ্ধা বৈধী ভক্তির উদয় হয়।

শ্রীবিষ্ণুর আজ্ঞানুকূল কর্ম্মার্পণকারী ব্যক্তি কার্য্যান্তরে অর্থাৎ প্রথমে শ্রীবিষ্ণুর সুখানুসন্ধানৈকমূলা পাদসেবনাখ্যা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির যাজনকারী না হইয়াও শাস্ত্রের আজ্ঞাপালন, পুণ্য-কামনা বা স্বাস্থ্যাদি-লাভের জন্য তীর্থে গমন করিয়াও ভগ-বল্লীলাস্থানে স্বভাবতঃই ভ্রমণশীল মহাভাগবতগণের দর্শন-স্পর্শন, সম্ভোষণাদি-লক্ষণা সেবার আভাস বা ভক্ত্যাভাস লাভ করিতে পারেন এবং সেই সেবাভাসের প্রভাবে সাধু-গণের চরণে লৌকিক-শ্রদ্ধা লাভ করেন। তাহাতে সাধু-দিগের পরস্পর ভগবৎকথা-সংলাপ-শ্রবণের ইচ্ছা হয়, তৎ-ফলরূপে শ্রীভগবৎ-কথায় রুচির উদয় হয় এবং রুচিলক্ষণা ভক্তির আবির্ভাব হইলে সেই রুচির দ্বারাই শ্রবণকীর্ত্তনাদি-লক্ষণা ভক্তির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে। শুদ্ধভক্তির পূর্ব্বাঙ্গরূপ সাধুসঙ্গফলে ক্রমে অনন্যা ভক্তিতে শ্রদ্ধাপূর্ব্বিকা শুদ্ধভক্ত্যা-

রূপা সাধনভক্তি ও তৎফলস্বরূপ দাস্যভক্তিরূপ রতি ও প্রীতির উদয় হয়। অতএব কর্ম্মার্পণরূপ ভাগবতধর্ম বা নামিকী ভক্তির অনুষ্ঠানকালে লৌকিক-শ্রদ্ধার সহিত ভক্তসঙ্গের কোন প্রকার সঙ্কল্প পূর্ব্বাঙ্গ হইতে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাবিশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্বাসের সহিত পরাঙ্গ শরণাপত্তি বা গুরুসেবা বা শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তিযাজনের সৌভাগ্যলাভ হইলে, স্বতঃই স্বরূপা, ফলানুসন্ধান-রহিতা ও অপ্রতিহতা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির দ্বারা আত্মা অর্থাৎ জীব অতীষ্ট সম্যগ্‌রূপে প্রসন্ন হ'ন অর্থাৎ তাঁহাতে প্রীতির উদয় হয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠানে মন সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু শ্রবণ-কীর্ত্তন-সঙ্কল্প স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির উদয়ে আত্মা সুপ্রসন্নতা লাভ করে অর্থাৎ চিত্তটী প্রেমোল্লাসিত হয়; তদ্দ্বারা শ্রেষ্ঠ —অতীষ্ট বস্তু হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মই—'শ্রেষ্ঠধর্ম্ম' বলিয়া লৌকিক ব্যক্তিগণের নিকট প্রসিদ্ধ। অন্যদিকে বেদাদি শাস্ত্রের শেষকথাও কর্ম্মার্পণ। কিন্তু কর্ম্মার্পণ নামিকী ভক্তিমাত্র। কর্ম্মার্পণ—জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারস্বরূপ। সাধুসঙ্গ না হইলে জ্ঞান বা ভক্তিরূপ সাধুত্বের অন্তঃপুরে উপনীত হওয়া যায় না। গুরু-মহতের কৃপাসঙ্গ-দ্বারাই ভক্তির অন্তঃপুরে অর্থাৎ অন্তরঙ্গা ভক্তিতে প্রবেশ-লাভ হইতে পারে, শত শত সাধনের দ্বারা তাহা হইতে পারে না। এজন্য শুদ্ধভক্তির পূর্ব্বাঙ্গরূপ সাধু-সঙ্গকে পরধর্ম্ম অর্থাৎ ভগবৎ-সন্তোষার্থ অনুষ্ঠিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা হইল। সাধুসঙ্গ শ্রীভগবান্‌কে যেরূপ সন্তুষ্ট ও বশীভূত করে, সেরূপ আর কিছুই করিতে পারে না।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও নবধা ভক্তি

শ্রীনারদ শ্রীঋষিগণের নিকট বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-বর্ণন-প্রসঙ্গে যে শ্রীহরির শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-প্রভৃতিকেও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অন্তর্গতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য বহির্ম্মুখ-গণকেও সাক্ষাদ্ভক্তির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য; বস্তুতঃ স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হইতে পৃথক্। মহা-পুরুষগণের একমাত্র গতি শ্রীহরির শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি ভক্তি, শ্রীহরির সুখানুসন্ধানলক্ষে প্রাণি মাত্রেরই অখণ্ড কর্ত্তব্য—ইহা প্রদর্শনের জন্যই শ্রীনারদ ঐরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীভরত তাঁহার তৃতীয়-জন্মে শ্রীভগবানের কৃপায় নিজের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত-সকল স্মরণ করিয়া, প্রতিস্রোত-আপণার ব্যবহারিক লোকের নিকটে আপনাকে উন্মত্ত, জড়, অন্ধ ও বধিররূপে দেখাইলেন। এই প্রসঙ্গদ্বারা শ্রীজড়ভরতের ভক্তিনিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীভরতের পিতৃদেব দেহ-ত্যাগ করিলে তাঁহার ভ্রাতৃগণ শ্রীভরতের অলৌকিক প্রভাব বুঝিতে পারিলেন না, যেহেতু তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি ত্রিগুণময়ী কর্ম্মবিদ্যাতেই পরিনিষ্ঠিত ছিল। অতএব তাঁহারা পরতত্ত্ব-জ্ঞানে জড়মতি ছিল। এই জন্যই ভ্রাতৃগণ তাঁহার অনুশাসন হইতে বিরত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা শ্রীভরতের অনাদরকারী ভ্রাতৃগণের মূর্খত্ব বর্ণন করিয়া সেই ভক্তি যে ত্রিগুণাত্মক-ধর্ম্মের অতীত ও তাহাই পরবিদ্যা—ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

শাস্ত্রে যে-সকল বর্ণ ও আশ্রমোচিত আচার বিহিত হইয়াছে, সেই আচারেরও অনুষ্ঠনীয় ফল—শ্রীভগবদ্ভক্তি। শ্রীগুরুদেব শ্রীল ব্রহ্মদেবীগণকে এইরূপে উপদেশ করিয়াছেন, যথা—হে শ্রীব্রহ্মদেবীগণ! দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, স্বাধ্যায় ও ইন্দ্রিয়-সংযম প্রভৃতি-দ্বারা, অধিক কি বলিব, অন্য যত যত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান আছে, সেই সকল সাধন-রাশির মুখ্য ফল—শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তিলাভ (ভা ১০।৪৭।২৪)।

এই শ্লোকে যে দানাদি সাধনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে সকল সাধনই শ্রীকৃষ্ণার্পিত হওয়া প্রয়োজন; কারণ, যে দান, ব্রত ও তপস্যা-প্রভৃতি সাধন শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হয় না, সেই সকল সাধনে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিলাভ করিতে পারা যায় না। এই অভিপ্রায়ে শ্রীল নারদ শ্রীপ্রচেতোগণকে (ভা ৪।৩১।১৩) বলিয়াছিলেন—"তদ্বর্ণ্য তানি কর্ম্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ। নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ॥" অর্থাৎ মানব-মাত্রের সেই জন্মই জন্ম, সেই সকল কর্ম্মই প্রকৃত কর্ম্ম, সেই জীবনই প্রকৃত জীবন, সেই মন ও বাক্যই প্রকৃত ধন্য—যে জন্মে, যে কর্ম্মে, যে জীবনে, যে মনে, যে বাক্যে ভগবান্ শ্রীহরি সেবিত হ'ন; অতএব এই সকল প্রমাণের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত দানাদি সাধনরাশি শ্রীকৃষ্ণার্পিতরূপেই বুঝিতে হইবে।

কর্ম্মার্পণ হইতেই মঙ্গলারম্ভ

কেবল নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিলেও মঙ্গল লাভ করা যাইবে না; অর্পণ না করা পর্য্যন্ত মঙ্গলের আরম্ভই হয় না। কেহ যদি নিঃস্বার্থভাবে অর্থাৎ কোনরূপ প্রতিষ্ঠাদি কামনা না করিয়াও দাতব্য-চিকিৎসালয়-স্থাপন, অতিথি-সেবা,

মনুষ্যদের উপকার ও বহুদানাদি করেন, তথাপি তদ্দ্বারা বন্ধনই হইবে। উহাকে ঈশ্বরের আদেশ জ্ঞানে শ্রীবিষ্ণুর সহিত যোগযুক্ত হইয়া অথবা ঈশ্বরের সন্তোষার্থ ফল ঈশ্বরে অর্পণ না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই বন্ধন-মুক্তি হইতে পারে না। ইহা শ্রীগুরুদেবের আদর্শের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুর সহিত সম্বন্ধ রাখিলে দেবতাগণও নানাপ্রকার কাম্য-বর দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া জীবকে বন্ধন করিতে পারে না। কর্ম্মার্পণ পর্য্যন্ত মহতের সঙ্গের অপেক্ষা নাই। কর্ম্মার্পণের পরে ভক্ত-মহতের সঙ্গ হইলে পরম-মঙ্গল লাভ হয়। অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তিতে প্রবেশ ঘটে।

পূর্ব্বে বহু যোগী রাশি-রাশি যোগ সাধন করিয়াও চিত্ত-শুদ্ধির অভাবে জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই; কিন্তু তাঁহারাই পরে তাঁহাদের লৌকিক ও বৈদিক উভয়বিধ কর্ম্ম শ্রীবিষ্ণুতে সমর্পণ করিবার ফলে অর্থাৎ কর্ম্মার্পণের পরে শুদ্ধা ভক্তি লাভ করিয়াছেন এবং তদনন্তর ক্রমপথে আব্রহ্মস্তম্ব হইতে ভগবদ্ভক্ত-পর্য্যন্ত জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া বলিতেছেন,—

পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিন-
স্ত্বদর্পিতেহা নিজকর্মলব্ধয়া।
বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া
প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুত তে গতিং পরাম্॥

(ভা ১০।১৪।৫)

হে ভূমন্! আপনি স্বরূপে ও গুণে পরিপূর্ণ-ভগবৎ-স্বরূপ; ব্রহ্ম-স্বরূপে পূর্ণ বটে, কিন্তু গুণ-রহিত। এই পৃথিবীতে পূর্ব্বে অনেক মহাত্মাযোগিগণ রাশি-রাশি যোগ-সাধনে জ্ঞান-লাভ করিতে না পারিয়া পরে তাঁহাদের লৌকিক ও নিজ-নিজ কর্ম্মসমূহ আপনাতে অর্পণপূর্ব্বক তৎফলে মহৎ-কৃপায় ভগবৎকথায় রুচিরূপা ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন; আবার কথোপনীতা অর্থাৎ ভগবৎকথা-প্রভাবে ভগবৎসান্নিধ্যকারিণী পুনরায় কথনীয়া রুচিরূপা অর্থাৎ কীর্ত্তনীয় শ্রীভগবানে রুচি অর্থাৎ আবেশময়ী ভক্তি দ্বারাই সুখে আব্রহ্মস্তম্ব হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীভগবত্তত্ত্ব পর্য্যন্ত উপলব্ধিপূর্ব্বক আপনার শ্রীতিমাধুর্য্যানুভবরূপ পরমাস্তরঙ্গা গতি বা সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীভগবদর্পণ-সিদ্ধ তদানুগত্যময় লৌকিক কর্ম্মও পরম-ধর্ম্মরূপে গণিত হয়—ইহা শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু শ্রীউদ্ধবগীতা হইতে ন্যায়ানুগ সাধন-ভক্তির একটী দৃষ্টান্ত-দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন,—"ভগবদর্পণসিদ্ধ-তদনুগতিরূপা-লৌকিককর্ম্মণোঽপি পরমধর্ম্মত্বমুদাহরিষ্যতে—

যো যো ময়ি পরে ধর্ম্মঃ কল্পতে নিষ্ফলায় চেৎ।
তদায়াসো নিরর্থঃ স্যাদ্ভয়াদেরিব সত্তম॥

(ভা ১১।২৯।২১)

হে সাধুশ্রেষ্ঠ উদ্ধব! ভয় ও শোকাদির নিমিত্ত পলায়ন ও ক্রন্দনাদিবৎ যে যে লৌকিক ধর্ম্ম আমাতে কৃত হয়, তাহাও পরব্রহ্মস্বরূপ আমাতে নিষ্কামভাবে অর্পিত হইলে ধর্ম্মরূপেই পরিগণিত হইবে"—ইত্যাদি শ্লোকে ভগবদর্পণ-সিদ্ধ তদানুগত্যধর্ম্মযুক্ত লৌকিক-কর্ম্মেরও পরধর্ম্মত্ব কথিত হইয়াছে।

শ্রীভগবানে সমর্পিত কর্ম্মেরও অনাদর করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে কেবলা ভক্তি বিহিতা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও শ্রীভগবান্ আবেশময়ী শুদ্ধা ভক্তির অনুষ্ঠানে অসামর্থ্যাবস্থায়ই শ্রীভগবানে কর্ম্মার্পণ বিধান করিয়াছেন।

"শ্রীভগবৎসমর্পিত-কর্ম্মণোঽপ্যাদরেণ তু দর্শিতম্—'তস্মাদেকেন মনসা' (ভা ১১।২।৩৭) ইত্যাদি। শ্রীগীতোপ-নিষৎসু (১২।৮-১১) চ তস্যাসামর্থ্য এব তদ্বিহিতম্—

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ ইতি।

অত্র পাদ্ম-কার্ত্তিকমাহাত্ম্যেতিহাসোঽনুসন্ধেয়ঃ—'চোল-দেশরাজস্য কস্যচিদ্বিষ্ণুদাস-নাম্না বিপ্রেণ শুদ্ধভক্তিমেব কুর্ব্বতা সহ কস্য পূর্ব্বং ভগবৎপ্রাপ্তিঃ জাতিতি স্পষ্টয়া বহূন্ বজ্ঞান্ ভগবদর্পিতানপি দৃষ্ট্বা বিদ্বদ্ভো ন ভগবৎপ্রাপ্তিবদ্ধুৎ।"

(ভ স, ১০১ অনু)

শ্রীস্কন্দপুরাণান্তর্গত কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যবর্ণনপ্রসঙ্গে একটী ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, সেটিও এস্থানে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। এক সময়ে চোলদেশের অধিপতি শুদ্ধ-অর্চ্চনা-নুষ্ঠানকারী 'বিষ্ণুদাস'-নামক কোন এক ব্রাহ্মণের সহিত

স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন,—'দেখা যাউক, তাহার প্রথমতঃ ভগবৎপ্রাপ্তি হয় ?'—এই প্রকারের স্পর্দ্ধা করিয়া সেই রাজা শ্রীভগবানে কর্ম্মার্পণপূর্ব্বক বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিতে পারিলেন না। কিন্তু, সেই ব্রাহ্মণ শুদ্ধ-অঙ্কুরস্বরূপ ভক্তির সামর্থ্যে শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিলেন দেখিয়া সেই রাজা ভগবদর্পিত যজ্ঞাদি কর্ম্মসমূহ পরিত্যাগ করিয়া 'মুকুন্দ'-নামে কোন একজন ভক্তকে বলিতে লাগিলেন, —'আমি যে ব্রাহ্মণের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া এইসকল যজ্ঞ-দান-প্রভৃতি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলাম, সেই ব্রাহ্মণ আমার পূর্ব্বেই শ্রীবিষ্ণুর সারূপ্য লাভ করিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠে চলিয়া গেলেন। অতএব আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, যজ্ঞ-দান-প্রভৃতি কর্ম্মানুষ্ঠান-দ্বারা কখনও শ্রীবিষ্ণু প্রসন্ন হয়েন না; তাঁহার সন্তোষবিধানে ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ কারণ।'

এই প্রবন্ধের সার স্বল্পকথায় পুনরাবৃত্তি করা যাইতেছে। পরমকরুণ শ্রীভগবানের শাব্দিক অবতার বেদ শাসক বা শাস্ত্রকর্ত্তৃ অবতীর্ণ হইয়া পরতত্ত্ব-বিমুখ জীব-জগৎকে নিষিদ্ধ-কর্ম্মরূপ পাপের নৈমর্গিক আচরণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্মে যে-সকল নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন—তাহাই 'কর্ম্মকাণ্ড'। বর্ণাশ্রমে থাকিয়া শ্রীবিষ্ণুতে ফল-কামনা ত্যাগ করিলে চিত্তশুদ্ধি বা সংসার-মুক্তি হয়। কর্ম্মকাণ্ডের ফল জীব নিজে আত্মসাৎ না করিয়া শ্রীভগবানের সন্তোষার্থ যখন তাঁহাতে কায়মনোবাক্যে সমর্পণ করেন, তখন তাহা কর্ম্মার্পণ, কর্ম্মযোগ, কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি বা সাত্ত্বিকী ভক্তি-নামে অভিহিত হয়। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মান্তর্গত কর্ম্মকাণ্ডের ফল—ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের তৃপ্তি; বর্ণাশ্রমে কর্ম্মার্পণের দ্বারা যে শ্রীহরিতোষণ-(তোষণাভাস) চেষ্টা, তাহা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি বা 'কর্ম্মযোগ'। ইহার ফল—মুক্তি। কর্ম্মকাণ্ডে যে স্বীয় অপস্বার্থমাত্র পরিত্যাগ করিয়া পরোপ-কার-চিকীর্ষায় অতিথি-সেবা, পশুরোপকার-প্রভৃতি, তদ্দ্বারা বাসনার উদ্ভব বা বন্ধন হয়; আর কর্ম্মযোগের মধ্যে যে অতিথিসেবা-প্রভৃতি অর্থাৎ অতিথি শ্রীবিষ্ণুর দ্বারা চালিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এই বুদ্ধিতে অতিথির অন্তরে অন্তর্যামি-পরমাত্মা দর্শন করিয়া যে অতিথি-সেবা, তৎফলে চিত্তশুদ্ধি ও সংসার-মুক্তি লাভ হয়। অন্তর্যামি-দৃষ্টি কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফলকে নষ্ট করে, আর মহতের সেবা-ভাস-ফলে তাঁহার কৃপায় লৌকিক শ্রদ্ধা এবং তাঁহার সঙ্গফল শুদ্ধভক্তির পূর্ব্বাঙ্গ যাজনের দ্বারা ক্রমশঃ বিশ্বাসের সহিত মহতের সেবারূপ শুদ্ধভক্তির পরাঙ্গ দ্বারা অন্তরঙ্গা ভক্তি লাভ হয়। কর্ম্মার্পণের দ্বারা জ্ঞানের অধিকার হয়। ভাগ-বতের কৃপাসঙ্গে ভক্তি লাভ হয়। সুখানুসন্ধানবৃত্তির সহিত যে অনুগমন, তাহাই সঙ্গ। ভক্তি যতই নৈরন্তর্য্যময়ী ও সুখানুসন্ধানাবেশময়ী হইতে থাকে, ততই ভগবদ্-বৈভব-স্ফূর্ত্তি হয়। ভক্ত-মহতের প্রভাব কৃপা—ভক্তি-যাজনকারীর চিদ্বল ও কৃপাশক্তি-বরণের যোগ্যতা; ভক্ত-মহতের ও ভক্তি-যাজনকালীর স্বরূপগত ও পরিমাণগত ভক্তিবাসনা-ভেদে ফল শীঘ্র বা বিলম্বে এবং সেই জাতীয় ও সেই পরিমাণে প্রকাশিত হয়। অতএব নির্ভর ভক্তিযোগের দ্বারাই পরম-প্রয়োজন লাভ হয়।

কীর্ত্তন-প্রসঙ্গ

বিভিন্ন মঠে শ্রীকীর্ত্তনোৎসব

১৭ই অগ্রহায়ণ, ৩রা ডিসেম্বর রবিবার অন্যদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-রূপানুগবর ও বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের বিরহ-পূজা-সঙ্কীর্ত্তন-উৎসব।** সেই সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের ক্ষেত্র তাঁহার শ্রীসমাধি-পীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠ এবং সেই সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের ঋত্বিক্ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর। সভ্য ও সঙ্গত সুধেয়োগণ (সঙ্কীর্ত্তকগণ) মূল ঋত্বিকের আনুগত্যে সেই সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আরাধক। এবৎসর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলাস্থলী বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের বাণী-স্মরণ-কীর্ত্তনমুখে শ্রীবিরহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

গত ১৭ই অক্টোবর, ৩১শে আশ্বিন মঙ্গলবার শ্রীশ্রী-গোবর্দ্ধন-পূজা ও শ্রীশ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে তাঁহার

শ্রীমুখবিগলিত 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ'-ব্যাখ্যামুখে ও অন্যান্য শাখা-মঠসমূহে শ্রীহরিকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

গত ১৩ই আশ্বিন, ২৯শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুত্রয়ের, গত ৯ই অক্টোবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের ও ২১শে অক্টোবর শুক্রবার পরমগুরুদেব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের কৃপায় শ্রীচৈতন্যমঠ ও অন্যান্য শাখামঠ-সমূহে শ্রীহরি-কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। পরম-গুরুদেবের তিরোভাবতিথিতে শ্রীশ্রীগুরুদেব 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ'-ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

৭ই অগ্রহায়ণ, ২৩শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রী-পুরুষোত্তম ধামে ঔঁ শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের সাক্ষাৎ কৃপোপস্থিতিতে ও কৃপোপদেশে পরমপরাৎপর-শ্রীগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল মধুসূদনদাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-সঙ্কীর্ত্তন-উৎসব শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ধাম-পরিক্রম, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখপদ্মবিগলিত শ্রীহরিকথা-শ্রবণ, 'শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ'-ব্যাখ্যা, শ্রীগৌরজন-বিহিত সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীমহাপ্রসাদ-বিতরণাদি সুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

বিভিন্ন-স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তন

করাচীতে—গত ২২শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার স্থানীয় 'থিয়োসফিক্যাল্ সোসাইটি' হলে প্রিন্সিপাল মিঃ পি, এম্, আড্‌বানী এম-এ মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী রাগালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রীজী 'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর দর্শন'-সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। গত ৩০শে সেপ্টেম্বর সহরের প্রসিদ্ধ সত্যনারায়ণজীর মাটমন্দিরে ভক্তিশাস্ত্রীজী 'ভগবৎপ্রেম'-সম্বন্ধে, ১লা অক্টোবর স্থানীয় শিকারপুরী কলোনীর বিশিষ্ট সজ্জন শেঠ্ লীলারাম রাধা-কিষণদাস মহোদয়ের গৃহে 'সাধুসঙ্গের আবশ্যকতা'-বিষয়ে, ২রা অক্টোবর 'সোল্জার বাজার'-নামক স্থানে মিঃ বিষাণ সিংহ আত্মা সিংহ রিটায়ার্ড্ জেল-সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত-অবলম্বনে 'মনুষ্যজীবনের কৃত্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধ্য'-বিষয়ে হিন্দী ভাষায় হরিকথা কীর্ত্তন করেন এবং গত ৪ই অক্টোবর করাচীর সুপ্রসিদ্ধ ইউন-এম্প্রেস থিয়েটারে 'ইউন-এসোসিয়েসনে' 'সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম'-সম্বন্ধে ও ৯ই অক্টো-বর স্থানীয় 'জামিল ইন্‌ষ্টীটিউট্'-হলে 'মনুষ্য-জীবন ও উহার উপযোগিতা'-সম্বন্ধে ইংরাজী-ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী 'বোম্বে বাজার'-নামক স্থানে 'সাক্কি এণ্ড হেদিয়াবী মার্চ্চেণ্ট্স্ এসোসিয়েসনে' গত ১৮শে সেপ্টেম্বর শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে ব্রহ্মচারীজী বিভিন্নস্থানে 'শুদ্ধভক্তি', 'শ্রীগৌরকিশোর-উপাখ্যান', 'হরিতত্ত্ব', 'ভক্তির মহিমা', 'মনুষ্যজাতির কর্ত্তব্য', 'আত্ম-ধর্ম্ম', 'শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন, 'সৎসঙ্গ', 'জীবনের চরম সত্য', 'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সন্দেশ' প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দী ও অন্যান্য ভাষায় শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কীর্ত্তনকারিগণ গত ২৪শে সেপ্টেম্বর শিকারপুরী শেঠ লীলারাম রাধাকিষণদাস মহোদয়ের গৃহ-প্রাঙ্গণে একটি শিক্ষিত জনসভায় 'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জীবন-চরিত' এবং ১২ই অক্টোবর প্রসিদ্ধ 'থিওসফিক্যাল্ হলে' 'বাস্তব পথ'-সম্বন্ধে এবং স্থানীয় 'সাউথ্ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে' 'ধর্ম্ম ও উহার স্থান'-সম্বন্ধে ইংরাজী-ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ২৫শে নভেম্বর (১৯৪১) প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুত রামপ্রসাদ খাত্তেলওয়ালা মহোদয়ের ভবনে শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী রাগালঙ্কারজী 'শ্রীপ্রহ্লাদ-মহারাজের উপদেশ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সভায় বহু শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় ও মহিলার সমাগম হয়।

ব্রহ্মচারীজী প্রতি শুক্রবারে 'গৌড়মণি বিরক্ত-আশ্রমে' সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ধারাবাহিকভাবে 'শ্রীমিথি-যোগেন্দ্র-সংবাদ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তি ইহাতে আকৃষ্ট হন।

গত ৩রা ডিসেম্বর উক্ত আশ্রমে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কীর্ত্তন-কারিগণ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন ও শ্রীল প্রভুপাদের গুণাবলী-কীর্ত্তনমুখে তদীয়-বিরহোৎসব সম্পন্ন করেন।

মোগলসরাই-এ—গত ২১শে অক্টোবর শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ মোগলসরাই 'পুজারাড়ী'তে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন।

(পরবর্ত্তি-প্রসঙ্গ প্রচ্ছদপটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সংশোধন ও সংযোজন

গৌড়ীয় ২৩শ বর্ষ, ৪-১১শ সংখ্যার ১৪ পৃষ্ঠায় 'দিন,' ঔর 'কিয়াপ্,' প্রবন্ধের ১ম স্তম্ভের ১৭শ পঙ্‌ক্তিতে 'হুংপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেলে' স্থানে 'যেমন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেলে' হইবে; ৪০শ পঙ্‌ক্তিতে (কোন না কোনদিন মস্তিষ্কের বিকৃতিও হয় হইতে পারে।) শেষে "হৃৎপিণ্ড কিন্তু মস্তিষ্ক নহে।" ইহা বসিবে।

১৫ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভের ২৬শ পঙ্‌ক্তিতে 'ইহার মধ্যে ধ্যান ও ধারণারূপ ভক্তির' স্থানে 'ইহার মধ্যে ধ্যান, কথানুস্মৃতি ও সমাধিরূপ ভক্তির' হইবে।

১৬ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভে ১২শ পঙ্‌ক্তির (ভালবাসা হৃদয়ের স্বাভাবিকী বৃত্তি।) শেষে "প্রীতি ও বিদ্বেষ এই দুইটী হৃদয়ের দ্বারা হয়। মস্তিষ্কের বিচার করিয়া প্রীতির আস্পদের জন্য প্রাণ বিসর্জন করা যায় না, হৃদয়ের দ্বারাই প্রাণ-ত্যাগ করা যায়।"—ইহা বসিবে।

২১ পৃষ্ঠায় 'তুলাপ্রকল্পা' প্রবন্ধের ২য় স্তম্ভের ১৫-১৬শ পঙ্‌ক্তিতে 'তুই ও তুঁড়ির ভেদবুদ্ধি বিশ্বপ্রেমের স্কন্ধে আরোহণ ক'রেছে,' স্থানে 'তুই ও তুঁড়ির ভেদরূপ কৃত বিশ্বস্কন্ধে আরোহণ করিয়াছে,' হইবে।

২৪ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভের ২২শ পঙ্‌ক্তিতে 'এই উক্তি কি মনুষ্যের প্রতি প্রযোজ্য?' স্থানে 'এই উক্তি কি কেবল মনুষ্যের প্রতিই প্রযোজ্য?' হইবে।

২৫ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভের ২৩শ পঙ্‌ক্তিতে 'প্রযুক্ত নহে?' স্থানে 'প্রযোজ্য নহে?', ২৭শ পঙ্‌ক্তিতে 'ও' স্থানে 'এবং', ৩০শ পঙ্‌ক্তিতে 'দৃশকাষ্ঠে' স্থানে 'দৃশকাষ্ঠে' হইবে।

২৬ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভের ১১শ পঙ্‌ক্তিতে 'তদপেক্ষা বহুগুণ জীব—প্রেষ্ঠ' স্থানে 'তদপেক্ষা বহুগুণ জীব বান্ধব—প্রেষ্ঠ' হইবে; ২৮শ পঙ্‌ক্তিতে 'নিজকে ভগবদধীন ভাবনা,' স্থানে 'নিজকে ভগবদধীন ভাবেন,' হইবে।

২৯ পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভে ৯ম পঙ্‌ক্তিতে 'তস্মাদুভয়ৈব' স্থানে 'তস্মাদুভয়থৈব' হইবে; ৩২শ পঙ্‌ক্তিতে 'উহা ভগবদ্ভক্তি' স্থানে 'উহাই ভগবদ্ভক্তি' হইবে; ৩২-৩৩শ পঙ্‌ক্তিতে 'ইহাই মুখ্য উপাসনা, শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনের প্রয়োজন নাই' স্থানে 'ইহাই মুখ্য উপাসনা এবং শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনের প্রয়োজন নাই' হইবে; ৩৪-৩৬শ পঙ্‌ক্তিতে 'এই নাস্তিক্য-মতবাদ' স্থানে 'এইরূপ নাস্তিক্য-মতবাদ' হইবে।

৩১ পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভে ২৫শ পঙ্‌ক্তিতে 'উভয় মতবাদী হইতে বিলক্ষণ।' স্থানে 'উভয় মতবাদী হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ ও পৃথক্।' হইবে।

৩২ পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভে ১০-১১শ পঙ্‌ক্তিতে 'অধিকারের উন্নতির জন্য অন্তর্যামি-দৃষ্টিতে সমস্ত জীবের প্রতি আদর শাস্ত্র বিধান করিয়াছেন।' স্থানে 'অধিকারের উন্নতির জন্য শাস্ত্র অন্তর্যামিদৃষ্টিতে সমস্ত জীবের প্রতি আদর বিধান করিয়াছেন।' হইবে।

৩৩ পৃষ্ঠায় "তুমি আমা হইতে বড় কিরূপে?" প্রবন্ধে ২য় স্তম্ভের ৮ম পঙ্‌ক্তিতে 'ইহাই পতির পত্নীর প্রতি ক্রোধের মূল কারণ।' স্থানে 'ইহাই পত্নীর প্রতি পতির ক্রোধের মূল কারণ।' হইবে।

৩৪ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভে ২-৩য় পঙ্‌ক্তিতে 'স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে নিজ সম্পত্তি বলিয়া' স্থানে 'স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে নিজ-ভোগ্য-সম্পত্তি বলিয়া' হইবে।

৩৬ পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভে ১৪শ পঙ্‌ক্তিতে 'তাঁহার শিষ্যের দ্বারা একাধিক' স্থানে 'তাঁহার একাধিক শিষ্যের দ্বারা' হইবে।

৩৮ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভে ২য়-৩য় পঙ্‌ক্তিতে 'আমার পত্নীবুদ্ধিও করেন নাই।' স্থানে 'আমার ভোগ্য-পত্নীবুদ্ধিও করেন নাই।' হইবে।

৪০ পৃষ্ঠায় "শ্রীকীর্ত্তন-প্রসঙ্গ" প্রবন্ধের ১ম স্তম্ভের ৬ষ্ঠ পঙ্‌ক্তিতে 'মঙ্গল উৎপন্ন করে।' স্থানে 'মঙ্গল উৎপাদন করে।' হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

২৩শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৮শে মাঘ, ১৩৫১ ; ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫ | ২৯শ-৩০শ সংখ্যা

প্রভুপাদ ও ভোগাপাদ

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি-নামিনে।
শ্রীবার্ষভানবীদেবী-দয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞান-দায়িনে প্রভবে নমঃ।
মাধুর্য্যোজ্জ্বল-প্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগ-ভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তি-বিগ্রহায় নমোঽস্তু তে।
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগ-বিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্ত-হারিণে।

যিনি বিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ, তিনিই প্রভু। 'প্রভু'-শব্দে শ্রীবিষ্ণুকে বুঝায়। 'পাদ'-শব্দ গৌরব বা ভক্তিস্নেহ বাচকও হয়; 'পাদ শব্দো ভক্তৌ চ নিদ্দিষ্টঃ' (ভক্তিরসামৃত, ১৮০ অনু)। 'প্রভুপাদ' বলিতে বিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ, 'কেবল ভক্তি-লভ্য', সর্বপ্রপূজ্যচরণ শ্রীগুরুপাদপদ্ম, যিনি 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' বলিয়া নিত্য কীর্ত্তনীয়। প্রভু বা ঈশ্বরে কোন মায়া-সম্বন্ধ নাই। প্রভু মায়ার অতীত। বিষ্ণু—মায়াধীশ, বিষ্ণুর ন্যায় বিষ্ণুর পার্ষদও মায়াকে অতিক্রম করিয়া নিত্য অবস্থিত। সুতরাং প্রভুপাদে মায়ার কোনরূপ বাদ বা উক্তি আরোপ করিলে, সেই বাদ-বিশেষকে প্রভুপাদ-বিগ্রহ বলা যাইতে পারে না; তাহা মায়াবাদেরই মূর্ত্তি। প্রভুপাদ সচ্চিদানন্দবিগ্রহের প্রকাশ-বিগ্রহ। তিনি সচ্চিদানন্দ-বস্তু। আর তাঁহাতে যদি কোন মায়ার বাদ আরোপ করিয়া কোন মর্ত্ত্যমূর্ত্তি কল্পনা করা হয়, তবে তাহা অদ্বৈতত্ত্ব বিবাট্‌তত্ত্বেরই অন্তর্গত হইবে। মায়িক চক্ষু বিবাট্ দর্শন করে, আর প্রেমাঞ্জনরঞ্জিত-প্রীতিচক্ষু সত্যস্বরূপ আনন্দবিগ্রহকে দর্শন করে। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীবলদেব যখন কংসের রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন অবিদ্বদ্‌গণ শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণকে বিবাট্ অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিকদেহযুক্ত নর-বালকরূপেই দর্শন করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবকে দর্শন করিবার অভিনয় করিয়াও তাহাদের শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরামের স্বরূপের দর্শন হয় নাই। পক্ষান্তরে শ্রীনন্দ-যশোমতী, শ্রীশ্রীবসুদেব-দেবকী শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণকে পাঁচ বালকরূপে দেখিলেও তাহা বিবাট্ বা মায়িক দর্শন নহে। দুই শতবর্ষ বয়স্কবালে উন্নত হইলেও বয়স্কমণি শ্রীকৃষ্ণকে মায়াময় জ্ঞান করিয়াছিল। এই যে বিবাড়্‌রূপে দর্শন অর্থাৎ মায়ার ধর্ম্ম প্রভুতে আরোপ, ইহা হইতেই জীবের আত্মপাত অর্থাৎ সংসারে উপস্থিতি হয়। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত তার-স্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

তং সত্যসারনিধিং ভজেত
নান্যত্র সজ্জেদ্যত আত্মপাতঃ ।

(ভা ১১।১৩৯)

শ্রীল স্বামিপাদ টীকায় বলিতেছেন,—"তমেব সত্যং ভজেত ; অন্যত্রোপলক্ষণে ন সজ্জেত, যত আসক্তাদাত্মনঃ পাতঃ সংসারে ভবতি। অতএব বিরাড়্গতে কুত্রাপি ন সজ্জেত, যতঃ লব্ধমানাদাত্মপাতঃ সংসার এব স্যাৎ।"

বাস্তব শ্রীগুরুপাদপদ্মে যাঁহার সত্য-সত্যই অনিমিত্তা প্রীতি-লক্ষণা ভক্তির উদয় হইয়াছে, যাঁহার প্রভুপাদরূপে, বিষ্ণুপাদরূপে অপ্রাকৃত বা দর্শন হইয়াছে ; তাঁহার কোনরূপ সংসার থাকিতে পারে না। সুতরাং 'প্রভুপাদ' বা 'বিষ্ণুপাদ'-শব্দবয়ের তাৎপর্য্য এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র ও গোস্বামি-শাস্ত্রের তাৎপর্য্য সব মিথ্যা হইয়া যায়। শ্রুতি-স্তবে দৃষ্ট হয়—

ভূমি পুরুপুণ্যতীর্থসদনান্যাময়ো বিমল-
স্ত্র উত ভবৎপদাম্বুজভজোঽঘভিদ্ভ্যুত্তমাঃ ।
দধতি সকৃন্মনস্যুরি য আত্মনি নিত্যসুখে
ন পুনরুপাসতে পুরুষসারহরাবসথান্ ॥

(ভা ১০।৮৭।৩৫)

হে দেব, যাঁহারা আপনার শ্রীপাদপদ্মকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, বিলসদাকার, আপনার সেই ভক্তজনগণের পাদোদকও সর্ব্বপাপবিনাশন। এতাদৃশ ভক্তগণ পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ অতিশয় পবিত্র পুণ্যতীর্থক্ষেত্র ও শ্রীভগবদ্ধাম-সমূহেই অবস্থান করিয়া থাকেন, পরন্তু কদাপি স্বজন-সুত-দারাদি-সমন্বিত গৃহের সেবা করেন না। তাঁহাদের কথা কি, যাঁহারা নিত্যসুখময়-স্বরূপ আপনাতে একবারও মনো-নিবেশ করিয়াছেন, তাঁহারাও আর পুরুষের বিবেক, ধৈর্য্য, ক্ষমা, শান্তি প্রভৃতি মহদ্গুণগণের হরণকারি গৃহের সেবা করেন না।

যে সত্যানন্দনিধিতে একবারমাত্র মনোনিবেশ করিলে পুরুষসারহরণকারি গৃহাদি-সম্ভূত কুৎসিৎ রসে বিহারার্থ আর প্রবৃত্তি হয় না, যদি প্রভুপাদ, বিষ্ণুপাদ বা শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের নিত্য-সেবা দর্শন ও কৃপালাভের অভিমান করিবার পরও আমার সেই বিষয়াভিনিবেশই থাকে, তবে আমি নিশ্চয়ই প্রভুপাদের সেবা করি নাই—ইহাই প্রমাণিত হয়।

আমাদের শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ দুইটি কথা সর্ব্বদাই কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিতেন—'অনয়া রাধিত ইতি রাধা', আর, 'অনয়া মীয়তে ইতি মায়া'। 'রাধা' ও 'মায়া' দুইটি প্রতিযোগি শব্দ। প্রতিযোগিতার মধ্যে বাস্তব বস্তুর অভাব ও ভান আছে। সুতরাং প্রভুপাদের প্রতিযোগী যে চিদ্বৃত্তি, তাহা মায়াপাদ বা ভোগ্যপাদ। এস্থানে 'পাদ'-শব্দ গৌরবে বা ভক্তিতাৎপর্য্যে ব্যবহৃত নহে। 'পাদ'-শব্দ নিকৃষ্টতা-দ্যোতক ; কারণ, পূজ্যবস্তুর চরণ ও ভোগ্যবস্তুর চরণ একজাতীয় বস্তু নহে। ভোগ্যপাদে একদিকে যেমন প্রভুপাদ-বস্তুর অভাব, আর একদিকে তেমনই প্রভুপাদের ভান আছে। প্রভুপাদ—পরমারাধ্যতম বস্তু। 'আরাধনা'-শব্দে—'আ সমাক্ রাধনা' অর্থাৎ শ্রীরাধারাণীর আনুগত্য। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্য আর আশ্রয়বিগ্রহ-শ্রেষ্ঠের আনুগত্য একই। সুতরাং প্রভুপাদের আনুগত্যের দ্বারা আমাদের সংসার-লাভ হয় না, অতি আনুষঙ্গিকভাবেই সর্ব্বসংসার-বাসনার বীজ উন্মূলিত হয়। আর যদি চিত্তে প্রভুপাদের প্রতিযোগী কোন কু-ভাবকে পোষণ করিয়া তাহাকে প্রভুপাদের মূর্ত্তিরূপে কল্পনা করি, অর্থাৎ প্রভুপাদের রূপের ভান প্রদর্শন করি, তবে সেইরূপ মায়ার সেবার ফলে সংসার-লাভ অনিবার্য্য। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীজিহ্বা-প্রাঙ্গণে শ্রীচৈতন্যসরস্বতী সর্ব্বদা নৃত্য করিতেন—ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। তিনি শ্রীগৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তি। তিনি শ্রীবার্ষভানবী-দয়িত, তিনি শ্রীগৌরকরুণাশক্তি-বিগ্রহ, তিনি শ্রীরূপানুগ-ভক্তিদ, তিনি শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী ; সেই শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীগুরুপ্রেষ্ঠই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ। আর তিনি যদি ভোগ্যবস্তু (!!) বা কুবিষয়ের দাতা হন, তাহা হইলে তাঁহার ঐসকল নাম মিথ্যা হয় ; কিন্তু তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম বাস্তব সত্য, তাঁহার সেবকও বাস্তব সত্য, তাঁহার সেবাও বাস্তব সত্য। তাঁহার 'রাধনা' বা 'আনুগত্য'—মায়ার আনুগত্য নহে। অতএব যখনই 'প্রভুপাদ'-শব্দ উচ্চারণ করিব, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া ধারণা করিব, তখনই প্রভুপাদ ও আমার মধ্যে আমার কোন সম্বন্ধ বা ভূমিকা নাই—ইহাই প্রমাণিত হইবে। কিন্তু যে-ক্ষেত্রে আমার মধ্যে সেই রাধনা-বৃত্তি নাই, আছে কেবল ধর্ম্মধ্বজতা (কাপট্য), সেবার অভি-নিবেশের পরিবর্ত্তে প্রভুত্ব করিবার উৎকট-পিপাসা, কৃষ্ণাবেশ বা কৃষ্ণসুখানুসন্ধানের পরিবর্ত্তে বিষয়ের আবেশ

বা নিজ-ভোগানুসন্ধান, সে স্থানে প্রভুপাদের সেবা বা প্রভুপাদ নাই; তথায়ই ভোগ্যপাদ। এজন্য কু-বিষয়ের তথাকথিত প্রভুপাদ বা ভোগ্যপাদ; আমাদের হৃদয়বস্তু শ্রবণগুরুবর্গ, বর্ত্মপ্রদর্শকগুরুবর্গ বা শিক্ষা-গুরুবর্গের প্রাণ-কোটিসর্ব্বস্ব "প্রভুপাদ" নহে। কু-বিষয়ে আবিষ্ট-চিত্ত অজ্ঞাভিলাষি-বিষয়িগণের দরবারে অন্ধ অভিসন্ধিমূলে 'প্রভুপাদ, প্রভুপাদ' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে যদি গগন বিদীর্ণ করিয়া ফেলে, অথবা কপট ক্রন্দন করিতে করিতে স্রোতস্বিনীও প্রবাহিত করে, তথাপি তাহাকে মায়ারই তাণ্ডব, মায়ারই ক্রন্দন, মায়ারই কুনাট্য বলিয়া অজ্ঞাভিলাষরহিত গুরুদেবতানুগণ উপলব্ধি করেন। শ্রীপ্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মের সেবকগণ অর্থাৎ 'অনন্যা রাধিতঃ' —এই মহাবাক্যের উপাসকগণ সেই মায়ার কুনাট্যে বিমোহিত হন না। তাঁহারা হৃদয়বস্তু বৈষ্ণবগুরুর আনুগত্যে স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণের দ্বারা প্রভুপাদের অভিন্নতা স্বরূপ অনুভব করেন। 'অনন্যা রাধিতঃ' ও 'অনন্যা ধীয়তে' এই দুইটি মহাবাক্যে অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিজস্ব অসাধারণ লক্ষণ বা তটস্থ লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার বাণীসমূহই তাঁহার তটস্থ বা বিষয় লক্ষণের জ্ঞাপক। তিনি শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ। তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতি মায়িক জীবকে ছলনা করিতে পারে, কিন্তু তাঁহার জিহ্বায় যে শ্রীচৈতন্যসরস্বতী অনুক্ষণ নৃত্য করিয়াছেন, তাহা কোন মঙ্গলকামী জীবকে বঞ্চনা করিবেন না। আমাদের প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী। ঠাকুর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদের ভাষায়—

"সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া,　　কৃষ্ণভক্তি যাঁ'র ছিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব।"

যিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীসরস্বতী, শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিই যাঁহার হৃদয়, তাঁহাকে হৃদয়ের দ্বারাই আরাধনা করিতে হইবে—অস্তিত্বের দ্বারা আরাধনার ছলনায় তাঁহাকে মাপিতে গিয়া তাঁহার যে আকৃতি-প্রকৃতি দৃষ্ট হইবে, তাহাই মায়ার মূর্ত্তি। আমাদের প্রভুপাদ ভোগ্যপাদ নহেন।

"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥"
"নিত্যানন্দ-কৃপায় সে পৌরচন্দ্র চিনি।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে ভক্তি-তত্ত্ব জানি॥"
(চৈ ভা ম ১০।৩০৫, ৩০৯)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-মিশন

(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৫১ সন

যথাবিহিতসম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ১৪ ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার হইতে পঞ্চদিবসকাল শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ-পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধাম-নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রম করা হইবে। মহাশয়, কৃপা করিয়া পরিক্রমে যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্তাঙ্গের ন্যূনাধিক সাধন-ফল লাভ ঘটে। দ্বারাবাহিক পরিক্রমের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীভজন-কিঙ্কর
শ্রীসুন্দরানন্দদাস বিদ্যাবিনোদ
কার্য্যসচিব, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা

৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার—[১] শ্রীঅন্তর্দ্বীপ ও [২] শ্রীসীমন্তদ্বীপ—[শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীযুগাদ্যিগুপ্তাসন, শ্রীনিবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীগৌরমন্ত্রমূর্ত্তি ; সরডাঙ্গা, সিমুলিয়া, গোপডাঙ্গা, বেথার চর, বেলপুকুর, শ্রীধর অঙ্গন, চাঁদকাজীর সমাধি]

১০ই ফাল্গুন, ২২শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার একাদশী—বিশ্রাম।

১১ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার—[৩] শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও [৪] শ্রীমধ্যদ্বীপ—[গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, স্বরূপগঞ্জ, শ্রীসুরভিকুঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, কোপাড়া ; মালিয়া, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাগ, রামনপুরা]

১২ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার—বিশ্রাম।

১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার—[৫] শ্রীকোলদ্বীপ, [৬] শ্রীঋতুদ্বীপ, [৭] শ্রীজহ্নুদ্বীপ, [৮] শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ ও [৯] শ্রীরুদ্রদ্বীপ—[সহর নবদ্বীপ, গরুখালির কোল ও চর, তেঘরির কোল, কোল-আমাদ, কোলের দহ ; বাহুলপুর, চম্পাহাটী বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির ; বিদ্যানগর, ভারগর ; মামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা মাতাপুর ; রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গের ডাঙ্গা]

১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাসকীর্ত্তনোৎসব ও ১৪ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার—**শ্রীগৌরপ্রকটোৎসব**। রবিবার হইতে দিবসত্রয় **শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব** হইবে।

শ্রীশ্রীমায়াদীশায় নমঃ

শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৫১ সন

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার হইতে দিবসত্রয় **শ্রীধাম-নবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব-উপলক্ষে ভক্ত-সম্মেলন, নামসংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী-কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথি-সেবা ও যাত্রা-মহোৎসবাদি** হইবে। ১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় **শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সৎকার্য্যের আলোচনা** হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রস্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গলাভে পরমানন্দিত হইবেন।

আগামী ১৩ই মাঘ, ২৬শে জানুয়ারী, শুক্রবার হইতে দিবসত্রয় **শ্রীধাম-মায়াপুর প্রাচীন-নবদ্বীপে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর জন্মোৎসব-উপলক্ষে শ্রীনাম-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত** হইবেন। **৯ই ফাল্গুন, ২১ ফেব্রুয়ারী, বুধবার হইতে ১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার পর্য্যন্ত নয়টি দ্বীপ-পরিক্রম** হইবে।

শ্রীসজ্জন-কিঙ্কর

শ্রীসুন্দরানন্দদাস বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যসচিব, শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী-সভা

দ্রষ্টব্য :—বি এণ্ড এ আর্ লাইনে কৃষ্ণনগর-সিটিতে গাড়ী বদল করিয়া নবদ্বীপঘাট ষ্টেশনে নামিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই আই আর লাইনে 'নবদ্বীপ-ধাম' ষ্টেশনে নামিয়া সহর নবদ্বীপ হইয়াও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়। সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হয়।

☞ উৎসব-উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি 'মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিমধুর প্রভু, শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া'—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব-সংখ্যা

গৌড়ীয়

২৩শ পণ্ড } শ্রীগৌড়াব্দমঠ, শনিবার, ১২ই ফাল্গুন, ১৩৭১; ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫ { ১৭শ-১৮শ সংখ্যা

"পুরাণ-পুরুষ"

শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু লিখিয়াছেন,—

"দুই ভাই জনমের কালি' অন্ধকার।
দুই ভাগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড় ভাগবত-শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তি রস-পাত্র॥
দুই ভাগবত-দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হন বশ॥
এক অদ্ভুত—সমকালে দোঁহার প্রকাশ।
আর অদ্ভুত—চিত্তগুহার তম: করে নাশ॥
এই চন্দ্র-সূর্য্য দুই পরম সদয়।
জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিল উদয়॥"

(চৈ চ আ ১।৯৮-১০২)

পরাৎপরতত্ত্ব শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ 'দুই ভাই' সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবের হৃদয়-গুহার অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত করিয়া দুই ভাগবতের সহিত সাক্ষাৎকার করান। পরতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানের অভাবরূপ অজ্ঞানান্ধকার সেই অপ্রাকৃত সূর্য্য-চন্দ্রের অহৈতুকী কৃপায় চিরবিনষ্ট হয় অর্থাৎ অনাদিসিদ্ধ অজ্ঞানের ধ্বংসাভাব হয়। সূর্য্য-চন্দ্ররূপী পরতত্ত্বের কৃপা-রশ্মিতে 'শ্রীভাগবত পুরাণ'-স্বরূপ এক ভাগবত ও 'ভক্তিরস পাত্র'রূপধারী এক মহাভাগবতের বা শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শন-লাভ ঘটে। এই দুই ভাগবতের দ্বারা ভক্তিরস-বিতরণপূর্ব্বক সেই অপ্রাকৃত সূর্য্য ও চন্দ্র ভক্তির বশীভূত হইয়া ভক্ত-হৃদয়ে অবস্থান করেন। সমকালে এই দুই অপ্রাকৃত শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ্কের উদয়ে জীবের হৃদ্-গুহার অনাদিকালের সঞ্চিত সমগ্র অন্ধকার বিদূরিত হয়। অজ্ঞানান্ধকারের চিরতরে বিনাশ ও দুঃখের আত্যন্তিক-নিবৃত্তি পরতত্ত্বের স্বপ্রকাশতার অতিরিক্তি হইতেই আনুষঙ্গিকভাবে হইয়া থাকে। সূর্য্য-চন্দ্ররূপী সেই পরতত্ত্ব মহাবদান্য-লীলা প্রকট করিয়া জগতের ভাগ্যে গৌড় শৈলে উদিত হইয়াছিলেন।

শ্রীভাগবতপুরাণ সাক্ষাৎ শ্রীলীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি; আর শ্রীভক্তভাগবতও সেই পরমপুরুষেরই প্রতিনিধি।

"কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥"

(ভা ১।৩।৪৩)

পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্ধর্ম্ম ও ভগবদ্ভজ্ঞানাদির সহিত অপ্রকট-প্রকাশে উপগত হইলে বিষয়মুগ্ধ জীবের চক্ষু ভগবদ্ধর্ম্ম ও ভগবদ্ভজ্ঞান-বিবেক-রহিত হইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। সেই সময় এই পুরাণ-সূর্য্যের উদয় হয়। সুতরাং এই পুরাণ—ঋষি-প্রণীত দীপশলাকা, অন্যান্য শাস্ত্রের তুল্য নহে; কিন্তু ইহা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি, সূর্য্যবৎ স্বপ্রকাশ। শ্রীমধুরা—পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ-সূর্য্যের উদয়াচল ও প্রভাস—অস্তাচল; শিষ্টগণ—চক্রবাকতুল্য, দুষ্টগণ—নীহারতুল্য,

পাপনষ্ট—অন্ধকারতুল্য ও ভক্তগণ—কমল-কাননতুল্য। সূর্য্যের উদয়ে কমলের আনন্দ-বিকাশ হয়। শ্রীকৃষ্ণ-সূর্য্য অস্তমিত হইলে পুরুষ সূর্য্য উদিত হইবেন'—এই বাক্যের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যেরই প্রতিমূর্ত্তি, ইহা সূচিত হইতেছে। 'সূর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি—সূর্য্যই'—এই বিষয়েও সন্দেহ নাই। প্রতিমূর্ত্তি ও প্রতিচ্ছবি এক নহে। প্রতিমূর্ত্তি সেই বস্তুরই বাহ্য আবির্ভাব-বিশেষ।

ভক্তিরসশাস্ত্রে ভক্ত-ভাগবতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাগবত—শ্রীশুকদেবগোস্বামী। তিনি অপরোক্ষানুভবকারী। 'অনুভব'-শব্দের অর্থ সাক্ষাৎকার। যিনি অনুভবকারী, তিনিই অনুভব করাইতে পারেন।

সকলেরই চিত্তের ধর্ম্মের দুইটী স্বরূপ—(১) মাধুর্য্য ও (২) ঔদার্য্য। পরতত্ত্বের এই দ্বিবিধ চিদ্ধর্ম্মই যথাক্রমে 'রসিকশেখর' ও 'পরম-করুণ' নামে অভিহিত হন। পরতত্ত্ব স্বয়ং যাহা, তাহাই তাঁহার মাধুর্য্যস্বরূপ বা রসিক-শেখরত্ব; আর অবাঙ্মনসগোচর হইয়াও তিনি যে স্বয়ং আপনাকে ধরা দেন, আপনাকেই আপনি বিতরণ করেন, ইন্দ্রিয়াতীত ভগবান্ হইয়াও প্রীতির ভিখারী হন, স্বয়ং পূর্ণতম অস্তিত্বের বপুস্বরূপ হইয়াও রসের কাঙ্গাল হন—ইহাই তাঁহার ঔদার্য্য-স্বরূপ। সেই রসিকশেখর পরমকরুণ আবার 'পরম পুরুষ' হইলেন—ইহাই 'কৃষ্ণে স্বয়ংরূপতে' শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

"অনন্তচক্রপ্রায় সেই লীলাচক্র ফিরে।
সব লীলা ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে॥
জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর প্রকাশ।
পূতনা-বধাদি করি' যৌবনান্ত বিলাস॥
কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান।
তাঁতে লীলা 'নিত্য' কহে নিগম-পুরাণ॥

(চৈ চ ম ২০।৩৯১-৩৯৩)

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে কালে-কালে ক্রমে-ক্রমে নিত্যলীলা প্রকটিত হয়। এক ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া ১২৫ বর্ষকাল যৌবনান্ত-লীলা পর্য্যন্ত প্রকটিত হইয়া সেই ব্রহ্মাণ্ডে লীলার অপ্রকট হয়। শ্রীকৃষ্ণের লীলার কালকাল এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হইয়া, প্রথম-ক্ষণাদে দ্বিতীয় ক্ষণ আরম্ভ হইলে প্রথম-ক্ষণ-সম্বন্ধিনী লীলা অন্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হয়। এইরূপ অসংখ্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিক্ষণ-সম্বন্ধিনী লীলা প্রকট হইয়া অন্য ব্রহ্মাণ্ডে আবার সেই ক্ষণ-সম্বন্ধিনী লীলার উদয় হয়। ইহার উদাহরণে সূর্য্যের ভ্রমণমার্গ অর্থাৎ জ্যোতিশ্চক্রে ভ্রমণ কথিত হইয়াছে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য লীলা ক্রমে-ক্রমে উদিত হইয়া অপ্রকটিত হইতেছেন। জীবজ্ঞানে সেই অনন্ত লীলার উপলব্ধির সম্ভাবনা নাই। গঙ্গাধারা যেরূপ নিরবচ্ছিন্ন, অলাতচক্র যেরূপ নিরন্তর-ঘূর্ণায়মান ব্যাপক, শ্রীকৃষ্ণলীলার নিরবচ্ছিন্ন প্রাকট্যও সেইরূপ ভিন্ন-ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে উপলব্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, বাল্য ও পৌগণ্ড-কৈশোরাদি লীলা নিত্যকালই সম্ঘটিত হইতেছে। কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে অধিষ্ঠিত জীবের শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্য-প্রাকট্যানুভূতি না হইলেও তাঁহার লীলার নিত্যত্ব আছে। **সকল লীলার এক-কালে নিত্যপ্রাকট্যের মাঝেই 'নিত্য-লীলা'; কিন্তু প্রপঞ্চে অনুক্রমে লীলার প্রাকট্য ঘটে। তৎকালে অন্যান্য লীলা অপর ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট থাকে বলিয়া** কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে এক কালে নিত্যত্ব উপলব্ধ হয় না। বস্তুতঃ লীলা—নিত্য। চৌদ্দ মন্বন্তর অর্থাৎ কল্পের নির্দ্দিষ্ট কালে কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে ক্রমে শ্রীকৃষ্ণলীলা-মণ্ডল পুনরাবর্ত্তিত হয়। অতএব লীলা অনিত্য নহে। অন্য কোন ব্রহ্মাণ্ডে নিত্যলীলা পরিদৃষ্ট হয় না বলিয়া এই ব্রহ্মাণ্ডের লোক নিত্যলীলা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। এজন্য বেদ-পুরাণাদি নিত্য-লীলার কথাই বলেন। গোলোকের নিত্যবিহারস্থলী ক্রমে-ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়।

যখন এই ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরূপ-গুণ-লীলার অপ্রকট হইল, তখন কেবল 'শ্রীনাম' ও শ্রীনাম-কীর্ত্তনকারী শ্রীমদ্-ভাগবত প্রকাশিত থাকিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে উপগত হইলে গ্রন্থ-ভাগবতরূপে যে 'পুরাণার্কে'র উদয় হইল, তাহাই শ্রীকৃষ্ণপুরাণ বা শ্রীমদ্ভাগবত; আর ভক্ত-ভাগবতরূপে যে পুরাণার্কের উদয় হইল, তাহাই রসরাজ-মহাভাব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরহরি। এইজন্য পঞ্চতত্ত্বের নমস্কার-শ্লোকে শ্রীগৌরসুন্দর 'ভক্তরূপ কৃষ্ণ' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

"পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥"

(চৈ চ আ ১।১৪, ১।৬)

"কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব॥

ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্য-গোসাঞি।
'ভক্ত-স্বরূপ' তাঁর নিত্যানন্দ-ভাই॥"

(চৈ চ আ ৭।১১-১২)

পরমপুরুষ রসিকশেখর যখন স্বমাধুর্য্যাস্বাদনের জন্য ভক্তরূপ ধারণ-পূর্ব্বক পরমকরুণ-স্বরূপ প্রকট করিলেন, তখন বিশ্বে চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হইয়াছিল অর্থাৎ পুরাণ-পুরুষের আবির্ভাবকালে চন্দ্রমুখী-গ্রহণ হইল। পুরাণপুরুষ চন্দ্রমুখীকে অর্থাৎ শ্রীমার্কণ্ডেয়নদীকে গ্রহণ করিলেন—শ্রীমার্কণ্ডেয়নদীর ভাব বা অভিমান ও বর্ণ বা কান্তিটী গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরাধার ভাব-কান্তি-অঙ্গীকারকারী পরমপুরুষকে কি-জন্য সুমেধোগণ 'পুরাণ-পুরুষ' বলেন? শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু বলেন,—"পূরণাৎ পুরাণম্"—পূরণ করে বলিয়া ইঁহার নাম 'পুরাণ'। যাহার দ্বারা বেদের পূরণ হয়, তাহাই পুরাণ। বেদন-ধর্ম্ম আছে বলিয়াই তাহার নাম 'বেদ'। বেদন-ধর্ম্মের কার্য্য—কেবল অজ্ঞান দূর করা নহে, অনুভব বা সাক্ষাৎকার করান; সুতরাং যাহা সাক্ষাৎকার করায়, তাহাই 'বেদ' এবং সেই সাক্ষাৎকাররূপ বেদনধর্ম্মেরও যাহা পূরণ করে অর্থাৎ পরিশিষ্টতা সম্পাদন করে, তাহাই 'পুরাণ'। পরমপুরুষ যখন ভক্তরূপ আবিষ্কার করিয়া ভক্তিরস-পাত্র ভক্তভাগবত ও ভাগবত-পুরাণ-শাস্ত্রের সহিত সাক্ষাৎকার করান—অনুভব করান, তখনই তিনি 'পুরাণ-পুরুষ'। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু বলেন,—

"ন চাবেদেন বেদস্য বৃংহণং সম্ভবতি; ন হ্যাপরিপূর্ণস্য কনক কলসস্য ত্রপুণা পূরণং দৃশ্যতে।" (তত্ত্বসন্দর্ভ, ১২শ অনুচ্ছেদ, ১)।

যাহা বেদ নহে, তাহার দ্বারা বেদের পূরণ অসম্ভব। স্বর্ণকলসের কোন-স্থান-পূরণের প্রয়োজন হইলে সীসকের দ্বারা তাহা কখনও পূরণ হইতে পারে না। "পূর্ণপুরুষ" (ভা ১।৭।৪)—"পরমপুরুষ" (ভা ১।৭।৭) শ্রীকৃষ্ণের 'পূরণ'-শব্দের অর্থ—তাঁহার পরিশিষ্টতা সম্পাদন; খণ্ড-বস্তুর ন্যায় অংশ-বিশেষের অভাব পরিপূরণ করা নহে। অন্বয়-পরতত্ত্ব পরাকাষ্ঠা বা পূর্ণতম-তত্ত্বের পূরণ—অচিন্ত্যচমৎকারিতা-বিশেষ। শ্রুতি-মন্ত্র এই,—

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"

পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ নাম-রূপ-গুণ-পরিকর ও লীলার মধ্যে যাহা অবশিষ্ট ছিল, সেই পরম-চমৎকারিতারও চমৎকারিতা সম্পাদনরূপ পরিশিষ্টতা-বিধান যিনি করিলেন, তিনিই 'পুরাণ-পুরুষ'। শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাকে পূরণ করেন বলিয়া তিনি 'শ্রীকৃষ্ণপুরাণ' বা 'শ্রীমদ্ভাগবত'রূপে অবতীর্ণ। সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি (কর্ম্ম-বাসনা), মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ ও মুক্তি—এই দশলক্ষণাক্রান্ত মুক্তি নবম পদার্থ; সেই মুক্তির আশ্রয়-স্বরূপ দশম পদার্থরূপে যিনি পূর্ণতমস্বরূপ, তাঁহাকেও যিনি পূরণ করেন অর্থাৎ তাঁহারও নাম-রূপ-গুণ-পরিকর ও লীলার পরিশিষ্টতা সম্পাদন করেন, তিনিই 'পুরাণ-পুরুষ'।

শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু নবম-পদার্থ মুক্তিকে 'প্রেমভক্তি'-ই বলিয়াছেন। "তদেবমস্য সর্গো বিসর্গশ্চেত্যাদিষু দশ-শ্লোকীভাগবতমহাপুরাণ-পরিপাট্যেষু অর্থেষু মুক্তি-পর্যন্তেষু তস্যৈব বিপ্রাপ্তিঃ।" (শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ, ১৭শ অনুচ্ছেদ)।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, সেই পূর্ণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের লীলার মধ্যে কি অবশিষ্ট ছিল? উত্তরে সুমেধঃশিরোমণি শ্রীরূপসনাতনের গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন,—

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
দ্তদ্ভাঢ্যাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥"

(১) শ্রীরাধার (আশ্রয়বিগ্রহের) প্রণয়মহিমা কিরূপ? আমার (বিষয়বিগ্রহের) অদ্ভুতমধুরিমা, (২) যাহা শ্রীরাধা (আশ্রয়বিগ্রহ) আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ? আমার (বিষয়বিগ্রহের) মধুরিমার অনুভব হইতে (৩) শ্রীরাধারই (আশ্রয়বিগ্রহের) বা কি সুখের উদয় হয়?—এই তিনটী বিষয়ে লোভ জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শ্রীশচীগর্ভ-সমুদ্রে উদিত হইলেন।

আশ্রয়বিগ্রহ বিষয়বিগ্রহকে সুখ অনুভব করাইতেছিলেন, কিন্তু আশ্রয়-বিগ্রহের সুখ বিষয়-বিগ্রহের পক্ষে অনুভব করা অবশিষ্ট ছিল। অশ্রয়-জাতীয় ভাব-দ্বারা বিষয়-জাতীয় ভাবে সেই সেবা-সুখ আস্বাদিত হয় না; এইজন্য বিষয়বিগ্রহ আশ্রয়-জাতীয়ের ভাব অঙ্গীকার করিলেন। নাট্যশাস্ত্রের আদি-প্রবর্ত্তক ভরতমুনি করুণ ও কান্তার রসকে সমান বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি

মুনি হইলেও অপ্রাকৃত ব্রজরসের তত্ত্ব জানেন না। চিন্-রাজ্যে কান্তের রস অপেক্ষা কান্ত-রসের আধিক্য নিত্যসিদ্ধ।

"দোঁহার যে সম-রস, ভরত-মুনি মানে।
আমার ভক্তের রস নেহ নাহি জানে॥
অন্যের সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।
তাহা হৈতে রাধা-সঙ্গে শত অধিকাই॥
তা'তে জানি, মোতে আছে কোন এক রস।
আমার মোহিনী রাধা, তা'রে করে বশ॥
আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি, নারি আস্বাদিতে।
সেই সুখ-মাধুর্য্য মনে লোভ বাঢ়ে চিত্তে॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিব বিবিধ-প্রকার॥
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে-প্রকারে।
তাহা শিখাইব লীলা-আচরণ-দ্বারে॥
এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয়-ভাবে নহে তাহা আস্বাদন॥
রাধিকার ভাবকান্তি-অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥
রাধাভাব অঙ্গীকরি' ধরি' তা'র বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হ'ব অবতীর্ণ॥"

(চৈ চ আ ৪।২৫৭-৫৮, ২৬১-৬৮)

শ্রীকৃষ্ণলীলার দ্বারকা-মথুরা-বিগ্রহের দিব্যোন্মাদের কথা শুনা যায়, কিন্তু শ্রীগৌরলীলায় সংকীর্ত্তন-মহারাসে বিরহ-বিগ্রহের দিব্যোন্মাদ প্রকটিত হইয়াছে। যিনি শ্রীউদ্ধবের অবতার, সেই শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীগৌর-রূপী শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া বলিতেছেন,—

"বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ,-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী, কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥"

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে ৮।৭৪ধৃত সার্ব্বভৌমকৃত-শ্লোক)

'বৈরাগ্য' বলিতে কৃষ্ণেতর-বিষয়ে বিরাগ বা ভক্তির অনুপযোগী বৈরাগ্য, যাহা ভক্তির অসাধারণ লক্ষণ। ভক্তি-রহিত বৈরাগ্যই কর্ম্ম বৈরাগ্য, আর 'বিদ্যা' বলিতে যেরূপ-বর্ণাশ্রিকা অর্থাৎ অনুভবময়ী বা আনন্দদায়িনী বিদ্যা ও নিজভক্তিযোগ। যোগ-শব্দে পরমাবিষ্টতা বুঝায়। প্রথমতঃ-স্মৃতিময়ী যে ভক্তি, তাহা শিক্ষা দিবার জন্য লীলাপুরুষোত্তম পরমপুরুষ—'পুরাণ-পুরুষ' হইলেন। তিনি দুইভাবে শিক্ষা দিয়াছেন—এক আস্বাদন করিয়া, আর দ্বিতরণ করিয়া। তিনি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-শরীরধারী মহাবদান্য।

পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ পুরাণ-পুরুষ হইলেন—শ্রীভাগবত-পুরাণরূপে ও শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিপূরণকারী ঔদার্য্যবিগ্রহাবতাররূপে। শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রীগৌরসুন্দরের সত্তা অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরই—শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবতই —শ্রীগৌরসুন্দর। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠ কলত্রূপ। শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাগবত-স্বরূপিণী স্বয়ংরূপা সর্ব্বাংশিনী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীরই দ্বিতীয় বিগ্রহ। শ্রীমদ্ভাগবত যেরূপ স্বয়ংরূপ-শাস্ত্র, শ্রীগৌরসুন্দরও সেইরূপ স্বয়ংরূপ। অতএব শ্রীকৃষ্ণলীলার পরিশিষ্টতা-সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষ • শ্রীগৌরহরিই পুরাণ-পুরুষ। পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ, পরে শ্রীগৌর—এইরূপ কোনও ক্রম নাই। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য নিত্য-প্রকাশ। কে অগ্রে, কে পশ্চাৎ বলা যায় না। আগে শ্রীচৈতন্য ছিলেন, পরে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ হইলেন; আবার সেই দুই একত্র হইয়া এখন শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন—এ-কথার তাৎপর্য্য এই যে, কেহ আগে, কেহ পাছে, এরূপ নয়—দুই প্রকাশই নিত্য।"

"শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরকিশোর—ইঁহারা পৃথক্ তত্ত্ব ন'ন, উভয়ই মধুর-রসের আশ্রয়। একটু ভেদ এইমাত্র যে, মাধুর্য্য-রসে দুইটি প্রকার আছে অর্থাৎ মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য; তন্মধ্যে মাধুর্য্য যেখানে বলবৎ, সেইখানে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ এবং ঔদার্য্য যেখানে বলবৎ, সে-খানে শ্রীগৌরাঙ্গ-স্বরূপ।"

শ্রীগৌরলীলা কেবল সাধকগণের জন্য ও শ্রীকৃষ্ণলীলা সিদ্ধগণের আস্বাদনের জন্য—এরূপ বিচারও অপসিদ্ধান্ত। শ্রীগৌরলীলা শ্রীকৃষ্ণলীলার পরিশিষ্ট; সুতরাং সাধক ও পরমসিদ্ধ—উভয়ই এই লীলার সেবা ও আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু অগ্রে 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত'রচনা করিয়া পরে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-রচনার মধ্যে শ্রীগৌরলীলা আস্বাদন করিয়াছেন। শ্রীল

• "শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবে-বিশেষ এবায়ং গৌর ইত্যাদ্যাহুঃ, তদপ্যতিচারাৎ"—('সর্ব্বসম্বাদিনী'—মঙ্গলাচরণ)

কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণভজন-নিরত শ্রীবৃন্দাবনবাসী ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শেষলীলা-শ্রবণে চিত্ত উৎকণ্ঠিত হওয়ায় তিনি 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামি-বৃন্দ এবং শ্রীরূপানুগ ভক্তগণ সকলেই শ্রীব্রজভজনে অতি-নিবিষ্ট থাকিয়াও শ্রীচৈতন্যলীলানুশীলন-তৎপর ছিলেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের নিত্যভজন-পন্থী শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

"কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, নর্ত্তন-উল্লাস
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন, চারিদণ্ড শয়ন।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রেমে সেহ নহে কোন দিনে।
কভু ভক্তিরস-শাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্যকথা শুনে, করে চৈতন্য-চিন্তন॥"

(চৈ চ ম ১৯।১২৯-৩১)

"রাঘবাচার্য্য গোসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী।
চৈতন্যচরিতে তেঁহো অতি বড় রঙ্গী॥
পণ্ডিত-গোসাঞির শিষ্য—ভূগর্ভ গোসাঞি।
গৌরকথা বিনা তাঁর মুখে অন্য নাই॥
তাঁর শিষ্য—গোবিন্দ-পূজক চৈতন্যদাস।
মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী, প্রেমী কৃষ্ণদাস॥
আচার্য্য-গোসাঞির শিষ্য—চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ।
নিরবধি তাঁর চিত্তে শ্রীচৈতন্যানন্দ॥
আর যত বৃন্দাবনে বৈসে ভক্তগণ।
শেষ-লীলা শুনিতে সবার হৈল মন॥
মোরে আজ্ঞা করিল সবে করুণা করিয়া।
তাঁ-সবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া॥"

(চৈ চ আ ৮।৬৭-৭২)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণলীলার পরিশিষ্টতা সম্পাদন করিয়াছেন, বলিয়াই শ্রীব্রজভজনানন্দিগণ শ্রীচৈতন্যলীলা-আস্বাদনে এত আগ্রহবিশিষ্ট ছিলেন। চমৎকারিতা-বিশেষের দ্বারা পরিশিষ্টতা-সম্পাদনকারী ও উদার্য্যবিগ্রহ-রূপে তাহার বিতরণকারী শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ শ্রীগৌর-হরিই, এইজন্য, 'পুরাণ-পুরুষ'। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

"গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তা'রে স্ফুরে,
সে জন ভকতি-অধিকারী।
• • • •
গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধা-মাধব-অন্তরঙ্গ॥"

শ্রীগৌরাঙ্গের গুণে যিনি সর্ব্বদা আবিষ্ট, তাঁহারই শ্রীশ্রীরাধামাধবের নিত্যলীলা স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হয়; তিনিই প্রেম-ভক্তির অধিকারী। যিনি শ্রীগৌরপ্রেমরস-সমুদ্রে সর্ব্বদা নিমজ্জমান, তিনিই শ্রীশ্রীরাধামাধবের অন্তরঙ্গ নিজ-জন।

শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আনুমানিক খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে শ্রীশঠকোপমুনি অপ্রাকৃত শ্রীকামদেবের কামিনী অভিমানে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্রয়-বিগ্রহ-শিরোমণির আনুগত্যে যে বিষয়-বিগ্রহের সেবানুকূল্য অর্থাৎ সুখানুসন্ধান, তাহার অস্ফুট ভাবোদয় শ্রীবৃন্দাবনীয় কল্পদ্রুমাধঃস্থ মহাযোগপীঠের অবতার—শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের হৃদয়ে হয়। শ্রীরাধা-ভাবদ্যুতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাবৈশিষ্ট্যের কথা পূর্ব্বেও মহাজনগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীরাধাভাবদ্যুতির আনুগত্যে যে ভজন-প্রণালী, তাহা পুরাণ-পুরুষ শ্রীগৌর-সুন্দরই পূর্ণতমভাবে প্রকটিত করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনবদ্বীপ-লীলায় শ্রীমহাপুরুষ ও তাঁহার অংশাবতারগণের তথা শ্রীমহাপুরুষের আশ্রয়বিগ্রহগণের লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এজন্য শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে শ্রীগৌরসুন্দর সম্ভোগলীলা প্রকট করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন,—

"বিদ্যা সৌন্দর্য্য-সংবেশ-সম্ভোগ নৃত্য-কীর্ত্তনৈঃ।
প্রেমনাম-প্রদানৈশ্চ গৌরো দ্যোতি যৌবনে॥"

(চৈ চ আ ১৭।৩)

বিদ্যা, সৌন্দর্য্য, সংবেশ, সম্ভোগ, নৃত্য, কীর্ত্তন, প্রেম ও নামদানের দ্বারা শ্রীগৌরচন্দ্র যৌবনকালে লীলা প্রকট করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপাগ্রজবর শ্রীশ্রীকবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর ইঙ্গিতানুসারে শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী শ্রীহ্লাদিনী-শক্তির প্রকাশ-বিশেষ। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর লীলা খুব গূঢ়। এইজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাহা বিশেষভাবে প্রকাশ করেন নাই।

শ্রীমুরারি-গুপ্তের শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীবাস পণ্ডিতের শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীকাশীমিশ্রের শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এবং শ্রীস্বরূপদামোদর-শ্রীরূপ-সনাতনের শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে চমৎকারিতা-বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আছে। ইহা অন্যান্য রসিক ও ভাবুকগণের অনুভবের বিষয়।

শ্রীল মুরারিগুপ্ত ঠাকুর এইভাবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের স্তব করিয়াছেন,—

"স জয়তি বিনত-বিনয়ঃ, কনকাভঃ কমলায়তেক্ষণঃ।
বরদাভয়দণ্ডি-বর-ভুজঃ, বহুধা ভক্তিরসাভিনর্ত্তকঃ॥
জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো
জয়তি জয়তি কীর্ত্তিস্তস্য নিত্যা পবিত্রা।
জয়তি জয়তি ভৃত্যস্তস্য বিশ্বেশমূর্ত্তে-
র্জয়তি জয়তি নৃত্যাং তস্য সর্ব্বপ্রিয়াখ্যাম্॥"

শ্রীনারদাভিন্ন শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের নিত্য-জন শ্রীচৈতন্যলীলা-ব্যাস শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দকে এইভাবে স্তব করিয়াছেন,—

"আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈক-পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎ-প্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥"

শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে এইভাবে স্তব করিয়াছেন,—

"বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥
কালাবৃষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্ত-ভৃঙ্গঃ॥"

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামি-প্রভু এইভাবে স্তব করিয়াছেন,—

"রাধা-কৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ-স্বরূপম্॥
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত-মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥"

শ্রীস্বরূপের মিত্রবর শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবকে এইভাবে স্তব করিয়াছেন,—

"যদ্বিভ্রন্নিজভাবং যো বিভাব্য স্বভাবাৎ
সুমধুরমবতীর্ণো ভক্তরূপেণ লোভাৎ।
জয়তি কনকধাম্না কৃষ্ণচৈতন্যনাম্না
হরিরিহ যতিবেশঃ শ্রীশচীসূনুরেষঃ॥"

শ্রীসনাতনাত্মা শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরকে এইভাবে স্তব করিয়াছেন,—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥
অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥"

শ্রীরূপপ্রভু আবার শ্রীচৈতন্য-বিরহ-কাতর হইয়া শ্রীনীলাচলের নীলাম্বুধির তটে দিব্যোন্মাদে বিহারশীল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের স্মৃতিতে উদ্দীপ্ত হইয়া গাহিয়াছেন,—

"পরোরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালী-কলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্যস্মরণ-জনিত-প্রেমবিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥"

শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভুও শ্রীস্বরূপ-রূপের দ্বারায় শ্রীগৌরহরির সেই বিপ্রলম্ভাত্মক শ্রীমূর্ত্তিরই আরাধনা করিয়াছেন,—

"ক্ব মে কান্তঃ কৃষ্ণস্মরিতমিহ তং লোকয় সখে
ত্বমেবেতি দ্বারাধিপমভিদধন্নুদ্ধ ইব।
দ্রুতং গচ্ছ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃতত-
দ্ভাবো গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥
অনালোলাখেলামহসি বরতল্পস্য পুরতঃ
স্বরূপে স্বেনাপি স্বনিজগণেনাপি মিলিতঃ।
স্বয়ং কুর্ব্বন্নাদ্যৈরতিমধুরগানৈঃ মুরভিদঃ
সরঙ্গো গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥"

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু তৎকৃত শ্রীশ্রীতিথিনির্ণয়ে এইভাবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রকে স্তব করিয়াছেন,—

"আলোড়িতঃ পরিত্যক্তঃ প্রকটিতঃ সানন্দমালোকিতঃ
আত্মাপিতঃ পুনঃ-কলোহরহিতো যোগেশ্বরাদ্যৈর্হরিঃ।
বৃন্দারণ্যভুবি প্রকাশমধুরঃ সর্ব্বাতিশায়িস্থিতো
রাধামাধবয়োঃ প্রমোদয়ন্ মামুল্লাস কল্পদ্রুমঃ॥
তাদৃগ্ভাবং তাবং প্রথয়িতুমিহ যোঽবতারমায়াতঃ।
আদুর্জ্জন-পরশং স ভবতি চৈতন্যবিগ্রহঃ কৃষ্ণঃ॥"

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার কোন্ ভক্তের হৃদয়ে কিরূপভাবে প্রকটিত হইয়াছিলেন, তাহা সুধী পাঠকগণ এই সকল স্তব হইতে উপলব্ধি করিতে পারেন। এ বিষয়ে আমরা অধিক বিস্তার না করিয়া সুধী পাঠকগণের নিকটই ইহা আস্বাদন ও উপলব্ধির জন্য পরিবেশন করিয়া কান্ত হইলাম। শ্রীস্বরূপ রূপানুগবরাশ্রয়ে শ্রীশ্রীগৌরহরির বৈশিষ্ট্য ইহা হইতে উপলব্ধি হইবে। শ্রীকবিকর্ণপুর, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ প্রভৃতি তাঁহাদের স্তবস্তব ভাবানুসারে শ্রীগৌরহরিকে স্তব করিয়াছেন। বস্তুতঃ সেই পরম-পুরুষ —যিনি 'পুরাণ-পুরুষ'-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাতে সমস্ত মাধুর্য্য ও ঔদার্য্যই সুসমন্বিত।

"গুরুদেবতাত্মা"

'গুরুদেবতাত্মা'-শব্দের তাৎপর্য্য

"গুরবেব দেবতা ঈশ্বর আত্মা প্রেষ্ঠশ্চ যস্য সঃ—'গুরুদেবতাত্মা'।" গুরুই 'দেবতা' অর্থাৎ ঈশ্বর, 'আত্মা' অর্থাৎ প্রেষ্ঠ যাঁহার, তিনিই 'গুরুদেবতাত্মা'—ইহাই শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ 'গুরুদেবতাত্মা'-শব্দের টীকায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'ঈশ্বর'-শব্দের তাৎপর্য্য শ্রীস্বামিপাদের ভাষায় "কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুং সমর্থঃ"—যিনি করিতে, না করিতে ও অন্যথা করিতে সমর্থ, তিনিই 'ঈশ্বর'; এক কথায় যিনি—সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র। শ্রীভগবান্—সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র; ঐকান্তিক ভাগবতোত্তমেও তাঁহার সেই সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতা-গুণ সঞ্চারিত। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে যিনি সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ও ত্রিকালজ্ঞ-দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সুখানুসন্ধান-স্বভাবময়ী অব্যভিচারিণী ভক্তির সহিত হরিভজন করেন, তিনিই 'বৈষ্ণবাগ্রণী মান্য' হইতে পারেন, অপরে নহে।

সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতায় সন্দিহান ব্যক্তি—গুরু-দ্রুহ-ত্যাগী

শ্রীগুরুদেবের সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতায় যাহার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ আছে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই শ্রীগুরুপাদপদ্মে মর্ত্যবুদ্ধিকারী, অসূয়াপরায়ণ, মৎসর; অতএব অপরাধী। শ্রীগুরুদেবকে যে ব্যক্তি নিজেরই মত রক্তমাংসের বর্ম্ম-যুক্ত জীব মনে করে, অথচ বাহিরে অর্চ্চনাদি আড়ম্বর প্রদর্শন করে, সেই মায়িক বা কপটী শ্রীহরিদেবকে বহু পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করিয়াছে; তাহার বাহ্য গুরুপূজার অভিনয় দৌরাত্ম্যের আত্মরক্ষন-চেষ্টার আদর্শ।

"যোঽসূয়িতস্তেন দৌরাত্ম্যঃ প্রকটীকৃতম্।
গুরুণে পরিত্যক্তেন ত্যক্তঃ পূজা হরিঃ॥"

(ভ র, ২০৭ অনুচ্ছেদ-ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-বাক্য)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি গুরুকে পরিত্যাগ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি করিয়াছে, তাহার দ্বারা জ্ঞান কলুষিত ও দৌরাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ব্যক্তি শ্রীহরিকে পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করিয়াছে।

পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা গুরু-নির্ণয় অসম্ভব

ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়া বা তাহাতে সাধু বা গুরুর লক্ষণ ও আচার-প্রচারের কথা শুনিয়া যদি কোন ব্যক্তি গুরুকে মাপিতে চাহে, তবে তাহার কোনদিন গুরু-দর্শন হইবে না। শ্রীহরিভক্তিবিলাস, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বা শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থাধিরাজ-চূড়ামণি গ্রন্থ হইতে শ্রীগুরুদেবের লক্ষণ, মহতের লক্ষণ ও আচরণাদি, এমন কি, পূর্ব্ব মহাজনগণের আচরণাদির কথা অবগত হইয়া বা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ (?) করিবার অভিমান করিয়াও আধ্যক্ষিক-জ্ঞান-প্রভাবিত বদ্ধজীব অর্থাৎ লঘুব্যক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্ধান প্রাপ্ত হইতে পারে না। ঐ-সকল লক্ষণ ও আচার-প্রচারের সহিত মিলাইয়া বদ্ধজীব মহৎ বা শ্রীগুরুদেবকে চিনিতে পারে না; চিনিতে পারা দূরে থাকুক, চিনিবার বা চিনাইবার দুষ্প্রবৃত্তি

হইলেও তাহার সর্ব্বনাশ হয় অর্থাৎ সে অপরাধ-পঙ্কে চির-নিমজ্জিত হয়।

প্রত্যক্ষ উদাহরণ

প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে কোন এক বিশেষ পণ্ডিত ও ভ্যাগী ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভুর আচরণের কথা পাঠ করিয়া সেইরূপ সদ্গুরুপাদপদ্মের অনুসন্ধানে বহির্গত হন। সে ব্যক্তি কোন মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ জগদ্গুরুর দর্শনার্থে আগমন করিয়া যখন দেখিতে পাইলেন যে, সেই মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ তাঁহার ধারণার শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভুর ন্যায় শুষ্কমাত্র-ত্যাগী নহেন বা কৌপীনমাত্রধৃক্ নহেন, পরন্তু তিনি আচার্য্যোচিত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে অবস্থান করেন, তখন উক্ত ব্যক্তির সিদ্ধান্ত হইল যে, পৃথিবীতে শ্রীল রঘুনাথের ন্যায় নিষ্কিঞ্চন কোন গুরুদেব নাই। ঐ ব্যক্তি তাহার পঠিত ও কল্পিত ধারণার দ্বারা শ্রীগুরুদেবের সন্ধান করিতে গিয়া এরূপ অপরাধে নিমজ্জিত হইল যে, কোনদিন আর তাহার সদ্গুরু-পাদপদ্মের সন্ধান-লাভ হইল না বা হইবে না। আরও কয়েকটী ব্যক্তির বিষয়ে জানা যায় যে, তাহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীশ্রীগৌরনারায়ণের আচার ও উপদেশ নিজে নিজে পাঠ করিয়া বহু বৎসর পূর্ব্বে কোন্ নিষ্কিঞ্চন জগদ্গুরুদেবের দর্শনে আসিয়াছিল। যখন উহারা দেখিতে পাইল এবং জানিতে পারিল যে, সেই ভাগবতপরমহংস-প্রবর বেষ-গ্রহণের লীলা প্রকট করিবার পরও গোলোকানুবৃত্তিতে পূর্ণাশ্রমে অবস্থান করেন, তখন সেই-সকল ব্যক্তি মহা-ভাগবত-পরমহংসের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়া দূরে থাকুক, পরন্তু তাঁহার নিন্দক হইয়া অনন্ত-নিরয়গামী হইয়া পড়িল। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মাপিতে গেলে শক্তিশালী পুরুষগণেরও যে কি অবস্থা হয়, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীদামোদর-পণ্ডিত, শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র, শ্রীল গদাধর-পণ্ডিত প্রভৃতির ন্যায় শ্রীগৌরপার্ষদগণ কৃপাপূর্ব্বক যে-সকল অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহাই সুবুদ্ধি সাধকগণের সম্মুখে অনাদি অনন্তকাল সতর্কতার পতাকারূপে দেদীপ্যমান থাকিবে। শ্রীদামোদর-পণ্ডিত "নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য" শ্লোকের বক্তা শ্রীশ্রীগৌর-নারায়ণকে "যাও ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেনে কর?"—(চৈ চ অ ৩।১৫), অথবা শ্রীপ্রদ্যুম্ন-মিশ্র শ্রীরায়-রামানন্দের দেবদাসী-সেবার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া জগদ্গুরু শ্রীরায়-রামানন্দের প্রতি যেরূপ বিচার করিবার অভিনয় করিয়াছিলেন, অথবা শ্রীল গদাধর পণ্ডিত শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি প্রতি লোক-শিক্ষার্থ যেরূপ ধারণা করিবার অভিনয় করিয়াছিলেন, অথবা শ্রীল গৌর-কিশোর প্রভু কোন লৌকিক গোস্বামীকে বন্দনা করিবার জন্য অন্যায়ভাবে শ্রীগৌরজনকে 'কলির ব্রহ্মাণ্ড' হইতে মস্তকে করিয়া শ্রীধামে আনয়ন করিবার যে আদেশ-প্রদান-প্রতিষেধ-লীলা করিয়াছিলেন, সেই সকলের মর্ম্ম কেহ পুঁথি-পত্র পড়িয়া বা বিচার-বুদ্ধি-মনীষার দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারে না অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে বিচারের আধার মস্তিষ্ক মাপিতে পারে না। এজন্যই শ্রীশ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন তাঁহার শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে একাধিকবার উচ্চকণ্ঠে গাহিয়াছেন,—

"ভাগবত পড়িয়াও কা'রো বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে যাইবেক নাশ॥
(চৈ ভা ম ৯।২৪২)
ভাগবত পড়িয়াও কা'রো বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে হইবে সর্ব্বনাশ॥"
(চৈ ভা ম ২০।১৫০)

আবার বলিয়াছেন,—

"ভাগবত পড়াইয়া কা'রো বুদ্ধিনাশ।
নিন্দে অবধূতচাঁদে জগৎনিবাস॥"
(চৈ ভা ম ২১।২৮)

সমগ্র শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীনিত্যানন্দ-কৃপা শ্রীব্যাসাবতার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মাপিয়া লইবার বুদ্ধিকারী ব্যক্তিগণের প্রতি সুতীব্র কশাঘাত করিয়াছেন; এমন কি, তাহাদের মস্তকে পদাঘাত পর্য্যন্ত করিয়া অমায়ার কৃপা করিবার অদ্ভুতপূর্ব্ব মহাবদান্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সমগ্র শ্রীচৈতন্যভাগবতের ইহাই সার উপদেশ যে, "শ্রীভাগবতরূপী শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও বিষ্ণু শ্রীবৈষ্ণবপাদপদ্মকে মাপিতে যাইও না; তোমার সর্ব্বনাশ হইবে, তুমি পুড়িয়া মরিবে। তোমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের আয়তন কতটুকু যে, ব্রহ্মজ্ঞানকেও যিনি অতিক্রম করিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুজনকে তোমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের দ্বারা মাপিয়া লইতে পারিবে!"

সন্দেহবাদিগণের পূর্ব্বপক্ষ

কেহ কেহ বলেন,—'শ্রীগুরুপাদপদ্ম যদি বদ্ধজীবের অধিকার বিচার না করিয়া কেবল স্বতন্ত্র আচার প্রদর্শন

করেন, তবে বদ্ধজীব কি করিয়া তাহা ধারণা করিতে পারিবে এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতিষ্ঠা বা কিরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিবে? দিগ্বিজয়ী মহদ্গণ যাহা ইচ্ছা তাহা করুন; কিন্তু যিনি গোষ্ঠানন্দী শ্রীগুরুদেব, তাঁহার কর্ত্তব্য—অনর্থযুক্ত শিষ্যের অধিকার বুঝিয়া তদ্রূপ আচরণ করা।'

শ্রীগুরুপাদপদ্ম—সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র

লোকশিক্ষক শ্রীগুরুদেব বা মহৎ যে সর্ব্বক্ষণই আমাদের বিচার বা ধারণা-অনুসারে চলিবেন, তাহা নহে। গোষ্ঠানন্দী শ্রীগুরুদেবও সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র। তিনি জীবের ধারণা বা পুথি-পত্র হইতে লব্ধ বিচারের কিঙ্কর নহেন। যিনি ঐকান্তিক, তিনি যাহাই করুন, তাহাই বিধি ও শাস্ত্র। ইহা স্মৃতিশাস্ত্রও স্বীকার করেন,—

"সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ"

অর্থাৎ বেদের প্রমাণ যেরূপ স্বতন্ত্র, সাধুগণের আচারও সেইরূপ স্বতন্ত্র প্রমাণ।

ঐকান্তিক মহদ্গণ যাহা করেন, তাহাই শাস্ত্র, তাহাই বেদ; কারণ, তাহাতে পরতত্ত্বের পরম সুখ হয়। পরতত্ত্বের পরমসুখানুসন্ধান ব্যতীত ঐকান্তিক মতের কোনই কৃত্য নাই। আমার কিঙ্কর বদ্ধজীবের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের সদসদ্-বিচারের ছাঁচে সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ঐকান্তিকের আচরণকে ঢালা যায় না। প্রত্যেক মহাজনের আচরণ পরস্পর স্বতন্ত্র এবং প্রকৃষ্টের পরম-সুখদ। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি শ্রীগুরুপাদপদ্মের লীলা করিয়া যে সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র আচরণ প্রকট করেন বা সকল জীবজগতের মূল গুরুপাদপদ্ম শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু যে সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র আচরণ প্রকট করেন, তাহাই শাস্ত্র; কিন্তু ঈশ্বরগণের সেই একচেটিয়া আচরণ অনীশ্বর শিষ্য বা সাধকের অনুকরণীয় নহে, অনুকরণ করিলে মৃত্যু অনিবার্য্য।

শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে,—সকলেই ত' শ্রীরায়-রামানন্দ বা শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নহেন, সকলেই ত' শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নহেন? তত্ত্ববিৎ মহদ্গণ বলেন,—যিনি শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন, শ্রীরায়-রামানন্দাভিন্ন পরমহংসশ্রেষ্ঠ নহেন, তিনি গুরুপদ-বাচ্যই হইতে পারেন না। যে ব্যক্তি শ্রীনিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ বা শ্রীরায়-রামানন্দাভিন্নবিগ্রহ ব্যতীত অন্য কোনও মনুষ্যকে গুরু করিয়াছে বা গুরু করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তির শুদ্ধকরণ হয় নাই বা হয় না; সে হয় কপটী, না হয়, অসৎ মনু ব্যক্তির আশ্রিত। তাহাকে 'কপটী' বলিবার কারণ এই যে, সে শ্রীনিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে নিজের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের দ্বারা অনিত্যানন্দ মনে করিতেছে বা মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ শ্রীনারদকে দেবতাগণের ন্যায় সাধারণ পুণ্যবান্ ঋষিরূপে দর্শন করিতে বা বিচার করিতে চাহিতেছে—সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র "কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থ ঈশ্বরঃ" বা শ্রীগুরুদেবরূপে নহে।

যাঁহারা বাস্তব শ্রীগুরুদেবকে শ্রীরায়-রামানন্দাভিন্নবিগ্রহ হইতে অন্য কিছু মনে করেন অথবা কল্পনা বা আরোপের দ্বারা শ্রীরায় রামানন্দ বা শ্রীনিত্যানন্দ মনে করেন, কিংবা শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীরঘুনাথ হইতে শ্রীরায়-রামানন্দকে পৃথক্ মনে করেন, তাঁহারা শ্রীবৃন্দাপ্রেষ্ঠকে শ্রীগুরু করেন নাই, মায়াকে বা পুণ্যবান্ ঋষিমাত্রকে গুরু করিয়াছেন বা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। শ্রীগুরুদেব পুণ্যবান্ ঋষি নহেন; তিনি—সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ঈশ্বর। শ্রীগুরুপাদপদ্মের 'ঈশ্বরত্বে'র উপলব্ধি না হইলে মায়া-জয় হইতে পারে না অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের দর্শনই হয় না। তবে ইহাও নহে যে, শ্রীগুরুপাদপদ্ম বিষয়-বিগ্রহ বা সম্ভোক্তা। শ্রীরায়-রামানন্দ বিষয়-বিগ্রহ বা সম্ভোক্তা নহেন; তিনি আশ্রয়-বিগ্রহ-শিরোমণির নিজ-জন-রূপে শ্রীশ্রীরাধামাধবের নিত্যসুখানুসন্ধানকারী শ্রীগুরুদেব।

আচার্য্যগণের আচার পরস্পর শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপর, স্বতন্ত্র ও মৌলিক

শ্রীশ্রীল-সনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীরঘুনাথাদি গোস্বামিবৃন্দ নিত্য-সিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ হইয়াও স্বেচ্ছাবশে যে সাধক-জীবোচিত লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও তাঁহাদের সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা। আবার শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী, শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু-প্রমুখ গোষ্ঠানন্দী জগদ্গুরুগণ যে নিত্যসিদ্ধোচিত-লীলা প্রকট করিয়াছেন, তাহাও তাঁহাদের সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা। এক মহাজনের আচরণের দ্বারা অপর মহাজনকে মাপা যায় না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কলিকাতা-নগরীকে "শ্রীশ্যামসুন্দরীর চিন্ময় কুঞ্জ" (স তো ৯।১২) বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীভাগবতাচার্য্য-প্রভুর স্থিতিতে আবিষ্ট হইয়া তথায় সংকীর্ত্তন করিয়াছেন। আবার শ্রীল গৌরকিশোরপ্রভু সাধকোচিত-লীলা প্রকাশ করিয়া কলিকাতাকে 'কলির

ব্রহ্মাণ্ড' বলিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাসমূর্ত্তিতে শ্রীগুরুদেবের "কলির ব্রহ্মাণ্ডে যাইও না, যার ঘরে করিয়া হরিনাম কর"—এই সাক্ষাৎ আদেশ-লঙ্ঘন-প্রতিম-লীলা প্রকট করিয়া 'কলির ব্রহ্মাণ্ডে' (বস্তুতঃ প্রপঞ্চাতীত শ্রীধামে) গোকুল-মহোৎসব শ্রীনামের কীর্ত্তন অবতরণ করাইয়া এবং সর্ব্বত্র কপাট খুলিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া অর্থাৎ কীর্ত্তন প্রচার করিয়া সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীগৌরশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীগোষ্ঠীপূর্ণ শ্রীনারায়ণমন্ত্র-গ্রহণের প্রকৃত অধিকারী পৃথিবীতে দেখিতে না পাইয়া শ্রীলক্ষ্মণ-সেনিকের ন্যায় ভাগবতবরকে অষ্টাক্ষরের প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। অবশেষে শ্রীরামানুজের অত্যন্ত কাতরতা দেখিয়া সর্ব্বতন্ত্র-মন্ত্র-দানকালে বলিয়া দিয়াছিলেন,—"এক শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত এই মন্ত্র-রাজের রহস্য আর কেহ অবগত নহেন। আমি তোমাকে অত্যন্ত স্নিগ্ধ জানিয়া এই মন্ত্র প্রদান করিলাম। কলিকালে ইহার অধিকারী আর দ্বিতীয় কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না। সুতরাং তুমি এই মন্ত্র আর কাহাকেও দিবে না।" শ্রীরামানুজ শ্রীগুরুদেবের নিকট বিদায় লইয়া শ্রীরঙ্গমের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং গমনকালে পথিমধ্যে যাহাকে দেখিতে পাইলেন, তাহাকেই এই বলিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন,—"তোমরা শ্রীমন্দিরের নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে এক অমূল্য রত্ন দান করিব।" এই কথা শুনিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার একটি বিরাট জনতা ক্রমে ক্রমে শ্রীমন্দিরাভিমুখে সমবেত হইল। তখন শ্রীরামানুজ শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাদাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া বন্ধনির্ঘোষে জনতাকে গুপ্তোপ্য অষ্টাক্ষর শ্রীনারায়ণ-মন্ত্র প্রদান করাইলেন। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের কর্ণে একাকী নির্জ্জনে মন্ত্র প্রদান করেন—ইহাই শাস্ত্রোক্ত বিধি; বিশেষতঃ শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাদাদেশ লঙ্ঘন করিয়া শ্রীরামানুজাচার্য্য যে লীলাটী প্রকাশ করিলেন, ইহা তাঁহার সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র আচার্য্য-লীলা। এখানে শিষ্য শ্রীগুরুদেবের প্রদর্শিত ব্যবস্থা বা আচার-প্রচারের 'মাছি-মারা কেরাণী' না হইয়া যে লীলাটী করিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহার আচার্য্যত্বই অধিকতর সম্প্রকাশিত হইল।

বদ্ধজীবে সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা-আরোপ—জনরাশকর

যাহাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রকৃতপ্রস্তাবে চিন্ময়ানুভব-বিশিষ্ট শ্রীনিত্যানন্দবাতিরিক্ত-বিগ্রহ নহেন, অথচ যাহারা কল্পনা বা আরোপের দ্বারা কাম-ক্রোধাদি-রিপুর দাস বদ্ধজীবকে বা সাধক-জীবকে 'গুরু' মনে করিয়া তাহাকে শ্রীনিত্যানন্দের আসনে বসাইবার অনধিকারীর অপরাধ করে, সেই-সকল মনোধর্ম্মী অতিবাড়ী ব্যভিচারী ব্যক্তিগণের যে চেষ্টা, তাহা প্রকৃতই অপরাধদুষ্ট ও পাপপুষ্ট ব্যবহার। কিন্তু যিনি প্রকৃতই শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম, অর্থাৎ যাঁহার প্রত্যেকটী কার্য্য শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের সুখানুসন্ধানময়, তাঁহার সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতায় যে ব্যক্তি বিন্দুমাত্রও অবিশ্বাস বা সন্দেহ করে, সেই ব্যক্তিরই গুরু-করণ হয় নাই; সেই ব্যক্তি গুরুদাস নহে,—কপটী বা দাম্ভিক। এই জন্য শ্রীগুরুদাস শ্রীনিত্যানন্দকৃত্য শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বজ্রগম্ভীর-স্বরে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন,—

"যদিহা যবনী ঘরে নিত্যানন্দ করে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে॥"

(চৈ ভা অ ৬।১২৩)

"নিত্যানন্দ-স্বরূপ—পরম অধিকারী।
অল্প-ভাগ্যে তাহানে জানিতে নাহি পারি॥
অলৌকিক চেষ্টা যেবা কিছু দেখ তান।
তাহাতেও আদর করিলে পাই ত্রাণ॥
পতিতের ত্রাণ লাগি' তাঁ'র অবতার।
যাহা হইতে সর্ব্বজীব হইবে উদ্ধার॥
তাঁহার আচার—বিধি-নিষেধের পার।
তাঁহারে জানিতে শক্তি আছয়ে কাহার?
না বুঝিয়া নিন্দে তাঁ'র চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তা'র বাধ॥"

(চৈ ভা অ ৬।১১৪-১১৯)

'পতিতের ত্রাণে'র জন্য শ্রীনিত্যানন্দের অবতার ও তাঁহা হইতে সর্ব্বজীবের উদ্ধার হয়—ইহাও যেরূপ সত্য, তাঁহার আচার যে 'বিধি-নিষেধের পার', ইহাও সেইরূপই সত্য। পতিতের ত্রাণ বা সর্ব্বজীবের উদ্ধারের জন্য তাঁহার অবতার বলিয়া তিনি সর্ব্বজীবের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের ভাল-মন্দের 'আসামী' হ'ন না। তাঁহার যদি কোনপ্রকার অলৌকিকী অর্থাৎ সর্ব্বলোক-বিরুদ্ধ-প্রতিম কোন অতিমর্ত্ত্য-চেষ্টা দেখা যায়, তাহা হইলে তাহারই আদর অর্থাৎ তাহাতে শ্রদ্ধাই করিতে হইবে। ভগবৎসম্বন্ধি দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা—শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার একটি বাহ্য লক্ষণ।

অতএব যাহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্রতায় বিশ্বাস বা অলৌকিকত্বে আদর অর্থাৎ শ্রদ্ধা হয় নাই, সেই ব্যক্তি শরণাগত হইতে পারে নাই; সে শিষ্য নহে, সে গুরু হইতে চাহে অর্থাৎ ঈশ্বরকে ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের বিচারের অধীন বা আপাধী করিতে চাহে! কাজেই মস্তিষ্কের দ্বারা বিচার করিতে গিয়া গুরুনিন্দারূপ অপরাধ তাহার পক্ষে নৈসর্গিক হইয়া পড়ে। সেই ব্যক্তিতে বিষ্ণুভক্তি বা ব্রহ্মজ্ঞানাদি-গুণ থাকিলেও সে অত্যন্ত অপরাধী, সুতরাং মায়াধীশের মায়া অতিক্রম করিতে পারে না। শ্রীগুরুতে দেবতা-বুদ্ধি অর্থাৎ ঈশ্বর-বুদ্ধি হইলে মায়া জয় করা যায়। সর্ব্বজীবের উদ্ধারের জন্য শ্রীনিত্যানন্দাদিরূপ শ্রীগুরুদেবের অবতার হয় বলিয়া তিনি সর্ব্বজীবের ভোগ্য-ধারণার অনুযায়ী আচার-প্রচার প্রকাশ করিবেন, ইহা বঞ্চনীয় দাবী করিতে পারে না। শ্রীহরিদেবগ্রেষ্ঠ শ্রীমহাদেব সতীর জন্য সর্ব্বজীবের ভোগ্য-ধারণার অতীত আচরণ প্রকট করিয়া শ্রীপার্ব্বতীদেবীকে ক্রোড়ে স্থাপন করিতে পারেন। জগদ্গুরুর এই অলৌকিক আচারে যিনি সর্ব্বহৃদয়ে আদর করেন, তিনিই প্রকৃত শরণাগত শিষ্য এবং তাঁহারই গুরুকরণ হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মে ঈশ্বর-বুদ্ধি হইয়াছে। যে দুর্ভাগার মস্তিষ্কের দ্বারা বিচার-ফলে জগদ্গুরু শিবের এই অলৌকিকী চেষ্টায় বিন্দুমাত্রও সংশয় উপস্থিত হয় তাহার বিষ্ণুভক্তি থাকিলেও অসুর-যোনি-লাভ হয়—এই শিক্ষা-প্রদর্শনচ্ছলে শ্রীমহাদেবের সতীর্থ শ্রীসত্যব্রত-শিষ্য শ্রীচিত্রকেতুর শ্রীমহাদেবের ঈশ্বরত্বে সন্দেহ-লীলা ও তদপরাধফলে অসুর-যোনি-লাভের অভিনয়ের সাক্ষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীগুরুদেব ও শ্রীমহাদেবকে সমপর্য্যায়ে গণনা করিয়াছেন। কারণ, শ্রীগুরুদেব শ্রীমহাদেবের ন্যায়ই শ্রীহরিদেব-শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিদেবের পরিপূর্ণ সুখানুসন্ধানকারী। শ্রীমহাদেব যে সভামধ্যে নির্লজ্জের ন্যায় শ্রীপার্ব্বতীদেবীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছেন, ইহাতে শ্রীসত্যব্রতদেবের পূর্ণ সুখ হইয়াছে। কিন্তু যাহারা নিত্যসত্যসঙ্গের জাগতিকবর্ণের রহস্য অবগত নহে, সেই-সকল ইন্দ্রিয়তাড়িত সমংসর সকৈতব ব্যক্তিগণের হৃদয়ে সন্দেহ বা অশ্রদ্ধাবুদ্ধি হয়। এই মহাসত্য-স্থাপনের জন্যই শ্রীমহাদেবের প্রতি শ্রীচিত্রকেতুর ঐরূপ লীলা। এইজন্যই শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বলিয়াছেন,—

"শিষ্য-সঙ্গে পাইলেন একত্র যাতনা।
অনিন্দ্য-জনের দুঃখ কি কহিব সীমা?
যে দুর্মতি জন বৈষ্ণবের নিন্দা করে
জন্ম-জন্ম নিরয়ধি সে-ই দুঃখে মরে॥"

(চৈ ভা অ ৬।৯১-৯৩)

অপর-পক্ষে যে ব্যক্তি অগুরুকে ক্ষুদ্র কল্পনা করিয়া তাহাতে ঈশ্বর বুদ্ধি করিবে অর্থাৎ অগুরুতে গুরুর আরোপ করিয়া তাহাকে মন্ত্রপুঞ্জ-দ্বারা সাজাইবে, অকৃত হইয়া কৃতের, অনীশ্বর হইয়া ঈশ্বরের অনুকরণ করিবে, সেইরূপ গুরুত্রব ও শিষ্যত্রব—উভয়েই নিরয়গামী হইবে, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। আবার যে ব্যক্তি এই কথার সুযোগ লইয়া "কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ"—ন্যায়ানুসারে শ্রীমহাদেবকেও কামুক মনে করিবে, সে ব্যক্তি শ্রীমহাদেবের রৌদ্রলীলার আঘাতেই ছারখার হইয়া যাইবে।

আত্মবিনাশক ও ঐকান্তিক ভক্তের অধিকার-তারতম্য

শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্ত এই যে,—মুমুক্ষু বা জ্ঞানীর পূর্ণ বৈরাগ্য থাকিবে; অজিতেন্দ্রিয় কখনও জ্ঞানী হইতে পারে না। "স্তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা" (ভা ১১।২০।৯)। যিনি মুমুক্ষু-সাধকোচিত বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন, সেইরূপ সাধক যদি ঐকান্তিক শ্রীতিমানের ন্যায় আচরণ করেন, তবে তাহা মহাভাগবতের অনুকরণরূপ পাপও হইবে। অনুকরণপ্রিয় ব্যক্তি সাধকোচিত জ্ঞানশূন্য বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া ঐকান্তিকের আচরণ বা বিষয়ীর ব্যবহার অনুকরণ করিলে তাহা বানরের ন্যায় কার্য্য হইয়া পড়ে। এজন্য শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—

• • • "বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥
ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে 'প্রকৃতি' সম্ভাষিয়া॥"

(চৈ চ অ ২।১১১-১৮,১২০)

নির্ব্বেদগ্রন্থের বেষ ধারণ করিয়া যে প্রকৃতির সম্ভাষণ করে, সে বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধ আচরণ করে। বর্ণবন্ধ

শ্রীগৌরনারায়ণ সেই কপটীর মুখ দর্শন করিতে পারেন না। ভক্তপ্রকৃতিও মুনি অর্থাৎ মননশীল বৈরাগ্যবান্ জ্ঞানি-সাধকের মন হরণ করিয়া থাকে। ক্ষুদ্র জীবসমূহ মর্কট-বৈরাগ্য অর্থাৎ মুমুক্ষু-সাধকোচিত বৈরাগ্যের অভিনয় করে, অথচ জ্ঞানি-সাধকের একমাত্র যোগ্যতা যে জিতেন্দ্রিয়তা, তাহা তাহাদিগের যদি না থাকে, তবে তাহারা আনুকরণিক মাত্র। জ্ঞানীর অধিকার ও ঐকান্তিক ভক্তের অধিকার এক নহে।

শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বেনাপোলের নির্জ্জন বাগানে রামচন্দ্র-খানের প্রেরিত বেশ্যার সহিত বাহ্যি-আচরণ, বেশ্যার বাক্যের উত্তর-প্রত্যুত্তরাদি-দান কিংবা শ্রীরায়-রামানন্দের নির্জ্জন-স্থানে দেবদাসীর সৃঙ্গার-বিধান, অথবা স্বয়ং লোক-শিক্ষকের লীলাকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীসার্ব্বভৌম-গৃহিণী, শ্রীঅদ্বৈত-গৃহিণী, শ্রীরাঘব-ভগিনী শ্রীদময়ন্তী প্রকৃতির নিকট হইতে কৃপাপূর্ব্বক সেবা-গ্রহণ-লীলা, অথবা দ্বিতীয় শ্রীগৌড়ীয়-ভক্তের আচরণ কিংবা যতিশিরোমণি শ্রীরামানুজাচার্য্যের পরমা সুন্দরী যুবতী শ্রীলক্ষ্মীদেবীর নিকট হইতে তাঁহার পতির অনুপস্থিতি-কালে সেবা ও ভিক্ষা গ্রহণ —'প্রকৃতি-সম্ভাষণ' বলিয়া গণিত হয় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনামাচার্য্যের আচরণ বা শ্রীরায়-রামানন্দ-প্রভুর আচরণকে 'প্রকৃতি-সম্ভাষণ' বলেন নাই। অবশ্য রামচন্দ্র-খান শ্রীনামাচার্য্যকে যুবক ও নিজ-প্রেরিত বেশ্যাকে যুবতী কামিনী মনে করিয়া আচার্য্য-পাদপদ্মকে নিজের দৃষ্টান্তে দেখিয়াছিল। শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্রও লোকশিক্ষার্থ শ্রীরায়-রামানন্দকে রক্তমাংসের অধীন মনুষ্য মনে করিবার এক লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুর শ্রীল হরিদাস বা শ্রীল রায়-রামানন্দপ্রভু বৈরাগ্যবান্ মুনি বা বিদ্বান্ অর্থাৎ জ্ঞানি-মাত্র নহেন। তাঁহারা অন্ত্য-পারমহংস্যধর্ম্মে নিত্যসিদ্ধভাবে অধিষ্ঠিত; তাঁহারা ঐকান্তিকশিরোমণি, শ্রীকৃষ্ণসুখানু-সন্ধানের আবেশে নিত্য আবিষ্ট। এজন্য শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—

"এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তা'তে জানি অপ্রাকৃত-দেহ তাঁহার॥
তাঁহার মনের ভাব তেঁহ জানে মাত্র।
তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র॥"

(চৈ চ অ ৪।৬২-৬৩)

'এক রামানন্দের হয় এই অধিকার'—শ্রীগৌরসুন্দরের এই শ্রীমুখোক্তি পাঠ করিয়া এবং তৎসঙ্গে নিম্নলিখিত উক্তিগুলি মস্তিষ্কের দ্বারা আলোচনা করিয়া বহুজীব ভীষণ আত্ম-বঞ্চনার স্রোতে ধাবিত হইয়া থাকে। শ্রীরায়-রামানন্দের সঙ্গে তুলনা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর জ্ঞানি-সাধক সন্ন্যাসিগণের সম্বন্ধে আত্মদৈন্যমুখে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন,—

"আমি ত' সন্ন্যাসী, আপনারে বিরক্ত করি' মানি।
দর্শন দূরে, 'প্রকৃতি'র নাম যদি শুনি॥
তবহিঁ বিকার পায় মোর শুদ্ধ-মন।
প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন?"

(চৈ চ অ ৪।৩৫-৩৬)

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীরায়-রামানন্দের ন্যায় শ্রীগোপীশিরোমণির আনুগত্যকারী রাগাত্মিক ঐকান্তিকের তো দূরে প্রকৃতি-দর্শনই নাই। মুমুক্ষু (জ্ঞানী)-সাধক সন্ন্যাসী আপনাকে 'বৈরাগী' বলিয়া মনে করিলেও তাহার পুরুষাভিমান প্রবল। শ্রীশিব একজনই হ'ন; ব্রহ্মাদি দেবতা বহু ব্যক্তি হইতে পারেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যসিদ্ধ শ্রীযূথেশ্বরী অর্থাৎ শ্রীগোপী, নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানকারী। মস্তিষ্কের দ্বারা এইরূপ গুরুর দর্শন-লাভ হয় না। শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশ-বিগ্রহের স্বপ্রকাশিকা শক্তি হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া এইরূপ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সাক্ষাৎকার করান। শ্রীগৌরকিশোর মহাপ্রভু যখন শ্রীবাস-পণ্ডিতের নিকট শ্রীনিত্যানন্দের নিন্দা-প্রতিম উক্তি করিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেছিলেন, তখন,—

"ঈষৎ হাসিয়া বলে শ্রীবাস পণ্ডিত—।
আমারে পরীক্ষ' প্রভু, এ নহে উচিত॥
মদিরা-যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
জাতি-প্রাণ-ধন যদি মোর নাশ করে॥
তথাপি মোহার চিত্তে নহিব অন্যথা।
সত্য সত্য তোমারে কহিনুঁ এই কথা॥"

(চৈ ভা ম ৮।১৩, ১৪-১৬)

শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরও শ্রীশ্রীগৌরকিশোর-প্রভুকে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রভুর-সম্বন্ধে ঠিক এইরূপই উত্তর-দান করিয়াছিলেন। ইহাই শ্রীগুরুতে দেবতা বা ঈশ্বরবুদ্ধি। ইহার এক রতি কম থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান পাওয়া

যাইবে না। যিনি পূর্ণ শরণাগত হইয়া শ্রীহরিভজনে অভিলাষী, তাঁহার সম্মুখে নিশ্চয়ই শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অবতার হয়।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপার্ষদ আচার্য্য শ্রীবৈষ্ণবানন্দ, যিনি পূর্ব্বে শ্রীরঘুনাথপুরী নামক সন্ন্যাসী ছিলেন (চৈ ভা অ ৪।৭৪৬ ; চৈ চ আ ১১।৪২ ; গৌ গ ৯৭), যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী, শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু সমস্বরে বন্দনা করিয়াছেন, সেই ঈশ্বর-বস্তুর অনুকরণে সাধারণ জীব করিতে গেলে পতিত, অপরাধী, পাষণ্ডি-পদবাচ্য হইবে। অধিতীয় অধিকারী আচার্য্য শ্রীবৈষ্ণবানন্দেই তাহা সম্ভবিত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সুখবর্দ্ধন হইয়াছে। শ্রীনিত্যা-নন্দপার্ষদ আচার্য্য শ্রীবৈষ্ণবানন্দই এই আদর্শের একমাত্র অধিকারী, অপরে নহে। তিনিই আচার্য্য, ভক্তি-অধিকারী, গুরু, ঈশ্বর ও প্রভু।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে বা শ্রীআচার্য্যে এইরূপ দেবতা বা ঈশ্বর-বুদ্ধি বিচারের দ্বারা, আরোপের দ্বারা, কল্পনার দ্বারা, অনুকরণের দ্বারা বা মস্তিষ্ক-আলোড়নের দ্বারা অথবা কোনপ্রকার মনীষার দ্বারা হয় না। যাঁহার বাস্তব শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ প্রেষ্ঠবুদ্ধির আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহারই অতি স্বাভাবিকভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতায় আত্ম-নিক্ষেপ করিবার সুবুদ্ধির উদয় হয়, অথবা আত্মবুদ্ধির উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীগুরুদেবের সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতায় আনুষঙ্গিকভাবেই সুবিশ্বাস হয়।

শ্রীগুরুদেবই আত্মা বা প্রেষ্ঠ

শ্রীগুরুপাদপদ্মই যাঁহার আত্মা অর্থাৎ দেহ-গেহ-সর্ব্বস্ব হইতেও প্রিয়তম, তিনিই শ্রীগুরুদেবতাত্মা। আপনাকে 'গুরু-প্রেষ্ঠ' বলিলে বা বলাইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মবুদ্ধি বা প্রেষ্ঠবুদ্ধি হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে যিনি আত্মা জ্ঞান করেন, তিনিই শ্রীগুরুদেবতাত্মা ; শ্রীগুরুদেব হইতে যিনি ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ দোহন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি গুরুদেবতাত্মা নহেন। "শ্রীব্রজবাসিগণের নিজ-পুত্রাদি হইতেও শ্রীকৃষ্ণে অধিক প্রীতি থাকিবার কারণ কি ?" —ইহা শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীশুকদেব বলিয়াছিলেন,—

"সর্ব্বেষামপি কৃতানাং নৃপ যাদৃগ্ যতঃ।
ইত্থংভূতাত্মবিত্তাত্মাস্বয়ন্নতস্তথৈব হি ॥
তত্রাপেক্ষ যথা দেহঃ স্বসুকায়ন্নি দেহিনাম্।
ন তথা মমতালম্বি-পুত্রবিত্তগৃহাদিষু ॥
দেহাদ্যবধিনাং পুংসামপি রাজন্যসত্তম।
যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা ন হ্যন্য যে চ তম্ ॥
দেহোঽপি মমতাভাক্ চেত্তর্হ্যসৌ নাত্মবৎ প্রিয়ঃ।
যজ্জীর্য্যত্যপি দেহেঽস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী ॥
তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্।
তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্।
কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥"

(ভা ১০।১৪।৫০-৫৫)

হে রাজন্! নিজ আত্মাই সমস্ত প্রাণীর প্রিয় হইয়া থাকে। আত্মাত্মীয় পুত্র-কন্যা প্রভৃতি যত্ন আত্মার প্রিয় বলিয়া গৌণভাবে প্রিয়, বস্তুতঃ সাক্ষাৎ প্রিয় নহে। অতএব দেহিগণের নিজ নিজ আত্মার প্রতি যেরূপ স্নেহ হয়, মমতার বিষয়ীকৃত পুত্র, কন্যা ও গৃহাদিতে তাদৃশ স্নেহ হয় না। দেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট পুরুষগণেরও দেহ যেরূপ প্রিয় হয়, দেহ-সম্বন্ধি গৃহ, স্ত্রী বা পুত্রাদি সেরূপ প্রিয়তম হয় না। যদিও এই দেহ মমতাস্পদ, তথাপি উহা আত্মতুল্য প্রিয় নহে। যেহেতু এই দেহ জরাগ্রস্ত হইলেও জীবনের আশা বলবতী থাকে অর্থাৎ দেহত্যাগে আত্মার অতিশয় কষ্ট হইবে জানিয়া দেহধারী দেহ ত্যাগ করিতে চাহে না ; সুতরাং আত্মার প্রতি স্নেহাধিক্য বশতঃ জীবিতাশা বলবতী থাকে। ইহাতেই বুঝা যায়,—সকল দেহাভিমানী জীবেরই নিজ-নিজ আত্মা প্রিয়তম। সেই আত্মসুখের জন্যই দেহ, অপত্য-প্রভৃতি চরবস্তু ও গেহাদি অচরবস্তু এবং যাহা কিছু আছে, সে সকলই আত্ম-সম্বন্ধে প্রিয়রূপ প্রতিভাত হয় ; যেহেতু সুখস্বরূপ বলিয়াই তৎসম্বন্ধে দুঃখাত্মক জগৎও সুখাত্মক-রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যিনি সর্ব্বাকর্ষক পরমানন্দ-স্বরূপ বলিয়া 'শ্রীকৃষ্ণ'-নামে অভিহিত, সেই শ্রীযশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণই অখিল আত্মার আত্মা অর্থাৎ তাঁহাকেই 'পরমাত্মা' বলিয়া জানিও। যদি বল,—শ্রীকৃষ্ণ যদি সেই পরমাত্মাই হইবেন, তবে ত' তিনি অন্তরে অন্তর্যামিরূপেই বিরাজিত থাকিবেন ; তিনি প্রাকৃত-লোকদৃষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছেন

কেন? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন,—জগতের মঙ্গলের জন্যই তিনি আত্মারামের আত্মা ও পরমস্বরূপ হইয়াও পরমকল্যাণ-গুণনিধি, অতএব পরম-কারুণিক। এইজন্য নিজ ভক্তগণকে কৃপা-বিতরণার্থ অবতীর্ণ হইয়া ভক্ত-প্রসঙ্গে জগদ্গত জীবগণের মঙ্গলহেতু করে করে নিজ স্বরূপ-শক্তিদ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

প্রেষ্ঠবুদ্ধির লক্ষণ কি?

শ্রীকৃষ্ণ যদি নিখিল জীবের পরমাশ্রয়-স্বরূপই হইবেন, তাহা হইলে তাঁহাতে দেহ-আত্ম-বিভাগযুক্ত দেহিগণের ন্যায় ক্ষুৎপিপাসাদি ধর্ম্ম দেখা যাইতেছে কেন? যেহেতু, আত্মারই ক্ষুধা-পিপাসাদি ধর্ম্ম নাই; আর যিনি নিখিল আত্মার পরমাশ্রয়, সেই শ্রীকৃষ্ণে কেমন করিয়া ক্ষুৎ-পিপাসাদি ধর্ম্ম থাকা সম্ভব হইতে পারে? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন,—তিনি নিজ ভক্তগণের প্রতি কৃপাবশতঃ দেহীর ন্যায় ক্ষুৎপিপাসাদি-ধর্ম্মাক্রান্তরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তাঁহার অবতার যেরূপ তাঁহারই নিজস্ব-কৃপাশক্তিদ্বারা প্রকাশিত, তেমনই তাঁহার দেহিবৎ ক্ষুৎপিপাসাদি ধর্ম্মও তাঁহার প্রেমবশ্যতা-স্বভাবের স্বরূপসিদ্ধ ধর্ম্ম। অতএব আত্মাই প্রিয়তম। শ্রীগুরুপাদপদ্মে যাঁহার আত্মা অর্থাৎ প্রিয়তম-বুদ্ধির উদয় হইয়াছে, তাঁহার শ্রীগুরুদেবের কোন ব্যাপারেই প্রাকৃতবুদ্ধি নাই। "গোরার আমার সব ভাল"—এই উপলব্ধি, যাঁহার 'গোরা'তে বা গুরুতে আত্মবুদ্ধি হইয়াছে, তাঁহাতেই সম্ভব। প্রিয়তমের কোন দোষ থাকিতে পারে না। তাঁহাতে বিজ্ঞনীয় কিছু নাই—এই বুদ্ধি প্রিয়তাজ্ঞান হইতে স্বভাবতঃই উদিত হয়। আর প্রিয়ের সুখানুসন্ধান করিবার জন্যই হৃদয় সর্ব্বদা স্বাভাবিকভাবে ব্যগ্র থাকে; প্রিয়ের সেবাও প্রতিপদে সুখরূপা বলিয়াই অনুভূত হয়। শ্রীগুরুদেব আত্মা বা প্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার সুখানুসন্ধান-বৃত্তিতে নিরবচ্ছিন্ন আবেশ স্বাভাবিক, এবং তাঁহার সেবাও সুখরূপা ও প্রসন্নতিশালিনী। তাঁহার জন্য কোনও দুঃখ, এমন কি, প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত ক্লেশদায়ক ত' হয়ই না, পরন্তু পরম-সুখদায়ক হইয়া থাকে। এইরূপ প্রেষ্ঠ-বুদ্ধিলব্ধি হইতেই ভক্তবর্য্য শিব বলেন,—

"তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।"

অতএব যাহারা বিচারপ্রধান-পথে মস্তিষ্কের দ্বারা ও মস্তিষ্ক-প্রেরণায় অসদ্ভাবনা অর্থাৎ সংশয় ও বিপরীত-ভাবনা অর্থাৎ উল্টা ধারণাদ্বারা শ্রীগুরুদেবকে মাপিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ উন্মুখ, তাহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মে মর্ত্যবুদ্ধিকারী, অসূয়াকারী, দুরন্ত অপরাধে অপরাধী, নারকী—অত্যন্ত দুর্ভাগা। জন্মজন্মান্তরের পাপমলিন ও অপরাধ-ভারাক্রান্ত হৃদয় থাকিলে হৃদয়ের স্বাভাবিক-বৃত্তি যে প্রীতি, তাহার দ্বার চিররুদ্ধ হইয়া যায়। এইজন্যই উক্ত হইয়াছে,—

"যাবৎ পাপেন মলিন হৃদয়ঃ তাবদেব হি।
-এ শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ মনুষ্যে সদ্গুরৌ তথা।"

(ভ স, ১ অনুচ্ছেদধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-বাক্য)

যে-কাল পর্য্যন্ত হৃদয় পাপসমূহের দ্বারা মলিন থাকে, তৎকাল পর্য্যন্তই পরমকারুণিক অবতার শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি ও শ্রীগুরুদেব-প্রেষ্ঠাবতার সদ্গুরুতে সত্যবুদ্ধি হয় না। প্রীতির আধার হৃদয়ের অনুগত কর্ণ ও চক্ষুদ্বারা যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী শ্রবণ ও দর্শন, তাহাই যথার্থ শ্রীগুরুদেবের দর্শন। আর প্রাকৃত সদসদ্বিচার বা মনোধর্ম্মের আধার মস্তিষ্কের দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শন করিবার যে চেষ্টা, তাহাতে ভূত-প্রেত-পিশাচকে 'গুরু' বলিয়া কল্পনা বা ভগবৎপার্ষদ শ্রীশিবকে ভূত-প্রেত পিশাচ সহচর বুদ্ধি করিয়া আত্মবঞ্চনাই লাভ হয়। এইজন্য শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ তারস্বরে বলিয়াছেন,—

"যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ।"

(ভ স, ২১২ অনুচ্ছেদধৃত ভা ৭।১৩।২৬শ শ্লোক)

অর্থাৎ জ্ঞানপ্রদীপ-প্রদাতা শ্রীগুরু সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ। যে ব্যক্তি তাঁহার প্রতি ইনি মর্ত্য (মনুষ্য)' এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি করে, তাহার সমস্ত শাস্ত্র-শ্রবণ হস্তিস্নান-তুল্য ব্যর্থ হইয়া থাকে।

শ্রীলক্ষ্মণ-দেশিকের শ্রীগুরুদেব শ্রীমহাপূর্ণের প্রতি শ্রীলক্ষ্মণ-পত্নী জন্মাবধি জাতিবুদ্ধি হইয়াছিল; এইজন্য শ্রীলক্ষ্মণ-দেশিক সেইরূপ অপরাধিনী-অথচ পরমা সুন্দরী, যুবতী ও সুলক্ষণা পত্নীকে চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং 'শ্রীরামানুজাচার্য্য'-নামে খ্যাত হন। প্রেষ্ঠের জন্য যিনি ইহ জগতের প্রাণাপেক্ষা প্রীতির পাত্রকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহারই শ্রীগুরুদেবে অন্তরে প্রেষ্ঠ-বুদ্ধি

হইয়াছে ; সুতরাং "গুরুশ্রেষ্ঠ" বলাইলে গুরুশ্রেষ্ঠ হওয়া যায় না। গুরুশ্রেষ্ঠ হওয়ার দার্ষ্টিকতা অপেক্ষা গুরুতে শ্রেষ্ঠ-বুদ্ধি অর্থাৎ গুরুর সর্ব্বস্ব-বিসর্জ্জন-ব্যাপারটি ভক্তিসম্মত। শ্রীগুরু-দেবতাত্মা না হইয়া যাহারা শ্রীগুরুর চরণ-সন্নিধ্য যে শ্রীমুকুন্দ, তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দ লাভ করিতে চাহে, তাহারা কোনকালেই মঙ্গললাভ করিতে পারে না :

"গুরুচক্রাং ন মিলতি স্মরণাৎ সেবয়াত্তে বুধৈঃ।
মিলিতোঽপি ন লভ্যতে জীবৈরহমিকাপরৈঃ॥"

(ভ র ২০১ অনুচ্ছেদ-ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-বাক্য)

সুবুদ্ধিজনগণ যদি গুরুভক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক অবিচ্ছিন্ন-স্মৃতি বা অভিনিবেশের দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা করেন, তাহা হইলেই ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হ'ন ; কিন্তু অহঙ্কারপরায়ণ জীব সমীপস্থ ভগবান্‌কেও লাভ করিতে পারে না।

"নাহমিজ্যা-প্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা :
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরু-শুশ্রূষয়া যথা॥"

(ভা ১০।৮০।৩৪)

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—সর্ব্বভূতের আত্মা আমি গুরু-শুশ্রূষাদ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকি, অর্চ্চন, বৈষ্ণব-দীক্ষা, সমাধি বা তপশ্চরিত্রার দ্বারাও সেরূপ সন্তুষ্ট হই না।

শ্রবণ ও ভজন-শিক্ষাগুরুর ঈশ্বরত্ব ও শ্রেষ্ঠবিপ্রত্ব

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন, —"অথ শ্রবণগুরু-ভজনশিক্ষাগুর্ব্বোঃ প্রাধিক্যেকত্বমিতি তত্ত্বৈবাহ,—

'তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্‌গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥'

(ভা ১১।৩।২১)

'তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত' (ভা ১১।৩।২১) ইতি পূর্ব্বোক্ত-ত্বত্র শ্রবণগুরৌ . . . অস্ত শিক্ষাগুরোর্বহুত্বমপি প্রাগ্বদ্‌-জ্ঞেয়ম্।" (ভ র ২০৬ অনু)

শ্রবণগুরু ও ভজনশিক্ষাগুরু প্রায়ই একত্ব অর্থাৎ শ্রীশ্রবণগুরু শ্রীভজনশিক্ষাগুরুও হইয়া থাকেন। সেই শ্রবণ-গুরুর সমীপে অবস্থান-পূর্ব্বক তাঁহাকে নিজের জীবনসর্ব্বস্ব, প্রিয়তম ও নিজাভীষ্ট-দেবতা অর্থাৎ ঈশ্বররূপে উপলব্ধি করিয়া এবং দম্ভরহিত আনুগত্য-সহকারে ভাগবতধর্ম্মসমূহ শিক্ষা করিবে। ইহাদ্বারা 'শ্রীভগবান্ যিনি শ্রীবলি-প্রভৃতি আত্মসমর্পণকারী ভক্তকে নিজ আত্মা পর্য্যন্ত দান করিয়াছেন, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।'—ইহাই শ্রীপ্রবুদ্ধ শ্রীনিমিরাজকে উপদেশ করিয়া-ছিলেন। শ্রবণ-গুরুর সংসর্গেই শাস্ত্রীয়জ্ঞানোৎপত্তি হয়, অন্যপ্রকার অর্থাৎ কেবল শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ করিয়া কখনই শ্রীভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞান লাভ হইতে পারে না :

"আচার্য্যোঽরণিরাদ্যঃ স্যাদন্তেবাস্যাদুরারণিঃ।
তৎসন্ধানং প্রবচনং বিদ্যাসন্ধিঃ সুখাবহঃ॥"

(ভা ১১।১০।১২)

ব্রহ্মবিদ্যারূপে অগ্নির উৎপাদনে আচার্য্যই নিম্নস্থিত 'অরণি'-কাষ্ঠদ্বয়, শিষ্য উপরিস্থিত 'অরণি'। শ্রবণগুরুর উপদেশ 'তৎসন্ধান-কাষ্ঠ' এবং বিদ্যা সন্ধিস্থলে উৎপন্ন সুখকর অগ্নিস্বরূপ। 'ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থ শিষ্য শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্ম-নিষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের অভিগমন করিবে', 'আচার্য্যবান্ পুরুষই ব্রহ্মকে জানিতে পারেন,' 'হে নচিকেতঃ ! তুমি তর্কের দ্বারা মতিকে দুষ্ট করিও না, শ্রীগুরুবাক্য শ্রবণ-দ্বারাই প্রকৃষ্ট জ্ঞান হয়' ইত্যাদি উক্তি হইতে শ্রবণগুরুর সংসর্গেই শাস্ত্রীয় জ্ঞানোৎপত্তির কথা জানা যায়।

"গুর্ব্বাত্মদৈবত" না হইলে শ্রবণগুরু বা ভজন-শিক্ষাগুরুর নিকট হইতে তাঁহার প্রাণ-কোটিসর্ব্বস্বকে লাভ করা যায় না। যে ব্যক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নিজ-জীবন-কোটী হইতেও প্রিয়তম জ্ঞান করিয়া দম্ভ-রহিত আনুগত্যের সহিত তাঁহার সুখানুসন্ধানতৎপর হইয়া তাঁহার কৃপাবলোকনের জন্য সর্ব্বক্ষণ তাঁহার দ্বারের দ্বারী হইয়া থাকেন, শ্রীহরি সেইরূপ ব্যক্তিকেই তাঁহার শ্রেষ্ঠজনের দ্বারা আত্মদান করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নিজ ঈশ্বর ও প্রাণ-কোটিসর্ব্বস্ব জানিয়া সর্ব্বক্ষণ তাঁহার শাসনরূপ কৃপানুজ্ঞাকে প্রীতির সহিত বরণ করিলে ও অক্ষরে অক্ষরে তৎকৃপা-বলোকন-পূর্ব্বক তাহা পালন করিলে, তাহার নিকট মায়া কোন বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। সেই গুরুদেবকের নিকটেই প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরহরি আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রীগুরুদেবতাত্মার বিচার এইরূপ,—

"বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াং বা
গতিরিহ ন ভবতঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটির্নির্ভরং বা নবাম্ভ-
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন॥"

(স্তবমালা)

হে নীরদবন্ধো ! যেরূপ চাতকের উপর অভিনব বারি বর্ষণ করুক, অথবা অন্যান্য বহুই সিঞ্চন করুক, চাতকের যেরূপ মেঘ ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় বা গতি নাই বলিয়া চাতকগণ একমাত্র মেঘের স্তব ব্যতীত অন্য কাহারও স্তব করে না, সেইরূপ তুমি আমার প্রতি যাহাই প্রদান কর, আর নাহাই বিতরণ কর, তুমি ব্যতীত আমার অন্য কোন গতি, আশ্রয় বা প্রভু নাই। চাতকের মেঘ ব্যতীত অন্যান্য কোনরূপ জলাশয়ই যেরূপ তৃষ্ণাহর হয় না, তদ্রূপ তুমি ব্যতীত আর কেহই আমার সংসারদাবদগ্ধ ও তৃষ্ণিতরূপ ভগবদ্ভক্তিসেবাগ্রহ হইতে পারে না।

বেল্টপুর

শ্রীপুরীধাম হইতে পশ্চিমে প্রায় ছয় ক্রোশ দূরে 'ব্রহ্মগিরি' বা 'আলালনাথ'-নামক এক সুপ্রাচীন দিব্যস্থান বিরাজিত। সত্যযুগে আদিগুরু শ্রীব্রহ্মা এই স্থানে শ্রীবিষ্ণুর ভজন করিয়াছিলেন। এইজন্য এই স্থানের নাম 'ব্রহ্মগিরি' হইয়াছে। শ্রীরামানুজাচার্য্যের অভ্যুদয়ের বহুপূর্ব্ব হইতে বহু নারায়ণ-পরায়ণ সিদ্ধ-মহাপুরুষ দক্ষিণদেশে অবতীর্ণ হইয়া জগতে শ্রীহরিভক্তির কথা প্রচার করেন। ইঁহারা 'দিব্য-সূরি'-নামে প্রসিদ্ধ। এই সকল দিব্যসূরি বা ভগবৎ-পার্ষদগণকে তামিল-ভাষায় 'আলোয়ার' বা 'আলবর' বলা হয়। শ্রীব্রহ্মার ভজন-সিদ্ধস্থান ব্রহ্মগিরি নির্জ্জনতায় ও পবিত্রতায় শ্রীহরিসেবার বিশেষ অনুকূল বলিয়া দক্ষিণদেশের মধ্যযুগীয় কতিপয় দিব্যসূরি বা আলোয়ার ঐ স্থানে চতুর্ভুজ শ্রীঅর্চ্চা-অবতারের আরাধনা করিতেন। আলবর্ বা আলোয়ার-গণের নাথ বা প্রভু বলিয়া শ্রীনারায়ণ 'আলবর্-নাথ' বা 'আলোয়ার-নাথ'-নামে খ্যাত হন এবং ব্রহ্মগিরির কিয়দংশ আলোয়ার-নাথের নামানুসারে 'আলবর-পত্তনম্', 'আলার্-পাট্টা','আলারপুর', 'আলবরপুর' প্রভৃতি নামে অদ্যাপি খ্যাত রহিয়াছে। আলবরনাথ বা আলোয়ার-নাথের অপভ্রংশই— 'আলালনাথ'।

কথিত হয়, আলালনাথের অনতিদূরে প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে 'শ্রীভবানন্দ রায়'-নামক এক পরমভাগবত ভূম্যধিকারী বাস করিতেন। এখনও সেই স্থানে ভবনীয়ন সমৃদ্ধির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নিদর্শন পাওয়া যায়। পুরী হইতে শ্রীআলাল-নাথের শ্রীমন্দিরে উপনীত হইবার প্রায় এক মাইল অবশিষ্ট থাকিতে দুই পার্শ্বে প্রাচীন ভবাবশেষের সমাধিগর্ত্তরূপ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকপিলেশ্বর-দেবের দুর্গের বিকৃত ভগ্নাবশেষের রূপ এখনও পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিছুদিন পূর্ব্বে বেল্টপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত রাধামোহন পট্টনায়ক মহাশয় তথায় একটী পুষ্করিণী খনন আরম্ভ করিলে কয়েকটী প্রস্তরখণ্ড ও কতকগুলি কড়ি পাইয়াছিলেন। উক্ত পট্টনায়ক মহাশয়ের সহিত তাঁহার বেল্টপুরের গৃহে গত ১০ই অগ্রহায়ণ (১৩৪১), ২৬শে নভেম্বর (১৯৩৪) শ্রীএকাদশী-তিথিতে আমাদের আলাপ হয়। তিনি আমাদিগকে সেই সকল প্রস্তরখণ্ড প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং একগণ্ডা কড়িও উপহার-স্বরূপ দিয়াছিলেন। কড়িগুলি বহুদিন মৃত্তিকা-গর্ত্তে থাকায় চূণের মত অবস্থা লাভ করিয়াছে। উক্ত পট্টনায়ক মহাশয় আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া বেল্টপুরের বিভিন্ন স্থান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন —"এই বেল্টপুরেই শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীরায়-রামানন্দ প্রভু আবির্ভূত হন। তবে তাঁহার জন্মস্থিটী এখন লুপ্ত হইয়াছে।" শ্রীযুক্ত রাধামোহন পট্টনায়ক মহাশয় শ্রীভবানন্দের অন্যতম আত্মজ শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়কের (যাঁহাকে বড় জানা বা শ্রীপ্রতাপরুদ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র চাঙ্গে চড়াইয়াছিলেন—চৈ চ অ নবম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) বংশধর বলিয়া দাবী করেন। তাঁহার কথিত বিবরণ-অনুসারে শ্রীভবানন্দ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রই শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীশিখিমাহিতি। শিখিমাহিতির ভগিনী শ্রীমাধবীদেবী। মাধবীদেবী বেল্টপুরে শ্রীগোপীনাথ-শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করেন। তদনুসারে বেল্টপুরের সংলগ্ন স্থান 'গোপীনাথপুর' নামে খ্যাত হইয়াছে। 'মুখলবন্দী'র ১নং তৌজি বেল্টপুর ও ২নং তৌজি গোপীনাথপুর। শ্রীআলালনাথ বা শ্রীব্রহ্মগিরির দিকে যাইবার পথে প্রায় একমাইল থাকিতে দক্ষিণহস্তে একটী কমল-শোভিত

সরোবর দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সরোবরের পার্শ্ববর্তী গ্রামই গোপীনাথপুর। গোপীনাথপুরে অদ্যাপি শ্রীগোপীনাথ-শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত রহিয়াছেন। আমাদের সেই শ্রীবিগ্রহ-দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছিল। তথায় শ্রীশ্রীগোপীনাথ-নামক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলমূর্ত্তি ও শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত আছেন। স্থানীয় লোকের প্রমুখ বিবরণানুসারে শ্রীমাধবীদেবীর প্রতিষ্ঠিত শৈলী শ্রীগোপীনাথ-শ্রীবিগ্রহযুগল বর্ত্তমানে গুপ্ত হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত এই ঠাকুর-বাড়ীতে কৃষ্ণচরণদাস-নামক এক কৌপীনধারী মহান্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার দুর্ম্মতি হওয়ায় সেই ব্যক্তি জনৈকা ভ্রষ্টা স্ত্রীলোককে হত্যা করে এবং তাহাতে তাহার দাত বৎসর-জেল হয়। তখন গ্রামবাসীরা পুরীর শ্রীরাধাকান্ত-মঠের তদানীন্তন মহান্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণদাসজীকে উক্ত সেবা প্রদান করেন। ঐ ঠাকুর-বাড়ীতে এখনও শ্রীশ্রীমাধবীদাতার পরবর্ত্তী সাতজন সেবাইত মহান্তের সমাধি আছে।

শ্রীযুক্ত রাধামোহন পট্টনায়ক বলেন,—"এই শ্রীগোপী-নাথের সেবা শ্রীলিখিমাহিতির ভগ্নী শ্রীমাধবীদেবীর দ্বারা যে প্রতিষ্ঠিত, তাহা বংশতালিকা হইতে প্রমাণিত হয়। শ্রীমাধবীদেবী 'শ্রীপুরুষোত্তমদেব-নাটক'-নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সেই পুঁথিখানি তাঁহার নিকটেই ছিল। তিনি নাকি তাহা কটক রেভেন্সা কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আর্ত্তবল্লভ মহান্তি মহাশয়কে প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল রায়-রামানন্দের শ্রীহস্ত-লিখিত 'টীকা-পঞ্চক'-নামক একটী পুঁথিও তাঁহার নিকট ছিল। সেই পুঁথিটীও নাকি শ্রীযুক্ত রাধামোহন বাবুর আত্মীয় ও বেণ্টপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ মহান্তি মহাশয় (Under Secretary, Supply and Transportation department, Orissa) উক্ত শ্রীআর্ত্তবল্লভ মহান্তি মহাশয়কে প্রদান করিয়াছেন।"

শ্রীযুক্ত রাধামোহন বাবুর কথিত বিবরণে আরও জানা যায়—শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক হইতে তাঁহাদের যে বংশলতা-সম্বলিত প্রাচীন তালপত্রের পুঁথি ছিল, তাহা তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত পদ্মচরণ পট্টনায়ক কাশিমবাজারাধিপতি স্বর্গীয় মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুরকে প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের 'নোয়াগা' প্রভৃতি স্থানে যে-সকল ভূমি-সম্পত্তি ছিল, তাহা এখন এমার-মঠের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের গৃহে উৎকল-অক্ষরে চতুর্লিখিত অনেক প্রাচীন পুঁথি ছিল। তাহাও কালক্রমে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত রাধামোহন বাবুর নিকট হইতে কাশিমবাজারে তাঁহাদের সেই বংশ-তালিকা চাহিয়া পাঠাইবার পর তিনি তজ্জন্য চেষ্টা করিয়াও তাহা প্রাপ্ত হন নাই—ইহা শুনিতে পাওয়া গেল। শ্রীরায়-রামানন্দপ্রভু হইতে ঘন-মহান্তি পর্য্যন্ত বংশ-তালিকাটি শ্রীযুক্ত রাধামোহন বাবুর নিকট আর বর্ত্তমানে নাই। উক্ত ঘন-মহান্তি ১১৫৮ দিল্লীশ্বরাব্দে জীবিত ছিলেন—ইহা কটক জজ্‌কোর্টে হরিচরণ পট্টনায়কের একটি আপিলের Certified Copy হইতে প্রমাণিত হয়। শ্রীযুক্ত রাধামোহন বাবু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দিল্লীশ্বরযুক্ত একটি দলিল আমাদিগকে দেখাইয়াছিলেন। ঘন-মহান্তির তিন পুত্র—(১) উত্তরেশ্বর মহান্তি, (২) বৈষ্ণবচরণ মহান্তি ও (৩) হরিচরণ মহান্তি। হরিচরণ 'পট্টনায়ক' উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছিলেন এবং তিনি ১২৪৯ দিল্লীশ্বরাব্দে জীবিত ছিলেন। হরিচরণ পট্টনায়ক বৈষ্ণবচরণের পৌত্র কুলমণিকে দত্তক-পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই কুলমণির পুত্রই পদ্মচরণ পট্টনায়ক। বৈষ্ণবচরণের পুত্র ভাগবতচরণ। তাহার তিন পুত্র—(১) মাগুণি হরিচন্দন, (২) কুলমণি, (৩) বহুমণি পট্টনায়ক। বহুমণির পুত্র নটবর। নটবরের পুত্র রাধামোহন পট্টনায়ক। তিনি আমাদিগকে সমস্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন।

স্থানীয় অধিবাসিগণের কেহ কেহ বলেন,—শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব শ্রীভবানন্দ ও শ্রীরায়-রামানন্দের আবির্ভাব-স্থানের প্রতি প্রীতিনিবন্ধন তৎসংলগ্ন আলালনাথে আগমনের লীলা প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু প্রকাশিত বৈষ্ণব-সাহিত্যে বেণ্টপুরের সম্বন্ধে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বোষ্টপুর বা বৈকুণ্ঠপুরের অপভ্রংশ হইতে 'বেণ্টপুর'-নামের উৎপত্তি অনুমান করেন। আলগর পুর বা আলাল-নাথের নিকটে 'বোষ্টপুর' নামক স্থানের অবস্থিতি কিছু আশ্চর্য্য নহে। 'বোষ্ট'-শব্দটী আলগরগণের প্রিয় শব্দ। বর্ত্তমান বেণ্টপুর ও গোপীনাথপুর-গ্রাম পাশাপাশি অবস্থিত। এখন উভয় গ্রামেরই কোন সমৃদ্ধি নাই; তবে ইহা যে একটি প্রাচীন স্থান, তাহা তথায় উপনীত হইলে বেশ উপলব্ধি হয়। শ্রীশ্রীগোপীনাথের আখড়ার মধ্যে যে-সকল সমাধি

আছে, তাহারও প্রাচীনতা প্রমাণিত হয়। গোপীনাথপুর-গ্রাম ও বেতপুর-গ্রামের মিলন-স্থলে একটী উচ্চ বেদীর উপর শ্রীতুলসীর ঝাড় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রামে ব্রাহ্মণাদি সকল জাতির বাস আছে; তন্মধ্যে 'মহান্তি'গণের সংখ্যাই অধিক। মহান্তিগণ 'করণ' বা কায়স্থের সমপর্য্যায়ে গণিত।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও শ্রীগুরুবর্গের আবির্ভাব-তিরোভাবোৎসব

গত ৪ই মাধব (১৩৪১), ১৮ই জানুয়ারী (১৯৩৫) বৃহস্পতিবার, শ্রীসরস্বতীপঞ্চমী-তিথিতে পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসবর ১০৮শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ-পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় ও গৌড়ীয়-মিশনের উদ্যোগে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগৌরশক্তি শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের আবির্ভাব এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসব শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

উষঃকালে আরাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'-পাঠ হয়। প্রাতঃকালে ভক্তমণ্ডলী সংকীর্ত্তন-যোগে শ্রীঅঙ্গনীপ পরিক্রম করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিকান্তে শ্রীধামবাসী ভক্তগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। অপরাহ্নে শ্রীযোগপীঠ-শ্রীঅঙ্গনে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভু "পরবিদ্যা ও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী"-সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যা-রাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শ্রীমায়াপুরগৌড়ীয়মঠ ও অন্যান্য শাখামঠে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী ও শ্রীশ্রীগুরুবর্গের আবির্ভাব ও তিরোভাব-তিথিপূজা শ্রীহরিকীর্ত্তন ও শ্রীমহাপ্রসাদ-বিতরণ-মুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর আবির্ভাবোৎসব

৭ই মাধব (১৩৪১), ২০শে জানুয়ারী (১৯৩৫) রবিবার, শ্রীমাঘীসপ্তমী-তিথিতে শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীঅদ্বৈতভবনে শ্রীহরিসংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীমহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর আবির্ভাবোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিকের পর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভু 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' ও 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' হইতে শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর কৃপা ও লীলা-সম্বন্ধে পাঠ করেন। অতঃপর সমাগত ভক্তগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব

গত ১৩ই মাঘ (১৩৪১), ২৬শে জানুয়ারী (১৯৩৫) শুক্রবার, শ্রীমাঘী-শুক্লা-ত্রয়োদশী-তিথিতে শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাবোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবোপলক্ষে শ্রীপঞ্চতত্ত্ব-নামকীর্ত্তন, 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'-পারায়ণ ও সংকীর্ত্তন-পোতা-যাত্রা সহ শ্রীঅঙ্গনীপ-পরিক্রম হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর-মহারাজ বহুক্ষণ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করেন। তৎপর দিবস মধ্যাহ্ন-ভোগারাত্রিকের পর শ্রীধামবাসী ভক্তগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীমায়াপুরগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব-তিথিতে প্রাতে শ্রীমন্দির-পরিক্রম ও হরি-সংকীর্ত্তন হয়। সমগ্রদিবস 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'-পারায়ণ হয় এবং সন্ধ্যা-রাত্রিকের পর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' হইতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর লীলা ও কৃপার কথা পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পরদিবস মধ্যাহ্ন-ভোগারাত্রিকের পর ভক্তগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও অন্যান্য মঠ-সমূহে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর আবির্ভাবোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-মহোৎসব

পরমারাধ্যতম পতিতপাবনবর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় ও আনুগত্যে এবং গৌড়ীয়-মিশনের উদ্যোগে

(পরবর্ত্তী-প্রবন্ধ প্রত্যেকটীর দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

আমায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্।
মন্ত্রাণাং তদ্বদাহুস্তদর্থজ্ঞা যথা লৌকিকবাক্যানি॥
আপ্তোপদেশশব্দাচ্চ
নিত্যতঃ সিদ্ধস্য বস্তুনোঽধিগমঃ।

প্রাণভিন্নস্য বুদ্ধা প্রতিসন্ধিরিবেতরাণাম্।
মুখ্যবুদ্ধিঃ পরিশেষে বৈকল্যে লক্ষণা।
—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী
'নিত্য' ঐতিহ্য আদি গ্রন্থের॥

২৩শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২২শে বৈশাখ, ১৩৫২ ; ৫ই মে, ১৯৪৫ | ৩৭শ-৪২শ সংখ্যা

তোষামোদ ও মানদধর্ম্ম

লোকশিক্ষক শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর মানদধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করিবার প্রয়োজন প্রদান করিয়াছেন। চৌষট্টি-প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে "প্রাণিমাত্রে মানাদরের উদ্বেগ না দিব" (চৈ চ ম ২২।১১৫) এবং শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের শিক্ষার মধ্যেও "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা" (চৈ চ অ ২০।২১) প্রভৃতি উপদেশ পাওয়া যায়। অজ্ঞানকারী ব্যক্তির তত্ত্ব ও তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। 'তত্ত্বজ্ঞান-রহিত অর্থাৎ প্রাণি-মাত্রের প্রতি আদর বা সম্মান-রহিত হইয়া অজ্ঞানের অভিনয় করিলে তাহা বিড়ম্বনামাত্র; সেইরূপ অর্জ্জন ভস্মে ঘৃতাহুতি তুল্য।'—এরূপ উক্তি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। এইসকল শাস্ত্রবাক্য, প্রয়োজন, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগৌরপার্ষদ-গণের আচরণ কি সম্বন্ধে বহির্মুখ-জীবমাত্রকে বহুমান বা তাহাদিগকে তোষামোদ করিবার নীতি শিক্ষা দিতেছে না? উন্মুখ ব্যক্তি বা সাধুর স্তব-স্তুতি সকলেই করেন। তাঁহারা নিত্য গুরু ও মানী; তাঁহাদিগকে মান প্রদান করিবার জন্য কোন নীতির আবশ্যক করে না। বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে (চৈ চ ম ২২।৮২)—

"কাহেরে গরুড় করে,—ঐছে কোন্ হয়?"

কাক—বিষ্ঠাভোজী, কদন্নভোজী, নীচযোনিপ্রাপ্ত, অতিবদ্ধ সঙ্কুচিতচেতন জীববিশেষ? আর গরুড় শ্রীভগবৎ-পার্ষদ ও ভগবৎসেবানুরক্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভু বিষ্ঠাভোজী বহির্মুখ-জীবকেও ভগবৎপার্ষদরূপে পরিণত করেন।

এইসকল উপদেশ ও আচরণ দেখিয়া এরূপ অনুমিত হয় যে, বহির্মুখ-জীবগণকে বহুমান করা, তাহাদিগকে নানাপ্রকার চাটু-বাক্যে সম্মান প্রদর্শন করা, তোষামোদ করা—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত মানদধর্ম্ম?

মহাজনগণের আচরণের মধ্যে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তিতেও দেখিতে ও জানিতে পারা যায় যে, তাঁহারা গুরুব-ষ্টকাদি পাঠ করিয়া বহুমান করিয়া দণ্ডবৎপ্রণামাদি করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার ঠাকুর শ্রীল কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন (চৈ চ অ ৩২৮-২৯)—

"ব্রহ্মাদি গুরুব ষ্টকাদি অন্ত করি'
দণ্ডবৎ করিবেক বহুমান্য করি'॥
এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম—সবারে প্রণতি
সেই ধর্ম্মরক্ষা, যাঁর হয় সাধু মতি।"
"প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্।
প্রবিষ্ট ঈশ্বরস্যেতি তাবদ্ভাগবতোত্তমঃ॥"
(ভা ১১।২৯।১৬)

'শ্রীভগবান্ স্বয়ংই জীবরূপ আশ্রয়-দ্বারা সকল দেহে অনু-প্রবিষ্ট রহিয়াছেন'—ইহা চিন্তা করিয়া গুরুব, ষ্টকাদি, গো, গর্দ্দভ পর্য্যন্ত যাবতীয় জীবকে ভূপতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে।

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা

অন্তর্গত 'মানদমণ্ডলী'-নামে একটি সেবা-বিভাগ উন্মোচন করিয়াছিলেন। সেই মানদমণ্ডলীর বিশিষ্ট সেবা এই—'যাঁহারা ভগবানের বা ভগবদ্ভক্তের প্রিয় সেবা-কার্য্য করিবেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের সেবার নির্দ্দেশক যোগ্য সম্মান প্রদান করা।' ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও শ্রীধামপ্রচারিণী-সভায় বহু বিষয়ী ও জাগতিক অভিজাতাভিমান-শূন্য ব্যক্তিকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোন-না-কোন সেবায় যৎকিঞ্চিৎ উন্মুখ দেখিয়া তাঁহাদিগকে বহু ভক্তি-সূচক উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে প্রতি-বৎসর শ্রীধামপ্রচারিণী-সভায় বহু ব্যক্তি, সজ্জন ও সেবক ভক্তিসূচক নানা উপাধি বা নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইসকল উদাহরণ ও আদর্শ, মানদধর্ম্মই যে হরিকীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবের ধর্ম্ম, ইহা প্রমাণ করিতেছে।

মানদধর্ম্ম—শ্রীহরিকীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবের ধর্ম্ম, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু মানদধর্ম্ম ও তোষামোদ কি এক?

প্রত্যেক জীবকে শ্রীভগবানের সহিত সম্পর্কিতরূপে দর্শন করিয়া তাহাকে যে যথাযোগ্য সম্মান-প্রদান,—ইহারই নাম 'মানদধর্ম্ম'। অন্তর্যামি-দৃষ্টি-রহিত হইয়া অর্থাৎ জীবের অন্তরে শ্রীনারায়ণ অন্তর্যামিরূপে বাস করিতেছেন,—এই দৃষ্টিতে এবং 'অন্তর্যামি-চালিত হইয়া জীব আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে'—এইরূপ জ্ঞানের সহিত অন্তর্যামীর সুখবিধানের জন্য যে প্রাণী যেরূপ সম্মানের অধিকারী, তাহাকে সেইরূপ সম্মান না দিয়া যদি কেবল জীবের বহির্ম্মুখতাকে বহুমানন করা যায়, নিজের কোন-প্রকার অপস্বার্থ-সাধন বা উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য জীবের বহির্ম্মুখতার স্তব-স্তুতি ও চাটুকারিতা করা যায়, তবে তাহাই 'তোষামোদ'। তোষামোদে নিজের কোন অসৎ-স্বার্থসিদ্ধি অর্থাৎ লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা বা কোনপ্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অভিসন্ধি আছে; আর মানদধর্ম্মে কেবলমাত্র অভীষ্টদেবের সুখানুসন্ধান এবং অভীষ্টদেবের সুখানুসন্ধানকারীর অল্প-সেবাচেষ্টাকে বহু-মানমুখে আত্মসৌভাগ্য অভীষ্ট-সেবায় উল্লাস, উৎকণ্ঠা ও প্রীতির উত্তরোত্তর প্রগতির অনুসন্ধান আছে। যাঁহাদের চিত্ত শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের প্রীতিতে ভরপুর, সেই শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-প্রেমিক গুণগ্রাহী অদোষদর্শী মহাজনগণ যে বিষয়ী, দুরাচার প্রভৃতির কদর্য্যস্বভাব বা দুরাচারত্ব না দেখিয়া অতি ঈষৎ উন্মুখতাকে, অন্ততঃ একটুকু কর্ম্মার্পণ-চেষ্টাকেও বহুমানন করেন,—ইহা নিজের কোন অপস্বার্থমূলক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-সিদ্ধির উদ্দেশক নহে বলিয়া ও একমাত্র তাঁহাদের প্রাণকোটি-সর্ব্বস্ব অভীষ্টদেবের সুখানুসন্ধান-তাৎপর্য্যপর বলিয়া 'তোষামোদ'-পদবাচ্য নহে, পরন্তু ইহাই 'মানদ-ধর্ম্ম'। এইজন্যই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা ও শ্রীশ্রীধাম-প্রচারিণী-সভায় স্ব-স্ব প্রাণকোটি-সর্ব্বস্ব শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীগুণাভাসের প্রতি ঈষৎ উন্মুখ ব্যক্তিগণকেও মান দান করিয়াছেন। বহির্ম্মুখ জীব সমস্ত ক্রিয়া-কলাপ, অর্থ, বিত্ত, চিত্ত, দেহ, পরিজন—সমস্ত বস্তুকে কেবলমাত্র নিজ-ভোগের একচেটিয়া উপকরণ করিয়া রাখিয়াছে, দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করিতেছে। যাঁহাদের কর্ণে মহতের বাণী অতি সামান্যও প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা অতি আংশিক ও সার্ম্বিকভাবে তাঁহাদের সেই নৈসর্গিক চিত্ত, বিত্ত ও কায়মনোবাক্যে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া পরদুঃখকাতর শ্রীশ্রীগৌরসেবা-সর্ব্বস্ব শ্রীগৌরজনগণ উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। এই যে জীবের সামান্য কর্ম্মার্পণ-চেষ্টারূপ শ্রীগৌরহরির শ্রীগুণাভাস, তাহা সর্ব্বনিম্নস্তরের ভাগবতধর্ম্ম হইলেও নিজ-প্রভুর প্রতি বিমুখ-জীবের ঘাড়-ফিরান কার্য্য বা পরমার্থ-মন্দিরের দ্বারে প্রবেশের দিকে অতি প্রাথমিক-চেষ্টা মনে করিয়া গুণগ্রাহী মহদ্গণ বহুমানন করেন। এই গুণগ্রহণ-বৃত্তিতে বৈষ্ণবতা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু জীব যদি শ্রীগৌরপ্রেমিকগণের মানদানরূপ এই কৃপাকে মহতের আশীর্ব্বাদ ও কৃপারূপে বরণ না করিয়া উহাকে ভোগ করিবার অর্থাৎ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার সম্ভার বা প্রভীকরূপে গ্রহণ করে, তবে কৃপার পরিবর্ত্তে তাহা মায়া, দম্ভ বা বঞ্চনা হয়। যেরূপ 'মায়া'-শব্দে কৃপা ও দম্ভ (কাপট্য) উভয়ই বুঝায়,—তদ্রূপ মহতের কৃপাই তখন বঞ্চনা হইয়া পড়ে। কর্ম্মার্পণের অভিনয় করিয়া যখন বিজ্ঞাপন বা প্রস্তরফলকে নিজের কর্ম্মবীরত্বের চিত্র মুদ্রিত বা খোদিত দেখিবার অভিলাষ হয়, তখন আর তাহা কর্ম্মার্পণ বা 'ভাগবতধর্ম্ম'-পদবাচ্য থাকে না, তাহা কর্ম্মফল আত্মসাৎ বা ভোগ করিবার চেষ্টায় পরিণত হয়।

শ্রীগৌরপ্রেমিকের চিত্তবৃত্তি ও কর্ম্মার্পণ করিবার নামে কর্ম্মফল আত্মসাৎ করিবার প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য-স্বরূপ লাভ-পূজা-

প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির জন্য যে ব্যক্ত ও অব্যক্ত আগ্রহ—এই দুই চিত্তবৃত্তির মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীগৌরপ্রেমিক কাহাকেও 'ভক্তি-ভূষণ', 'বিদ্যাভূষণ', 'মহামহোপদেশক', 'ভক্তিব্রত', 'গৌর-সর্ব্বস্ব' প্রভৃতি শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া নিজের শ্রীগৌর-প্রীতিরই পরিচয়প্রদান-পূর্ব্বক মানদধর্ম্ম-বিশিষ্ট হইলেন; আর যে ব্যক্তি মহতের ঐ-প্রকার কৃপাকে সার্টিফিকেট্ বা প্রশংসাপত্র, গুরুবা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার প্রতীকবিশেষরূপে গ্রহণ করিয়া প্রচুর লাভিক হইয়া পড়িল, হৃদয়ে নিজের অযোগ্যতার উপলব্ধি দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইবার পরিবর্ত্তে প্রিয়প্রবা বিষয়বিগ্রহের জীবের অনুকরণে নিজের প্রশংসা শুনিবার জন্য যাহার চিত্ত ও কর্ণ উৎগ্রীব হইয়া উঠিল, অথবা কপট-দৈন্যের আবরণে ও সেবার অভিনয়ে চিত্ত অন্য অভিসন্ধিতে আসক্ত হইল, যাহার কর্ম্মার্পণ-চেষ্টা ক্রমশঃ মহতের কৃপাশীর্ব্বাদ-মণ্ডিত হইয়া ক্রমভক্তিমার্গে বিচরণ করিতে করিতে অহৈতুকী অপ্রতিহতা নির্গুণা ভক্তির দিকে অভিসার না করিল, যাহার চিত্তে অভীষ্ট-বস্তুর সুখানুসন্ধানময় আবেশ ও প্রবাসুস্মৃতির উদয় না হইল, তাহা হইলে জানিতে হইবে, সেই ব্যক্তি মহতের কৃপাশীর্ব্বাদ ও মানদ শ্রীগৌরজনের অহৈতুক কৃপালাভের পরিবর্ত্তে নিজ-দুর্ভাগ্য-ফলেই বঞ্চিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বিদ্যাভোজী রায়ের বিদ্যা-ভোজন-প্রবৃত্তি অটুট রাখিয়া তাহাকে গরুড় করেন নাই। আত্মবৈভবের গঙ্গা-প্লাবনে যাঁহাদের চিত্ত হইতে সমস্ত জড়মল বিদূরিত হইয়াছে এবং সেই স্বচ্ছ-হৃদয়ে শ্রীগৌরপ্রেমের সুরধুনীস্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছে, তাঁহাদের আদর্শরূপে কোন শ্রীগৌরজন দৈন্যমুখে শ্রীগৌরহরির মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"সার্ব্বভৌম কহে,—আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে মোর এ সম্পৎ-সিদ্ধি॥
মহাপ্রভু বিনা কেহ নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে,—ঐছে কোন্ হয়?
তার্কিক-শৃগাল-সঙ্গে ভেউ-ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি 'কৃষ্ণ', 'হরি'॥
কাহাঁ বহির্ম্মুখ তার্কিক-শিষ্যগণ-সঙ্গে।
কাহাঁ এই সহজসুধা-সমুদ্র-তরঙ্গে!!"

(চৈ চ ম ১২।১৮১-১৮৪)

একদিকে যেমন মানদশিরোমণি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়া শ্রীসার্ব্বভৌম দৈন্যের প্রস্রবণমূর্ত্তি হইয়াছেন; আর একদিকে যিনি মান দান করিয়াছেন, সেই প্রভুও নিজ-জনকে উপলক্ষ করিয়া জীবের নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রীতির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া কৃষ্ণপ্রীতিই যে জীবের নিত্য-স্বভাব এবং মহদ্‌গণ যে জীবকুলকে সেই স্বভাবে উদ্বুদ্ধ দেখিবার জন্য সতত ব্যাকুল, জীবকে কৃষ্ণপাদপদ্মে অঞ্জলি দিবার জন্যই তাঁহাদের অখিল-চেষ্টা ও তদন্তর্গতই মানদধর্ম্ম, বিপ্রলম্ভরসাশ্রিতেরই মানদধর্ম্ম স্বাভাবিক—ইহা শিক্ষা দিয়াছেন,—

"প্রভু কহে,—'পূর্ব্বে সিদ্ধ কৃষ্ণে তোমার প্রীতি।
তোমা-সঙ্গে আমা-সবার হইল কৃষ্ণে মতি॥'
(চৈ চ ম ১২।১৮৫)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু লিখিয়াছেন,—

"ভক্ত-মহিমা বাড়াইতে, ভক্তে সুখ দিতে।
মহাপ্রভু বিনা অন্য নাহি ত্রিজগতে॥"
(চৈ চ ম ১২।১৮৬)

অতএব যেখানে নিত্যসিদ্ধ মানদধর্ম্মবিশিষ্ট মহতের মান-দানরূপ কৃপাভাসকে জীব বরণ করেন, সেখানে জীবের চিত্ত দৈন্যের দ্বারা আপ্লুত হয়। অতএব 'মানদধর্ম্ম' আর 'তোষামোদ' বা চাটুকারিতা এক নহে। মানদধর্ম্মের ছলে নিজ অপস্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যে বহির্ম্মুখ বা বিষয়ী ব্যক্তিকে তোষামোদ, তাহার ন্যায় নীচ-বৃত্তি ও বিষয়বিষ্ঠা লেহন করিবার দুর্দ্দমনীয় পিপাসা আর কিছুই নাই। তোষামোদ বা চাটুকারিতাকে "প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে"—এই বৈষ্ণবী ভক্তির প্রতি সম্মান ত' বলা যাইবেই না, পরন্তু তোষামোদের ন্যায় জীবের প্রতি উৎপীড়নের এরূপ প্রচ্ছন্ন অবৈষ্ণবচেষ্টা আর কিছু আছে কি না, সন্দেহ। কারণ, তোষামোদ সর্ব্বাপেক্ষা বড়-রকমের ঘুষ। বিষয়ীর আসক্তির বস্তু স্ত্রী, পুত্র বা বিষয়-বৈভবের বিনাশ হইবে,—এই ভয় বা কোনরূপ অভিশাপের বিভীষিকা দেখাইয়া এক শ্রেণীর সাধুনামধারী বিষয়িগণের নিকট হইতে অর্থ বা দ্রব্যাদি শোষণ করে; ইহা স্পষ্ট ঘুষ। আর বিষয়ীকে তোষামোদ করিয়া স্ত্রৈণ বা বৃষলীপতির অর্থ-বিত্ত দোহন করিবার উদ্দেশ্যে কখনও তাহার কামিনীকে তোষামোদ এবং কখনও বা কামুক বিষয়ীর যে স্তব-স্তুতি করা হয়, তাহা প্রচ্ছন্ন ঘুষ।

নাস্তিক বিষয়ী অনেক সময় স্পষ্ট জুলুমকে পরিহার করিতে পারে, কিন্তু সাধুর লজ্জায় সজ্জিত ব্যক্তিগণ তোষামোদের দ্বারা যে প্রচ্ছন্ন জুলুম করে, তাহার মোহন-জালে নাস্তিক বহির্মুখও বদ্ধ হইয়া পড়ে। কারণ, বহির্মুখ ব্যক্তিমাত্রই প্রতিষ্ঠা-বিদ্যার বুভুক্ষু; সুতরাং প্রতিষ্ঠা-বিদ্যার বুভুক্ষুর সম্মুখে যে ব্যক্তি একগ্রাস অধিক বিষ্ঠা উপস্থিত করিয়া দেয়, সে ব্যক্তি কখনও মানদ-ধর্মযাজী নহে। প্রতিষ্ঠা-বিদ্যা-লোহনের জন্য সর্ব্বদা ঐ ব্যক্তির জিহ্বা লেলিহান বলিয়াই সে বিষয়ীকে প্রতিষ্ঠা দান করিতে উদ্যত হয় এবং বিষয়ীকে ঐরূপভাবে পীড়ন করিয়া তামসী ও রাজসী ভক্তির প্রশ্রয় দান করে। কারণ, শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

"অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্‌ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ॥"

(ভা ৩।২৯।৮)

যে সক্রোধ ও উদ্বেগভেদবাদী নির্দ্দয় ব্যক্তি হিংসা, দম্ভ বা মাৎসর্য্য লক্ষ্য করিয়া আমার প্রতি ভক্তির অভিনয় করে, সেই ব্যক্তি 'তামস-ভক্ত' নামে অভিহিত হয়।

"বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা।
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্‌যো মাং পৃথগ্‌ভাবঃ স রাজসঃ॥"

(ভা ৩।২৯।৯)

যে পৃথগ্‌ভাব (অর্থাৎ আমা হইতে অন্যত্র বিষয়াদিতে স্পৃহাযুক্ত) ব্যক্তি বিষয়-সমূহ, প্রতিষ্ঠা ও অর্থবিত্ত সঞ্চয় করিয়া অর্চ্চাদিতে আমার অর্চ্চন করে, সে 'রাজস-ভক্ত' নামে কথিত।

তোষামোদকারী অপর প্রাণীকে বাহিরের দিকে 'মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব'—এই উপদেশের ছলনা লইয়া তাহার প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা আচরণ করে অর্থাৎ তাহাকে কর্ম্মার্পণরূপ ভাগবতধর্ম্মের মহত্ত্ব শিক্ষা দিবার পরিবর্ত্তে তাহাকে টেব্‌লেট্ (tablet) বা প্রস্তরফলক, উপাধি বা সার্টিফিকেট্ প্রভৃতির লোভ দেখাইয়া তাহার উন্মুখতার অতি প্রাথমিক-চেষ্টাকে হত্যা করে এবং কোন ব্যক্তি পরতত্ত্বের দিকে একটুমাত্র ঘাড় ফিরাইয়াছে, সেই সুযোগে সেই ব্যক্তির গলা কাটিয়া দিয়া, (তোষামোদরূপ খড়্গের দ্বারা) হিংসা করিয়া থাকে এবং কাপট্য ও মাৎসর্য্যের প্রশ্রয় দিয়া, নিজে প্রতিষ্ঠা-বিদ্যা-লোহনে অকৃত্রিকাম হইয়া সংরম্ভী অর্থাৎ ক্রোধযুক্ত থাকে। ক্ষুব্ধ তোষামোদকারী সেই তামসিক শক্তিপুঞ্জকের অভিনয়কারী দম্ভী ও ঘাটপাড়গণের নিত্য পরমার্থের পথের দ্বারে প্রথম পদবিক্ষেপেচ্ছু ব্যক্তিগণকে তোষামোদ-খড়্গের দ্বারা বিনাশ করিয়া থাকে। তোষামোদকারিগণ নিজেরা অদ্বিতীয়-বিষয় অধ্বজ্ঞানের শ্রীপাদপদ্ম হইতে পৃথক্ হইয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি-বিদ্যার প্রতি স্পৃহাযুক্ত; সুতরাং অন্যকেও তাহাদের ভাণ্ডারের মাল অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা-বিদ্যার দুর্গন্ধদ্বারা তৃপ্ত করিয়া নিজেদের বিদ্যার ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে চাহে, ইহা জঘন্যতম বণিগ্‌বৃত্তি।

শ্রীগুরুসেবার ছলে, ভিক্ষাদি-সংগ্রহের নামে, মানদধর্ম্ম যাজন করিবার ছদ্মবেশে বস্তুতঃ নিজের লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-বিদ্যার ভাণ্ডার বর্দ্ধন করিবার উদ্দেশ্যে যে বহির্মুখতার তোষামোদ, তাহা কখনও মানদধর্ম্মী গুরুসেবক বা হরিকীর্ত্তনকারীর কৃত্য নহে। কোন-কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, গুরু বা আচার্য্যের ছদ্মবেশ-পরিহিত, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-বিদ্যার ভিক্ষুক ব্যক্তিগণ বিষয়ী ও দুরাচার শিষ্য-ক্রবগণের দুরাচারিতার তোষামোদ করিয়া নরক-পথের যাত্রী হয়। এই-সকল কার্য্য—মানদধর্ম্ম নহে। শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী ঠাকুর বা শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কখনও তোষামোদকে 'মানদধর্ম্ম' বলেন নাই। যাঁহারা সেইসকল শ্রীগৌরপ্রেষ্ঠবৃন্দের চিত্তবৃত্তির অতি সামান্য দিগ্‌দর্শনেরও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন। কিন্তু প্রেমিকগণের চিত্তবৃত্তির সেই উচ্চে বুঝিতে না পারিয়া যাহারা কৃপাকে মায়া ও দম্ভরূপে বরণ করিয়াছে, তাহাদের নির্ঘৃণতম দুর্ভাগ্যের সংস্পর্শে কোন জীব পতিত না হয়, এজন্য অহৈতুক জীবদুঃখকাতর অবঞ্চনার অদ্ভুতপূর্ব্ব-অবতার ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-প্রসাদ-পুরী গোস্বামিঠাকুর শ্রীগৌরপ্রেমিক শ্রীগুরুপাদপদ্ম-দ্বয়ের আদর্শের অনুসরণ হইতে স্বয়ং বিরত থাকিয়া নিজ সেবকগণকে মঙ্গলের পথে টানিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীব্যাসপ্রচারিণী-সভায় বা শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভায় উপাধি-প্রধানের প্রথা দেখিতে না পাইয়া অবাঙ্মনোবেগশালী কেহ কেহ মনে মনে ভাবিতে পারেন,—"সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই! শ্রীব্যাসপ্রচারিণী-সভার প্রধান কার্য্যটী উঠিয়া গেল, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার মানদমণ্ডলী-বিভাগ—যাহা সমস্ত বিভাগের শীর্ষদেশে অবস্থিত ছিল, তাহা শূন্য

হইল ; সুতরাং মানদধর্ম্ম বা হরিকীর্ত্তনকারীর ধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্ম গৌড়ীয়-সম্প্রদায় হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল।"

তোষামোদপ্রিয় ও তোষামোদকারী হিংসক, দাম্ভিক, সমৎসর, বঞ্চক, তামসী-রাজসী প্রকৃতির ব্যক্তিগণের এইরূপ চিত্তবৃত্তি স্বাভাবিক। মানদধর্ম্ম-যাজন ও তাহার সংস্পর্শে আসিবার উভয়তই ফল—নিজের অযোগ্যতার তীব্রতম উপলব্ধির সহিত হরিকীর্ত্তন। তিনি অমানী অর্থাৎ নিজের প্রতিষ্ঠাশার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ও লজ্জাশীল, তথা সমস্ত প্রতিষ্ঠা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-নখজ্যোতির সতত সম্বর্দ্ধনকারী এবং যিনি কেবল নিজের হরিভজন হইল না, "সবে কৃষ্ণ ভজন করে,—এইমাত্র জানে" (চৈ চ অ ১৩।১০৩)। তিনি মানদধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া অপরকে মান দান করেন এবং তাঁহার মানদানরূপ কৃপাশীর্ব্বাদ-শক্তিসঞ্চারে যে ব্যক্তি প্রকৃত-প্রস্তাবে অভিষিক্ত হইতে পারেন, তাঁহাতেও সেই অতি-মর্ত্ত্যদীনতা প্রকাশিত হয়। মহাভাগবতের সর্ব্বত্র কাক-দর্শনরূপ মানদানের মধ্যে বহির্ম্মুখতার প্রতি চাটুকারিতা নাই, কোন হিংসা নাই, কোনপ্রকার অন্যাভিলাষময় অভিসন্ধি নাই।

তোষামোদের মধ্যে দালালি-বুদ্ধি, পাটোয়ারিবুদ্ধি ও বঞ্চনাবৃত্তি আছে ; অভক্তকে ভক্তের প্রতিষ্ঠা দিয়া, বিষ্ঠার ক্রিমিকে কক্ষির আশায় করিয়া কল্পিত স্বর্গে উঠাইয়া তাহাকে অবৈধভাবে পীড়ন বা হিংসা করিবার অভিসন্ধি আছে। অমানি-মানদ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল রঘুনাথদাস প্রভুকে তাঁহার পূজ্য পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে মহাপ্রভুর মানদ-ধর্ম্মের ব্যাঘাত হয় নাই। যেহেতু তিনি বিষয়ীকে ভাগবতোত্তম বা শুদ্ধবৈষ্ণব বলিয়া তোষামোদ করেন নাই, সেইহেতু শ্রীমহাপ্রভুকে মানদধর্ম্মের লঙ্ঘনকারী বলা যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথকে বলিয়াছিলেন (চৈ চ অ ৬।১৯৭-১৯৮),—

"তোমার বাপ-জ্যেঠা—বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া।
সুখ করি' মানে বিষয়-বিষের মহা-পীড়া॥
যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়।
শুদ্ধবৈষ্ণব নহে, বৈষ্ণবের প্রায়॥"

দৈন্যের মূর্ত্তি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু—যিনি আপনাকে "পুরীষের কীট হইতে মুঞ্জি সে লঘিষ্ঠ" (চৈ চ আ ৫।২০৫) প্রভৃতি বাক্যে জীবজগৎকে দৈন্য শিক্ষা দিয়াছেন, তিনি মানদ-ধর্ম্মের ছলে সত্যকথা গোপন বা কোন সম্প্রদায়বিশেষকে তোষামোদ করিয়া নিজের প্রতিষ্ঠাকে বহুমানন করেন নাই। সেই অমানী, মানদ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন (চৈ চ আ ১০।৮৯),—

"পশ্চিমের লোক-সব মূঢ় অনাচার।"

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস-ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন আধুনিক প্রতিষ্ঠাবিদ্যা-লেহনকারী কপটী প্রাকৃত সাহিত্যিকগণের ন্যায় "চুপ্‌সি চুপ্‌ হাম্‌সি চুপ্‌"-নীতি অবলম্বন করিয়া,' অথবা নিজের প্রতিষ্ঠা-বিদ্যার ভাণ্ডারবৃদ্ধির জন্য অপর প্রতিষ্ঠা-বিদ্যাভোজীর তোষামোদ করিবার নীতি অবলম্বন করিলে প্রতিষ্ঠা-বিদ্যার ক্রিমি-কীট প্রাকৃত সাহিত্যিক-সমাজে অধিক সম্মান লাভ করিতে পারিতেন ; কিন্তু তিনি বিষয়-বিদ্যার কীড়াগণের স্তবস্তুতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া নিজ-অভীষ্টদেবের অকপট সেবা করিয়াছেন। এজন্যই অমানি-মানদধর্ম্মের শিক্ষকশিরোমণির দাস-সূত্রে তিনি শ্রীনিত্যানন্দ-নিন্দককে একাধিকবার "তবে লাথি মারোঁ তা'র শিরের উপরে" বলিতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত হন নাই। কারণ, শ্রীগৌরপ্রেমিকগণ জানেন,—তোষামোদ মানদধর্ম্ম নহে।

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের অহৈতুকী কৃপায় শ্রীগৌরজনের অবঞ্চনাময়ী কৃপায় এইরূপ আদর্শ প্রতিমুহূর্ত্তে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে বলিয়া আপনাকে ধন্যাতিধন্য মনে করিতেছি। 'তোষামোদ' বলিয়া কোন শব্দ যাঁহার অভিধানে নাই, অথচ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অকৃত্রিম ও অতিমর্ত্ত্য স্তুতিতেই যাঁহার সমগ্র সত্তা সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত, সেইরূপ কোন অনির্ব্বচনীয় মহাপুরুষ বহির্ম্মুখ লোকের প্রাণে আপাততঃ উদ্বেগপ্রদানের অভিনয় করিয়াও তাহার সর্ব্বোত্তম কল্যাণ বিধান ও নিজপ্রাণকোটি-সর্ব্বস্বের সুখবিধান করিতেছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময়ই বলিতেন, বিশেষতঃ "তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্। শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥" (ভা ১১।৩।২১)—এই শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে সকল সময়ই বলিতেন,—"অনাদিবহির্ম্মুখ জীবের হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক ব্যথা প্রদান করিয়াও তাহার মঙ্গল করিতে হইবে।" মহা-পুরুষের বাণীর মধ্যে এই বাস্তব সত্য সম্প্রকাশিত ছিল ; কিন্তু আমার ন্যায় দুর্ভাগা সেই আলোক-বর্ত্তিকার নিম্নে ছায়ারূপে অবস্থান করিয়া তোষামোদকেই মানদধর্ম্ম, কৃপাকেই মায়া ও দম্ভ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে। এই আত্মবঞ্চনা

হইতে আমাকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম পুনরায় আর এক অভিনয়-মূর্ত্তিতে অর্থাৎ কেবল তাঁহার বাণীর মধ্যে নহে, তাঁহার সমস্ত আচার ও আদর্শের মধ্যে জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয়তর্পণ-পিপাসাকে উপশমিত করিয়া অতীন্দ্রিয়ের সুখানুসন্ধান-লালসাকে বিস্তার করিয়াছেন। সেবার অভিনয়কারীকে ভোগবিমোহ করিবার জন্য যে-সকল বহুরূপী অস্ত্র আছে এবং তন্মধ্যে বণিগ্‌বৃত্তির যে মোহন-বিদ্যা লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহার সর্ব্বপ্রকার প্রচ্ছন্ন-স্বরূপ তিনি উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। যে শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে বঞ্চনা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি শিষ্যকে ভোগবিমোহ বা তদনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠা-প্রবিধাদি প্রদান করেন। শ্রীপ্রহ্লাদের ভাষায়—"ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্" (ভা ৭।১০।৫)। যাহাকে নিম্ন শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন, তাহাকেই তিনি অমায়ার শাসন করিয়া থাকেন। কাজেই শিষ্যব্রুবকে ভোগবিমোহ, সতীর্থব্রুবকে ভোগবিমোহ, মানব-সমাজকে ভোগবিমোহ, জাগতিক প্রতিষ্ঠাশালীকে তাহাদের প্রতিষ্ঠাবিদ্যার লোভে মুগ্ধ হইয়া যে ভোগবিমোহ, ত্রৈণিকে ভোগবিমোহ, বিষয়ীকে ভোগবিমোহ, ভণ্ডকে ভোগবিমোহ, ভক্তিমাতার ধর্ষণ-প্রয়াসীকে ভোগবিমোহ, ভর্ত্সনপরাধীকে ভোগবিমোহ, বৈষ্ণবাপরাধীকে ভোগবিমোহ, নামাপরাধীকে ভোগবিমোহ, ধামাপরাধীকে ভোগবিমোহ যে কেবল বিষয়বিদ্যার কূপে নিমজ্জিত হইবার লোলুপতা এবং তাহা হইতে মানব-বর্ষের অমৃতলিপ্সু বহু বহু দূরে অবস্থিত,—ইহা আমরা এই ছাপুকুরের শিক্ষায় প্রাপ্ত হই।

শ্রীপুরুষোত্তমের কয়েকটি প্রাচীন গৌড়ীয়বৈষ্ণব-মঠ

শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্র সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের নিকটই পরম পবিত্র-ক্ষেত্র বলিয়া আবহমানকাল হইতে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার চারিজন শিষ্যের দ্বারা ভারতবর্ষে যে চারিটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীপুরুষোত্তমের 'শ্রীগোবর্দ্ধন' বা 'ভোগবর্দ্ধন মঠ' অন্যতম। এমন কি, কবীর ও নানক-পরিগণের মঠও এই স্থানে দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্র নীলা পুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণুর ক্ষেত্র বা ধাম। এইজন্য এস্থানে বিভিন্ন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মঠ প্রাচীনকাল হইতে প্রকাশিত রহিয়াছেন। মহারাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন ও শ্রীপুরুষোত্তমের বিভিন্ন রাজবংশ সকলেই শ্রীবিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। গজপতি শ্রীপ্রতাপ-রুদ্র ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় উদ্ভাসিত হইবার পর শ্রীপুরুষোত্তমের সর্ব্বত্র শ্রীশ্রীগৌরহরির নাম প্রেম-প্রচারের জন্য বিভিন্ন স্থানে মঠ বা ভক্ত সঙ্ঘারাম-স্থাপনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। শ্রীল রায়রামানন্দ-প্রভু 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যানে', শ্রীপরমানন্দপুরী গোস্বামি-প্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের পশ্চিমদিকে, শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভু 'শ্রীটোটা-গোপীনাথ-মঠে', শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামি-প্রভু 'সাতাসনে'র অন্যতম 'বড় আসন-মঠে', শ্রীল ভগবানন্দ পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভু 'শ্রীগিরিধারী-আসন-মঠে', শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু 'শ্রীমদনমোহনদেব-আসন-মঠে', খঞ্জ শ্রীভগবান্ আচার্য্য 'শ্রীবলরাম-আসন-মঠে', শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী ও সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথদাস যথাক্রমে 'শ্রীরাধাকান্তমঠে' ও 'শ্রীসিদ্ধ-বকুল-মঠে', শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর 'শ্রীবিশাখা-মঠে', শ্রীঅভিরাম ঠাকুর 'শ্রীবালি-মঠে', শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু ও তদ্শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ 'শ্রীকুঞ্জমঠে', শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর শিষ্য শ্রীপ্রেমদাস বা শ্রীকৃষ্ণদাস 'শ্রীরাধা-দামোদর-মঠে', শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের কোন শিষ্য 'আঙ্গণিটা-মঠে', শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আত্মজা শ্রীঅচ্যুতানন্দা 'শ্রীনন্দিনী-মঠে', শ্রীশিখি-মাহিতির ভগিনী শ্রীমাধবীদেবী 'বেণ্টপুর শ্রীগোপী-নাথ-মঠে' ও শ্রীহরিদাস পণ্ডিতের অনুগৃহীতা শ্রীশচী-দেবী 'শ্রীগঙ্গামাতা-মঠে' শ্রীশ্রীগৌর-বিহিত নামপ্রেমকীর্ত্তন-প্রচারের বন্যা আনয়ন করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে এক নবযুগের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। ইহার পরবর্ত্তিকালে মহাত্মা শ্রীস্বরূপদাস বাবাজী 'কমলিপটিকা-আসন-মঠে' ও বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল-পুরুষ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের ভজন স্থলীর সন্নিকটে এবং তৎপরবর্ত্তিকালে স্থলীর অবস্থানবয় ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদের 'ভজনকুটীতে' ও চটকপর্ব্বতে 'শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ' স্থাপন

করিয়া শুদ্ধভক্তি প্রচার করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী ভাষায় 'Maths of Orissa' নামক একটি গ্রন্থ লিখিয়া উৎকলের মঠসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থটি এখন লুপ্তপ্রায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশীয় আধুনিকবিভিন্ন গবেষক শ্রীপুরুষোত্তমের বিভিন্ন মঠ-সম্বন্ধে কিছু কিছু বিকৃত ও অসম্পূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। আমরা সেই-সকল আলোচনার দ্বারা বিশেষ আলোকান্বিত হইতে পারি নাই। এজন্য প্রত্যেক মঠে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইয়া অনুসন্ধান-পূর্ব্বক যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা শ্রীশ্রীগুরুবর্গের অভিপ্রেত 'শ্রীবৈষ্ণবসঙ্ঘ-সমাজভিত্তি'র সেবা-চেষ্টার অতি ক্ষুদ্র আভাস বিচার করিয়া সজ্জন পাঠকগণের সমীপে উপস্থিত করিলাম। 'পুরী-ডিষ্ট্রীক্ট্-গেজেটিয়ারে' পুরীর মঠ-বিশেষে যে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"Maths are monastic houses originally founded with the object of • • • of giving religious instruction to *chelas* or disciples, and generally of encouraging a religious life. The heads of these religious houses, who are called *Mohants* or *Math-dharis*, are elected from among the *chelas*, and are assisted in the management of their properties by *Adhikaris*, who may be described as their business-managers. They are generally celibates, but in certain maths, married men may hold the office. *Mahants* are the *gurus* or spiritual guides of many people, who present the *maths* with presents of money and endowments in land. Thus, the Sriramdasa or Dakshinparsva math received rich endowments from the Marathas, its abbot having been the *guru* of the Moratha Governor; while the *Mahant* of the Emar math in the eighteenth century, who had the reputation of being a very holy ascetic, similarly got large offerings from his followers and is possessed of large estates. Both *Saiva* and *Vaishnava* maths exist in Puri. The lands of the latter are known as *amruta-manohi* (literally nectar-food), because they were given with the intention that the proceeds there of should be spent in offering *bhoga* before Jagannath, and that the *mahaprasad* thus obtained should be distributed among pilgrims, beggars and ascetics; they are distinct from the *amruta-manohi* lands of the temple itself, which are under the superintendence of the Raja. In 1848, Babu Brij Kishore Ghose roughly estimated the annual income of twenty-nine maths from land alone at Rs. 1, 45, 400 and this income has increased largely during the last eighty years.

There are over seventy maths in Puri town. The chief *Saiva* maths are located in the sandy tract near Swarga-dwar, viz. Sankaracharya, with a fine library of old manuscripts, and Sankarananda, which has a branch at Bhubaneswar. Near the Sankaracharya math is a small math of the *Kabirpanthis* or followers of Kabir and the Sikh Guru Nanak. Most of the maths are naturally Vaishnava. The richest of the latter are Emar, Sriramadasa and Raghabadasa, the inmates of which are *Ramats* or followers of Ramananda. The *Gauriyas* or followers of Chaitanya have two maths, viz, *Radhakanta*, with a celibate abbot, and *Kothbhoga*, with a married abbot; while the Madhvacharis have the Achari math with a Telugu married abbot, and the local sub-sects have two Oriya maths. The Uttaraparsva math is one of the oldest and most highly esteemed, being permitted to supply a special *bhoga* of Jagannath, the *mohana bhoga*. Another math with a fair income is located in the Jagannath-ballabha garden, which is frequently mentioned in the biographies of Chaitanya.—'Gazetters of Puri District (1929), edited by L. S. S. O. Malley, I. C. S. Revised Edition by P. T. Mansfield, I. C. S. Page 122-123 (Chapter IV).

১। শ্রীজগন্নাথবল্লভ-মঠ

শ্রীগুণ্ডিচাবাড়ী ও শ্রীমন্দিরের প্রায় মধ্যস্থলে পাতী মাল সাহীতে 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠ' অবস্থিত। পূর্ব্বদিকে ২৮ হাত ৩ পশ্চিমে—মার্কণ্ডেশ্বর, উত্তরে—চুড়ঙ্গাহী ও দক্ষিণে 'মহেন্দ্র সরোবর'— শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যানের সীমানা। 'বল্লভ' শব্দের অর্থ—প্রিয়। এই উদ্যান শ্রীজগন্নাথদেবের প্রিয় বা সুখকর বলিয়া ইহার ঐরূপ নাম হইয়াছে। শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যানস্থ মঠ সর্ব্বপ্রথমে কাহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় নাই। স্থানীয় ব্যক্তিগণের কেহ কেহ বলেন,—ইহা আদি-শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের একটী পীঠস্থান ছিল; তাঁহারা আরও বলেন,—শ্রীরামানন্দ-রায়ের কুলগুরু শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এইজন্য শ্রীরায়রামানন্দ অনেক সময় শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যানে অবস্থান করিতেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের এই প্রিয় উদ্যান হইতেই প্রত্যহই ফল-পুষ্পাদি বহু সেবোপকরণ শ্রীমন্দিরে প্রেরিত হইত, এখনও হইয়া থাকে। শ্রীজগন্নাথদেবের 'গুণ্ডিচায়' বা 'সুকরাচলে' নয় দিন অবস্থানকালে 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ'-নামক পুষ্পারামে শ্রীগৌরসুন্দর নয় দিন বিশ্রাম করিতেন।

"জগন্নাথবল্লভ নাম বড় পুষ্পারাম।
নব দিন করেন প্রভু তাহাতে বিশ্রাম॥"

(চৈ চ ম ১৪।১০৫)

শ্রীজগন্নাথদেবের বিজয়বিগ্রহ শ্রীমদনমোহন এই উদ্যানে গমন করিয়া 'দমনক'-নামক পুষ্প চুরি করিয়া আনেন। কথিত হয় যে, এই পুষ্প-বাটিকা শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের সমসাময়িক।

'শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠে'র শ্রীমন্দির পূর্ব্বাভিমুখে অবস্থিত। শ্রীমন্দিরের মধ্যপ্রকোষ্ঠে শঙ্খ চক্র-বংশীধারী চতুর্ভুজ ত্রিভঙ্গ শ্রীরাধাগোপাল মূর্ত্তি বিরাজিত। শ্রীমূর্ত্তির ঊর্দ্ধ দক্ষিণহস্তে চক্র, বামহস্তে শঙ্খ ও নিম্ন দুই হস্তে বংশী। ইহার সংলগ্ন দক্ষিণ-প্রকোষ্ঠে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলভদ্র, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীসুদর্শনচক্র অবস্থিত। ইংরাজী ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর সেপ্টেম্বর শ্রীআদিকল্প দাসজীর উদ্যোগে পণ্ডিত শ্রীনরসিংহ মিশ্র শ্রীরাধারমানন্দ ও সখ্যাদি বেশে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তি 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠে' শ্রীমন্দিরের অঙ্গনে প্রবেশের দক্ষিণদিকে একটি প্রকোষ্ঠে স্থাপন করিয়াছেন।

বহু পূর্ব্বে 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যানে'র অন্তর্গত শ্রীমন্দিরের সেবা ভার উদাসীন বৈষ্ণবগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। প্রায় আশী বৎসর পূর্ব্বে উক্ত পীঠের শেষ-মহান্ত শ্রীজগন্নাথবল্লভের সম্পত্তি হইতে প্রায় দশহাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া লইয়া তীর্থ-পর্য্যটনে বহির্গত হন; কিন্তু তিনি স্বদেশে ফিরিয়া বিবাহ* করেন। কর্ম্মচারিবৃন্দ কিছুদিন সেবা-পূজা পরিচালনা করেন। তৎপরে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ২০ দফা আইন-অনুসারে কটকের ডিষ্ট্রীক্ট জজ কর্ত্তৃক একটি কমিটির হস্তে 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-মঠে'র পরিচালন-ভার ন্যস্ত হয়। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের 'উড়িষ্যা-হিন্দু-রিলিজিয়াস্ এণ্ডাউমেণ্ট্ অ্যাক্ট' প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর এণ্ডাউমেণ্টের কমিশনার-কর্ত্তৃক তিনজন ট্রাষ্টীর হস্তে ইহার পরিচর্য্যা ভার অর্পিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ট্রাষ্টীত্রয়—অবসর-প্রাপ্ত ডিপুটী কালেক্টর রায়বাহাদুর শ্রীরামকিশোর দাস, পুরীর জজকোর্টের উকিল রায়সাহেব শ্রীব্রহ্মানন্দ মহান্তী ও জমিদার শ্রীজগবন্ধু সিংহ।

শ্রীজগন্নাথ-বল্লভের বিরাট্ উদ্যান বহুকাল হইতে ভক্ত ও ভগবানের নয়ন-মনোভিরাম হইয়া বিরাজিত রহিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীগোপীশিরোমণির ভাবে বিভাবিত হইয়া 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যানে' মহাভাবাবেশে চিত্রজল্পোক্তিসমূহ প্রকট করিতেন; শ্রীস্বরূপ-রামানন্দরায়ের সহিত এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণবিরহ-লীলা প্রকাশ করিতেন। রাগাত্মিক শ্রীরাধা-নিত্যজন শ্রীরায়রামানন্দ 'শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ' নামক একটি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। সেই নাটক শ্রীজগন্নাথদেবের নিকট অভিনয় করাইবার জন্য শ্রীরামরায় দুইজন নবীনা দেবদাসীকে সেই নাটকের অভিনয়যোগ্য গোপীভাব শিক্ষা দিতেন। এই-সকল কথা 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' অপ্রাকৃত রসিক ভক্তগণের আস্বাদনের জন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

"এককালে বৈশাখের পৌর্ণমাসী-দিনে।
রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উদ্যানে॥
'জগন্নাথবল্লভ' নাম উদ্যান-প্রধানে।
প্রবেশ করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণে॥

---

*পুরীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ রাজপথ, যে পথ দিয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথ গুণ্ডিচাবাড়ীতে অভিযান করেন।

প্রফুল্লিত বৃক্ষবল্লী—যেন বৃন্দাবন।
শুক, শারী, পিক, ভৃঙ্গ ঊর্দ্ধে আলাপন॥
পুষ্পগন্ধ লঞা বহে মলয়-পবন।
তরু হঞা তরুলতার শিখায় নাচন॥
পূর্ণচন্দ্র-চন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল।
তরুলতাদি জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল॥
ছয়ঋতুগণ যাঁরা বসন্ত প্রধান।
দেখি' আনন্দিত হৈলা গৌর ভগবান্॥
"ললিত-লবঙ্গলতা" পদ গাওয়াঞা।
নৃত্য করি' বুলেন প্রভু নিজগণ লঞা॥
প্রতি বৃক্ষবল্লী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অশোকের তলে কৃষ্ণে দেখেন আচম্বিতে॥
কৃষ্ণ দেখি' মহাপ্রভু ধাঞা চলিলা।
আগে দেখি' হাসি' কৃষ্ণ অন্তর্ধান হইলা॥
আগে পাইলা কৃষ্ণে, তাঁরে পুনঃ হারাঞা।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু মূর্চ্ছিত হঞা॥
কৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধে ভরিছে উদ্যানে।
সেই গন্ধ পাঞা প্রভু হৈলা অচেতনে॥
নিরন্তর নাসায় পশে কৃষ্ণ-পরিমল।
গন্ধ আস্বাদিতে প্রভু হইলা পাগল॥

• • • •

এইমত গৌরহরি, গন্ধে কৈল মন চুরি,
কৃষ্ণপ্রায় ইতি-উতি ধায়।
যায় বৃক্ষ-লতা-পাশে, কৃষ্ণ স্ফুরে সেই আশে,
কৃষ্ণ না পায়, গন্ধমাত্র পায়॥
স্বরূপ-রামানন্দ পায়, প্রভু নাচে, সুখ পায়,
এই মতে প্রাতঃকাল হৈল।
স্বরূপ-রামানন্দরায়ে, করি' নানা উপায়,
মহাপ্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি কৈল॥"
(শ্রীচৈ চ অ ১৩।৭৮-৮২, ৯৯-১০০)

'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যান' হইতে এখনও প্রত্যহ শ্রীজগন্নাথদেবের জন্য বড় শৃঙ্গারের সময় তিনটী ফুলমালা ও তিনটী তুলসীমালা যথাক্রমে ষোল, চৌদ্দ ও বার হাত লম্বা করিয়া গাঁথিয়া পাঠান হয়। এতদ্ব্যতীত পুষ্পদ্বারা ভিন্নক ও 'ফুল্লা' রচিত হয়।

প্রাতে শ্রীজগন্নাথদেবের অবকাশ-ভোগের জন্য 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠ' হইতে দধি, মাখন ও মুড়কি-উদ্যানের চাল ও পাক-করা প্রভৃতি উপকরণ প্রেরণ করা হয়। শ্রীজগন্নাথবল্লভের এই সকল দ্রব্য শ্রীমন্দিরে না যাওয়া পর্য্যন্ত অবকাশ ভোগ হইতে পারে না। সকাল ঘুপের জন্য চাউল, ডাউল এবং বেসর, মোহর, পাক ও টকের জন্য নানা প্রকার লঙ্কী আদায় করিয়া পাঠান হয়।

শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যানের অভ্যন্তরে শ্রীবজ্রাঙ্গজী ও দেবতার নিম্নলিখিত পাঁচটী মন্দির আছে—(১) বড় মহাবীর, (২) গুন্ডা-মহাবীর, (৩) ওথা (সুপারী) বাড়ী মহাবীর, (৪) অঞ্জনা-দেবী ও (৫) বুড়িঠাকুরাণী।

গুন্ডা-মহাবীর বা সুড়ঙ্গমহাবীর নামের কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় যে, শ্রীবজ্রাঙ্গজীর মন্দিরের নিকট হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির পর্য্যন্ত ভূমির তলদেশে একটী সুড়ঙ্গ ছিল।

শ্রীজগন্নাথবল্লভে যাত্রা-মহোৎসব—শ্রীজগন্নাথদেবের বিজয়-বিগ্রহ বিশেষ বিশেষ উৎসবোপলক্ষে তাঁহার প্রিয় উদ্যানে বিজয় করিয়া থাকেন। (১) দমনকযাত্রা—শ্রীরাম-কৃষ্ণ-বিজয়-বিগ্রহ চৈত্রী শুক্লা চতুর্দ্দশীতে (যাহা দমনক চতুর্দ্দশী নামে খ্যাত) দমনা-বৃক্ষ (দমনকপুষ্প-বৃক্ষ) চুরি করিবার জন্য গোপনে বিজয় করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহ শ্রীজগন্নাথ-মন্দির হইতে বিজয় করিয়া প্রথমে শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যানের ঝুলন-গৃহে বিরাজ করেন। তখন গন্ধর্ব্ব-পূজা ও ভোগ হয়। তৎপরে সেবকগণ কোন বাদ্য না বাজাইয়া শ্রীরাম-কৃষ্ণ-বিজয় বিগ্রহকে চোরের মত শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যানে লইয়া যান। পূর্ব্ব হইতে সুসজ্জিত বারটী দমনা-গাছ উৎপাটন করিয়া শ্রীরাম-কৃষ্ণের শ্রীহস্তে প্রদত্ত হয়। তৎপরে তিনি শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

(২) বসন্ত-পঞ্চমী—এই উৎসবে প্রায় তিনশত টাকার ভোগ হয়। বিজয়বিগ্রহ শ্রীদোল গোবিন্দ ও শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-সরস্বতী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির হইতে শ্রীজগন্নাথবল্লভ-মঠের ঝুলন-গৃহে বিজয় করেন। তথায় ভোগরাগ হয়। আবির, চন্দন, চূয়া প্রভৃতি দ্রব্য সমর্পণ করিবার পর শ্রীদোল-গোবিন্দ শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

(৩) দশমী হইতে ত্রয়োদশী পর্য্যন্ত শ্রীদোলগোবিন্দ ও শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-সরস্বতী শ্রীমন্দির হইতে আসিয়া শ্রীজগন্নাথ-

বল্লভ-উদ্যানের সম্মুখে বড়-দাণ্ডে দণ্ডায়মান হন। তখন শ্রীজগন্নাথবল্লভের মন্দিরের বারান্দা হইতে পঞ্চি-ভোগ (দুধ চিনি, ভোগ) এবং আখির, চন্দন, চূয়া প্রভৃতি দেওয়া হয়। তৎপরে তিনি নিজ মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

(৭) বেন্ট-যাত্রা—এই যাত্রা ফাল্গুন মাসে হয়। শ্রীরাম-লক্ষ্মণের বিজয়-বিগ্রহ বড় দেউল হইতে শ্রীজগন্নাথবল্লভে বেন্ট-যাত্রা (শ্রীরামচন্দ্রের মৃগয়াকৃতি) করিবার জন্য আসেন। বেন্ট-পুকুরের নিকট বারটী ডাব নারিকেল রাখা হয়। সেবকগণ শ্রীবিগ্রহের হস্তে ধনুর্কাণ স্পর্শ করাইয়া উহা শিকার করেন।

(৮) ছত্তমেলানি-যাত্রা—মকর-সংক্রান্তির দুই দিবস পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিজয়-বিগ্রহ শ্রীমন্দির হইতে বিজয় করিয়া শ্রীজগন্নাথবল্লভের সম্মুখে বড়-দাণ্ডে চন্দ্রাতপের তলে উপবিষ্ট হন। শ্রীজগন্নাথবল্লভ হইতে একটি দুগ্ধবতী গাভীকে আনিয়া শ্রীবিগ্রহের নিকট বাঁধিয়া রাখা হয়। তৎপরে 'মহাভোই' (গোয়ালাজাতিবিশেষ) নামক জাতির কোন ব্যক্তি গো-দোহন করে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সেই কাঁচা দুগ্ধ-ভোগ হয়, তৎপরে তিনি শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

(৯) শ্রীরামনবমী—শ্রীরামনবমী হইতে ৭ দিন পর্য্যন্ত শ্রীজগন্নাথমন্দিরস্থ শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ও শ্রীসীতাদেবীর বিজয়-বিগ্রহ শ্রীজগন্নাথবল্লভে বিজয় করেন। শ্রীজগন্নাথবল্লভে শ্রীরামলীলানবন্তীয় নাটক হইতে থাকে। নির্দ্দিষ্ট সেবকগণ অভিনয় করেন। যখন যেরূপ লীলা হয়, তখন তদনুরূপ লীলায় শ্রীবিগ্রহগণ বিজয় করেন। এই যাত্রায় দৈনিক ৪০৲ টাকার পঞ্চি-ভোগ হয়।

(১০) শ্রীনৃসিংহাবির্ভাব—শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশীতে শ্রীনৃসিংহ-বিজয়-বিগ্রহ শ্রীমন্দির হইতে শ্রীজগন্নাথবল্লভে বিজয় করেন। তথায় ভোগাদি গ্রহণ করিয়া পরে শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

(১১) শ্রীহনুমদাবির্ভাবোৎসব—পৌষ-সংক্রান্তি- (বিষুব-সংক্রান্তি) দিবস উদ্যানে শ্রীহনুমজ্জীউর জন্মোৎসব হয়।

উদ্যানের মধ্যে শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন পশ্চিমভাগে 'আদন-পুকুর' অবস্থিত। পূর্ব্বে গ্রীষ্মকালে এই স্থানে তিনটি খট্টা পুষ্প-শয্যায় সুসজ্জিত করা হইত। সেই মহান্তের পর হইতে ইহা বন্ধ আছে।

পুরী, কটক, ব্রহ্মপুর (গঞ্জাম), নয়াগড়, চেহারদা, কেন্দুঝাড়, বগুড়ি (সিংহাচলের নিকট) 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-মঠে'র ভূসম্পত্তি আছে। তাহা হইতে বার্ষিক প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় হয়। ইহা হইতে মঠের সেবা-পূজা ও শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের নির্দ্দিষ্ট সেবা নির্ব্বাহ হয়। এতদ্ব্যতীত বিদ্যার্থীদিগকে সাময়িকভাবে সাহায্য এবং পুরীর কুষ্ঠাশ্রম, অনাথাশ্রম ও বিধবাশ্রমকে সাহায্য দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য যে, কর্ম্মিসম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সেবা-পরিচালনের ট্রাষ্টী হওয়ায় এবং মহন্তের আনুগত্য না থাকায় শ্রীভগবানের ভোগের বহু জাগতিক পরার্দ্ধিতার কার্য্যে ও সেবা-পূজার নামে ইন্দ্রিয়তর্পণের কার্য্যে ব্যয়িত হইতেছে। বগুড়ির জমিদারীর আয় বাৎসরিক ১২০০৲।

জগন্নাথবল্লভ-উদ্যানের পুষ্পবৃক্ষ—অশোক, কৃষ্ণ, জাতী, যূথি, পলাশ, মল্লিকা, স্বর্ণকেতকী, সেবন্তী, নিয়ালী, মাধবী, মালতী, শ্বেতচম্পা, স্বর্ণচম্পা, মধুচম্পা, মন্দার, করবীর (শ্বেত ও রক্ত), স্বর্ণকরবী, পদ্ম প্রভৃতি।

ফলবৃক্ষ—আম, কাঠাল, নারিকেল, লিচু, সপেটা, পেয়ারা, কদলী, ডালিম, কমলা, কাগজিলেবু, সরাবা, সুপারী, তাল প্রভৃতি।

শ্রীবিগ্রহের ভোগাদি—প্রাতে শ্রীমঙ্গলারাত্রিকের পর দধি, মুড়কি, খোয়ামণ্ডা, পাকাকলা ও ডাব ভোগ হয়।

সকাল-ধূপ—পরমান্ন, কণিকা ও ভাজা প্রভৃতি ভোগ হয়।

মধ্যাহ্ন-ধূপ—অন্ন, ডাল, রসা, ঘণ্ট, শাক, ভাজা, টক প্রভৃতি ভোগ হয়।

উত্থাপন-ভোগ—বৈকালে রাবড়ি, খোয়া-মণ্ডা ও পাকা-কলা ভোগ হয়।

সন্ধ্যা-ভোগ—পরমান্ন, পাকা-কলা, খলিফটী ও তরকারী ভোগ হয়।

বড়শৃঙ্গার-ধূপ—শয়নের পূর্ব্বে ডাব ভোগ হয়।

শ্রীজগন্নাথবল্লভে শ্রীবিগ্রহের দৈনিক ভোগ—খোয়া ৵৷৷, চিনি ৵৷৷৷, ঘৃত আধছটাক, এলাচ দু' পয়সা, কিস্‌মিস্ এক ছটাক এবং রন্ধনের জন্য ঘৃত ৵৷৷, চিনি ৵৷৷, কিস্‌মিস্ দু' পয়সা, এলাচ এক-পয়সা, কাণিকা চাউল এক পোয়া, আতপ চাউল ৵৷৷, ডাউল ৵৷৷, এবং রাত্রিতে আটা ৵৷৷৷, ঘৃত ৵৷৷, সুজি ৵৷৷, চিনি ৵৷৷, দুধ ৵২, এলাচ দু' পয়সার

লাগে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ বড়দেউলে চাউল ১/১, ডাউল ।০ সের ও তরকারী প্রেরিত হয়।

শ্রীচন্দনযাত্রার সময় শ্রীজগন্নাথবল্লভে একবার পঞ্জি-ভোগ হয়।

স্নানযাত্রা—বড় দেউলের মধ্যে ভিতর-বেড় ও বাহির-বেড়াতে জগন্নাথবল্লভের দুইটি ঘর আছে। স্নান-বেদীতে বিজয় করিবার সময় যখন শ্রীবিগ্রহ গৃহের নিকট উপস্থিত হন, তখন তিন ঠাকুরের উদ্দেশে তিন পঞ্জি করিয়া ভিতরে ও বাহিরে ছয় পঞ্জি এবং স্নানবেদীতে তিন পঞ্জি ভোগ হয়।

শ্রীরথযাত্রা—এই যাত্রায় জগন্নাথবল্লভের তরফ হইতে রথগমনকালে বিভিন্নস্থানে মোট ২৯ পঞ্জি ভোগ হয়।

২। কোঠভোগ-মঠ

শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সন্নিকটে দোলমণ্ডপসাহীতে এই মঠটি অবস্থিত। শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু এই মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এই স্থানে এইরূপ প্রচার আছে। এই মঠে শ্রীশ্রীবড়চুড় গৌরাঙ্গমূর্ত্তি ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবৃন্দাবন-চন্দ্র নামে খ্যাত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। শ্রীজগন্নাথ-দেবের শ্রীমূর্ত্তিও অধিষ্ঠিত আছেন।

বর্ত্তমান সেবায়েত মহান্তের নাম—শ্রীরাসবিহারী গোস্বামী। 'শ্রীশান্তিপুরে' ইঁহাদের এখনও বসতবাড়ী আছে, তবে তাঁহারা সেখানে যান না। তিনি অধিকাংশ সময় শিষ্য-বাড়ীতে অর্থাদি-সংগ্রহে ব্যস্ত থাকেন। ইহার ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম—শ্রীগোবিন্দ গোস্বামী।

মঠের শ্রীমন্দিরটি ক্ষুদ্রকায় কিন্তু শ্রীমন্দিরসংলগ্ন সেবায়েতের বাড়ী খুব বড়; নীচের তালায় অনেক ভাড়া-টীয়া আছে। শ্রীবিগ্রহের সেবা, জমীদারীর আয়, বাড়ী-ভাড়া ও শিষ্যাদিপ্রদত্ত অর্থ হইতে চলে।

শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগ দুই প্রকার—(১) কোঠভোগ ও (২) ছত্রভোগ। রাজভবন বা মন্দিরের অর্থভাণ্ডার হইতে যে ভোগ প্রদত্ত হয়, তাহাকে 'কোঠ-ভোগ' বলে। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর প্রতিষ্ঠিত মঠের নাম কি জন্য 'কোঠ-ভোগ মঠ' হইয়াছে, তাহার তথ্য কোঠভোগ মঠের বর্ত্তমান অধিকারী মহাশয় প্রদান করিতে পারিলেন না।

৩। শ্রীটোটা-গোপীনাথ-মঠ

শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণে সমুদ্র-বালুকাপথে 'যমেশ্বর-টোটা'-নামক স্থান। উৎকল ভাষায় 'তোটা' বা 'টোটা'-শব্দের অর্থ—উদ্যান। শ্রীজগন্নাথ-দেবের দ্বারপাল বা দেওয়ান-স্বরূপ পঞ্চ শিবমূর্ত্তির অন্যতম শ্রীযমেশ্বরদেব। শ্রীযমেশ্বরের মন্দিরের সংলগ্ন দক্ষিণে যমেশ্বরের টোটা বা উদ্যান ছিল। সেই উদ্যানেই শ্রীমন্মহা-প্রভু শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুকে বাসস্থান প্রদান করিয়াছিলেন (চৈ চ ম ১৫।১৮৩),—

"গদাধর পণ্ডিত রহিলা প্রভুর পাশে।
যমেশ্বরে প্রভু যাঁরে করাইলা আবাসে॥"

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল গদাধরের সহিত সাক্ষাৎকার ও তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার জন্য প্রত্যহ যমেশ্বর-টোটায় গমন করিতেন। টোটা-দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন স্মৃতি, তৎসন্নিহিত কুঞ্জ-স্মৃতি, তৎসন্নিহিত চটক-পর্ব্বত-দর্শনে শ্রীগোবর্দ্ধন-স্মৃতি, টোটার সন্নিহিত বিশাল বটবৃক্ষ দর্শনে বংশীবট স্মৃতি ও সমুদ্র-দর্শনে যমুনা-স্মৃতির উদ্দীপন হইত। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে অনেক সময় যমেশ্বর-টোটায় বিজয় করিতেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠেও জানা যায়,—

"জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু যমেশ্বর-টোটা আইলা।
ভক্ত-অনুরোধে তাহা ভিক্ষা যে করিলা॥"
(চৈ চ অ ৪।১১৬)

কিংবদন্তী এই যে, একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু যমেশ্বর-টোটায় আসিয়া "আমার প্রাণনাথ কোথায়?"—এই বলিয়া মহা-ভাবে বিভোর হইয়া ভাবাবেশে হস্তের দ্বারা বালুকারাশি অপসারিত করিতে লাগিলেন। শ্রীল গদাধর শ্রীমন্মহা-প্রভুর হস্ত ধরিয়া ঐরূপ বালুকারাশি সরাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল গদাধরকে বলিলেন,—"গদাধর, যদি এই স্থানে কোন নিধি পাই, তাহা তুমি গ্রহণ করিবে কি?" শ্রীল গদাধর বলিলেন,—"প্রভো, আপনার প্রদত্ত নিধি নিশ্চয়ই মস্তক-ভূষণ করিব।" তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"দেখ, এই স্থানে আমার প্রাণনাথের চূড়ার অগ্রভাগ দেখা যাইতেছে, তুমি স্পর্শ কর।" সত্য-সত্যই শ্রীগদাধর একটি প্রস্তরময়ী শ্রীমূর্ত্তির শিরোভাগস্থ চূড়া দেখিতে পাইলেন এবং উৎকণ্ঠিত-চিত্তে ভক্তগণের সহিত এই শ্রীমূর্ত্তিকে বালুকারাশি অপসারণ-

পূর্ব্বক উত্তোলন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগদাধরকে সেই মূর্ত্তি শ্রীগোপীনাথের শ্রীমূর্ত্তি বলিয়া জ্ঞাপন পূর্ব্বক বংশীবটের তটে, নীলসমুদ্রের উপকূলে যাদবগণ বিচারে স্থাপন করিয়া নিত্য সেবা করিতে বলিলেন। এই মোহন শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহের কথা শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনও এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন (চৈ ভা অ ৭।১১৪-১১৬),—

"গদাধর-ভবনে মোহন গোপীনাথ।
আছেন, যে-হেন নন্দকুমার সাক্ষাৎ॥
আপনে চৈতন্য তানে করিয়াছেন কোলে।
অতি পাষণ্ডীও সে বিগ্রহ দেখি' ভুলে॥
দেখি' শ্রীকুটিল-মুখ অঙ্গের ভঙ্গিমা।
নিত্যানন্দ-আবেশ অন্তর নাহি সীমা॥"

একদিন শ্রীনিত্যানন্দ অকস্মাৎ রমেশ্বর টোটায় আগমন করিলেন। শ্রীল গদাধর তখন শ্রীগোপীনাথের সম্মুখে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের আগমন-বার্ত্তা শুনিবামাত্র শ্রীল গদাধর ভাগবত-পাঠ পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীনিত্যানন্দ সমীপে আগমন করিলেন এবং উভয়ে উভয়ের বন্দন ও প্রেমক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দুই প্রভুর শ্রীঅঙ্গেই প্রেমের বিকার প্রকটিত হইল: ভক্তগণ ইহা দেখিয়া চতুর্দ্দিক বেষ্টন-পূর্ব্বক আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দুই প্রভুই কিছু স্থির হইয়া শুক্লাসনে উপবেশন-পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-সঙ্কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীগদাধর শ্রীনিত্যানন্দকে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগোপীনাথের ভোগার্থ এক মান সূক্ষ্ম তণ্ডুল ও একখণ্ড সুন্দর রঙ্গিনবস্ত্র আনয়ন করিয়াছিলেন সেই দুইটি সেবোপকরণ শ্রীগদাধরের হস্তে অর্পণ করিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস এইরূপ লিখিয়াছেন (চৈ ভা অ ৭।১২৮-১৩৬),—

"নিত্যানন্দ গদাধর-ভিক্ষার কারণে।
একমানি চাউল আনিয়াছেন বন্ধনে॥
অতি সূক্ষ্ম শুক্ল সেবযোগ্য সর্ব্বমতে।
গোপীনাথ লাগি' আনিয়াছে গৌড় হৈতে॥
আর একমানি বস্ত্র—রঙ্গিন সুন্দর।
দুই আনি' দিলা গদাধরের গোচর॥
'গদাধর, এ তণ্ডুল করিয়া রন্ধন।
শ্রীগোপীনাথেরে দিয়া করিবা ভোজন॥'
তণ্ডুল দেখিয়া হাসে' পণ্ডিত গোসাঞি।
নয়নে ত' এমত তণ্ডুল দেখি নাঞি॥
এ তণ্ডুল গোসাঞি কি বৈকুণ্ঠে থাকিয়া।
বসে আনিয়াছেন গোপীনাথের লাগিয়া?
লক্ষ্মীমাত্র এ তণ্ডুল করেন রন্ধন।
কৃষ্ণ সে ইহার ভোক্তা, তবে ভক্তগণ॥
আনন্দে তণ্ডুল প্রশংসেন গদাধর।
বস্ত্র লই গেলা গোপীনাথের গোচর॥
দিব্য-রঙ্গ-বস্ত্র গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে।
দিলেন, দেখিয়া শোভা ভাসেন আনন্দে॥"

অতঃপর শ্রীল গদাধর পণ্ডিত নিম্ব-টোটার শাক তুলিয়া গৌরপ্রিয় শাক, সুকোমল তেঁতুল-পত্র বাটিয়া সমুদ্রের লোণা জল দিয়া একপ্রকার অম্ল-ব্যঞ্জন এবং শ্রীনিত্যানন্দের আনীত সূক্ষ্ম তণ্ডুলের অন্ন প্রস্তুত করিয়া শ্রীগোপীনাথের অগ্রে ভোগ প্রদান করিলেন। ঠিক এই সময় শ্রীগৌর-সুন্দর কোথা হইতে 'হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে অকস্মাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীগদাধরকে ডাকিতে লাগিলেন: শ্রীগদাধরের প্রীতিতে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীগৌর-সুন্দর বিনা-নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীগদাধরের পাকের প্রশংসা ও শ্রীগোপীনাথের প্রসাদান্নের বন্দনা করিয়া অত্যন্ত প্রীতিভরে তাহা ভোজন করিলেন। টোটা-গোপীনাথের প্রাঙ্গণে ভক্ত ও ভগবানের যে লীলা হইয়াছিল, সেই লীলা-প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাসের ভূলিকায় কিরূপ চিত্রিত হইয়াছে, তাহা সজ্জন পাঠকগণ অনুভব করুন (চৈ ভা অ ৭।১৪২-১৪৯),—

"প্রসন্ন শ্রীমুখে 'হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি'।
বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র কুতূহলী॥
'গদাধর, গদাধর', ডাকে গৌরচন্দ্র।
সম্ভ্রমে গদাধর বন্দে পদদ্বন্দ্ব॥
হাসিয়া বলেন প্রভু,—'কেন গদাধর!
আমি কিনা হই নিমন্ত্রণের ভিতর?
আমি ত' তোমরা দুই হৈতে ভিন্ন নই।
যা দিলেও তোমরা, খাইতে আমি সই॥
নিত্যানন্দের জন্য, গোপীনাথের প্রসাদ।
তোমার রন্ধন—মোর ইথে আছে স্বাদ॥'
কৃপা-বাক্য শুনি' নিত্যানন্দ-গদাধর।

মগ্ন হইলেন সুখ-সাগর-ভিতর ॥
সন্তোষে প্রসাদ আনি' দেব-গদাধর।
থুইলেন গৌরচন্দ্র প্রভুর গোচর ॥
সর্ব্বটোটা ব্যাপিলেক অন্নের সৌগন্ধে।
ভক্তি করি' প্রভু পুনঃ পুনঃ অন্ন বন্দে ॥
প্রভু বলে,—'তিন ভাগ সমান করিয়া।
তুলিব প্রসাদ-অন্ন একত্র বসিয়া ॥'
নিত্যানন্দ-স্বরূপের তণ্ডুলের প্রীতে।
বসিলেন মহাপ্রভু ভোজন করিতে ॥
দুই প্রভু ভোজন করেন দুই পাশে।
সন্তোষে ঈশ্বর অন্ন-ব্যঞ্জন প্রশংসে।
প্রভু বলে,—'এ অন্নের গন্ধেও সর্ব্বথা।
কৃষ্ণভক্তি হয়, ইথে নাহিক অন্যথা ॥
গদাধর, কি তোমার মনোহর পাক।
আমি ত' এমত কভু নাহি খাই শাক ॥
গদাধর, কি তোমার বিচিত্র রন্ধন।
তেঁতুলপত্রের কর এমত ব্যঞ্জন !!
বুঝিলাঙ বৈকুণ্ঠে রন্ধন কর' তুমি।
তবে আর আপনাকে লুকাও যা কেনি ?'
এই মত সন্তোষেতে হাস্য-পরিহাসে।
ভোজন করেন তিন প্রভু প্রেমরসে ॥
এ তিন জনের প্রীতি এ তিনে সে জানে।
গৌরচন্দ্র কাটে না কহেন কারো স্থানে ॥
কতক্ষণে প্রভু সব করিয়া ভোজন।
চলিলেন, পাত্র দুই কৈল ভক্তগণ ॥"

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু 'যমেশ্বর-টোটায়' শ্রীগদাধর পণ্ডিতের নিকট যাইতেছিলেন, এমন সময় এক দেবদাসী সুমধুর স্বরে গুর্জ্জরী-রাগিণীতে 'গীতগোবিন্দে'র কৃষ্ণোক্তি গান করিতেছিলেন। দূর হইতে এই গান শ্রবণমাত্র মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হইল। স্ত্রী, কি পুরুষ, কে ঐ গান করিতেছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া মহাপ্রভু প্রেমাবেশে সেই গায়কের দিকে ধাবিত হইলেন। পথে বহু মনসালিজ বা হাঁটালিজের গাছের বেড়া ছিল, তৎপ্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই মহাপ্রভু দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। অঙ্গ কণ্টকবিদ্ধ হইলেও প্রেমাবিষ্ট প্রভু কিছুই জানিতে পারিলেন না। ইহা দেখিয়া গোবিন্দ ব্যস্তে-ব্যস্তে মহাপ্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। গায়িকা দেবদাসীটী মাত্র অল্পদূরে আছেন, অথচ মহাপ্রভু ধাইয়া চলিতেছেন দেখিয়া গোবিন্দ 'স্ত্রী-লোকের গান' এই কথা উচ্চারণ করিতে করিতে মহাপ্রভুকে ধরিয়া ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন। 'স্ত্রী' শব্দটী শুনিবা-মাত্রই মহাপ্রভুর বাহ্যদশা লাভ হইল। মহাপ্রভু তখন সেই দিক্ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক বলিলেন (চৈ চ অ ১৩।৮৪),—

"• • গোবিন্দ, আজি রাখিলা জীবন।
স্ত্রী-পরশ হইলে আমার হইত মরণ ॥"

পণ্ডিত শ্রীবল্লভ-ভট্ট শ্রীল গদাধরের অনুগ্রহ-লাভের জন্য 'যমেশ্বর-টোটা'য় শ্রীগোপীনাথের নিকট আগমন করিতেন। যখন শ্রীবল্লভ-ভট্ট মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রীকৃষ্ণনামের অর্থ শুনাইতে গিয়া উপেক্ষিত হইয়াছিলেন, তখন নীলাচলস্থ শ্রীগৌরভক্তগণও শ্রীবল্লভ ভট্ট মহাশয়ের বিচারকে আদর করিতে পারেন নাই। এই সময় বল্লভ-ভট্ট যমেশ্বর-টোটায় শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের নিকট আসিয়া শ্রীল গদাধরকে কৃষ্ণনাম-ব্যাখ্যা শ্রবণার্থ প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। তখন শ্রীল গদাধর বলিয়াছিলেন (চৈ চ অ ৭।১৯),—

"অন্তর্যামী প্রভু জানিবেন মোর মন।
তাঁ'রে ভয় নাহি কিছু, বিষম তাঁ'র পণ ॥"

শ্রীপাদ বল্লভ ভট্টাচার্য্য শ্রীবালগোপাল-মন্ত্রে বাৎসল্য-রসের উপাসক ছিলেন। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর সঙ্গফলে ভট্টপাদের চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি কিশোর-গোপাল উপাসনায় আকৃষ্ট হইলেন। তখন ভট্টপাদ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর নিকট মন্ত্র-গ্রহণ ও ভজন-শিক্ষার জন্য পুনঃ পুনঃ আবেদন জানাইলেন। শ্রীল পণ্ডিত-গোস্বামী বলিলেন,—"আমি শ্রীগৌরসুন্দরের অধীন, তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত আমি স্বতন্ত্র হইয়া কিছুই করিতে পারি না। তুমি যে আমার নিকট আগমন কর, ইহাতেই মহাপ্রভু আমাকে বাক্যদণ্ড করিয়া থাকেন।" কিছুদিন পরে শ্রীবল্লভ-ভট্টের প্রতি শ্রীগৌর-সুন্দর সুপ্রসন্ন হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্ত-সমাজে 'গদাধর-প্রাণনাথ' ও 'গদাই-গৌরাঙ্গ' নামে প্রসিদ্ধ। কিংবদন্তী এই যে, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু, কেহ কেহ বলেন, তদবস্তন বাবু-ঠাকুর (চৈ চ আ ১২।৮০) অত্যন্ত প্রাচীন হইলে কুব্জ হইয়া পড়েন; তখন শ্রীগোপীনাথের মস্তক ও শ্রীমুখ-

মতন পর্য্যন্ত পূজারসেবা করিতে অসমর্থ হওয়ায় সেবা-বিহীন প্রাণ-পরিত্যাগের সংকল্প করেন। ইহাতে ভক্ত-বৎসল শ্রীগোপীনাথ সেবকের সেবা গ্রহণ করিবার জন্য দণ্ডায়মান অবস্থা হইতে পদদ্বয় কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করিয়া অবস্থান করেন। সেইরূপ অবস্থায়ই শ্রীগোপীনাথ-শ্রীবিগ্রহ বর্ত্তমানে বহেরু-টোটায় প্রকাশিত রহিয়াছেন। এই ঘটনা অবলম্বনে দক্ষিণদেশীয় এক কবি একটী নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যস্থিত একটী শ্লোক স্থানীয় কোন ব্যক্তির নিকট হইতে আমরা শ্রবণ করিয়াছি। তাহা এই.—

"আবাল্যাদনুষক্তস্যাঃ সুখমহমনয়ং বৎসরাণামশীতিং
নাস্ত স্থানে সমর্থস্তুর্বশিরসি বিভো মল্লিকালাম দাতুম্।—
তেনাস্মর্মে যদেতং ন ভবতি চ বৃথা তত্তবং স্বামিন্ বিধেয়ঃ
ভক্তেনোক্তং প্রসূনং তদবধি ভগবান্ ভক্তবশ্যনিবিষ্টঃ ॥"—

শ্রীটোটাগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে শ্রীগৌরহরি প্রবিষ্ট হইয়াছেন, এইরূপ শ্রুতি আছে।

শ্রীগদাধরের অপ্রকটের পর শ্রীমামু-ঠাকুর টোটা-গোপীনাথের সেবাধিকারী হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহাকে 'মামা' ডাকিতেন বলিয়া ইনি 'মামু-ঠাকুর'-নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বঙ্গ ও উৎকলে 'মামা'কে 'মামু' বলে। ইহার প্রকৃত নাম শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তী; ইনি শ্রীশচীমাতার পিতৃদেব শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর ভ্রাতৃষ্পুত্র। ইহার নিবাস ফরিদপুর জেলার মগডোবা-গ্রামে।

শ্রীটোটা-গোপীনাথের সেবকগণের গুরুপ্রণালী এই—(১) শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী (শ্রীমতী রাধিকা, মতান্তরে সৌভাগ্যমঞ্জরী)। (২) তদনুগ শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তী —মামু গোস্বামী (শ্রীরূপমঞ্জরী?), (৩) তদনুগ রঘুনাথ গোস্বামী, (৪) রামচন্দ্র, (৫) রাধাবল্লভ, (৬) কৃষ্ণজীবন, (৭) শ্যামসুন্দর, (৮) সান্ত্বামণি, (৯) হরিনাথ, (১০) নবীনচন্দ্র, (১১) মতিলাল, (১২) সুধাময়ী, (১৩) কুঞ্জবিহারী।

সুধাময়ী সেবায়ে দুই কন্যা—ব্রজসুন্দরী সেবা ও স্বামী সেবা। ব্রজসুন্দরীর পুত্র শ্রীগোপীনাথ সেবগোস্বামী পুরীর কুর্টেই বেন্টসাহী পল্লীতে এখনও জীবিত আছেন। স্বামী সেবায়ার পুত্রই কুঞ্জবিহারী সেবগোস্বামী; তিনি স্বধামগত হইয়াছেন। তাঁহার বিধবা পত্নী হরসুন্দরী সেবা নিজ-ভ্রাতা রঙ্গনাথ সেবগোস্বামীর নামে শ্রীগোপীনাথের সেবার অর্দ্ধাংশ সমর্পণ করিয়াছেন। শ্রীগোপীনাথ সেবগোস্বামী টোটা-গোপীনাথের সেবার বর্ত্তমান অধিকারী শ্রীপদ্মচরণদাসজীকে তাঁহার দ্বিতীয় অর্দ্ধেক সেবা-ভার প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীপদ্মচরণদাস শ্রীজাহ্নবা-প্রভুর পরিবারভুক্ত কোন অধিকারীর নিকট হইতে গৃহে থাকা কালে দীক্ষা-মন্ত্র গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে পূজারী হইয়া শ্রীটোটা-গোপীনাথের সেবা আরম্ভ করেন। তৎপরে শ্রীজগন্নাথ-মঠের শ্রীরাধাকৃষ্ণদাসের নিকট হইতে ভেক গ্রহণ করিয়া অধিকারীর পদ লাভ করেন। তিনি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ এখানে সেবা করিতেছেন। তিনি প্রথমে কুঞ্জবিহারী গোস্বামীর তত্ত্বাবধানে কার্য্য করিতেছিলেন। কুঞ্জবিহারীর দেহত্যাগের পর ইনি শ্রীগোপীনাথ সেবগোস্বামীর বিশেষ বিশ্বাসভাজন হওয়ায় অধিকারীর পদ প্রাপ্ত হন।

পূর্ব্বে শ্রীটোটা-গোপীনাথের কোন সম্পত্তি ছিল না। মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীল গদাধর পণ্ডিতকে টোটা-গোপীনাথের সেবার্থ যথেষ্ট ভূ-সম্পত্তি প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীল গদাধর বলিয়াছিলেন,—"আমি রাজপ্রতিগ্রাহী হইব না, মাধুকরী ভিক্ষার দ্বারা সেবা নির্ব্বাহ করিব।" তৎপরে যখন শ্রীল মামু-ঠাকুরের উপর শ্রীটোটা-গোপীনাথের সেবা অর্পিত হইল, তখন তিনিও শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর আদর্শ অনুসরণ করিয়া রাজপ্রতিগ্রাহী হইতে স্বীকৃত হইলেন না। মামু-ঠাকুরের পরের কোন সেবায়েত সেই আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া রাজার দান গ্রহণ করিলেন। তদবধি শ্রীটোটা-গোপীনাথের দশবাটি (টোটা-গোপীনাথ হইতে মঙ্গলাঘাটের দিকে ৪ মাইল দূরে) ভূ-সম্পত্তি হইল। ইহা হইতে বার্ষিক প্রায় ১২০৲ মন ধান ও প্রজাগণের নিকট হইতে প্রায় ১০০৲ একশত টাকা খাজনা পাওয়া যায়। তথায় নারিকেল, 'পোলাজ' (পুগাফল) প্রভৃতি বিবিধ ফলের বাগানও আছে। ২২৲ পণকর দিতে হয়।

শ্রীগোপীনাথ সেবগোস্বামীর তত্ত্বাবধানে গোমস্তা জমিদারী হইতে দ্রব্য-অর্থাদি আদায় করিয়া তাহা দুই ভাগে বিভক্ত করেন। গোপীনাথ সেবগোস্বামীর দিবার অর্দ্ধাংশ সম্পূর্ণই টোটা-গোপীনাথের শ্রীমন্দিরে আসে। রঙ্গনাথ সেবগোস্বামীর তত্ত্বাবধানে আদায় সব তাঁহার গৃহে যায়। তাঁহারা বাড়ী হইতে গোপীনাথের সেবার্থ কিয়দংশ সিধা-স্বরূপ প্রদান করেন।

শ্রীবলদেবাবির্ভাব-উৎসব, শ্রীজন্মাষ্টমী, শ্রীনন্দোৎসব, শ্রীরাধাষ্টমী, শ্রীগোবর্দ্ধন-উৎসব (অন্নকূট), শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব-উৎসব, শ্রীদোল-উৎসব, শ্রীগৌর-জন্মোৎসব প্রভৃতি উৎসব এখানে যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

প্রত্যহ প্রাতে বালভোগ, মধ্যাহ্নে অন্ন ও পায়সান্ন-ভোগ, বৈকালে উপাপন-ভোগ ও রাত্রিতে অন্ন ভোগ হয়। প্রত্যহ /৫ সের চাউলের অন্ন-ভোগ নির্দ্দিষ্ট আছে; ইহা ব্যতীতও সময় সময় অধিক পরিমাণ ভোগ হইয়া থাকে।

শ্রীবিগ্রহ

চটকপর্ব্বত ও বংশীবটের বরাবর পূর্ব্বাভিমুখী শ্রীটোটা-গোপীনাথ, বামে শ্রীরাধা ও দক্ষিণে শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী (কেহ কেহ বলেন—শ্রীললিতাদেবী) সহিত অপূর্ব্ব ভুবনমোহন-বেশে বিরাজিত রহিয়াছেন। এই তিন শ্রীমূর্ত্তি শ্রীগৌর-সুন্দরের দ্বারা প্রকটিত বলিয়া স্থানীয় সেবকগণ বলিয়া থাকেন। এই শ্রীমূর্ত্তিত্রয় মধ্য-প্রকোষ্ঠে বিরাজিত। দক্ষিণ দিকে প্রকোষ্ঠান্তরে শ্রীবলদেব শ্রীরেবতী ও শ্রীবারুণীর সহিত বিরাজিত রহিয়াছেন। এই শ্রীবিগ্রহ পরে প্রকাশিত হইয়াছেন। উত্তর দিকের প্রকোষ্ঠে শ্রীল মানু-ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন বিরাজিত আছেন। শ্রীগদাধরের শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশের দক্ষিণ দিকে উত্তর-পূর্ব্ব-কোণে শ্রীগোপীশ্বর মহাদেবের দর্শন হয়। শ্রীগোপীশ্বরের প্রত্যহ অন্ন-ভোগ হয়।

৪। শ্রীনারায়ণছাতা-মঠ

শ্রীজগন্নাথদেবের সিংহদ্বার হইতে উত্তর-পূর্ব্বদিকে যে বিস্তৃত রাজপথটি (বড়দাণ্ড) গিয়াছে, সেই পথের পার্শ্বে প্রায় এক ফার্লং দূরে উক্ত মঠ অতি প্রাচীনকাল হইতে অবস্থিত আছে। এই মঠের শ্রীবিগ্রহের নাম—শ্রীশুভলক্ষ্মী-নারায়ণদেব। শ্রীলিঙ্গার্চ্চনসংহিতানুসারে ইনি গদা-চক্রশঙ্খপদ্মধর চতুর্ভুজ শ্রীমাধবমূর্ত্তি। ইহার বক্ষঃস্থলে শ্রীলক্ষ্মীদেবী ও পদ্মাসনের নিম্নে শ্রীগরুড় বিরাজিত। উড়িষ্যার রাজা শ্রীঅনঙ্গভীমদেব, শ্রীজগন্নাথদেবের বর্ত্তমান শ্রীমন্দির পুনর্নির্ম্মাণের পূর্ব্বে বিঘ্নবিনাশের জন্য এই শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। এই জন্যই ইহার নাম শ্রীশুভলক্ষ্মীনারায়ণদেব হইয়াছে। মহারাজ শ্রীপ্রতাপ-রুদ্রের সময় এই সেবা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ প্রাপ্ত হন। তৎপরে ইহা শ্রীরামানুজসম্প্রদায়ের পূজকগণের হস্তে গমন করে। পরে আবার গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ ইহা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই মঠের সেবা-পূজা, অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি নির্ব্বাহার্থ রাজপ্রদত্ত বহু ভূসম্পত্তি ছিল। কিন্তু কালক্রমে সেবক-গণের অনবধানতাবশতঃ তাহা সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। তৎপরে, শ্রীজগন্নাথদেবের ষ্টেট্ হইতে প্রত্যহ ৵১০ দশ পয়সা করিয়া সেবার ব্যয় প্রাপ্ত হইয়া কোন সেবক সেবা চালাইতেছিলেন। একটি অশ্বত্থবৃক্ষের নিম্নদেশে একটি জীর্ণ মণ্ডপের মধ্যে এই শ্রীবিগ্রহ জলতুলসী-দ্বারা সেবিত হইতেছিলেন। এখন হইতে প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী মহারাজের অন্যতম শিষ্য-নামে পরিচয়দানকারী শ্রীগোপীচরণদাস বাবাজী পুরীতে আসিয়া উক্ত সেবার ঐরূপ দুর্দ্দশা-দর্শনে অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং সেই সেবা গ্রহণ করিয়া মাধুকরী ভিক্ষাদ্বারা সেবা পরিচালনা করিতে থাকেন। তাঁহারই ইচ্ছানুসারে কলিকাতার শ্রীরামচন্দ্র আঢ্য-নামক তদানীন্তন শ্রীক্ষেত্রবাসী জনৈক ধর্ম্মপ্রাণ বর্ত্তমান শ্রীমন্দিরটি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীনারায়ণ-ছাতার সংলগ্ন দক্ষিণদিকে রামচন্দ্র আঢ্য মহাশয়ের একটি বাড়ী আছে। এই বাড়ীতেই শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একসময় অবস্থান করিতেন। ইংরেজী ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী, মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীহরিকীর্ত্তন-মুখরিত সেই বাসভবনে শ্রীগৌরজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সুতরাং 'শ্রীনারায়ণছাতা'র পারিপার্শ্বিকতার সহিত শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান সেবকগণের বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

শ্রীগোপীচরণদাস মহাশয় প্রত্যহ মাধুকরী ভিক্ষাদ্বারা আতপ বা সিদ্ধ যে তণ্ডুল সংগ্রহ করিতেন, তাহাই স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোগ লাগাইতেন এবং অতিথি, অভ্যাগত ও কাঙ্গালগণকে প্রসাদ বিতরণ করিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকিত, তাহা গ্রহণ করিতেন। ইহার কিছুদিন পরে শ্রীরঘুনাথ-

দাস নামক আর একজন বিরক্ত বৈষ্ণব সেই মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি শ্রীবিগ্রহকে আতপান্ন ভোগ-প্রদানের কথা বলিলে শ্রীগোপীচরণদাসজী বলিলেন,—"কৃষ্ণ আমাকে যাহা ভিক্ষা দেন, আমি তাহাই তাঁহাকে প্রদান করি। ইহাতে আমার কোন হাত নাই।" তদুত্তরে শ্রীরঘুনাথদাসজী বলিলেন,—"তুমি যদি কর্ত্তা না হও এবং ঠাকুর যদি কর্ত্তা হন, তবে অবশ্যই আতপ চাউল পাওয়া যাইবে।" তৎপরদিবস হইতে সকলেই আতপ চাউল ভিক্ষা দিতে লাগিলেন। সেই সময় হইতে শ্রীশ্রীভক্ত-লক্ষ্মীনারায়ণজীউর আতপান্ন ভোগ হইয়া আসিতেছে এবং তখন শ্রীরঘুনাথদাসজীর নাম হয় 'কর্ত্তাবাবাজী'। তিনি শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি-মঠে স্বধাম গমন করেন।

শ্রীগোপীচরণদাসজী মধ্যে মধ্যে শ্রীজগন্নাথদেবের পাখাল-প্রসাদ কাঙ্গালিগণকে বিতরণ করিতেন। কোন সময় কাঙ্গালি-ভোজনের কালে প্রসাদ কম পড়ায় জনৈক কাঙ্গালী ক্রুদ্ধ হইয়া বাবাজীর উপর একটি রিক্তভাণ্ড নিক্ষেপ করিল। ইহাতে বাবাজীর অঙ্গে ক্ষত হয়। কিন্তু বাবাজী ইহাতে বিন্দুমাত্রও ক্রুদ্ধ না হইয়া আরও প্রসাদ লইয়া আসিয়া ঐ কাঙ্গালীকে পরিবেশন করেন। ময়মনসিংহ সেরপুরের জমিদার শ্রীগোবিন্দকুমার চৌধুরী মহাশয় এই ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীগোপীচরণ দাসজীর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইলেন এবং তাঁহার ষ্টেট্ হইতে মঠের সেবার জন্য দৈনিক ৩৲ তিন টাকা আনুকূল্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। শ্রীগোবিন্দকুমারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ প্রত্যহ ৸৹ বার আনা, তৎপরে ১৲ পাঁচ সিকা করিয়া এবং এখন প্রত্যহ ৷৵৮ পাই বা মাসিক ২০৲ টাকা করিয়া আনুকূল্য প্রদান করিতেছেন। শ্রীনারায়ণ-ছাতার শ্রীমন্দির-গৃহের প্রাচীরে একটি প্রস্তরফলকে খোদিত আছে—"এই সেবা সেরপুরের জমিদার স্বর্গীয় গোবিন্দকুমার চৌধুরী মহাশয়ের আনুকূল্যে নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে।"

এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমানে 'শ্রীনারায়ণছাতা-মঠে'র সামান্য কিছু ভূসম্পত্তি আছে। এই মঠের বর্ত্তমান সেবায়েতের নাম—শ্রীরাধাচরণদাস। ইনি শ্রীহরিদাস বাবাজীর শিষ্য। শ্রীহরিদাস শ্রীগোপীনাথদাসের সেবাশিষ্য ছিলেন।

৫। শ্রীল হরিদাসঠাকুর-সমাধি-মঠ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠকগণের সকলেই 'শ্রীশ্রীহরিদাস-ঠাকুর-নির্য্যাণে'র বৃত্তান্ত-প্রসঙ্গ পাঠ করিয়াছেন। একদিন শ্রীগোবিন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইঙ্গিতক্রমে শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের ভজন-স্থানে কিছু মহাপ্রসাদ লইয়া ঠাকুরকে দিতে গেলেন। দেখিলেন, শ্রীনামাচার্য্য শয়ন করিয়া মৃদু মৃদু সংখ্যা-সংকীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীগোবিন্দ শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে উত্থিত হইয়া মহাপ্রসাদ সেবন করিতে বলিলেন। শ্রীল হরিদাস বলিলেন,—"আমি আজ লঙ্ঘন করিব। এখনও সংখ্যা-কীর্ত্তন পূর্ণ হয় নাই, কিরূপে ভোজন করিব? শ্রীমহাপ্রসাদ আনিয়াছ, তাহাই বা কিরূপে উপেক্ষা করিব?" ইহা বলিয়া একরত্তি মহাপ্রসাদ লইয়া মুখে প্রদান করিলেন।

আর একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের নিকট গমন করিয়া তাঁহার কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীহরিদাস নিজ প্রভুকে নমস্কার করিয়া দৈন্যভরে বলিলেন,—"আমার শরীর সুস্থ বটে, কিন্তু বুদ্ধি ও মন অসুস্থ।" "কি ব্যাধি হইয়াছে?" জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীনামাচার্য্য বলিলেন,—"সংখ্যা-নাম-কীর্ত্তন পূর্ণ করিতে পারিতেছি না।" শ্রীনামাচার্য্য প্রত্যহ অপতিতভাবে সংখ্যা রাখিয়া তিনলক্ষ মহামন্ত্র কীর্ত্তন ও জপ করিতেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু অপ্রাকৃত-সিদ্ধদেহ শ্রীল হরিদাসকে তাঁহার সাধনাভিনয় হ্রাস করিতে বলিলেন। আরও বলিলেন,—"তুমি শ্রীনামের আচার্য্য ও প্রচারকরূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীতে শ্রীনামের মহিমা প্রচার করিয়াছ, এখন তুমি অল্পসংখ্যা করিয়া নামসংকীর্ত্তন কর।" শ্রীল হরিদাস তখন পাষাণ-দ্রাবক দৈন্যবাক্যে নিজের হেয়তা-জ্ঞাপন ও মহাপ্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া প্রভু-সমীপে নিজের এক অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন,—"প্রভো! বহু দিন হইতে আমার হৃদয়ে একটি অভিলাষ আছে—তোমার লীলা-সম্বোপনের পূর্ব্বে আমি তোমার অগ্রে এই দেহ পরিত্যাগ করিব। তোমার অপ্রকট-লীলার পর আমি আর এই পৃথিবীতে দেহ ধারণ করিয়া থাকিতে পারিব না।" হৃদয়ে তোমার শ্রীচরণকমল ধারণ, নয়নে তোমার শ্রীচন্দ্রবদন দর্শন, আর জিহ্বায় তোমার 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তোমার শ্রীপাদপদ্ম-সম্মুখে আমি প্রাণত্যাগ করিব, আমার এই নীচ-দেহ তোমার সম্মুখে পড়িয়া হউক;

তোমার কৃপায় আমার এই বাঞ্ছা-সিদ্ধি অবশ্যই হইবে।"

ইহা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"হরিদাস, তুমি যাহা বাঞ্ছা করিবে, কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ তাহা অবশ্যই পূর্ণ করিবেন; কিন্তু আমার যাহা কিছু সুখ, সমস্তই তোমাকে লইয়া, তুমি আমার লীলার পরিকর, তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইবে—ইহা কি উচিত?" তখন শ্রীল হরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ ধরিয়া বলিলেন,—"প্রভো! আমাকে বঞ্চনা করিবেন না, আমার ন্যায় অধমের প্রতি আপনি অবশ্যই এই দয়া করিবেন",—

"মোর শিরোমণি কত কত মহাশয়।
তোমার লীলার সহায় কোটিভক্ত হয়।
আমা হেন যদি এক কীট মরি' গেল।
পিপীলিকা মৈলে পৃথিবীর কাহা হানি হৈল?
'ভক্তবৎসল' তুমি, যুই 'ভক্তাভাস'।
অবশ্য পূরিবে, প্রভু, মোর এই আশ॥"

(চৈ চ অ ১১।৪০-৪২)

পরদিবস প্রাতে শ্রীজগন্নাথ-দর্শনান্তে শ্রীগৌরহরি শ্রীস্বরূপ গোস্বামী, শ্রীরায়-রামানন্দ, শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত শ্রীহরিদাসের সমীপে উপনীত হইয়া দর্শন প্রদান করিলেন। শ্রীহরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভু ও বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণ বন্দনা করিলে মহাপ্রভু শ্রীহরিদাসের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীল হরিদাস 'যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রভুর জিজ্ঞাসার উত্তর দান করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল হরিদাসের কুটীরের অঙ্গন-সম্মুখে মহা-সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। পণ্ডিত শ্রীবক্রেশ্বর, শ্রীস্বরূপ-দামোদর-গোস্বামিপ্রভু-প্রমুখ প্রভুর পার্ষদগণ শ্রীহরিদাসকে বেষ্টন করিয়া শ্রীনামসংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগণের সম্মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু পঞ্চমুখ হইয়া পরমসুখে শ্রীহরিদাসের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীহরিদাসের গুণগ্রাম-শ্রবণে ভক্তবৃন্দ বিস্মিত হইলেন। সকল ভক্ত শ্রীহরিদাসের চরণ বন্দনা করিলেন। শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণ-লীলা-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

"হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইলা।
নিজ-নেত্র—দুই ভৃঙ্গ—মুখপদ্মে দিলা॥
স্ব-হৃদয়ে আনি' ধরি' প্রভুর চরণ।
সর্ব্বভক্ত-পদরেণু মস্তক-ভূষণ॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু' বলেন বার বার।
প্রভুমুখ-মাধুরী পিয়ে, নেত্রে জলধার॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ করিলা উৎক্রমণ॥
মহাযোগেশ্বর-প্রায় স্বচ্ছন্দে মরণ।
'ভীষ্মের নির্য্যাণ' সবার হইল স্মরণ॥"

(চৈ চ অ ১১।৪৩-৪৭)

ভক্তগণ মহা-কীর্ত্তন কোলাহল আরম্ভ করিলেন। শ্রীশ্রী-মহাপ্রভু প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া শ্রীহরিদাসের অপ্রাকৃত তনু অঙ্কে ধারণ-পূর্ব্বক শ্রীনামাচার্য্যের কুটীর-অঙ্গনে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকল ভক্তও প্রভুর আবেশে আবিষ্ট হইয়া নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামি-প্রভু কিছুক্ষণ পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিবেদন করিলে ভক্তগণ শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরকে বিমানে স্থাপন করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে সমুদ্রাভিমুখে লইয়া গেলেন। এই সময়ের একটী সজীব চিত্র শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর তুলিকায় এইরূপ অঙ্কিত হইয়াছে,—

"হরিদাস-ঠাকুরে তবে বিমানে চড়াঞা।
সমুদ্রে লঞা গেলা কীর্ত্তন করিয়া॥
আগে মহাপ্রভু চলেন নৃত্য করিতে করিতে।
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ-সাথে॥
হরিদাসে সমুদ্র-জলে স্নান করাইলা।
প্রভু কহে,—'সমুদ্র এই মহাতীর্থ হইলা॥'
হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিলা প্রসাদ-চন্দন॥
ডোর, কড়ার, প্রসাদ, বস্ত্র অঙ্গে দিলা।
বালুকার গর্ত্ত করি' তাহে শোয়াইলা॥
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত করেন আনন্দে নর্ত্তন॥
'হরি বোল', 'হরি বোল' বলেন গৌররায়।
আপনি শ্রীহস্তে বালু দিলা তাঁর গায়॥
তাঁরে বালু দিয়া উপরে পিণ্ডা বাঁধাইলা।
চৌদিকে পিণ্ডের মহা-আবরণ কৈলা॥

তবে মহাপ্রভু কৈলা কীর্ত্তন, নর্ত্তন।
হরিধ্বনি-কোলাহলে ভরিল ভুবন॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তগণ-সঙ্গে।
সমুদ্রে করিলা স্নান-জলকেলি রঙ্গে॥
হরিদাসে প্রদক্ষিণ করি' আইল সিংহদ্বারে।
হরিকীর্ত্তন-কোলাহল সকল নগরে॥"

(চৈ চ অ ১১।৯২-৯২)

সপার্ষদ শ্রীগৌরহরি শ্রীহস্তে স্বয়ং শ্রীনামাচার্য্যের সমাধিপ্রদান-পূর্ব্বক যে সমাধি-পীঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, শ্রীনীলাচলে নীলাম্বুধির কূলে সেই সমাধি-পীঠ অদ্যাপি বিরাজিত। কথিত হয় যে, স্বর্গদ্বার-নামক বেলা-ভূমির বিস্তৃত স্থানটী পূর্ব্বে শ্মশান-ভূমিরূপে পরিণত ছিল। এজন্য তৎস্থানে এখনও শ্মশান-মশাধীরশ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত দৃষ্ট হয়। আবার কোন কোন প্রাচীন পুঁথিতে শ্মশান-ভূমির নিকটে 'শ্রীচৈতন্য-মণ্ডলী' নামক পরমভাগবতগণের আবাস-স্থান ছিল,—এইরূপ উক্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিস্তৃত শ্মশান-ভূমি লোকাবাস-নিবন্ধন ক্রমে ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে সরিয়া পড়িয়াছে। শ্রীশ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি-পীঠের সন্নিকটে শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী প্রভু, তদ্ভিন্ন শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী ও বহু গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের সমাধি-পীঠ এখনও বিরাজিত রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, —এই শ্মশান-ভূমিতেই শ্রীচৈতন্যমণ্ডলীর মহাভাগবতগণ ভজন করিতেন। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তগণের নিকট হইতে শুনিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বহস্ত-প্রদত্ত শ্রীনামাচার্য্যের সমাধি-পীঠের সংস্পর্শলাভের জন্যই গৌড়ীয়গণ তথায় ভজন করিয়াছেন। তাঁহারা তান্ত্রিকগণের ন্যায় শ্মশানকে ভজনানুকূল-স্থান বলিয়া বরণ করেন নাই। 'সাতাসনে' যে-সকল শ্রীগৌরপার্ষদ ভজন করিয়াছেন বা প্রসিদ্ধ সিদ্ধ মহাত্মা শ্রীস্বরূপদাস বাবাজী, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি সকলেই শ্রীশ্রীল ঠাকুর হরিদাসের স্মৃতিতে বিভাবিত হইবার জন্যই তৎসমাধি-পীঠের নিকটে স্ব-স্ব ভজন-স্থান নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন।

শ্রীনামাচার্য্যের সমাধি-পীঠের সেবা কালক্রমে বিষয়ের অন্তর্গতরূপে গণ্য করায় ইহা লইয়া মামলা-মোকদ্দমার সৃষ্টি হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে অনেকেই এই সমাধি-পীঠ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীগুরুবর্গের পীঠস্থানকে বিষয়ের অন্তর্গত-বস্তুরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন নাই। এজন্য তিনি শ্রীহরিদাস-সমাধির পশ্চাতে থাকিয়া দূর হইতে সমাধি-পীঠের সেবা করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে এই সমাধি-পীঠের সেবা জনৈক বিরক্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের হস্তে ন্যস্ত ছিল। 'সিদ্ধবকুল-মঠে'র বর্ত্তমান মহান্ত মহাশয় বলেন যে, শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের সমাধির সেবা পূর্ব্বে 'সিদ্ধবকুল-মঠে'র শিষ্য-পরম্পরায় কোনও উদাসীন বৈষ্ণবের হস্তে ছিল; পরে ইহা মামু-গোস্বামীর বংশের হস্তে যায়। যাহা হউক, ইহা কাহারও ব্যক্তিগত বৈষয়িক-সম্পত্তি নহে বলিয়া সেবক-পরম্পরাক্রমে বিরক্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। কিন্তু সেবা-পূজার তথাকথিত স্থায়ী সুবন্দোবস্তের জন্য পরোক্ত বিরক্ত বৈষ্ণব মামু-ঠাকুরের বংশের হস্তে প্রদান করেন। ক্রমে এই সমাধি-পীঠের সেবা ব্রজসুন্দরী সেব্যা ও রামী সেব্যার হস্তে উপস্থিত হয়। রামী সেব্যার পুত্র কুঞ্জবিহারী অত্যন্ত অসদাচারী হইয়া পড়ে। ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইন্ধন-সংগ্রহার্থ উক্ত কুঞ্জবিহারী শ্রীজগন্নাথ-দেবের মন্দিরের পশ্চাতে যে 'ত্রিমালী-মঠ'-নামে এক শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের মঠ আছে, সেই মঠের তদানীন্তন অধিকারীর নিকট শ্রীটোটা-গোপীনাথের সেবা কট-কবালা (এক বৎসরের মধ্যে টাকা পরিশোধ করিতে না পারিলে সমস্ত সম্পত্তি উত্তমর্ণের হইয়া যাইবে, এই সর্ত্তে যে কবালা হয়) করিয়া আড়াই-হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে। কট-কবালার মেয়াদ শেষ হইবার দুই মাস পূর্ব্বে শ্রীচরণদাস বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয় উক্ত কুঞ্জবিহারীকে বলেন যে, যদি কুঞ্জবিহারী শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের সমাধিটী শ্রীরামদাসজীকে লিখিয়া দেন, তাহা হইলে তিনি আড়াই হাজার টাকা দিয়া শ্রীগোপীনাথের সেবা রক্ষা করিতে পারেন। কুঞ্জবিহারী তাহাতে স্বীকৃত হন; ১৩১৩ বঙ্গাব্দে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি-পীঠের সেবা শ্রীরামদাসজীর হস্তে আসে।

এখানে আর একটী কথা বলা আবশ্যক যে, ইতঃপূর্ব্বে রামময়ী দেবী তাঁহার দৌহিত্র কুঞ্জবিহারীর নামেই সমস্ত সম্পত্তি উইল করিয়া দিয়াছিলেন। রামময়ী দেব্যার ঐরূপ অবৈধ উইল করিবার অধিকার নাই বলিয়া শ্রীগোপীনাথ দেবগোস্বামী এক মোকদ্দমা করেন। ঐ সম্পত্তি ব্রজ-

সুন্দরী দেব্যা ও রাধী দেব্যা—উভয়েরই অধিকারভুক্ত—কোর্টের দ্বারা এইরূপ সাব্যস্ত হইলে ব্রজসুন্দরী দেব্যা শ্রীরামদাসজীর নামে শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের সমাধিপীঠ সম্পর্কে এক মোকদ্দমা রুজু করিলেন। মোকদ্দমার রায় ব্রজসুন্দরী দেব্যার পক্ষেই হয়। তখন শ্রীরামদাসজী ব্রজসুন্দরীর নিকট হইতে বিশেষ কাকুতি-মিনতি করিয়া শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের সমাধিটী চাহিয়া লন এবং তিনি ভিক্ষার দ্বারা এই সেবা চালাইবেন ও সেবার উজ্জ্বলতা বিধান করিবেন—এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেন। ব্রজসুন্দরী দেব্যা তখন না-দাবী-পত্র লিখিয়া দেন।

এই বিবরণ শ্রীটোটা-গোপীনাথের বর্ত্তমান অধিকারী শ্রীপদ্মচরণদাসজী প্রদান করিয়াছেন। তিনি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ শ্রীগোপীনাথের সেবাধিকারী আছেন। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের সমাধির সেবার জন্য পুরীর রাজকোষ হইতে বাৎসরিক পঞ্চাশ টাকা করিয়া 'খজা' ছিল। উক্ত মোকদ্দমার পর সমাধি-পীঠের সেবা হস্তান্তরিত হওয়ায় শ্রীপদ্মচরণদাসজী উক্ত খজা শ্রীগোপীনাথজীউর মন্দিরস্থ শ্রীমধু-গোস্বামীর প্রকাশিত শ্রীশ্রীগৌরগদাধর-সেবার্থে প্রাপ্য বলিয়া দাবী করেন। অনেক লেখালেখি ও চেষ্টার পর সেই নির্দ্দিষ্ট টাকা শ্রীগোপীনাথের মন্দিরেই আসিত। কিন্তু কয়েক বৎসর হইল বর্ত্তমান পুরীরাজ উহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

বর্ত্তমানে শ্রীশ্রীনামাচার্য্যের সমাধি-পীঠ একটি নাতিউচ্চ মন্দিরে বিরাজিত রহিয়াছেন। এই মন্দিরটী পরবর্ত্তিকালে নির্ম্মিত হয়। সমাধি-মন্দিরের সংলগ্ন পশ্চিমভাগে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ধ্যানমূর্ত্তির বিরাজিত আছেন। অধিকাংশ স্থানেই মহাপ্রভু ও প্রভু-ঘরের শ্রীমূর্ত্তি নৃত্যপরায়ণ-অবস্থায় প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়, এস্থানে তদ্রূপ নহে; একমাত্র শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের দ্বিতীয় প্রাকারের অভ্যন্তরে উত্তর-পূর্ব্বভাগে পশ্চিমাভিমুখী শ্রীপ্রতাপ-রুদ্র-প্রকাশিত বলিয়া কথিত এইরূপ এক শ্রীমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। স্থানীয় ব্যক্তিগণ বলেন যে, এই শ্রীমূর্ত্তির শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের অপ্রকটের কিছু পরে এই স্থানে প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্যস্থলে একটি পৃথক্ সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার দক্ষিণে আর একটি পৃথক্ প্রকোষ্ঠে পৃথক্ সিংহাসনে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও মহাপ্রভুর বামভাগে আর একটী পৃথক্ প্রকোষ্ঠে অন্য সিংহাসনে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু আসীন আছেন। এই মন্দিরের মধ্য-ভাগের চইটি বহির্ভিত্তে শ্রীজয়-বিজয় বা শ্রীজগাই-মাধাইর মূর্ত্তি আছেন। শ্রীজয়-বিজয়ই শ্রীগৌরলীলার শ্রীজগাই-মাধাই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সম্মুখে বিরাজিত আছেন।

কথিত হয় যে, শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের সমাধিপীঠের স্থানটি 'ভজনকুটী' নামে খ্যাত হয়। কারণ, শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রত্যহ মধ্যাহ্নে সমুদ্র-স্নান করিয়া ঠাকুর শ্রীহরিদাসের সমাধি-স্থানে আসিতেন এবং তথায় কিছুকাল শ্রীনাম-ভজন-লীলা প্রকট করিয়া ঠাকুর শ্রীহরিদাসকে মহাপ্রসাদান্ন প্রদান করিতেন। শ্রীগৌরহরি শ্রীগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে প্রবেশ করিলে এই ভজন-কুটীতে শ্রীগৌর, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর শ্রীনামভজন-নিরত শ্রীমূর্ত্তিত্রয়ের প্রাকট্য কোন মহানুভব বৈষ্ণবের দ্বারা সম্পাদিত হন।

৬। শ্রীবালি-মঠ

এই মঠ শ্রীনিত্যানন্দ-সখা শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীমূর্ত্তি, পতিত-পাবন শ্রীজগন্নাথ, শ্রীরাধামদনমোহন-বিজয়-বিগ্রহ ও শ্রীশালগ্রাম আছেন। মূল শ্রীমূর্ত্তির নাম—শ্রীঅভিরাম-গোপাল: বহু পূর্ব্বে একটি চালা-ঘরে শ্রীবিগ্রহ ছিলেন; পরে শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। নাটমন্দির আরও পরে নির্ম্মিত হয়। শ্রীমাধবানন্দদাসের শিষ্য শ্রীশ্রীধরদাস, তচ্ছিষ্য শ্রীরঘুনাথদাস; তাঁহার শিষ্য বর্ত্তমান মহান্ত শ্রীঅভিরামদাস। শ্রীমাধবানন্দের পূর্ব্ব মহান্তগণের নাম বর্ত্তমান মহান্ত বলিতে পারিলেন না। শ্রীধরদাসের সাতজন শিষ্যের অন্যতম শ্রীহরেকৃষ্ণদাস বর্ত্তমান নাট্যমন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

'শ্রীবালি-মঠ' বড়-উড়িয়া-মঠের নিকট মার্কণ্ডেশ্বরসাহী পল্লীতে অবস্থিত। মহান্ত জানাইলেন যে, নিত্য-নৈমিত্তিক-সেবা-পূজা ব্যতীত বর্ত্তমানে অন্য কোন পারমার্থিক-জীবন বা ভজনাদির চিহ্ন আর মঠের মধ্যে নাই।

৭। শ্রীললিতা-বিশাখা-মঠ

মার্কণ্ডেশ্বরসাহী পল্লীতে মার্কণ্ডেয়-সরোবরের অনতি-দূরে পাশাপাশি এই দুইটি মঠ স্থাপিত ছিল। কিছুদিন

হইল মার্কণ্ডেয়রসাহী-নিবাসী নীলাম্বি-সাউ নামক এক মহাজন (উত্তমর্ণ) 'শ্রীললিতা-মঠে'র পূর্ব্ব মহান্তের সম্পত্তি ঋণের দায়ে ক্রোক দিয়া মহান্তের নাবালক অবস্থানের সুযোগ হইতে উহা গ্রহণপূর্ব্বক নিজ সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে এবং তৎস্থানে ব্যক্তিগত ঠাকুরবাড়ী স্থাপন করিয়াছে। 'শ্রীললিতা-মঠে'র সংলগ্ন দক্ষিণেই 'শ্রীবিশাখা-মঠ'। এই উভয় মঠ, অথবা কেহ কেহ বলেন, শেষোক্ত মঠটি শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল নরহরি সরকার-ঠাকুর স্থাপন করেন। শ্রীবিশাখা-মঠের বর্ত্তমান মহান্ত শ্রীপদ্মচরণদাস, তাঁহার গুরু শ্রীগিরি-ধারীদাস, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী গুরু বা মহান্ত শ্রীরামেশ্বরদাস। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ব মহান্তগণের পরম্পরা মন্দিরের বর্ত্তমান পূজারী বলিতে পারিলেন না। মহান্ত অধিকাংশ সময়েই জমিদারী হইতে অর্থত্রয়াদি আদায়ের জন্য বাহিরে থাকেন।

'শ্রীবিশাখা-মঠে'র শ্রীমন্দিরটি গৃহের আকার; গৃহের উপরিভাগে শ্রীমন্দিরের ন্যায় চূড়া ও চক্র আছে। একটি উচ্চ অলিন্দের উপর ঐ গৃহটি অবস্থিত। শ্রীমন্দিরে শ্রীল নরহরি সরকার-ঠাকুরের সেবিত কৃষ্ণ-বরণ-মনোহভিরাম দারুময়ী শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-শ্রীমূর্ত্তি পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া বিরাজিতা রহিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর এক হস্ত উত্তোলন করিয়া নৃত্যপরায়ণ, দেখিতে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীগৌর-মূর্ত্তিসদৃশ। দক্ষিণে শ্রীগৌরসুন্দর, বামে শ্রীনিত্যানন্দ, মধ্যে শ্রীশ্রীরাধা-শ্যামচাঁদ এবং শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলভদ্র ও শ্রীসুভদ্রা। এই সকল শ্রীবিগ্রহ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রচারিত আছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীগোপাল ও শ্রীশালগ্রাম বিরাজিত আছেন। মঠের পশ্চাদ্ভাগে শ্রীশ্রীরাধাশ্যামচাঁদের একটি বিস্তৃত চৌচা বা উদ্যান আছে। কিন্তু শুনিতে পাওয়া গেল, তাহার উপরও নাকি পূর্ব্বোক্ত মহাজন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। মনাপুরা, বাবুগা, বাগপুর প্রভৃতি স্থানে শ্রীবিশাখা-মঠের ভূ-সম্পত্তি আছে। শ্রীরাধাশ্যামচাঁদ প্রতিবৎসরই দোল-পূর্ণিমার সময় মনাপুরায় বিজয় করেন।

৮। শ্রীনন্দিনী-মঠ

এই মঠ শ্রীসীতাসতীসাধ্বী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর কন্যা শ্রীনন্দিনীদেবী-কর্ত্তৃক শ্রীমার্কণ্ডেয়রসাহী পরীতে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় শ্রীনন্দিনীদেবীর সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে.—

"নন্দিনী তুলসী জ্ঞেয়া জয়া চ বিজয়া ক্রমাৎ।"

(গৌ গ ৮৯)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীঅদ্বৈত-শাখার বর্ণনের মধ্যেও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীনন্দিনীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১২শ, ৫৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। স্থানীয় এক ব্যক্তি বলিলেন যে, শ্রীতুলসী দেবী উত্তরবঙ্গের কোন স্থানে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা কতদূর সত্য, তাহা অনুসন্ধেয়। 'শ্রীনন্দিনী-মঠে' শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীবিগ্রহ বামভাগে শ্রীরাধিকা ও দক্ষিণে শ্রীললিতার সহিত ত্রিভঙ্গভঙ্গিমঠামে বিরাজিত। শ্রীবিগ্রহের দর্শন অপূর্ব্ব। মন্দিরের মধ্যে প্রাচীনতার চিহ্ন দৃষ্ট হয়। শ্রীমন্দির নাতি-উচ্চ। শ্রীজগমোহনের পর একটি চত্বর। তৎপরে শ্রীনন্দিনীদেবীর পাষাণময়ী শ্রীমূর্ত্তি। কেহ কেহ বলেন—ইহা শ্রীবৃন্দারাণীর শ্রীমূর্ত্তি। কিন্তু ইহা শ্রীনন্দিনীদেবীর শ্রীমূর্ত্তি বলিয়াই অনুমিত হয়। শ্রীশ্রীবৃন্দাবন-চন্দ্রের অভিমুখিনী জপমালা-হস্তে আসীনা শ্রীনন্দিনী-দেবীর শ্রীমূর্ত্তি একটি নাতি-উচ্চ মণ্ডপের নিম্নে বিরাজিতা আছেন। মণ্ডপের উপরে শ্রীতুলসীবেদিকা অবস্থিতা। চত্বরের বামভাগে বহু তুলসীবেদী শোভা পাইতেছেন। এতদ্ব্যতীত নাট্যমন্দির ও মহান্তের ভজন-গৃহ, ভোগ-রন্ধন-গৃহ প্রভৃতি আছে। মঠের সংলগ্ন এক পার্শ্বে অনেকগুলি সেবকখণ্ড আছে। ঐসকল স্থান ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। মঠের মহান্ত নাবালক, বর্ত্তমান বয়স ১৫ বৎসর, নাম—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস; পলাম-জিলার কুকড়া-খণ্ডিতে অধিকাংশ সময় থাকেন। রামরড়া নামক স্থানে মঠের কিছু ভূসম্পত্তি আছে।

স্থানীয় এক ব্যক্তি বলিলেন, শ্রীঅদ্বৈত-দুহিতা শ্রী-নন্দিনী যখন শ্রীবৃন্দাবন হইতে পুরীতে গমন করিবার ইচ্ছা করিলেন, তখন শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীনন্দিনীকে বলিয়াছিলেন,—"আমিও তোমার সঙ্গে শ্রীপুরুষোত্তমে যাইব।" তাহাতে শ্রীনন্দিনী বলিলেন,—"আমি কি করিয়া তোমাকে লইয়া যাইব?" অচিন্ত্যশক্তি শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীনন্দিনীর প্রীতিতে আকৃষ্ট হইয়া ভক্তের অনুগমনে শ্রীবৃন্দাবনের পর্য্যন্ত উপনীত হইলেন। শ্রীনন্দিনী পুরীতে আসিয়া

শ্রীমার্কণ্ডেশ্বরসাহী পল্লীতে বাসস্থান গ্রহণ করিলেন এবং প্রত্যহ শ্রীজগন্নাথদেব-দর্শনে গমন, শ্রীমন্দির পরিক্রম, শ্রীগরুড়দর্শন, শ্রীমহাপ্রসাদ-সেবন ও মুক্তীর ভজন করিতে লাগিলেন। তৎপরে একদিন শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র পুরীর রাজাকে স্বপ্নযোগে জানাইলেন যে, তিনি পরমা ভাগবতী শ্রীনন্দিনী-দেবীর সহিত শ্রীবৃন্দাবন হইতে আসিয়া শ্রীমুনেশ্বরে কোন সরোবরের মধ্যে বাস করিতেছেন। 'রাজা তাঁহাকে সেই সরোবর হইতে উত্তোলন করিয়া শ্রীনন্দিনীদেবী যেস্থানে আছেন, সেস্থানে স্থাপন করুন।' স্বপ্নভঙ্গ হইবার পরমুহূর্ত্তেই রাজা স্বয়ং লোকজনের সহিত শ্রীমুনেশ্বরের কোন সরোবর হইতে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রকে পুরীতে লইয়া আসেন এবং মার্কণ্ডেশ্বরসাহীতে—যেস্থানে শ্রীনন্দিনীদেবী ভজন করিতেন, তথায় একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীবিগ্রহ স্থাপন এবং শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবার জন্য ভূ-সম্পত্তি প্রদান করেন।

৯। সাতাসন-মঠ

সমুদ্রের উপকূলে শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সমাধির সন্নিকটে ও নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'ভজন-কুটী'র সংলগ্ন উত্তরভাগে প্রাচীন 'সাতাসন-মঠ' অবস্থিত। শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামিপ্রভু, শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু, পণ্ডিত শ্রীল জগদানন্দ গোস্বামিপ্রভু-প্রমুখ গৌর-পার্ষদগণ এই সাতাসন-মঠে অবস্থান করিয়া ভজন করিয়াছিলেন। যখন শ্রীগৌরসুন্দর নিজ-পার্ষদগণ-সঙ্গে শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সমাধি প্রদান করিবার জন্য সমুদ্রোপকূলে আগমন করেন, তখন তাঁহারা সাতাসন-মঠে ও তৎসংলগ্ন-প্রদেশে বিশ্রাম ও কীর্ত্তনাদি করিয়াছিলেন।

কিংবদন্তী এই যে, অতি পুরাকালে সপ্তর্ষি শ্রীক্ষেত্রের সমুদ্রতীরে একান্তে ভজন করিবার জন্য পরস্পর সংলগ্ন-স্থানে সাতটি আসন রচনা করেন। তাহা হইতেই 'সাতাসন-মঠে'র নামকরণ হইয়াছে। একদিন মহারাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন সমুদ্রস্নান করিতে আসিয়া দেখেন যে, সাতজন ঋষি সমুদ্র-তীরে নির্জ্জন-প্রদেশে অবস্থান করিয়া শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন। রাজা ঋষিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সপ্তর্ষি রাজার বাক্যে মনোযোগ না দিয়া হরিকীর্ত্তন করিতে থাকিলেন।

এদিকে শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন সেই রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন, যেন শ্রীজগন্নাথ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন,—'তুমি এই সপ্তর্ষিকে ভজনের উপযোগী জমি ও প্রত্যহ মহাপ্রসাদ পাঠাইয়া দিবে।' তদনুসারে শ্রী-ইন্দ্রদ্যুম্ন 'ডিরাকলি' নামক একটি মৌজা এবং সপ্তর্ষির জন্য প্রত্যহ সাত আটিক (হাঁড়ি) ও সাত কড়োরা মহাপ্রসাদার ও ব্যঞ্জনাদি প্রসাদ-প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। সপ্তর্ষি রাজার প্রেরিত সনন্দ ফেরৎ দিয়া বলিলেন,—'আমাদের জমির কোন দরকার নাই, রাজার ইচ্ছা হইলে মহাপ্রসাদ পাঠাইতে পারেন।' সপ্তর্ষি নিষ্কিঞ্চন ভজনানন্দী বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে সপ্তর্ষিগণের ভজনস্থানে শ্রীবিগ্রহসেবা ও মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন রাজার প্রদত্ত জমিদারী সেবার জন্য গৃহীত হইয়াছিল।

'সাতাসন-মঠ' যখন শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের ভজনাশ্রম-রূপে গৃহীত হইল, তখন যা তাহার পূর্ব্ব হইতেই উহা নিম্নলিখিত সাতটি নামে অভিহিত হইয়াছিল,—

১। **বড় আসন**—এই আসনে শ্রীরাধা-দামোদর-শ্রীবিগ্রহ অবস্থিত ছিলেন, বর্ত্তমানে গিরিধারী-আসনে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। কথিত হয়, এখানে শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামিপ্রভু ভজন করিতেন।

২। **কদলীপট্টিকা-আসন**—এই স্থানে বর্ত্তমানে কোন শ্রীবিগ্রহ নাই। এই স্থানে প্রসিদ্ধ সিদ্ধমহান্ত শ্রীল স্বরূপদাস বাবাজী মহারাজ ভজন করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার 'স্বলিখিত জীবনী'তে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"মাহাত্মা শ্রীস্বরূপদাস বাবাজী একজন অপূর্ব্ব বৈষ্ণব। সমস্ত দিবসই কুটীরের ভিতর ভজন করিতেন। সন্ধ্যাকালে প্রাঙ্গণে আসিয়া তুলসী দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া নামগান করিতে করিতে নাচিতেন ও কাঁদিতেন। ঐসময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বৈষ্ণবগণ যাইতেন। কেহ কেহ তাঁহাকে সেই সময় একমুষ্টি মহা-প্রসাদ দিতেন। তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি পর্য্যন্ত তিনি তাহা স্বীকার করিতেন, অধিক লইতেন না। কেহ কেহ সেই সময় শ্রীচৈতন্যভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন। বাবাজী মহাশয় আবার ১০টা রাত্রিতে নিজের কুটীরে যাইয়া ভজন করিতেন। অন্ধকার থাকিতে থাকিতে

সমুদ্রতীরে গিয়া হাতমুখ ধোয়া ও স্নান করা সমাপ্ত করিতেন। কোন বৈষ্ণব পাছে তাঁহার কোন কার্য্য করেন, সেই আশঙ্কায় একক সব কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু অন্ধ, কেমন করিয়া রাত্রি থাকিতে সমুদ্রে নৈত্যিক স্নানাদি করিতেন, তাহা মহাপ্রভুই জানেন। তিনি একজন সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার বিষয়-চিন্তামাত্রই ছিল না। আমি সন্ধ্যার পর কোন-কোন দিন তাঁহার চরণ দর্শন করিতে যাইতাম। 'বড় মিষ্টবাক্যে তিনি আগন্তুক লোকের সহিত কথোপকথন করিতেন।" (সুলিখিত জীবনী ১৪১-১৪২ পৃষ্ঠা)।

শ্রীল স্বরূপদাস বাবাজী মহাশয়ের সম্বন্ধে আমরা আরও শুনিয়াছি যে, অনেক সময় স্থানীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দ তাঁহার জন্য মহাপ্রসাদ লইয়া আসিলে তিনি বলিতেন,—'তোমরা আমাকে ইংরাজী মাসের ১লা, ২রা, ৩রা পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ দিবে, ইহার পরে আর দিবে না।' কারণ, বাবাজী মহাশয় জানিতেন যে, তাঁহারা মাসের প্রথমমুখে যে অর্থ প্রাপ্ত হন, তাহা তাঁহাদের সদুপায়ে উপার্জ্জিত মাসিক বেতন, কিন্তু পরে যাহা পান, তাহা উৎকোচ বা অসদুপায়ে লব্ধ অন্যায়-বিত্ত।

এখন 'কদলী-পটুকা' আসনের ভূমিতে মহাত্মা শ্রীস্বরূপদাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধি বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি যেই স্থানে ভজন করিতেন, এখনও সেই স্থানের অস্তিত্ব থাকিলেও, দুঃখের বিষয়, সেই স্থানের যথাবিহিত মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না—মঠের বর্ত্তমান সেবাইতগণ সেই স্থানে অন্যান্য কার্য্যে ব্যবহার করিতেছেন।

৩। **শ্রীগিরিধারী-আসন**—এই স্থানে গিরিধারী-শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত; ইহাই শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর আসন বা ভজন-স্থান। 'ভক্তিকুটী'র-সংলগ্ন পূর্ব্বদিকে এই আসন অবস্থিত।

৪। **শ্রীসোঁকা-আসন** বা **শ্রীগুম্ফা-আসন**—এখানে বৈষ্ণবগণ ভজন করিতেন। ভজনগুহার নাম হইতেই আসনের নামকরণ হইয়াছে।

৫। **শ্রীমদনমোহনদেব-আসন**—এই স্থানে শ্রীমদনমোহনদেব বিরাজিত। কেহ কেহ বলেন, এই স্থানেই শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু ভজন করিতেন। আবার কেহ কেহ 'শ্রীগিরিধারী-আসন'কেই শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর ভজনাসন বলিয়া থাকেন।

৬। **শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম-আসন**—এখানে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম-শ্রীবিগ্রহ অবস্থিত। ইহা শ্রীখণ্ড-ভগবান্ আচার্য্যের ভজন-স্থান।

৭। **শ্রীশ্যামসুন্দরদেব-আসন**—এখানে শ্রীশ্যাম-সুন্দর-শ্রীবিগ্রহ অবস্থিত।

শ্রীগিরিধারী-আসনের বর্ত্তমান সেবাইত শ্রীমনোহরদাস 'সাতাসন-মঠে'র প্রাচীন দলিল-পত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে সাতাসনের সেবাইতগণের যে পরম্পরাটি প্রদান করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল,—

প্রথম আসন (বড় আসন)-প্রণালী—১। গৌর-চরণদাস, ২। একড়ুমারদাস, ৩। কৃষ্ণমোহনদাস, ৪। রাধাচরণদাস, ৫। দামোদরদাস, ৬। রাধামোহনদাস।

দ্বিতীয় আসন (কদলী-পটুকা আসন)—১। যুগল-কিশোরদাস, ২। সুবলচরণদাস, ৩। ভাগবতদাস, ৪। শ্যামদাস।

তৃতীয় আসন (গিরিধারী-আসন)—১। ব্রজকিশোর-দাস, ২। ভগবচ্চরণদাস, ৩। সনাতনদাস, ৪। গোবিন্দ দাস, ৫। নিমাইচরণদাস, ৬। গৌরাঙ্গদাস।

চতুর্থ আসন (গুম্ফা-আসন)—১। রামকৃষ্ণদাস, ২। সীতারামদাস, ৩। হরিবল্লভদাস।

পঞ্চম আসন (শ্যামসুন্দরদেব-আসন)—১। মদন-মোহনদাস, ২। রামচন্দ্রদাস, ৩। রাঘবেন্দ্রদাস, ৪। নিত্যানন্দদাস, ৫। রাধাচরণদাস, ৬। মোহনদাস, ৭। কৃষ্ণবিহারিদাস, ৮। গোবিন্দদাস।

ষষ্ঠ আসন (শ্যামানন্দী কৃষ্ণবলরাম-আসন)—১। বলরামদাস, ২। গৌরাঙ্গদাস, ৩। রঘুনাথদাস, ৪। রাধা-নন্দদাস, ৫। শ্যামচরণদাস, ৬। গদাধরদাস, ৭। কৃষ্ণদাস।

সপ্তম আসন (আসনের নামোল্লেখ নাই)—১। পদ্মচরণদাস, ২। সদানন্দদাস, ৩। মাধবদাস, ৪। মোহনদাস, ৫। নরোত্তমদাস।

বর্ত্তমানে ষষ্ঠ আসনের সেবাইত—কৃষ্ণচরণদাসের শিষ্য ভক্তার্জ্জনদাস। কদলীপটুকা ও গিরিধারী-আসনের সেবাইত —মনোহরদাস।

দুঃখের বিষয়, যেইস্থানে শ্রীশ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামি-প্রভু শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু, শ্রীশ্রীল জগদানন্দ

পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু এবং পরবর্ত্তিকাল পর্য্যন্ত মহাত্মা শ্রীস্বরূপদাসের ন্যায় ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণ বাস করিতেন, সেইস্থানে নানাপ্রকার অবৈধ আচারও দৃষ্ট হইতেছে।

প্রকাশ, 'সাতাসনে'র শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্য জিয়াকন্দি, কণ্টিকেরা, বঙ্কেরা প্রভৃতি যে-সকল মৌজা ছিল, তাহা সেবাইতগণের পরস্পর বাদবিসংবাদ ও ঋণে নীলাম হইয়া গিয়াছে। এখন কাহোয়ারী মৌজায় ১৮ একর জমি আছে। শুনা যায়, তাহা লইয়াও নাকি সাতাসনের অন্যতম আসনের সেবাইত উদ্ধবদাসের সহিত গিরিধারী-আসনের মনোহরদাসের মামলা-মোকদ্দমা চলিয়াছিল। পুরীর রাজার কার্য্যালয় হইতে সাতাসনের জন্য প্রত্যহ যে মহাপ্রসাদ ও প্রাত্যহিক ভোগের ব্যবস্থা ছিল, তাহাও এখন এরূপ স্থগিত হইয়াছে। কেবলমাত্র 'মদনমোহন-দেব-আসন' প্রত্যহ চারি আনা করিয়া রাজসরকার হইতে প্রাপ্ত হন।

'সাতাসনে'র সেবাপূজার অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ও তথায় নানাপ্রকার অনাচার, অদাচারের প্রাবল্য দেখিয়া ইং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় সুধীব্যক্তিগণ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে 'সাতাসনে'র সেবার ভার অর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন এবং তদনুসারে শ্রীরাধামোহনদাস, গঙ্গাধরদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস ও কৃষ্ণচরণদাস শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে অর্পণ-নামা লিখিয়া দেন, কিন্তু কএকজন অবৈধ আচার-সম্পন্ন ব্যক্তির প্ররোচনায় কেহ কেহ নানাপ্রকার উদ্বেগ-জনক ব্যাপার আরম্ভ করায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীল সরস্বতীঠাকুর 'সাতাসনে'র সহিত বৈষয়িক সংস্রব সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেন। বর্ত্তমানে তথায় হরিভজনের কোন নাম-গন্ধ নাই। শুনা যায়, 'সাতাসনে'র 'শ্রীগিরিধারী-আসনে'র গৌরাঙ্গদাসের চেলা মধুসূদনদাস পতিত হওয়ায় ঘরের পাথর পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া চলিয়া যায়। 'শ্রীগিরিধারী-আসনে' অনেক প্রাচীন গোস্বামি-গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছিল। রঘুনাথ বৈদ্য উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থান-সম্বন্ধে যে কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে 'সাতাসন-মঠে'র কিঞ্চিৎ ইতিহাস পাওয়া যায়। এই 'সাতাসনে'ই ভারতচন্দ্র রায় কবিগুণাকর পূর্ব্বে বিরক্তের বেশ গ্রহণ-পূর্ব্বক বাস করিয়া গৌড়ীয় অলঙ্কার ও রসশাস্ত্রসমূহ আলোচনা করেন। পরবর্ত্তিকালে পুনরায় গার্হস্থ্যাশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক প্রথমতঃ মূলাজোড়ের নাগগণের এবং পরে নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় রাজকবিরূপে নিযুক্ত হন।

১০। শ্রীশ্রীরাধাদামোদর-মঠ

শ্রীচৈতন্যলীলা-পাঠকগণ শ্রীচৈতন্যভাগবতে (অন্ত্য, ৩য় অধ্যায়) শ্রীল পরমানন্দপুরী গোস্বামিপ্রভুর কূপের নাম শ্রবণ করিয়াছেন। কথিত হয় যে, শ্রীপরমানন্দপুরী গোস্বামী শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের পশ্চিমদিকে একটী মঠ স্থাপন করিয়া বাস করিয়াছিলেন। সেই মঠের সংলগ্ন কূপটী এখন বালেলিসাহী পুলিশ-ষ্টেশনের সীমানার মধ্যে বর্ত্তমান আছে। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীপুরী-গোস্বামিপ্রভুর কূপের পুনরুদ্ধার ও তাঁহার জনৈক শিষ্যের দ্বারা উহার সংস্কার সাধন করেন। উক্ত শ্রীপরমানন্দপুরীর কূপের দিকে গমন-কালে বামহস্তে দক্ষিণদিকে ছত্রভোগী-সাহী-পল্লীতে 'নাগামঠ'-নামে প্রসিদ্ধ একটী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মঠ অবস্থিত। এই মঠ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর বিরক্ত শিষ্য নাগা-প্রেমদাসজী স্থাপন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

শ্রীপ্রেমদাসজী শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামি-প্রভুর সন্নিকটে গৃহ-সংসার পরিত্যাগ করিয়া বাস করিতেন। কথিত হয় যে, তিনি শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামি প্রভুর তিরোধানের পর শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে শ্রীপুরী গোস্বামিপ্রভুর কূপের অতিনিকটে একটী বটবৃক্ষতলে ছত্র স্থাপন করিয়া তথায় শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর-শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করেন। যেই বিশাল বটবৃক্ষের তলে শ্রীপ্রেমদাসের ছত্র স্থাপিত হইয়াছিল, সেই বৃক্ষটি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঝড়ে ভূমিসাৎ হইয়া লুপ্ত হইয়াছে। উক্ত প্রেমদাস উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশবাসী ও অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন বলিয়া নীলাচলবাসিগণ তাঁহাকে 'নাগা' বলিতেন। বস্তুতঃ 'নাগা'-শব্দের দ্বারা যে অবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সাধুকে বুঝায়, এস্থানে সেই অর্থ নহে; কারণ, তাঁহাদের গুরু-প্রণালী ও সিদ্ধ-প্রণালীর যে প্রাচীন পুঁথি অদ্যাপি সুরক্ষিত আছে, তাহাতে শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর-

মিলিত-তনু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর যুগলিত-স্বরূপের উপাসনা শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়গণের পদ্ধতি-অনুসারেই পূর্ণ হয়। সেই পুঁথিতে তাঁহাদের যে গুরু পরম্পরা দৃষ্ট হয়, তাহা এইরূপ,—শ্রীরূপ, শ্রীজীব, শ্রীপ্রেমদাস। নাগা-প্রেমদাস-নামে পরিচিত)। শ্রীকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধাচরণদাস, শ্রীভগবানদাস, শ্রীরূপরামদাস, শ্রীদামোদরদাস, শ্রীমাধবানন্দ-দাস, শ্রীগোবিন্দচন্দ্রদাস। শেষোক্ত ব্যক্তি বর্ত্তমান মহান্ত। ইঁহার প্রত্যেকেই 'মহান্ত গোস্বামী' বলিয়া পরিচিত ও জেলাশ্রিত। মহান্তগণ অনেক সময় কাছা-কোঁচা দিয়া কাপড় পরেন। প্রেমদাস বা নাগা প্রেমদাসের ও তৎ-পরবর্ত্তী সমস্ত মহান্তেরই স্বধামগমনের পর তাঁহাদের অস্থি সমাধি শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধা-দামোদর-কুঞ্জে প্রদত্ত হয়। বর্ত্তমান মহান্ত বলিলেন,—শ্রীপ্রেমদাস হইতে শ্রীদামোদরদাস পর্য্যন্ত ছয় পুরুষের অস্থি সমাধি শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধা-দামোদর-কুঞ্জে এখনও বর্ত্তমান আছে। কেবল বর্ত্তমান মহান্ত (শ্রীগোবিন্দচন্দ্রদাসজী) এপর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবন-গমনের অবসর পান নাই বলিয়া তাঁহার গুরুদেব শ্রীমাধবানন্দদাসজীর অস্থি-সমাধি তথায় প্রদান করিতে পারেন নাই। শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধা-দামোদর-কুঞ্জের সেবকগণ ব্রহ্মচারী গৃহস্থ, কিন্তু শ্রীক্ষেত্রের 'শ্রীরাধা-দামোদর-মঠে'র মহান্তগণ সকলেই ত্যক্ত-গৃহ। শ্রীবৃন্দা-বনের মঠের সহিত শ্রীক্ষেত্রের এই মঠের অন্য কোন সম্বন্ধ নাই, উভয়ই স্বতন্ত্র মঠ; কেবল উভয় মঠের মহান্তগণই শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর পরিবারভুক্ত বলিয়া শ্রীক্ষেত্রের শ্রীরাধা-শ্রীদামোদর-মঠের মহান্তগণের সমাধি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধা-দামোদর-কুঞ্জে স্থাপিত হইয়া আসিতেছে।

'শ্রীরাধা-দামোদর-মঠ' নামান্তর 'শ্রীনাগা-মঠে'র প্রাচীন মন্দির-প্রকোষ্ঠে শ্রীরাধা-দামোদর-বিগ্রহ ও শ্রীগৌরহরির ধাতুময়ী শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। উক্ত দুই শ্রীমূর্ত্তি শ্রীপ্রেমদাসজী-কর্ত্তৃক স্থাপিত। এতদ্ব্যতীত শ্রীবিশ্বম্ভর-দেব, পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথ এবং শ্রীমন্দিরের জগমোহনে শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশিত আছেন। শ্রীবিগ্রহগণ সকলেই পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া অবস্থিত। জগমোহনের পর একটী উন্মুক্ত বিস্তৃত চত্বর আছে। মন্দিরের পশ্চাতে পশ্চিমদিকে শ্রীশ্রীরাধা-দামোদরের একটী সুন্দর উদ্যান আছে। এই উদ্যানে শ্রীতুলসী-কানন, বহু পুষ্পবৃক্ষ ও নানাপ্রকার শাক-সব্জী দেখিতে পাওয়া গেল। মহান্ত মহাশয় অতি উৎসাহভরে স্বয়ং আমাদিগকে সেই উদ্যানটি দেখাইলেন। প্রেমদাস অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন বলিয়া কোনপ্রকার রাজ সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। পরবর্ত্তিকালে কোন কোন মহান্ত কিছু ভূসম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। এই মঠের বহু শিষ্য গঞ্জাম, খুরদা ও পুরী জেলার বিভিন্ন স্থানে আছেন। এখানে অনেক হস্তলিখিত তালপত্রের পুঁথি ছিল, কিন্তু তাহা অযত্নে প্রায় সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পুরীর এই মূল-মঠের অনুগতরূপে গঞ্জাম-জেলার ধরাকোট-তালুকে 'পাকেরি-মঠ' ও 'পাটলিগুডা-মঠ' নামে দুইটি মঠ এবং গঞ্জামের পূর্ব্বখণ্ড-তালুকে 'পিত্তল-মঠ' ও 'হুণ্ডত-মঠ' নামে দুইটী মঠ আছে। এই-সকল মঠেই শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ-বিগ্রহ প্রকাশিত আছেন।

পুরীর 'শ্রীরাধা-দামোদর-মঠে' প্রতি শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর আবির্ভাব-তিরোভাব উৎসব, শ্রীগৌরজন্মোৎসব, শ্রীজন্মাষ্টমী, শ্রীরাধাষ্টমী প্রভৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান মহান্ত এই মঠে একটি টোল স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা এখন লুপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই মঠের সহিত 'বড় উড়িয়া-মঠ' অর্থাৎ অতিবাড়ী-মঠের পংক্তি-ভোজনাদি হইত না। শ্রীপুরীধামের সমস্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মঠের সহিতই এইরূপ সম্বন্ধ ছিল; কিন্তু কাল-গতিতে পরমার্থনিষ্ঠা অপেক্ষা লোকপ্রিয়তার দিকে দৃষ্টি অধিক-তর নিবদ্ধ হওয়ায় বড় উড়িয়া-মঠ পাংক্তেয় হইতেছেন।

১১। শ্রীরাধাকান্ত-মঠ

শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের যে-সকল প্রাচীন মঠ অধিষ্ঠিত আছে, তন্মধ্যে 'শ্রীরাধাকান্ত-মঠ' বিশেষ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন। এই মঠ শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের অনতিদূরে দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। 'শ্রীরাধাকান্ত-মঠে'র বহুগণ-ভাজন বর্ত্তমান মহান্ত-মহারাজ ও তদনুগ পণ্ডিতমণ্ডলীর সৌজন্যে আমরা সেই মঠ-সম্বন্ধে যে-সকল বিবরণ ও তথ্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা হইতে জানা যায়,—উৎকল-রাজ-পুরোহিত শ্রীকাশী-মিশ্র শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের কিছু দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে বালিসাহী-পল্লীতে একটী আবাস-স্থান ও তৎ-সংলগ্ন উদ্যানাদি (টোটা) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ-সম্বন্ধে 'শ্রীরাধাকান্ত-মঠে' একটী সনন্দ আছে, বলিয়া শুনিতে পাওয়া গেল।

শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীল কাশীমিশ্রকে রাজ-গুরুজ্ঞানে নিত্য পূজা ও সম্মান করিতেন। শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থানকালে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের রাজগুরুর সেবা-নিয়ম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পংক্তিতে এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

"প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে নিয়মে।
যতদিন রহে তেঁহো শ্রীপুরুষোত্তমে॥
নিত্য আসি' করে' মিশ্রের পাদ-সম্বাহন।
জগন্নাথ-সেবার করে' বিজ্ঞান শ্রবণ॥
রাজা মিশ্রের চরণ ঘরে চাপিতে লাগিলা।
তবে মিশ্র তাঁ'রে কিছু ভঙ্গীতে কহিলা॥"

(চৈ চ ম ১০।৮১-৮৩)

শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যখন শ্রীপ্রতাপরুদ্রকে জানাইলেন যে, সন্ন্যাসিরূপী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব—সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তিনি দক্ষিণদেশে প্রেমভক্তি-প্রচারার্থ ভ্রমণলীলা করিতেছেন; তখন রাজা 'বিজ্ঞশিরোমণি' ভট্টাচার্য্যের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া বলিলেন,—

"তুমি তাঁ'রে কৃষ্ণ কহ, তা'তে সত্য মানি॥"

(চৈ চ ম ১০।১৭)

"যদি পুনরায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পুরীতে আগমন করেন, তাহা হইলে যেন তোমার অনুগ্রহে তাঁহাকে একবার দর্শন করিয়া নয়ন সফল করিতে পারি।"

তখন ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—

"তেঁহো আসিবে অল্পকালে।
রহিতে তাঁ'র এক স্থান চাহিয়ে বিরলে॥
ঠাকুরের নিকট, আর হইবে নির্জ্জনে।
এমত নির্ণয় করি' দেহ' এক স্থানে॥"

(চৈ চ ম ১০।১৯-২০)

তখন রাজা কহিলেন,—

"ঐছে কাশীমিশ্রের ভবন।
ঠাকুরের নিকট, হয় পরম নির্জ্জন॥"

(চৈ চ ম ১০।২১)

শ্রীপ্রতাপরুদ্রের কথা শুনিয়া শ্রীসার্ব্বভৌম শ্রীকাশীমিশ্রের নিকট আসিয়া তাহা জানাইলেন। ইহা শুনিয়া শ্রীকাশীমিশ্র বিশেষ আনন্দসহকারে বলিলেন,—

"আমি বড় ভাগ্যবান্।
মোর গৃহে প্রভুপাদের হ'বে অবস্থান॥"

(চৈ চ ম ১০।২৩)

শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করিয়া শ্রীমন্দিরের বাহিরে আসিলে শ্রীসার্ব্বভৌম শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সঙ্গে করিয়া শ্রীকাশীমিশ্রের ভবনে লইয়া গেলেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

"দর্শন করি' প্রভু চলিলা বাহিরে।
ভট্টাচার্য্য আনিল তাঁ'রে কাশীমিশ্র-ঘরে॥
কাশীমিশ্র আসি' পড়িল প্রভুর চরণে।
গৃহ-সহিত আত্মা তাঁ'রে কৈল নিবেদনে॥
প্রভু চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি তাঁ'রে দেখাইল।
আত্মসাৎ করি' তাঁ'রে আলিঙ্গন কৈল॥
তবে মহাপ্রভু তাহাঁ বসিলা আসনে।
চৌদিকে বসিলা নিত্যানন্দাদি ভক্তগণে॥
সুখী হৈলা দেখি' প্রভু বাসার সংস্থান।
যেই বাসায় হয় প্রভুর সর্ব্ব-সমাধান।
সার্ব্বভৌম কহে,—'প্রভু, যোগ্য তোমার বাসা।
তুমি অঙ্গীকার কর,—কাশীমিশ্রের আশা।'
প্রভু কহে,—'এই দেহ তোমা-সবাকার।
যেই তুমি কহ, সেই কর্ত্তব্য আমার'॥"

(চৈ চ ম ১০।৩১-৩৭)

এইভাবে শ্রীগৌরহরি কৃপাপূর্ব্বক শ্রীকাশীমিশ্রের ভবনে অবস্থান করিয়া নীলাচলবাসিগণকে কৃপা ও অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত রসাস্বাদন করিতে লাগিলেন।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীকাশীমিশ্রের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
রহিলেন কাশীমিশ্র-গৃহে কুতূহলে॥
নিরন্তর নৃত্যগীত-আনন্দ-আবেশ।
প্রকাশেন গৌরচন্দ্র, দেখে সর্ব্বদেশ॥
কভু নাচেন জগন্নাথের সম্মুখে।
তিলার্দ্ধেক বাহ্য নাহি প্রেমানন্দ-সুখে॥

কখন নাচেন কাশীমিশ্রের মন্দিরে।
কখন নাচেন মহাপ্রভু সিন্ধুতীরে॥
এইমত বিহরয়ে প্রেমের বিলাস।
তিলার্দ্ধেক অন্য কর্ম্ম নাহিক প্রকাশ॥"

(চৈ ভা অ ৫।১৩০-৩৪)

অন্যত্র শ্রীকাশীমিশ্র-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"কাশীমিশ্র পরম-বিহ্বল প্রেমরসে।
আঙ্গনে রহিলা প্রভু যাঁহার আবাসে॥"

(চৈ ভা অ ৪।২১৩)

সময় সময় শ্রীকাশীমিশ্রের ভবনে ভক্তগণের এরূপ জনতা হইত যে, তাহাতে তথায় লোকসঙ্কুলান হইত না। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়-নাটকে বলিয়াছেন,—

"যুগান্তেঽন্তঃকুক্ষেরিব পরিসরে পল্লবলয়ো-
ন্নমী সর্ব্বে ব্রহ্মাণ্ডকদমুদয়া যেঽবয়বযুঃ।
যথাস্থানং লব্ধাহ্বিলসদধিষ্ঠায় বপুষি স্বতঃ
সহস্রং লোকানাং বত লসতি মিশ্রাশ্রমপদে॥"

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়, ৮ম অঙ্ক)

অহো কি আশ্চর্য্য! যুগান্তকালে বটপত্রশায়ী শিশুরূপী সেই শ্রীভগবানের অঘটনঘটন-সদৃশ ক্ষুদ্র কুক্ষিমধ্যে এই সকল ব্রহ্মাণ্ড যেমন অনায়াসে অবস্থিত হইয়াছিল, সেইরূপ শ্রীকাশীমিশ্রের এই ক্ষুদ্র ভবনেও সমস্ত সহস্র লোক বিনা ক্লেশে প্রবেশ করিতেছে।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যখন শ্রীগোপীনাথকে বলিয়াছিলেন,—"শ্রীকাশীমিশ্রের ভবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর অবস্থানের জন্য সমর্পিত হইয়াছে।" তখন তাহা শুনিয়া শ্রীগোপীনাথ বলিলেন,—"সাধু, সাধু, সিদ্ধীরনিকটবর্ত্তী ভবতি, যতঃ সকলোৎসুখেনৈব জগন্নাথ-দর্শনং ভবিষ্যতি।"

শ্রীগৌরহরির সহিত যে-সকল ভক্ত শ্রীক্ষেত্রবাসী হইয়া প্রভুর সুখানুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদেরই অন্যতম শ্রীল যজ্ঞেশ্বর পণ্ডিত। শ্রীল যজ্ঞেশ্বর সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"যজ্ঞেশ্বর পণ্ডিত—প্রভুর বড় প্রিয়কর্ত্তা।
এক-ভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁর নৃত্য॥
আপনে মহাপ্রভু গাহেন যাঁর নৃত্যকালে।
প্রভুর চরণ ধরি' যজ্ঞেশ্বর বলে॥
'লক্ষসহস্র গন্ধর্ব্ব মোরে দেহ' চন্দ্রমুখ।
তা'সা গাব, মুক্তি নাচি, তবে মোর সুখ॥'
প্রভু বলেন,—'তুমি মোর পক্ষ এক শাখা।
আকাশে উড়িয়া যাও, পাও আর পাখা'॥"

(চৈ চ আ ১০।১১৭-২০)

শ্রীল যজ্ঞেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য—শ্রীগোপালগুরু। 'শ্রীরাধা-কান্ত-মঠে'র প্রচলিত বিবরণানুসারে শ্রীগোপালগুরুর পূর্ব্বনাম —শ্রীল মকরধ্বজ পণ্ডিত এবং ইনি শ্রীমুরারি পণ্ডিতের আত্মজ। ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবক শ্রীগোবিন্দের সঙ্গে থাকিয়া অতি বাল্যকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার অধিকার প্রাপ্ত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমকরধ্বজকে বালক দেখিয়া স্নেহভরে "গোপাল, গোপাল!" বলিয়া ডাকিতেন। ইহা শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর শ্লোকে ও শ্রীগোপালগুরু-অষ্টকে • পাওয়া যায়। উক্ত অষ্টকেই শ্রীমকরধ্বজ পণ্ডিত বা শ্রীগোপালকে শ্রীমুরারি পণ্ডিতের

•শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামিপ্রভুর অষ্টক

(মহান্ত শ্রীবিহারিদাসজীর শিষ্য শ্রীদীনবন্ধুদাস-কর্ত্তৃক জীর্ণপুঁথির লিপি-অনুসারে
শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত। শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৫৬)

শ্রীমন্মুরারিতনয়ং বিনতাবতংস-
বন্দে নটেশ মকরধ্বজ-পণ্ডিতাখ্যম্।
শ্রীগৌরচন্দ্রকৃপয়াপিত-গৌরবং শ্রী-
গোপালপূর্ব্বগুরবিত্যভিধাং দধন্তং॥১॥
যন্মে তনোতি কিলকং কিল কর্ণবিদ্ধা
গৌরপ্রভুর্নিগদতীতি বচস্তদানীং।
গোপালমেনমনুসেবত ভক্তবৃন্দ
বিদ্যাপিকাপি বিকলাক্ষিতঃস্থ পঙ্ক্তিম্॥২॥
শিক্ষাগুরুং গুরুকৃপা স পটীরভূমৌ
যঃ আচরন্ কিমপি গৌর ইবায় গৌরম্।
নিত্যাস্পদং সুখনিধিং বরদেব মন্ত্র-
মেবেতি শ্রীগুরুজনা গদনা তমাহি॥৩॥
শ্রীমন্নবদ্বয়বিধায়পি তস্য তুষ্ট-
বিদ্যানুগোপ্যসুবিধং তমবেদবন্তঃ।
বিদ্যাং নবীপপুরতো হরয়ে হরন্তং শ্রী-
গোপালমেব কলয়ে পরমা গুরুং তম্॥৪॥
গোবাধিপঃ যদ্ দিতা অধিকাশ্চুচিঃ
শ্রীমদ্ধাম হৈ গৌরহরেরিবেশাৎ।

পুত্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। পরে শ্রীগোপালের সহিত 'গুরু'-নাম সংযুক্ত হয়। এতৎসম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী প্রচারিত আছে। একদিন কোনও নামাপরাধ-কারী ব্যক্তি বহির্দেশে গমনকালে স্বীয় জিহ্বাকে টানিয়া ধরিয়া রাখেন, পাছে তাঁহার জিহ্বা অভ্যাসবশতঃ অজ্ঞাতসারেও নাম উচ্চারণ করিয়া ফেলে! এই কথা শুনিয়া বালক শ্রীগোপাল উক্ত ব্যক্তিকে বলেন,—"শ্রীহরিনামগ্রহণে স্থানাস্থান, কালাকালের বিচার নাই, ইহাই শাস্ত্রবিধি বহির্দেশে অবস্থানকালে যদি কাহারও প্রাণ-বিয়োগ হয়, তবে কি সেই ব্যক্তি হরিনাম গ্রহণ না করিয়াই ধরাধাম হইতে বিদায় লইবে? শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষায়—'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ,' 'নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ' এইরূপ পাওয়া যায়; সুতরাং গুরুগুরুর এই শিক্ষা লঙ্ঘন করিলে জীবের অধোগতি নিশ্চিত।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু বালকের এইরূপ সু-সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হন এবং গোপাল বালক হইলেও আচার্য্য বা গুরু-পদে অধিষ্ঠিত হইবার যোগ্য, ইহা ভক্তগণের নিকট ব্যক্ত করিয়া গোপালকে 'গোপালগুরু'-নামে অভিহিত করেন। সেইদিন হইতে শ্রীমকরধ্বজ পণ্ডিত বা শ্রীগোপালের নাম—'গোপালগুরু' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই বিষয়ও বা শ্রীগোপালগুরুর কোন নাম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি কোন গ্রন্থে নাই। উক্ত কিংবদন্তীটিও একটু অন্যরূপে কোথাও কোথাও প্রচারিত আছে। তবে এই কিংবদন্তীর মূলে যে সত্যটি লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইতে ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে, শ্রীগোপালগুরু শুদ্ধভক্তি-তত্ত্ববিৎ, আচার-প্রচারপরায়ণ ছিলেন বলিয়াই তিনি আচার্য্য বা গুরুপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীগোপালের 'গুরু'-নাম শ্রবণ করিয়া শ্রীল অভিরাম ঠাকুর তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে আগমন করিলেন। শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের সম্বন্ধে এইরূপ প্রচারিত আছে যে, তিনি প্রণাম করিলে একমাত্র শ্রীবিষ্ণুশিলা বা শ্রীবিষ্ণু-অর্চ্চা ব্যতীত অন্যান্য শিলা বা মূর্ত্তি তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ ও চূর্ণ হইয়া যাইত এবং প্রকৃত বৈষ্ণব ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণ শ্রীল অভিরামের প্রণাম সহ্য করিতে পারিত না, তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ হইত।

যখন বৈষ্ণবগণ শুনিলেন, শ্রীল অভিরাম ঠাকুর শ্রীগোপালগুরুকে দণ্ডবৎ করিয়া পরীক্ষা করিতে আসিতেছেন, তখন বাৎসল্য ও বন্ধুভাবের স্বভাব-নিবন্ধন সকলেই অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলকেই চিন্তাগ্রস্ত দেখিতে পাইয়া বলিলেন,—"আমি শ্রীগোপালের মস্তকে পদার্পণ করিতেছি। শ্রীগোপাল আমার পদাঙ্কিত-চিহ্নকে তিলক-চিহ্নরূপে ললাটে ধারণ

গোপালকো অভিরামাৎ ভিন্ন যৎ পশ্যতঃ
ভিন্নশিলা ভবত্যস্য প্রণামৈ। ॥ ॥
যৎ-প্রেমবন্ধনঃ স স্বামেমুক্তঃ
প্রোক্তঃ সাত্ত্বতগণাঃ প্রভু-গৌরচন্দ্রঃ।
তাদাত্ম্যরীত-বিবশেন সমুদ্ধবেন
যত্নে গুরুত্বমমহং তমিমং মহান্তম্ ॥৭॥
যস্যাঙ্ঘ্রপোঽপি ভবসাগরতারকর্ণধারাঃ
সাকীর্ত্তন-শ্রবণ-সংস্মরণাদিভক্তা।
আপাময়ঃ জনমিমং ন বয়ং ঘৃণাধ
গোপালপূর্ব্বগুরবেমমহং নতোঽস্মি ॥৮॥
চৈতন্যচন্দ্রকৃপয়া চিরমেব রাধা-
ভাবাদি পদ্মপুরুষঃ পরিপাল্যমানঃ।
চক্রাবতারবিদমর্চ্চি তত্ত্ব বুদ্ধোব
গোপালপূর্ব্বগুরবেমমহং নতোঽস্মি ॥৯॥

শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামিপ্রভুর শোচক

আরে মোর গোপালগুরু, ভকতিরসতরু,
অকালেতে কাল কবলিল।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব'লে, 'গোপাল' বলিতে ভোলে,
হেরি' শিশু-চরিত্র তাহার।
গৌরাঙ্গের সেবারঙ্গে, সদাই আনন্দে ভাসে,
গৌরা বিনু আর নাহি জানে আন।
কিসের বা বেদি ধ'রে, বৈষ্ণব বন্দিতে নারে,
গৌরা যেন গোপালের প্রাণ।
গোপাল-শিশুর প্রতি, শিক্ষা দিল এক রীতি,
প্রভু প্রেমাবেশে ঢুলি' ঢুলি'।
কহে সবে—'আরে আরে, আজি হৈতে গোপালেরে
ডাকিবা গোপাল গুরু বলি'।'
গোপালে ভকতি দেখি', সবার সকল আঁখি,
প্রেমের সমুদ্র উছলিল।
সবে করে অনুনয়, শ্রীগোপালগুরু-জয়,
প্রভু তত্ত্ব জগতে ব্যাপিল।
গোপালের গুরুভক্তি, করিতে বাহির শক্তি,
সদাই প্রসন্ন যাহে দেখি।
মহান্তের শির পরে, আহ্বি উপমা দিতে,
সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষ কলেবর।
দেখিল সকল ঠাঁই, এমন দয়ালু নাই,
কে-বা যা জগতে যশ ঘোষে।
সবে বৈল প্রেমাবেশে, হইল বঞ্চিত আজ,
বঞ্চয়ি নিজ-কৃপালোকে।

করিলে তাহার কোনরূপ চিন্তা নাই। শ্রীল অভিরাম ঠাকুর আসিয়া শ্রীগোপালগুরুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। শ্রীগোপালগুরু বিজয়ী হইলেন। তাই অদ্যাপি শ্রীগোপালগুরু গোস্বামি-প্রভুর অধস্তনগণ শ্রীহরিপদাকৃতি তিলক ধারণ করেন।

'শ্রীরাধাকান্ত-মঠে'র পণ্ডিতগণ বলেন,—শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত গহিতে বসিয়া আচার্য্যের কার্য্য করেন নাই। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে নৃত্য কীর্ত্তনাদিতেই অভিনিবিষ্ট থাকিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগোপালগুরুকে মাধী শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে শ্রীকাশীমিশ্রভবনের শ্রীশ্রীরাধাকান্তের সেবা ও আচার্য্যের আসন বা গদি প্রদান করেন। এজন্য অদ্যাপি শ্রীরাধাকান্ত-মঠের মাদলা-পঞ্জীতে শিষ্য পরম্পরা-ক্রমে মাধী শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে সেবা-সমর্পণ বা আচার্য্যাভিষেক-উৎসবের বিধান দৃষ্ট হয় এবং যথাবিধি তাহার অনুষ্ঠান হয়।

শ্রীপ্রতাপরুদ্রের পিতা শ্রীপুরুষোত্তমদেব বিজয়ী হইয়া কাঞ্চী হইতে শ্রীরাধাকান্তদেব, শ্রীসাক্ষীগোপাল, ভগবান্‌দেব, নৃসিংহদেব প্রভৃতি কতকমূর্ত্তি শ্রীবিগ্রহ ও ভগবৎ-সেবোপকরণ আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ইঁহাদিগকে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে ও তৎপারিপার্শ্বিক স্থানসমূহে সংরক্ষণ করেন। বর্ত্তমানে যে-স্থানে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পাদপীঠ বিরাজিত আছেন, তাঁহারই ঠিক বরাবর দক্ষিণ-দিকের শ্রীছত্রভোগ-মন্দিরের সংলগ্ন পশ্চিমোত্তর-কোণে একটি নাতি উচ্চ মন্দিরে কাঞ্চি হইতে আনীত শ্রীশ্রীরাধা-কান্তদেব অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সেই শ্রীবিগ্রহই শ্রীকাশী-মিশ্র শ্রীপ্রতাপরুদ্রের নিকট হইতে পূজার্থে যাচ্ঞা করিয়া লন। তদবধি শ্রীকাশীমিশ্র বালিসাহী-পল্লীর নির্জ্জনস্থানে শ্রীশ্রীরাধাকান্তের সেবা করিতেছিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব শ্রীকাশীমিশ্রভবনে থাকিয়া একটি ক্ষুদ্র মৃন্ময়-কুটীরে ('গম্ভীরা'-নামে খ্যাত) শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামরায়ের সহিত কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদন-লীলা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

উৎকলপ্রদেশে মন্দিরের মধ্যস্থলস্থ ক্ষুদ্র গৃহকে 'গম্ভীরা' বলা হয়। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'শ্রীঅমৃত-প্রবাহভাষ্যে' (চৈ চ ম ২।৭) 'গম্ভীরা'-শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—"আলিন্দার পর দালান, তা'র ভিতরের ক্ষুদ্র গৃহকে 'গম্ভীরা' বলে।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নিম্নলিখিত স্থানে গম্ভীরা-শব্দের প্রয়োগ আছে,—

"গম্ভীরা-ভিতরে রাত্রে নিদ্রা নাহি লব।
ভিত্তে মুখ-শির ঘষে, ক্ষত হয় সব॥" (চৈ চ ম ২।৭)

"গম্ভীরার দ্বারে করেন আপনে শয়ন।
গোবিন্দ আসিয়া করে পাদ-সম্বাহন॥"
(ঐ অন্ত্য ১০।৮২)

"এই মত অর্দ্ধরাত্রি কৈলা নিবাপণ।
ভিতর-প্রকোষ্ঠে প্রভুরে করাইলা শয়ন॥
রামানন্দ রায় তবে গেলা নিজ-ঘরে।
স্বরূপ-গোবিন্দ চাহে শুইলেন দ্বারে॥"
(ঐ অন্ত্য ১৪।৭১-৭৮)

"গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ করিলা শয়ন।
অর্দ্ধরাত্রিতে প্রভু করেন উচ্চসঙ্কীর্ত্তন॥" (ঐ ১৭।১)

"এইমত প্রলাপিতে অর্দ্ধরাত্রি গেল।
গম্ভীরাতে স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুরে শোয়াইল॥
প্রভুরে শোয়াঞা রামানন্দ গেলা ঘরে।
স্বরূপ, গোবিন্দ শুইলা গম্ভীরার দ্বারে॥"
(ঐ ১৯।৫৫-৫৬)

"বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগে উঠিলা।
গম্ভীরা-ভিতরে মুখ ঘষিতে লাগিলা॥" (ঐ ১৯।৫৮)

এই সকল উক্তি হইতে জানা যায়—গম্ভীরা শ্রীকাশী-মিশ্রের ভবনস্থ কোন অন্তঃপ্রকোষ্ঠ, যাহা শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের ভজনাগার বা বিশ্রামাগাররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। শ্রীকাশীমিশ্রের ভবনে তিনটি দ্বার ছিল। সেই তিনটি দ্বার উদ্ঘাটন না করিয়া এবং তিনটি উচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু মহাভাবাবেশে মিশ্রভবন হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর একটি শ্লোক হইতে জানা যায়,—

"তিন দ্বারে কপাট ঐছে আছে ত' লাগিয়া।
ভাবাবেশে প্রভু গেলা বাহির হঞা॥
এথা গোবিন্দ প্রভুর শব্দ না পাঞা।
স্বরূপেরে জাগাইলা কপাট খুলিয়া॥"
(চৈ চ অ ১৭।১১, ১৩)

"অন্তর্দ্বাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো।
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিক-স্বরভিমধো নিপতিতঃ।

তনূরুসঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাদ্-
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥"
(শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব-কল্পতরুঃ, ৫ম্ শ্লোকঃ)

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "গৃহসহিত আত্মা তাঁরে কৈল নিবেদন"—এই উক্তি-অনুসারে শ্রীকাশীমিশ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিলেন, জানা যায়। শ্রীকাশীমিশ্র নিঃসন্তান ছিলেন। সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীরাধাকান্তের সেই সেবা ও তৎসংলগ্ন উদ্যানাদি (যাহার অন্তর্গত শ্রীসিদ্ধবকুল বা শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের ভজনস্থান) শ্রীগোপালগুরুকে শ্রীরাধাকান্তের সেবার্থ গ্রহণ করিয়া আচার-প্রচার করিতে আজ্ঞা দিলেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীগোপালগুরুর সম্বন্ধে 'জৈবধর্ম্মে' এইরূপ লিখিয়াছেন,—"শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীকাশীমিশ্রের ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গদিতে আজকাল শ্রীবক্রেশ্বরের শিষ্য শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী বিরাজমান। . . শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর শিক্ষা সম্প্রতি তাঁহারই কণ্ঠে আছে।" (জৈবধর্ম্ম, ২৯শ অধ্যায়)। শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভু দুইভাগে রসোপাসনার কড়চা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর কণ্ঠে যথাক্রমে রসোপাসনার অন্তঃপন্থা ও বহিঃপন্থা সংরক্ষণ করেন; তাহা হইতে একদিকে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' ও 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত' প্রকট করেন; অন্যদিকে শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামিপ্রভু 'স্মরণ-ক্রমপদ্ধতি' বা 'সেবা-স্মরণ-পদ্ধতি' নিষ্কপটস্পর্দ্ধায় প্রকাশ করেন। শ্রীশ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামিপ্রভুর রসোপাসনার এক ধারা যেরূপ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু হইতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুতে প্রবাহিত, তদ্রূপ শ্রীল স্বরূপ গোস্বামিপ্রভুর রসোপাসনার অন্য ধারাও শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু হইতে শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামিপ্রভুতে সঞ্চারিত হইয়াছে। এইজন্যই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ একাধিকবার তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থ 'জৈবধর্ম্মে' লিখিয়াছেন,—"শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামি-প্রভু শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীনিত্যানন্দ-বংশপ্রদীপে প্রধান গুরু এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্থানে শ্রীস্বরূপ-গোস্বামীর গদিতে জগদ্-গুরুরূপে বিরাজমান।" (ঐ, ২৬শ অধ্যায়)।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ পণ্ডিতের পাঁচটী শাখার মধ্যে শ্রীগোপাল-গুরু শ্রীমিশ্র, শ্রীগোপালগুরুর শিষ্য—শ্রীধ্যানচন্দ্র। শ্রীগোপালগুরু 'স্মরণ-ক্রমপদ্ধতি' বা 'সেবাস্মরণ-পদ্ধতি' এবং তাঁহার শিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র 'শ্রীধ্যানচন্দ্র-পদ্ধতি' গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন। 'শ্রীরাধাকান্ত-মঠে' শ্রীধ্যানচন্দ্র-পদ্ধতির একটি হস্ত-লিখিত পুঁথি আছে। কিন্তু ইহা লিপিকর প্রমাদে পরিপূর্ণ। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, শ্রীগোপালগুরু বা শ্রীধ্যানচন্দ্রের শ্রীহস্ত-লিখিত ঐ পুঁথিরও তথায় নাই।

শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর সময় হইতেই শ্রীকাশীমিশ্রের ভবন শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেব-শ্রীবিগ্রহের নামানুসারে 'শ্রীরাধা-কান্ত-মঠ'-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। শ্রীকাশীমিশ্রের সময় কেবল শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ ছিলেন। শ্রীগোপালগুরু শ্রীরাধাকান্তের বামভাগে শ্রীরাধা ও দক্ষিণে শ্রীললিতাদেবীকে স্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীরাধাকান্তের বামে নৃত্যপরায়ণ শ্রীগৌরাঙ্গ ও দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীবিগ্রহ (দারুময় শ্রীমূর্ত্তি) স্থাপন করেন। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর একটি তৈলচিত্র বা আলেখ্যও পূর্ব্ব হইতেই পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

'শ্রীরাধাকান্ত-মঠে'র সেবকগণ বলেন,—শ্রীমন্মহাপ্রভু যে-স্থানে ভজন-লীলা প্রকট করিয়াছেন বা যাহা 'গম্ভীরা'-নামে পরিচিত, তাহা শ্রীশ্রীগোপালগুরু ও তদ্শিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্রের সময় শ্রীক্ষেত্রবাসী-নির্ম্মিত একটী ক্ষুদ্র কুটীররূপে প্রকাশিত ছিল। তন্মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদুকা ও পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দ গোস্বামিপ্রভুর রচিত পেঁকয়া-ওয়াড়-দ্বারা নির্ম্মিত কন্থা (শ্রীরাধাকান্তমঠের বর্ত্তমান কোন কোন সেবক বলেন—শ্রীস্বরূপ গোস্বামিপ্রভুর দ্বারা কলার পেটো চিরিয়া চিরিয়া প্রভুর বহির্ব্বাসের মধ্যে যে শয্যা নির্ম্মিত বা কন্থা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা) শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর সময় হইতে শিষ্যপারম্পর্য্যে 'শ্রীরাধাকান্ত-মঠে' পূজিত ও সযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কন্থাটি পূর্ব্বে দীর্ঘ ছিল, কিন্তু বহু ব্যক্তি উহা হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিতে থাকায় বর্ত্তমানে উহা খুব অল্প পরিসর হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্যবহৃত শ্রীব্রজ-রজের নির্ম্মিত একটি কমণ্ডলু আছে। অন্য আর একটি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত কমণ্ডলুও তথায় রক্ষিত আছে। তাহা পরবর্ত্তিকালে স্থাপিত বলিয়া মঠের অধিকারিগণ বলিলেন।

শ্রীগোপালগুরু গোস্বামিপ্রভুর অপ্রকট-লীলা-অধিকারের

পর সমুদ্রোপকূলে শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের সমাধির সংলগ্ন দক্ষিণে পূর্ব্বাভিমুখে যে একটি মন্দির রহিয়াছে, তথায় শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামিপ্রভুর সমাধি দেওয়া হয়। 'শ্রীশ্রীরাধাকান্ত-মঠে'র বিধানানুসারে ভাবগৃহ মহান্তগণেরও কেহ লাভ করিবার পরক্ষণেই স্থানেই অস্থি-সমাধি দেওয়া হয়।

শ্রীগোপালগুরুর অপ্রকট লীলাকালে যে-সকল গৌড়ীয়-বৈষ্ণব শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীযমুনার তীরে বংশীবটের নিকটে 'নাগর-গাছে'র তলদেশে ভজন-নিমগ্ন শ্রীগোপালগুরুকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হন। তাঁহারা যখন শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীধ্যানচন্দ্রকে এই কথা জানাইলেন, তখন শ্রীগুরুপাদপদ্ম-বিরহকাতর শ্রীধ্যানচন্দ্র ইহা শুনিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের পুনঃ সাক্ষাৎকার-লাভের ইচ্ছায় শ্রীবৃন্দাবনগমনার্থ ব্যাকুল হইলেন।

এদিকে শ্রীগোপালগুরুর গদীতে শ্রীধ্যানচন্দ্র উপবিষ্ট হওয়ার পর পুরীর তদানীন্তন রাজা 'ঐ স্থান রাজপুরোহিত কাশীমিশ্রের অধিকারে ছিল এবং কাশীমিশ্র নিঃসন্তান থাকিয়াই গোলোকগত হন, সুতরাং যখন শ্রীকাশীমিশ্র কোনপ্রকার অর্পণনামা দ্বারা শ্রীগোপালগুরুকে তাহা সমর্পণ করেন নাই, তখন তাহা রাজসম্পত্তিরূপেই গণিত হইবে'— ইহা বলিয়া রাজা শ্রীরাধাকান্তমঠকে স্বীয় কবলে আনিবার চেষ্টা করেন। ইতঃপূর্ব্বে মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীগোপালগুরু গোস্বামি-প্রভুকে শ্রীরাধাকান্তের সেবার্থ ভূসম্পত্তি-গ্রহণের জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীগোপালগুরু কোনরূপ বিষয়-সম্পত্তি গ্রহণ করেন নাই। তিনি ভিক্ষার দ্বারা সেবা নির্ব্বাহ করিতেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্রের অবসরে উৎকলরাজ শ্রীধ্যানচন্দ্রকে পীড়ন ও 'শ্রীরাধাকান্ত মঠ' হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যে বহু পাত্রমিত্র লইয়া শ্রীরাধাকান্তের মন্দির-দ্বার আটক করিলেন এবং শ্রীধ্যানচন্দ্রকে তাঁহার লোকজন-সহ অবিলম্বে অন্যত্র গমনের আদেশ জারি করিলেন।

একদিকে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহ-দুঃখে কাতর, আর একদিকে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈত ও শ্রীশ্রীরাধাকান্তের সেবা হইতে বিচ্যুত হইবার আশঙ্কায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া শ্রীধ্যানচন্দ্র যখন কাল-যাপন করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীব্রজধাম হইতে আগত বৈষ্ণবমুখে শ্রীবংশীবটের নিকটে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অবস্থান-লীলার কথা শ্রবণ করিতে পাইয়া শ্রীধ্যানচন্দ্র অতিশয় উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সত্যসত্যই শ্রীবংশী-বটের নিকটে একটি বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া শ্রীশ্রীগোপালগুরু ভজনাবিষ্ট ছিলেন। শ্রীধ্যানচন্দ্র শ্রীগুরু-পাদপদ্মের পুনঃ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া যেন পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে সকল কথা নিবেদন করিলেন এবং শ্রীগুরুদেবকে শ্রীক্ষেত্রে বিজয় করিবার জন্য সকাতর প্রার্থনা জানাইলেন, কিন্তু শ্রীগোপালগুরু কিছুতেই শ্রীব্রজধাম পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। তবে প্রিয় শিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্রকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন,— "শ্রীরাধাকান্তমঠের টোটায় (বাগানে) যে একটি নিম্ববৃক্ষ আছে, সেই নিম্ববৃক্ষে আমার অবস্থান হইবে। তুমি তদ্দ্বারা আমার একটি দারুময়ী শ্রীমূর্ত্তির প্রকট করিয়া আমার নিত্য পূজা করিলে আমার বিরহ-ব্যথা হইতে রক্ষা পাইবে; আর আমি তথায় আবির্ভূত হইয়া রাজাকে সব বলিয়া দিব; তিনি সব ছাড়িয়া দিবেন।"

শ্রীধ্যানচন্দ্র শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আজ্ঞানুসারে স্বীয় প্রভুর একটি দারুময়ী শ্রীমূর্ত্তি প্রকট ও প্রতিষ্ঠা করিলেন। শ্রীশ্রীগোপালগুরুর সেই শ্রীমূর্ত্তি অদ্যাবধি শ্রীরাধাকান্তমঠের শ্রীমন্দিরের জগমোহনে শ্রীগর্ভমন্দিরের দ্বারের পার্শ্বে পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া বিরাজ করিতেছেন। পূজা ও ভোগনিবেদনকালে সেই শ্রীমূর্ত্তি গর্ভমন্দিরে একটি পৃথক্ আসনে সংস্থাপন করিয়া 'শ্রীধ্যানচন্দ্র-পদ্ধতি'র বিধানানুসারে নিত্য পূজা করা হয়। শ্রীবৃন্দাবনে বংশীবটের নিকটে যেস্থানে শ্রীশ্রীগোপালগুরু আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তথায়ও শ্রীগোপালগুরুর দারুময়ী শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীশ্রীরাধাকান্তের সেবা শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামীই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীধ্যানচন্দ্র 'শ্রীরাধাকান্ত-মঠে'র এই দুইটি সেবাই প্রকট করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোনপ্রকার রাজ-সাহায্য অর্থাৎ রাজপ্রদত্ত ভূসম্পত্তি প্রভৃতি গ্রহণ করেন নাই। শ্রীরাধাকান্তমঠের সেবকগণ বলেন,—শ্রীগোপালগুরু ও শ্রীধ্যানচন্দ্র যদি কোন রাজসাহায্য, ভূসম্পত্তি প্রভৃতি গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে পুরীতে শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের মঠ এত সমৃদ্ধ হইত না। কারণ, শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীমন্

মহাপ্রভুর ভক্তগণকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেবা করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যাকুল ছিলেন। বলা বাহুল্য যে, শ্রীধ্যানচন্দ্রের সমসাময়িক পুরীরাজের চিত্তবৃত্তি শ্রীগোপালগুরুর কৃপায় পরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং তিনি 'শ্রীরাধাকান্ত-মঠ' হস্তগত করিবার দুর্বুদ্ধি-পোষণের পরিবর্ত্তে শ্রীরাধাকান্তের সেবার্থ ভূসম্পত্তি-দানের ইচ্ছায় শ্রীধ্যানচন্দ্রের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীধ্যানচন্দ্র তাহা গ্রহণ করেন নাই। মহান্ত শ্রীগোবিন্দশরণজীর সময় হইতে ভূসম্পত্তি গৃহীত হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। বিভিন্ন মহান্ত বিভিন্ন মঠ স্থাপন করিয়া শ্রীরাধাকান্তমঠের শাখামঠসমূহের বিস্তার করিয়াছেন।

শ্রীগোপালগুরুর সময় হইতে পুরীর প্রত্যেক রাজাই প্রত্যেক মহান্তকে সনন্দ দিয়াছেন। সেই-সকল সনন্দ হইতে শ্রীরাধাকান্তমঠের মহান্তগণ শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে চামরসেবা, পুষ্পাঞ্জলি, চন্দনযাত্রার সময় শ্রীমদনমোহনের নৌকার মধ্যে চামর-ব্যজন, রথের উপরে উঠিয়া শ্রীবিগ্রহগণের সম্মুখে চামর ব্যজন, শ্রীজগন্নাথদেবের পাকশালার চুল্লী হইতে অগ্নি আনয়ন করিয়া তদ্দ্বারা স্বধামগত মহান্তগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াসম্পাদন এবং এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রকার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্রের পর হইতে পুরীর প্রত্যেক রাজাই শ্রীরাধাকান্তমঠের প্রত্যেক মহান্তকে 'মহান্ত'-পদবীতে ভূষিত করিয়া আসিতেছেন। কথিত হয় যে, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় মঠের অধ্যক্ষগণ কেবল 'অধিকারী' নামে পরিচিত হইতে পারেন, কিন্তু পুরীর রাজার রাজবিধি-অনুসারে একমাত্র 'শ্রীরাধাকান্ত-মঠে'র ষষ্ঠাধীশই 'মহান্ত' পদবী লাভ করেন।

কার্ত্তিকমাসে শ্রীজগন্নাথের বাল্যভূপের সময় শ্রীগরুড়-স্তম্ভের সম্মুখে 'শ্রীরাধাকান্ত-মঠে'র সংকীর্ত্তন হয়; এজন্যও রাজ-সনন্দ আছে। কার্ত্তিকমাসে শ্রীলক্ষ্মীমন্দিরে লীলাগান, শ্রীচন্দনযাত্রার সময় শ্রীমদনমোহনের সম্মুখে কীর্ত্তন এবং রথযাত্রার সময় শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে সকলের অগ্রণী হইয়া সংকীর্ত্তন করিবার সনন্দ 'শ্রীরাধাকান্ত-মঠে'র মহান্তগণকে পূর্ব্ব হইতেই পুরীরাজ প্রদান করিয়াছেন।

অবিবাহিত ত্যাগী ব্রাহ্মণবটু যিনি পূর্ব্ব মহান্ত-কর্ত্তৃক শিষ্যরূপে গৃহীত হন, সেরূপ কোন ব্যক্তি পূর্ব্ব মহান্তের অনুমোদনানুসারে মহান্ত-পদ ও গদি প্রাপ্ত হন। মহান্তগণ ভেক গ্রহণ করিয়া গুরুদত্ত বেশ কৌপীন-বহির্ব্বাসাদি ধারণ করেন; তবে সেবাঘরোপে ও ব্যবহারাঘরোপে কাছা-কোঁচা দিয়াও কাপড় পরিধান করেন। ইঁহারা বলেন,—শ্রীভগবানের অর্চ্চনকালে বা শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের কোন সেবাকালে ত্রিকচ্ছযুক্ত বেশ ধারণ না করিলে সেবা করা যায় না। এজন্য মহান্ত ও পূজারীকে কৌপীন পাকা-সত্ত্বেও ত্রিকচ্ছ-বেশ ধারণ করিতে হয়। শ্রীজগন্নাথদেবের পাণ্ডাগণও ত্রিকচ্ছ-বেশ গ্রহণ করিয়া শ্রীজগন্নাথের সেবা করেন। তবে পাণ্ডাগণ সকলেই গৃহস্থ; কিন্তু 'শ্রীরাধা-কান্ত-মঠে'র সেবকগণ ব্রহ্মচর্য্য হইলেও এবং ডোর-কৌপীন-বহির্ব্বাস লইয়া ভেক গ্রহণ করিলেও অর্চ্চনের সময় ত্রিকচ্ছ-বেশ গ্রহণ করেন—ইহাই তাঁহাদের নীতি। মহান্ত মহারাজ যখন পুরীর রাজার সহিত সাক্ষাতাদি করিতে যান, তখনও ত্রিকচ্ছ-বেশই ধারণ করেন। এতদ্ব্যতীত ভেকগ্রহণকারী অন্যান্য সকলেই সকল সময়েই ডোর-কৌপীন ও বহির্ব্বাস ধারণ করেন।

'শ্রীরাধাকান্ত-মঠে' উৎকল-অক্ষরে তালপত্রের হস্তলিখিত প্রায় তিনশত পুঁথি রক্ষিত আছে; কিন্তু অধিকাংশই জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্ব্যতীত মুদ্রিত গ্রন্থের একটি গ্রন্থাগার আছে। বর্ত্তমান মহান্ত মহারাজ শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরদাসজী সংস্কৃতশাস্ত্রে, বিশেষতঃ বেদান্ত-দর্শনে বুৎপন্ন। ইনি শ্রীকাশীতে ও শ্রীনবদ্বীপে অধ্যয়ন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সঙ্গীত-বাদ্যাদি কলাবিদ্যারও পারদর্শী ও বিশেষ বিদ্যোৎসাহী। তাঁহার প্রচেষ্টায় পুরীর শ্রীরাধাকান্তমঠে, শ্রীনবদ্বীপে ও শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধাকান্তমঠে 'শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ' ও শ্রীবৈষ্ণবদর্শনের ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত পারলাকেমিডি, টিকিলি পুরুষোত্তমপুর প্রভৃতি স্থানেও ছাত্রগণ ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্যাদি 'শ্রীরাধাকান্ত-মঠে'র অর্থ-সাহায্যে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।

স্বর্গদ্বারে শ্রীশ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের সমাধির সংলগ্ন শ্রীশ্রীগোপালগুরু ও শ্রীশ্রীধ্যানচন্দ্রের যে সমাধিপীঠ আছে, তথায় প্রভুদ্বয়ের ব্যবহৃত পাদুকা সংরক্ষিত হইয়া নিত্য পূজিত হইতেছেন।

শ্রীরাধাকান্তমঠের মহান্তগণের শিষ্যপরম্পরা

শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী, শ্রীধ্যানচন্দ্র মহান্ত গোস্বামী, শ্রীবলভদ্রদাস গোস্বামী, শ্রীদয়ানিধিদাস গোস্বামী, শ্রী-

গোপালদাস গোস্বামী, শ্রীগোবিন্দবল্লভদাস গোস্বামী, শ্রীরামকৃষ্ণদাস গোস্বামী, শ্রীহরেকৃষ্ণদাস গোস্বামী, শ্রীরাধাকৃষ্ণদাস গোস্বামী, শ্রীরাধাচরণদাস গোস্বামী শ্রীহরেকৃষ্ণদাস গোস্বামী, শ্রীগোবিন্দচরণদাস গোস্বামী, শ্রীবলভদ্রদাস গোস্বামী, শ্রীরাধাকৃষ্ণদাস গোস্বামী, শ্রীবিশ্বম্ভরদাস গোস্বামী।

শ্রীহরিমণ্ডল হইতে সংগৃহীত ও শ্রীআদিকদাস রচিত 'গুরুপ্রণালী'-গ্রন্থের একটি হস্তলিখিত পুঁথিতে শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর নিম্নলিখিত একটি শিষ্য-পারম্পর্যের তালিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি,—

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীহরেকৃষ্ণ পণ্ডিত, শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী, শ্রীধ্যানচন্দ্র মহান্ত গোস্বামী, শ্রীবলভদ্র মহান্ত গোস্বামী, শ্রীবনমালিদাস গোস্বামী, শ্রীপ্রভাকরদাস গোস্বামী, শ্রীসহায়কদাস গোস্বামী, শ্রীকল্পতরুদাস গোস্বামী, শ্রীপরমানন্দদাস গোস্বামী, শ্রীদীনবন্ধুদাস গোস্বামী, শ্রীআদিকদাস।

উক্ত 'গুরুপ্রণালী'-গ্রন্থে শ্রীগোপালগুরু গোস্বামিপ্রভু 'শ্রীমধুমেধা-সখী'-রূপে উক্ত হইয়াছেন। যথা,—

"শ্রীহরেকৃষ্ণ সখ্যাখ্যো হেমরূপ-স্বভাবতঃ।
সিদ্ধাখ্যা তত্র কথিতা **মধুবিদ্যাভিধা** দুধঃ॥
কৃষ্ণপ্রেমসখীমধ্যে মান্যা ত্বমেতি বিশ্রুতা।
পণ্ডিতো ভক্তিযোগেন নিত্যং হরেকৃষ্ণঃ ভজেৎ॥
অতঃ **অষ্টসখ্যো মধুমেধাদয়ঃ** প্রসিদ্ধাঃ।"

তথা—

"মধুমেধা, সুমধুরা, সুধরা, মধুরেক্ষণা।
তনুমধ্যা, মধুস্মৃতা, ঘনচূড়া, বরাঙ্গনা॥
অগ্রগোপী শ্রীগোপালগুরুরেব মহোত্তমঃ।
চৈতন্যকৃপয়া তস্যাঃ সিদ্ধাখ্যা **মধুমেধিকা**॥"

শ্রীরাধাকান্তমঠের শাখামঠসমূহ

পুরীর 'শ্রীরাধাকান্ত-মঠ'ই আদি ও মূলমঠ। ইহা শ্রীগোপালগুরু গোস্বামিপ্রভুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তৎপরে শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে বংশীবটের নিকটে শ্রীরাধাকান্ত-মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পরের মহান্তগণ ক্রমশঃ বিভিন্নস্থানে 'শ্রীরাধাকান্ত-মঠে'র প্রায় ৫০টি শাখামঠ বিস্তার করেন। প্রত্যেক স্থানেই শ্রীরাধাকান্তের সেবা আছে। নিম্নে কএকটি শাখামঠের তালিকা প্রদত্ত হইতেছে,—

শ্রীবৃন্দাবন-শ্রীনিধুবনে শ্রীগৌরগোপাল মঠ। এই মঠে বড়ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গ 'শ্রীগৌরগোপাল'-নামে খ্যাত এবং শ্রীরাধাকান্ত-শ্রীবিগ্রহও আছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীবৃন্দাবনে কাম্যবনে মহাপ্রভুর মঠ নামে পঞ্চতত্ত্বের একটি সেবা পূর্ব্বে শ্রীরাধাকান্তমঠেরই পরিচালনাধীনে ছিল; কিন্তু সেই মঠ এখন স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীরাধাকুণ্ডেও শ্রীরাধাকান্তমঠের একটি শাখামঠ আছে। তাহার নাম শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের বর্ণনানুসারে 'শ্রীঅকথানন্দ-কুঞ্জ'। শ্রীহরেকৃষ্ণ পণ্ডিত শ্রীতুঙ্গবিদ্যা বলিয়া পরিচিত। উক্ত কুঞ্জে শ্রীহরেকৃষ্ণ পণ্ডিতের একটি দারুময়ী শ্রীমূর্ত্তি আছেন। 'বাবটে' শ্রীকিশোরীকুণ্ডের উপর শ্রীরাধাকান্ত মঠের একটি সেবা আছে। কিন্তু মূলমঠ হইতে তাহারা বিশেষ কিছু সাহায্য না পাওয়ায় ক্রমে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীগোলঘাটে 'বড়-আখড়া'র নিকট 'গম্ভীরার মঠ' নামে পরিচিত শাখামঠে শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীশ্রীরাধাকান্তের সেবা আছে। এই মঠ শ্রীরাধাকৃষ্ণদাস মহান্তজীর সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুরীতেও অনেকগুলি শাখামঠ আছে। পুরীর শ্রীরাধাকান্ত-মঠের সন্নিকটে 'শ্রীগিরিধারী-মঠ'—শ্রীরাধাকান্তমঠের আশ্রিতা সুরতপুরার রাণী শ্রীরাধাকৃষ্ণদাস মহান্তজীর সময় এই মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বালুসাহীতে 'বড়তরফ' ও 'সানতরফ'-মঠে শ্রীরাধাকান্ত-শ্রীবিগ্রহের সেবা আছেন। এতদ্ব্যতীত পুরীজেলার কাকটপুরে, গঞ্জামের পুরুষোত্তমপুরে, ভিজাগাপট্টমের টিকিলিতে, পারলাকেমিডিতে শাখামঠসমূহ আছে। আলালনাথে ও বেণ্টপুরেও শ্রীরাধাকান্তমঠের শাখামঠ আছে। বেণ্টপুরে শ্রীমাধবীদেবীর শ্রীগোপীনাথের সেবা বলিয়া যাহা খ্যাত, তাহা শ্রীশ্রীরাধাকান্তমঠের পরিচালনাধীনে অনুষ্ঠিত হইতেছে। পারলাকেমিডিতে দুইটি মঠ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে আরও কএকটি মঠ আছে। পারলাকেমিডি ও টিকিলির রাজা শ্রীরাধাকান্তমঠের শিষ্য।

'শ্রীরাধাকান্ত-মঠে'র সেবকগণ বলেন, পুরীর 'শ্রীসিদ্ধবকুলমঠ' পূর্ব্বে শ্রীরাধাকান্তমঠেরই অন্তর্গত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ মহান্তজীর সময় (শ্রীগোপালগুরু হইতে সপ্তম) হইতে সেই মঠ স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। শ্রীরামকৃষ্ণদাস মহান্তজীর দুই শিষ্য ছিলেন। শ্রীহরেকৃষ্ণদাস শ্রীরামকৃষ্ণদাসের জ্যেষ্ঠ শিষ্য। তিনি শ্রীরাধাকান্তমঠের মহান্ত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার কনিষ্ঠ শিষ্যকে শ্রীসিদ্ধবকুল-মঠটি প্রদান করিলেন। কিন্তু শ্রীসিদ্ধবকুল-মঠের মহান্ত হইতে অন্যরূপ বিবরণ ও গুরুপরম্পরা পাওয়া যায়।

শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর তিরোভাবতিথিতে শ্রীরাধাকান্তমঠের মহান্তগণ পূর্ব্বোক্ত গুরুগোস্বামিদ্বয়ের প্রতিনিধি-স্বরূপ গম্ভীরার পীঠে আসীন হন। তখন নাবতীয় শাখামঠের অধিকারিগণ ও শিষ্যগণ শ্রীরাধাকান্তমঠের মহান্তমহারাজকে ভেট ও প্রণামী দেন।

পুরী, কটক, গঞ্জাম, বিশাখাপত্তন প্রভৃতি স্থানে 'শ্রীরাধাকান্ত-মঠে'র জমিদারী আছে। জমিদারীর বার্ষিক আয় প্রায় পঞ্চাশী হইতে নব্বই হাজার টাকা। 'শ্রীজগন্নাথ-মঠে'র আয়ও প্রায় আশী হাজার টাকা।

১২। শ্রীসিদ্ধবকুল-মঠ

গৌড়দেশ হইতে শ্রীগৌরপার্ষদগণ শ্রীশ্রীগৌরপদামৃত-সমুদ্রে মিলিত হইবার জন্য শ্রীকাশীমিশ্র-ভবনে উপনীত হইলেন। স্বয়ং-পরিবর কাশীমিশ্রের ভবন ভক্তরঙ্গিণীর বন্যায় উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলকে নিজ-সমীপে বসাইয়া স্বহস্তে শ্রীজগন্নাথদেবের মালা-পঙ্কাদি-প্রসাদ বিতরণ করিলেন। সকলকেই সম্মান করিয়া মহাপ্রভু উল্লসিত হইলেন; কিন্তু ঠাকুর শ্রীহরিদাসকে না দেখিয়া তাঁহার আগমন-সম্বন্ধে প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন। দৈন্য-বিগ্রহ শ্রীহরিদাস সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া রাজপথ-প্রান্তে পতিত ছিলেন। ভক্তগণ অবিলম্বে শ্রীহরিদাসের নিকট প্রভুর আজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন। তখন—

হরিদাস কহে,—"আমি নীচ জাতি ছার।
মন্দির-নিকটে যাইতে মোর নাহি অধিকার॥
নিভৃতে টোটা-মধ্যে স্থান যদি পাঙ।
তাঁহা পড়ি' রহোঁ, একলে কাল গোঙাঙ॥
জগন্নাথ-সেবকের মোর স্পর্শ নাহি হয়।
তাঁহা পড়ি' রহোঁ,—মোর এই যোগ্য হয়॥"

(চৈ চ ম ১১।১৬৪-১৬৭)

ভক্তগণ এই কথা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জ্ঞাপন করিলে প্রভু বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং প্রভু কাশীমিশ্রের সমীপে নিজের ভজনস্থানের নিকটে পুষ্পোদ্যানে একটী নিভৃত গৃহ যাচ্ঞা করিলেন,—

"আমার নিকটে এই পুষ্পের উদ্যানে।
একখানি ঘর আছে পরম-নির্জ্জনে॥
সেই ঘর আমাকে দেহ', আছে প্রয়োজন।
নিভৃতে বসিয়া তাঁহা করিব স্মরণ॥"

(চৈ চ ম ১১।১৭৪-১৭৬)

শ্রীকাশীমিশ্রের সর্ব্বস্বই শ্রীগৌরসুন্দর কৃপা-পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আজীবন ভৃত্যরূপে অঙ্গীকার করুন,—এরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংই শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের নিকট গমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং পরস্পর পরস্পরের গুণ-বর্ণনে প্রেমবিহ্বল হইলেন। শ্রীহরিদাস বলিলেন,—"প্রভো, আমাকে স্পর্শ করিও না, আমি অত্যন্ত নীচ, অস্পৃশ্য ও পরম-পামর।" তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

"• • তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর' তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর' তুমি যজ্ঞ-তপো-দান॥
নিরন্তর কর' তুমি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ-জ্ঞাসী হৈতে তুমি পরম-পাবন॥"

• • • •

"এত বলি' তাঁরে লঞা গেলা পুষ্পোদ্যানে।
অতি নিভৃতে তাঁরে দিলা বাসা-স্থানে॥
'এই স্থানে রহি' কর' নাম-সংকীর্ত্তন।
প্রতিদিন আসি' আমি করিব মিলন॥
মন্দিরের চক্র দেখি' করিহ প্রণাম।
এই ঠাঞি তোমার আসিবে প্রসাদান্ন'॥"

(চৈ চ ম ১১।১৮৯-১৯১, ১৯৩-১৯৫)

এখনও এই স্থান হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের নীলচক্র দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমানে চতুর্দ্দিকেই অনেক বাড়ী-ঘর ও উচ্চ প্রাচীরাদি হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে সিদ্ধবকুলে যে-কোন স্থানে উপবেশন করিয়া নীলচক্রের দর্শন পাওয়া যাইত। এই পুষ্পোদ্যানই বর্ত্তমানে 'সিদ্ধবকুল'-নামে পরিচিত। পূর্ব্বে ইহা 'মুক্তা-মঠ'-নামে পরিচিত ছিল।

সিদ্ধ-বকুলের বিষয়ে এইরূপ এক কিংবদন্তী আছে,—প্রাতে শ্রীজগন্নাথদেবের অবকাশ-(দন্তধাবন ও স্নানাদি) কালে তিনটি দন্তকাষ্ঠ শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রার জন্য প্রদত্ত হয়। এই দন্তকাষ্ঠ পূর্ব্বদিন হইতেই সংগৃহীত থাকে। ইহা 'কুয়াটিয়া'-বৃক্ষ হইতে সংগৃহীত

হয়। একদিন সেই কুণ্ডাটিয়া-দন্তকাষ্ঠের তিনটি কাঠির মধ্যে একটি কাঠি দৈবক্রমে হারাইয়া যায়। তখন অবকাশ-কাল উপস্থিত হওয়ায় বকুল-বৃক্ষের একটি দন্তকাষ্ঠ কোনভাবে (ভ্রমবশতঃই হউক, অথবা জ্ঞাতসারেই হউক) আর দুইটি দন্তকাষ্ঠের সহিত সেবকগণ প্রদান করেন। প্রভুর দন্ত-মার্জন-সেবার পর সেই কাষ্ঠ সাধারণতঃ পাণ্ডাগণ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রসাদরূপে প্রদান করেন। সেইদিন পাণ্ডাগণ শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদী বকুল-দন্তকাষ্ঠটি শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রদান করেন। শ্রীমহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদী দন্ত-কাষ্ঠটি প্রাপ্ত হইয়া প্রেমাবিষ্ট হন এবং শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের ভজন-স্থানে আসিয়া সেইটি রোপণ করিয়া দেন। তাহা ক্রমে ক্রমে একটি ছায়াদানকারী বৃক্ষরূপে পরিণত হয়। কথিত হয় যে, সেই বৃক্ষের নিম্নে বসিয়া শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ভজন করিয়াছিলেন। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণের পর তাঁহার অন্যতম 'সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথদাস' গোস্বামি-মহাশয়ের সময় পুরীর রাজকর্ম্মচারিগণ রথের চক্র-নির্ম্মাণের জন্য ঐ বকুল-গাছটী কাটিতে আসেন। শ্রীজগন্নাথ-দাস ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর রোপিত ও ঠাকুর শ্রীল হরিদাসের ভজন-স্থানের অন্তর্গত পূজনীয় বৃক্ষ জানিয়া রাজকর্ম্মচারি-গণের নিকট আপত্তি করেন; কিন্তু নিষ্কিঞ্চনের কোন কথা রাজকর্ম্মচারিগণ শুনিতে প্রস্তুত না হওয়ায় ইহা শ্রীজগন্নাথদেবেরই ইচ্ছা জানিয়া তিনি নীরব থাকেন। যে-দিন সেই বৃক্ষটি ছেদন করা হইবে বলিয়া রাজকর্ম্মচারি-গণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া গেলেন, তাহারই পূর্ব্বরাত্রে গাছটি অকস্মাৎ অন্তঃসারশূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হন। রাজকর্ম্মচারিগণ পরদিন ওথায় আসিয়া বৃক্ষের ঐরূপ অবস্থা-দর্শনে আশ্চর্য্যা-ন্বিত হন এবং ইহা রাজাকে জ্ঞাপন করেন। সেই সময় হইতে লোকে ইহাকে 'সিদ্ধবকুল'-আখ্যা প্রদান করেন।

কথিত হয় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈত্র-সংক্রান্তি বা মহা-বিষুব-সংক্রান্তিতে উক্ত দন্তকাষ্ঠটি রোপণ করিয়াছিলেন; এইজন্য অদ্যাপি 'শ্রীসিদ্ধবকুল-মঠে' চৈত্রসংক্রান্তি-দিবস 'দন্ত-কাষ্ঠ-রোপণ-মহোৎসব'-নামে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। সেইদিন ১০৮ ঘড়া জলের দ্বারা শ্রীসিদ্ধ-বকুলের অভিষেক হয়।

শ্রীসিদ্ধবকুল-মঠে শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের অপ্রকটের পর ঠাকুরের অন্যতম শ্রীজগন্নাথদাস শ্রীনামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের একটি শালগ্রাম শ্রীমূর্ত্তি, বড় কুল মহাপ্রভু (দারুময়ী শ্রীমূর্ত্তি), তাঁহার দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ ও বামে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহের সেবা প্রকাশ করেন। নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসের শ্রীমূর্ত্তি শ্রীমন্দিরের জগমোহনে গর্ভমন্দিরের দ্বারের সংলগ্ন উত্তরদিকে পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর হরিদাস জপমালিকা-হস্তে আসনে আসীন হইয়া শ্রীনাম জপ করিতেছেন,—এইরূপ ভাবের শ্রীমূর্ত্তি সকটিত আছেন। মূল-মন্দিরের সংলগ্ন উত্তর-পার্শ্বে আর একটি ক্ষুদ্র-মন্দিরে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের একটি শ্রীমূর্ত্তি আছেন। এই শ্রীনৃসিংহমূর্ত্তি শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের ভজন-কালেও এখানে অবস্থিত ছিলেন, এরূপ প্রবাদ।

শ্রীসিদ্ধবকুল-মঠে তালপত্রে হস্ত-লিখিত বহু প্রাচীন পুঁথি ছিল। বর্ত্তমান মহান্ত-মহারাজ বলিলেন,—তাঁহার বাল্য-কালে তিনি ঐ-সকল পুঁথি অযত্নে নষ্ট হইতে দেখিয়াছেন, বর্ত্তমানে উল্লেখ-যোগ্য কোন পুঁথি নাই। ঐ-সকল পুঁথির মধ্যে সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের লীন-কৃষ্ণদাসের রচিত অতি প্রাচীন ভাষায় পদ্যানুবাদ ছিল। উহা অতিবাড়ী জগন্নাথদাসের উৎকল-ভাষায় রচিত শ্রীমদ্ভাগবত-পদ্যানুবাদ হইতেও অধিকতর লালিত্যপূর্ণ ও সিদ্ধান্ত-বিরোধহীন বলিয়া উৎকলবাসী গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের নিকট সমাদৃত হইত; কিন্তু দৈববিচ্ছায় উহা সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইয়াছে। ঐ-সকল পুঁথির মধ্যে উৎকল-কবি শ্রীগোবিন্দদেবের 'শ্রীগৌর-কৃষ্ণোদয়'-নামক একটি পুঁথিও তিনি দেখিয়াছিলেন।

শ্রীসিদ্ধবকুল-মঠের গুরুপরম্পরা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

(১) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু, (২) শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, (৩) সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথদাস, (৪) শ্রীবরহরিদাস মহান্ত গোস্বামী, (৫) শ্রীগৌরহরিদাস, (৬) শ্রীরাধামোহনদাস, (৭) শ্রীগোপী-মোহনদাস, (৮) শ্রীভগবান্‌দাস, (৯) শ্রীগোপীচরণদাস, (১০) শ্রীশ্যামচরণদাস, (১১) শ্রীসাধুচরণদাস, (১২) শ্রীবরহরি-দাস, (১৩) শ্রীবলরামদাস, (১৪) শ্রীপরমানন্দদাস, (১৫) শ্রীবলভদ্রদাস। ইনি বর্ত্তমানে শ্রীসিদ্ধবকুলমঠের মহান্ত। শ্রীবরহরিদাসজী হইতে সকলেই 'মহান্ত-গোস্বামী' উপাধিযুক্ত।

সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথদাসের মাহাত্ম্য-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পুরীর রাজা তাঁহাকে শ্রীবিগ্রহের সেবার্থ প্রচুর ভূসম্পত্তি-প্রদানে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীল জগন্নাথদাসজী তাহা

প্রত্যাখ্যান করিয়া মাধুকরী ভিক্ষার দ্বারাই সেবা নির্ব্বাহ করেন। পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে শ্রীগোপীচরণদাস মহান্তের সময় হইতে ভূসম্পত্তি-লাভের পরিচয় পাওয়া যায়। সিদ্ধবকুল-মঠের বর্ত্তমান মহান্তমহাশয় বলেন,—শ্রীভগবান্-দাস মহান্তজীর সময় শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধির সেবাটি হস্তান্তরিত হয়।

১৩। শ্রীগঙ্গামাতা-মঠ

শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের দক্ষিণে শ্বেতগঙ্গা-নাম্নী একটি দীর্ঘিকা অবস্থিত। এই দীর্ঘিকার তটে শ্রীনবদ্বীপ-বিদ্যানগরের শ্রীমহেশ্বর বিশারদের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীক্ষেত্র-বাস করিতেন। সন্ন্যাসলীলাভিনয়ের পর শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধানলীলা প্রদর্শন করিতে করিতে শ্রীপুরুষোত্তমে উপস্থিত হইলেন এবং মহাভাবাবেশে শ্রীজগন্নাথকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়া শ্রীমন্দিরে মহাভাবমূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীমন্দিরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য উপস্থিত ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে পড়িছার দ্বারা বহন করাইয়া নিজ গৃহে লইয়া আসিলেন। পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগামী শ্রীনিত্যানন্দাদিও শ্রীসার্ব্বভৌম-ভবনে উপনীত হইলেন।

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীজগন্নাথ-দর্শনান্তে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত তাঁহার আবাস-মন্দিরে আগমন করিলে ভট্টাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বেদান্ত-শ্রবণার্থ উপদেশ করিলেন। অমানি-মানদ-ধর্ম্মের শিক্ষক-লীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরহরি তাহা স্বীকার-পূর্ব্বক সাত দিন পর্য্যন্ত মৌনভাবে বেদান্ত শ্রবণ করিলেন। অষ্টম দিবসে সার্ব্বভৌম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মৌনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, প্রভু হৈন্যমুখে মায়াবাদ-ভাষ্যকে উপেক্ষা করিলেন এবং ঐ ভাষ্যের দ্বারা 'ব্রহ্মসূত্র' কিরূপ কদর্থিত ও আবৃত হইয়াছে, তাহা বিভিন্ন শাস্ত্র-যুক্তিদ্বারা প্রদর্শন-পূর্ব্বক অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তকেই বেদ ও বেদান্তের তাৎপর্য্য বলিয়া স্থাপন করিলেন। ভট্টাচার্য্য নানাপ্রকার তর্কের পর পরাস্ত হইয়া গেলেন। ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনামত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য 'আত্মারাম'-শ্লোকের অষ্টাদশ-প্রকার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিলেন। এই ব্যাখ্যা শুনিয়া সার্ব্বভৌম পরমচমৎকৃত হইলেন। তিনি চিত্তদর্পণ মায়াবাদ পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিলেন। মহাপ্রভু তখন সার্ব্বভৌমকে প্রথমে চতুর্ভুজ, পরে ষড়্ভুজ-বংশীমুখ দ্বিভুজ-স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। প্রভুর কৃপায় সার্ব্বভৌমের হৃদয়ে মহাপ্রভুর তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হওয়ায় সার্ব্বভৌম তদ্মুহূর্ত্তেই শত শ্লোক রচনা করিয়া শ্রীমহাপ্রভুকে স্তব করিলেন।

অন্য একদিন শ্রীমহাপ্রভু অপরাহ্ণ-কালে স্বহস্তে শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ লইয়া সার্ব্বভৌমের গৃহে আগমন করিলেন এবং সন্ধ্যাস্নানদন্তধাবনাদি না করিয়াও প্রাপ্তি-মাত্রই শ্রীমহাপ্রসাদের সম্মান করা উচিত, ইহা ভট্টাচার্য্যকে শিক্ষা দিলেন। অন্য একদিন সার্ব্বভৌম ভক্তির শ্রেষ্ঠ-সাধনাঙ্গ জানিতে ইচ্ছা করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে নাম-সংকীর্ত্তন করিতে উপদেশ দিলেন। আর একদিন শ্রীমদ্-ভাগবতের 'অহোবকীয়ং'-শ্লোকের শেষাংশ-ধৃত 'মুক্তি-পদ' পাঠের সম্বন্ধে নানা প্রকার বিচার হইল। শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতার আবির্ভাব দেখিয়া শ্রীগৌরসুন্দর সার্ব্বভৌমের ভবনে পাঁচদিন ভিক্ষা করিয়াছিলেন। সার্ব্ব-ভৌম-গৃহিণী ষাঠীর মাতা শ্রীমহাপ্রভুর জন্য বিবিধ সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া ভিক্ষা করাইলে ষাঠীর স্বামী অমোঘ মহাপ্রভুর প্রতি মাৎসর্য্য পোষণ করায় অমোঘের বিসূচিকা-ব্যাধি হয়; মহাপ্রভুর ইচ্ছায় অমোঘ ব্যাধিবিমুক্ত হইয়া তাঁহার কৃপা লাভ করেন।

শ্রীগৌরহরির শ্রীপুরুষোত্তম-লীলার এই আদি-স্থানটি লুপ্ত হইলে শ্রীমহাপ্রভুই তাঁহার কোন নিজজনকে জগতে প্রেরণ করিলেন। তিনি একটি মহীয়সী বৈষ্ণবী শক্তি।

বঙ্গদেশের রাজসাহী-জেলায় পুঁটিয়া-রাজধানী অবস্থিত। পুঁটিয়ার রাজবংশের রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের শচীদেবী-নাম্নী এক কন্যা অতি শৈশবকাল হইতেই সংসারে উদাসীনতা এবং ভগবৎ-সেবায় নিষ্ঠা প্রদর্শন করেন। রাজা নরেন্দ্র-নারায়ণ শচীদেবীর বিবাহ-প্রদানার্থ উপযুক্ত বরের সন্ধান করিতে উদ্যত হইলে শ্রীশচীদেবী পিতাকে বিশেষ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন যে, কোন মরণশীল পুরুষের সহিত যেন তাঁহার বিবাহ না দেওয়া হয়। কালক্রমে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁহার মহিষীর নিত্যধামপ্রাপ্তি ঘটিলে শ্রীশচীদেবী তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইয়া প্রথমে শ্রীক্ষেত্রে এবং পরে তথা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন।

এই সময়ে শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীসদাশিব পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর শিষ্য শ্রীল অনন্তাচার্য্যের প্রিয় শিষ্যবর শ্রীল হরিদাস পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু বৈষ্ণবমণ্ডলে বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। ইঁহার কথা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

"পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য—অনন্ত-আচার্য্য।
কৃষ্ণপ্রেমময়-তনু, উদার, সর্ব্ব-আর্য্য॥
তাঁহার অনন্তগুণ কে করু প্রকাশ?
তাঁ'র প্রিয় শিষ্য ইহা—পণ্ডিত হরিদাস॥
চৈতন্য-নিত্যানন্দে তাঁ'র পরম বিশ্বাস।
চৈতন্যচরিতে তাঁ'র পরম উল্লাস।
বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী, না দেখয়ে দোষ।
কায়মনোবাক্যে করে' বৈষ্ণবে সন্তোষ॥
নিরন্তর শুনে তেঁহো 'চৈতন্যমঙ্গল'।
তাঁহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণবসকল।
কথায় সভা উজ্জ্বল করে' যেন পূর্ণচন্দ্র।
নিন্দ-গুণামৃতে বাড়ায় বৈষ্ণব-আনন্দ॥
তেঁহো অতি কৃপা করি' আজ্ঞা দিল মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষলীলা বর্ণিবার তরে॥"

(চৈ চ আ ৮।২৯-৬৪)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর বর্ণনানুসারে জানা যায়, শ্রীল হরিদাস পণ্ডিত-গোস্বামী শ্রীধাম-বৃন্দাবনে বৈষ্ণব-সভায় নিত্য শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিতেন এবং তিনি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুকে মহাপ্রভুর শেষলীলা বর্ণন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন।

পুঁটিয়ার রাজদুহিতা শ্রীশচীদেবী শ্রীধাম-বৃন্দাবনস্থ শ্রীহরিদাস পণ্ডিত-গোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার কৃপা যাচ্ঞা করিলেন। শ্রীল পণ্ডিত-গোস্বামী শ্রীশচীদেবীর ন্যায় রাজকন্যার পক্ষে তীব্র বৈরাগ্যের সহিত ভগবদ্ভজন সম্ভবপর নহে, জানাইয়া তাঁহাকে গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু শ্রীশচীদেবীর মধ্যে স্বরূপ-শক্তির অহৈতুকী কৃপার আবির্ভাব-দর্শনে তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার এই অনুরাগ সাময়িক উচ্ছ্বাসময় কল্প ব্যাপার নহে। তিনি পুনরায় তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য শ্রীধামে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-লজ্জা-সম্ভ্রম দূরে পরিত্যাগ করিয়া মাধুকরী ভিক্ষা করিতে আদেশ করিলেন। শ্রীশচীদেবী রাগভক্তিতে বিভাবিত হইয়া, সমস্ত দ্বিধাবৃত্তি তুলিয়া যখন ব্রজের কুঞ্জে-কুঞ্জে মাধুকরী ভিক্ষার ছলে শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধানাবেশে আবিষ্ট হইলেন, তখন তাহা দেখিয়া পণ্ডিত শ্রীল হরিদাস শ্রীশচীদেবীর প্রতি প্রচুর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিলেন। চৈত্রী শুক্লা ত্রয়োদশীতিথিতে বুধবারে শ্রীগোবিন্দমন্দিরে গোস্বামী শ্রীল হরিদাস শ্রীশচীদেবীকে অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র উপদেশ করিলেন। শ্রীশচীদেবী শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া একবৎসর কাল বিশ্রম্ভের সহিত গুরু-সেবা করিলেন। এই সময় শ্রীল হরিদাস পণ্ডিতগোস্বামীর শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-নাম্নী একটী পরমা স্নিগ্ধা শিষ্যা তথায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া প্রত্যহ অপতিতভাবে তিনলক্ষ হরিনাম করিতেন এবং রাগের সহিত শ্রীযুগল সেবায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন। পণ্ডিত শ্রীহরিদাস শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াকে আদেশ করিলেন,—"তুমি শচীকে সঙ্গে করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে ভজন কর। তাহাকে বেষ-ধারণ করাও। ইহাকে তোমার করেই সমর্পণ করিলাম। তুমি শচীকে যত্নের সহিত পালন করিও।"

শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস ও শ্রীকুণ্ড-গোবর্দ্ধন পরিক্রম করিলেন।

শ্রীশচীদেবী কয়েক বৎসর-কাল একান্তভাবে শ্রীরাধা-কুণ্ডে ভজন করিয়া ভজনপ্রৌঢ়া হইলে শ্রীহরিদাস পণ্ডিত শ্রীশচীদেবীকে শ্রীপুরুষোত্তমে গমনার্থ আদেশ করেন এবং তথায় ক্ষেত্র-সন্ন্যাসগ্রহণ-পূর্ব্বক শ্রীমহাপ্রভুর লুপ্ত লীলাস্থল শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভবনে নিত্যসেবা প্রকাশ করিতে বলেন। শ্রীশচীদেবী শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শ্রীধাম-বৃন্দাবন হইতে শ্রীক্ষেত্রে আগমন করেন এবং শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশমত শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের সন্নিকটস্থ যে-স্থানে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের আবাসভূমি ছিল, সেই স্থানের অনুসন্ধান করেন। তখন ঐ স্থানটি সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কেবল একটি জরাজীর্ণ মন্দিরে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পূজিত শ্রীরাধা-দামোদর-শালগ্রাম অবস্থিত ছিলেন।

শ্রীশচীদেবী গৃহে অবস্থান-কালেই শাস্ত্র-গ্রন্থের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহার পর শ্রীরাধা-কুণ্ডে বাস-কালে তিনি বৈষ্ণবের নিকট নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিতেন। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার বিশেষ

অধিকার করিয়াছিল। তিনি শ্রীক্ষেত্রে নিজ সম্প্রদায়ে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন। শ্রীক্ষেত্রবাসী ভগবদ্ভক্তিপরায়ণগণ প্রত্যহই শ্রীশচীদেবীর মুখে শ্রীমদ্-ভাগবতের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সেই সকল কথা গৃহে গিয়াও আলোচনা করিতেন। ক্রমে ক্রমে শ্রীশচী-দেবীর শ্রীভাগবত-ব্যাখ্যার যশঃ-সৌরভ তদানীন্তন পুরীর রাজা শ্রীমুকুন্দদেবের কর্ণে উপনীত হইল। তিনি একদিন শ্রীশচীদেবীর শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে আসিয়া এত মুগ্ধ হইলেন যে, প্রত্যহই নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণার্থ উপস্থিত হইতে লাগিলেন। শ্রীমুকুন্দদেব একদিন স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলেন, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব যেন শ্বেতগঙ্গার সন্নিকটস্থ স্থানটি শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যাত্রীকে অর্পণার্থ আদেশ করিতেছেন। পরদিবস প্রাতঃকালে রাজা শয্যা হইতে উঠিয়াই শ্রীশচীদেবীর নিকট এই বার্ত্তা প্রেরণ করিলেন এবং শ্রীশচীদেবী যে-স্থানে সত্র করিয়াছেন, সেই স্থানটি দানপত্রের দ্বারা শ্রীশচীদেবীকে লিখিয়া দিবার প্রস্তাব জানাইলেন। বিষয়বিরক্তা শ্রীশচীদেবী বিষয়ী রাজার নিকট হইতে ভূ-সম্পত্তি প্রভৃতি বিষয় গ্রহণ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইলেও শ্রীগুরুদেবের আদেশ স্মরণ করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর গুণ্ডলীলা ও সেবা-উদ্ধারার্থ রাজার প্রদত্ত স্থানটি গ্রহণ করিলেন। সেই স্থানে শ্রীশচীদেবী ভিক্ষার দ্বারা ঠাকুর-সেবা চালাইতে লাগিলেন।

এক সময়ে কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে মহাবারুণী-স্নানের জন্য অনেকে গঙ্গার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন, কিন্তু ভগবৎ-সেবাপরায়ণা শ্রীশচীদেবী কর্ম্মমার্গীয় ব্যক্তিগণের ঐরূপ হুজুগে মত্ত না হইয়া একান্তমনে শ্রীগুরুদেবের আদিষ্ট ভগবৎ-সেবা ও ক্ষেত্র-সন্ন্যাসকেই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত জানিয়া তাহাতে পরিনিষ্ঠিত থাকিলেন। শচীদেবী স্বপ্নযোগে শ্রীজগন্নাথের দ্বারা আদিষ্ট হইলেন,—"যেদিন গঙ্গায় স্নান-যোগ, সেইদিন তুমি শ্বেতগঙ্গায় স্নান করিবে। গঙ্গাদেবী তোমার সঙ্গপ্রার্থিনী হইয়া শ্বেতগঙ্গায় উপস্থিত হইবেন।" শচীদেবী স্বপ্নে এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সকলের অজ্ঞাতসারে অর্দ্ধরাত্রে শ্বেতগঙ্গায় অবগাহন করিলেন। অবগাহন করিবামাত্র তিনি গঙ্গাস্রোতের দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া ক্রমশঃ অগ্রস্থানে নীত হইতে থাকিলেন এবং স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের অভ্যন্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় দেখিলেন, শ্রীক্ষেত্রবাসী নরনারী সকলেই গঙ্গাস্নান করিতেছেন; চতুর্দ্দিকেই স্নান কোলাহল হইতেছে, তন্মধ্যে তিনিও সানন্দে স্নান করিতেছেন। এই কোলাহলে দ্বাররক্ষকগণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। দ্বাররক্ষকগণ জাগরিত হইয়া পণ্ডিছাগণকে জানাইল। পণ্ডিছা এই সংবাদ রাজাকে জানাইলে রাজা শ্রীমন্দির খুলিবার জন্য আদেশ দিলেন। শ্রীমন্দির খুলিয়া দেখা গেল—শ্রীমন্দির-ভাণ্ডারে শ্রীশচীদেবী দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

এই ব্যাপারে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকগণের অনেকের মনেই সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাঁহারা মনে করেন যে, শচীদেবী শ্রীজগন্নাথদেবের ধনরত্নাদি অপহরণ করিবার লোভে পূর্ব্ব হইতেই শ্রীমন্দিরে লুকাইয়া ছিলেন এবং সেই সকল বস্তু অপহরণ করিতে না পারিয়া দুঃখিত হন। মহাভাগবতের প্রতি এইরূপ সন্দেহ ও তাঁহার নিন্দা করায় শ্রীজগন্নাথসেবকগণ নানাপ্রকার রোগশোকে অভিভূত হইয়া পড়েন। এদিকে শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীমুকুন্দদেবকে স্বপ্নে বলেন,—"ত্রয়োদশীর রাত্রিতে যাঁহাকে মন্দিরে দেখিয়াছ, তিনি আমার বিশেষ অনুরাগী ভক্ত। আমি তাঁহার স্নানার্থ নিজ শ্রীচরণ হইতে গঙ্গা নিঃসৃত করিয়াছিলাম। যদি তুমি মঙ্গল চাও, তাহা হইলে, আমার পূজক পাণ্ডাগণের সহিত সেই মহাভাগবতের শ্রীচরণে উপনীত হইয়া অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা কর এবং তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ কর, নতুবা আমি বৈষ্ণবাপরাধিগণের সেবা গ্রহণ করিব না।"

শ্রীমুকুন্দদেব পণ্ডিছা প্রভৃতি সকলকে ডাকাইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের এই আদেশ জ্ঞাপন করিলেন এবং স্বয়ং শ্রীজগন্নাথদেবের পূজকগণের সহিত শ্রীশচীদেবীর চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। তখন হইতেই শ্রীশচীদেবী 'গঙ্গামাতা'-নামে প্রসিদ্ধা হইলেন। শ্রীজগন্নাথের সেবক-গণের সহিত শ্রীমুকুন্দদেব শ্রীগঙ্গামাতার নিকট মন্ত্রদীক্ষা প্রার্থনা করিলে শ্রীশচীদেবী অত্যন্ত দৈন্যভরে 'তাঁহার শ্রীজগন্নাথদেবের সেবক, অতএব পরমপূজ্য'—এই বলিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন, পরে শ্রীজগন্নাথদেবের সাক্ষাৎ আদেশ লঙ্ঘন করিলে তাঁহার অপ্রীতি হইবে ভাবিয়া শ্রীমুকুন্দদেবকে দীক্ষা দান করিলেন। শ্রীমুকুন্দদেব গুরু-দক্ষিণার্থ ভূসম্পত্তি-প্রভৃতি-প্রদানে ইচ্ছুক হইলে শ্রীগঙ্গামাতা বলিলেন,—"তোমার শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তি লাভ হউক, আমি

একমাত্র ইহাই ভিক্ষা করি, আমি অন্য কোন দক্ষিণা-গ্রহণের অধিকারিণী নহি।" তাঁহার পুনঃ পুনঃ সকাতর প্রার্থনার অবসানে শ্রীগঙ্গামাতা শ্রীবৈষ্ণবসেবার্থ ছই ভাণ্ড মহাপ্রসাদ, একভাণ্ড তরকারী, একখানি প্রসাদীবস্ত্র, ছইপণ কপর্দ্দক (১১০ পয়সা) প্রভৃতি মধ্যাহ্নভোগের পর মঠে প্রেরণের অনুমতি দিলেন। অতঃপর সেই প্রসাদ রাজ-ভোগ হইতে নিয়মিতভাবে শ্রীগঙ্গামাতা-মঠে প্রেরিত হয় এবং তাহা শ্রীগঙ্গামাতার সমাধিপীঠে সমর্পণ করা হয়।

ইহার পর মহীরথশর্ম্মা-নামক একজন স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ শ্বেতগঙ্গার তীরে পিতৃপুরুষগণের তর্পণ করিতে আসিয়া শ্রীগঙ্গামাতার দর্শন ও উপদেশলাভে কৃতার্থ হন এবং স্মার্ত্তমত পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীগঙ্গামাতার নিকট অষ্টাক্ষর শ্রীগোপালমন্ত্র প্রাপ্ত হন। তিনি 'স্বর্গদ্বারে' ভজন করিয়া অল্পকালেই সিদ্ধি লাভ করেন এবং গঞ্জাম-জেলায় শুদ্ধভক্তি প্রচার করিয়া বিশেষ পূজার্হ হন। তাঁহার জন্মস্থান—'ধনঞ্জয়পুর'।

শ্রীরসিকরায়

রাজপুতনার অন্তর্গত 'জয়পুর'-নগরীতে যেস্থানে শ্রীরূপ-গোস্বামি-প্রভুর প্রাণধন শ্রীগোবিন্দদেব বিরাজ করিতেছেন, তথায় চন্দ্রশর্ম্মা-নামক এক ব্রাহ্মণের ঘরে 'শ্রীরসিকরায়'-নামক শ্রীবিগ্রহের সেবা ছিল। সেবাপরাধে ব্রাহ্মণ নির্বংশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। একদিন ব্রাহ্মণ স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলেন যে, শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহাকে বলিতেছেন,—"তোমার গৃহদেবতা শ্রীরসিকরায়কে শীঘ্রই তুমি শ্রীক্ষেত্রে শ্বেতগঙ্গার তটস্থিত শ্রীগঙ্গামাতার নিকট পৌঁছাইয়া দাও, নতুবা তোমার কোনদিন মঙ্গল হইবে না।" ব্রাহ্মণ নিঃসন্তান হইয়া এতদিন বিশেষ মনঃকষ্টেই কালাতিপাত করিতেছিলেন। স্বপ্নে শ্রীজগন্নাথদেবের এই আদেশ পাইয়া ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া ব্রাহ্মণ একটি পেটিকায় অভ্যন্তরে শ্রীরাধারাণীর সহিত শ্রীরসিকরায়-বিগ্রহকে স্থাপন-পূর্ব্বক শ্রীক্ষেত্রে শ্রীগঙ্গামাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীগঙ্গামাতা শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া বলিলেন,—"এই শ্রীবিগ্রহ রাজসেবার যোগ্য। আমি সামান্যমাত্র মাধুকরী ভিক্ষার দ্বারা সেবা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। এইরূপ শ্রীবিগ্রহ কোথায় রাখিব? আমাকে সেবাপরাধিনী হইতে হইবে। আপনি গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, আপনার ঠাকুর আপনি লইয়া যান।" ব্রাহ্মণ নিরুপায় হইয়া নিকটস্থ তুলসী-কাননে অলক্ষিতভাবে শ্রীবিগ্রহ রাখিয়া দিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। এদিকে রাত্রিকালে শ্রীগঙ্গামাতা স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলেন, শ্রীরসিকরায় শ্রীগঙ্গামাতাকে বলিতেছেন,—"আমি তোমার সেবাগ্রহণার্থ তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। ব্রাহ্মণ আমাকে তুলসী-কাননে রাখিয়া গিয়াছেন, তুমি আমাকে সেই স্থান হইতে উঠাইয়া যথাস্থানে স্থাপন কর।"

শ্রীগঙ্গামাতা এইরূপ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠোৎসব সম্পাদন করিলেন। শ্রীগঙ্গামাতার প্রভাবে অচিরেই শ্রীরসিকরায়ের সেবার ঔজ্জ্বল্য প্রকাশিত হইল। কেহ কেহ বলেন,—"জয়পুর-নিবাসী ঐ ব্রাহ্মণটির নাম শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র।" 'ধরাকোটে'র রাজা শ্রীরামচন্দ্র সিংহ শ্রীগঙ্গা-মাতার অবস্থান বঙ্গবাসী শ্রীভগবান্‌দাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বহু ব্যয়ে শ্রীগঙ্গামাতা-মঠের বর্ত্তমান শ্রীমন্দিরাদি নির্ম্মাণ, কূপ খনন ও ভগবৎ-সেবার্থ উড়িষ্যাপ্রদেশে একটি গ্রাম প্রদান করেন। সেই গ্রামের নাম—রামচন্দ্রপুর। তদবধি এই গ্রাম শ্রীগঙ্গামাতা-মঠের জমিদারীর অন্তর্গত হইয়াছে। শ্রীভগবান্‌দাস 'শ্রীমোহনরায়'-নামক শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার প্রশিষ্য শ্রীনীলাম্বরদাস 'শ্রীবিনোদ-রায়' ও 'শ্রীশ্যামরায়'-নামক শ্রীবিগ্রহদ্বয় প্রকাশ করেন। শ্রীনীলাম্বরদাসের গুরুদেব শ্রীমধুসূদনদাস শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহ এবং শ্রীরসিকরায়ের দক্ষিণে শ্রীললিতাদেবী প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীগঙ্গামাতার শিষ্য শ্রীবনমালিদাস শ্রীরাধাকুণ্ডে ও শ্রীশ্যাম-বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর-শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন। অধুনা শ্রীগঙ্গামাতা-মঠে ক্ষুদ্র রৌপ্য-সিংহাসনে যে শ্রীদামোদর-শালগ্রামমূর্ত্তি পূজিত হইতেছেন, ইহাই শ্রীসার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের পূজিত শালগ্রাম বলিয়া শ্রীগঙ্গামাতা-মঠের সেবকগণ নির্দ্দেশ করেন।

শ্রীগঙ্গামাতা সুতীব্র অনুরাগের সহিত শ্রীরসিকরায়ের পরিচর্য্যা করিতেন। অষ্টপ্রহরের মধ্যে তিনি চারি প্রহর শ্রীবিগ্রহ সেবা, তিনপ্রহর লীলা-স্মরণ ও বাকী এক প্রহর শৌচ, স্নান, প্রসাদ-সেবা ও বিশ্রামাদি কার্য্যে অতিবাহিত করিতেন। পূর্ব্বে তিনি স্বয়ং মাধুকরী ভিক্ষায় বহির্গত হইতেন; কিন্তু শ্রীরসিকরায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁহার পরিচর্য্যায় অতিনিবিষ্ট হওয়ায় ভিক্ষাবৃত্তি বিস্মৃত

হইয়াছিলেন। শ্রীগঙ্গামাতার ভিক্ষাভ্রম দেখিয়া শ্রীরসিকরায় কৌশলে ভক্তগণকে আকর্ষণ করিয়া নিজ সেবার দ্রব্যসম্ভার জানাইতে থাকিলেন। শ্রীগঙ্গামাতা ১২০ বৎসর ধরাধামে অবস্থান করিবার পর বার্দ্ধক্য-নিবন্ধন শ্রীরসিকরায়ের সেবায় ত্রুটি হইতেছে ভাবিয়া শ্রীইষ্টদেবের প্রতি অপরাধ-ক্ষমাভিক্ষাপূর্ব্বক বলিলেন যে, তিনি পরিচর্য্যাবিহীন জীবনভার আর বহন করিতে চাহেন না; তাঁহার একটী অভিলাষ—যেন তিনি মুখে শ্রীরসিকরায়ের নাম উচ্চারণ, নেত্রে তাঁহার শ্রীমুখচন্দ্র দর্শন, কর্ণে তাঁহার শ্রীগুণ শ্রবণ, নাসারন্ধ্রে তাঁহার শ্রীচরণতুলসীর গন্ধ গ্রহণ করিতে করিতে এই মরাভর্জ্জরিত দেহ পরিত্যাগ করিতে পারেন। শ্রীরসিকরায় শ্রীগঙ্গামাতাকে স্বপ্নযোগে জানান,—"তুমি কোন উপযুক্ত শিষ্যের উপর আমার সেবার ভার প্রদান করিয়া অচিরেই আমার নিত্য-সেবায় প্রবেশ করিতে পারিবে।" ইহার পর শ্রীগঙ্গামাতা শ্রীবৃন্দাবন-ভট্ট-নামে কাশ্যপগোত্রীয় এক সুধীর ও সুশান্ত বিংশবর্ষীয় যুবককে বৈষ্ণবাচার ও সিদ্ধান্তে পারঙ্গত করিয়া বৈষ্ণবমণ্ডলীর সম্মুখে মাঘী শুক্লপঞ্চমী তিথিতে দীক্ষাময় ও বেষ প্রদানপূর্ব্বক, শ্রীমঠের গদ্দিতে অভিষিক্ত করেন। শ্রীবৃন্দাবন-ভট্ট শ্রীবনমালিদাস মহান্ত গোস্বামী-নামে পরিচিত হন। শ্রীগঙ্গামাতা ১১২১ খৃষ্টাব্দে আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সমস্ত শিষ্যগণের সমক্ষে অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করেন।

বৃহৎ খেমেণ্ডীর রাজ্যের রাজা শ্রীঅনন্ত-ভীমদেব শ্রীবনমালিদাসজীর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া 'বালিজোড়ী' ও 'ভূরুকী' নামে দুইটী গ্রাম ও স্বর্ণমুদ্রা গুরুদক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীবনমালিদাসের পরে বঙ্গদেশীয় বিপ্রকুলোদ্ভূত শ্রীগোপালদাস গুরুপদবি প্রাপ্ত হন। তিনি পুঁটিয়ার রাজসভায় গিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। অষ্টগর্গ-নরপতি শ্রীমধুসূদন জগদেব শ্রীগোপালদাসের নিকট মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়া শ্রীগুরুদেবকে 'শালবন' নামে গ্রাম দক্ষিণা প্রদান করেন। নয়াগড়ের জমিদার শ্রীবৃন্দবিহারী শ্রীগোপালদাসকে একটী গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীগোপালদাসের পর বঙ্গদেশীয় এক ব্রাহ্মণবটু 'শ্রীভগবান্‌দাস' নাম প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগঙ্গামাতা-মঠের গদ্দিতে উপবেশন করেন। শ্রীভগবান্‌দাস সমুদ্রোপকূলে একটী পর্ণকুটীরে অবিশ্রান্ত শ্রীহরিনাম জপ করিতেন এবং পরে শ্রীউৎকলদেশে শ্রীগঙ্গামাতা-মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীমন্দিরে শ্রীরাধিকা-শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। ইহার পর শ্রীভগবান্‌দাস গঞ্জাম-নগরে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্‌দাস শ্রীবৃন্দাবনে নির্য্যাণ লাভ করেন। তৎপরে শ্রীমধুসূদনদাস শ্রীগঙ্গামাতা-মঠের মঠাধীশ হন। তাহার পর শ্রীনীলাম্বরদাস মঠের গদ্দিতে আরোহণ করেন। শ্রীনীলাম্বরদাস শ্রীরসিকেন্দু-শ্রীবিগ্রহের বামপার্শ্বে শ্রীচৈতন্যদেবের নৃত্যরত-শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করেন। রাজা আদিকন্দদেব শ্রীনীলাম্বরদাসের চরণাশ্রয় করিয়া দুইটী গ্রাম প্রদান করেন। নয়াগড়ের রাজা ও অষ্টগর্গের রাজা শ্রীরামচন্দ্র জগদেব শ্রীনীলাম্বরদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া গুরুদেবকে স্ব-স্ব রাজধানীতে লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীনীলাম্বর যখন এই উভয় রাজাকে তাঁহাদের রাজ্য হইতে পশুবলি-প্রথা বন্ধ করিবার জন্য আদেশ করেন, তখন তাঁহারা গুরুদেবের আজ্ঞা অনাদর করায় শ্রীনীলাম্বরদাস তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করেন। রাজা আদিকন্দদেব নিজগুরুদেব শ্রীনীলাম্বরদাসের বিদ্বেষী হইয়া উঠেন এবং তিনি পূর্ব্বে যে ভূ-সম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া শ্রীগঙ্গামাতা-মঠের সহিত মামলা-মোকদ্দমা হয়। শ্রীনীলাম্বরদাসের শিষ্য শ্রীনরোত্তমদাস মঠাধীশ হইলে আদিকন্দদেবের সহিত মোকদ্দমায় জয়লাভ করেন এবং আদিকন্দদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা শ্রীরঘুনাথ রাজসিংহাসন লাভ করিলে তিনি শ্রীগুরুদেবকে চক্রপুর-নামে একটী গ্রাম দান করেন। অষ্টগর্গাধিপতি শ্রীচৈতন্য জগদেব শ্রীনরোত্তমদাসজীর শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া শ্রীগোপীনাথ-শ্রীবিগ্রহ, শ্রীমন্দির ও ভূসম্পত্তি দান করেন। শ্রীপীতাম্বরদাসকে আচার্য্যের আসন প্রদান করিয়া শ্রীনরোত্তমদাস স্বধামে গমন করেন। শ্রীনরোত্তমের তিনটি প্রধান শিষ্যের মধ্যে শ্রীপীতাম্বর, শ্রীঅচ্যুত ও শ্রীপরমানন্দ ছিলেন। শ্রীপীতাম্বর আচার্য্যের আসন লাভ করিলে শ্রীঅচ্যুত ও শ্রীপরমানন্দ শ্রীপীতাম্বরদাসের সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া মঠ ত্যাগ করেন। বিকলীর রাজমহিষী শ্রীপীতাম্বরদাসকে 'ডিঙ্গা-ডেই'-নামে একটী গ্রাম দান করেন। শ্রীপীতাম্বরদাসের পর শ্রীমাধবদাস বালক অবস্থায় মঠাধীশ হন। তখন শ্রীদীনবন্ধুদাস ও শ্রীমনোহরদাস

নামে দুইজন কর্মচারী শ্রীমাধবের লালনপালন ও মঠ-পরিচালনকার্য্যের সহায়ক হইয়াছিলেন। ধরাকোটের রাজা শ্রীব্রজসুন্দর সিংহ তাঁহার পোষ্যপুত্র যুবরাজ শ্রীমদনমোহনকে শ্রীমাধবদাসের নিকট হইতে দীক্ষা-মন্ত্র গ্রহণ করাইয়াছিলেন। শ্রীব্রজসুন্দর সিংহ তখন শ্রীমাধবদাসকে বহু ধনরত্ন উপহার প্রদান করেন। শ্রীমাধবদাস শ্রীগুরুদর্শনদাস-নামক জনৈক পণ্ডিতের নিকট ন্যায় ও অলঙ্কারাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন রাজার প্রদত্ত অর্থের দ্বারা প্রায় ছয় লক্ষ টাকায় একটি ভূ-সম্পত্তি শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্য ক্রয় করিয়াছিলেন। তৎপরে সান-খেমণ্ডীর রাজা শ্রীপুরুষোত্তম 'আমবঠা'-গ্রাম ও ধরাকোটের শ্রীমদনমোহন 'ব্রজসুন্দরপুর'-গ্রাম শ্রীমাধবদাসকে দান করিয়াছিলেন। শ্রীমাধবদাসের পর শ্রীরাধাকৃষ্ণদাস শ্রীগঙ্গামাতা-মঠের মহান্ত হন। শ্রীরাধাকৃষ্ণদাসের দেহান্তের পর শ্রীবনমালিদাস বর্ত্তমানে শ্রীগঙ্গামাতা-মঠের গদিতে উপবেশন করিয়াছেন। তিনি অল্পবয়স্ক হইলেও বিদ্যোৎসাহী, বিনয়ী ও সৌজন্যপরায়ণ।

শ্রীগঙ্গামাতা-মঠে পঞ্চযুগল-শ্রীমূর্ত্তি—শ্রীশ্রীরাধা-রসিকরায়, শ্রীশ্রীরাধা-শ্যামসুন্দর, শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন, শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদ ও শ্রীশ্রীরাধারমণ-নামে খ্যাত। এতদ্ব্যতীত শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সেবিত শ্রীদামোদর-শালগ্রাম, নৃত্যরত শ্রীগৌরমূর্ত্তি (ধাতুময়ী) ও শ্রীনন্দগোপাল-শ্রীবিগ্রহ একটি সিংহাসনেই পূজিত হইতেছেন। শ্রীরসিকরায় দ্বিভুজ-মুরলীবদন, ভক্তমনমনোহারিরাম, অতি অপূর্ব্বদর্শন ত্রিভঙ্গী শ্রীমূর্ত্তি। তাঁহার বামে শ্রীরাধা ও দক্ষিণে শ্রীললিতা বিরাজিতা।

উক্ত মঠের প্রদত্ত বিবরণানুসারে শ্রীগঙ্গামাতা ১৬০১ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হইয়া ১৭২১ খৃষ্টাব্দে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। পুরীর বাটলোকনাথের মন্দিরের নিকট রাধাকান্তী-কোটের উত্তরে শ্রীগঙ্গামাতামঠের 'সমাধি-বাগিচা' আছে। তথায় শ্রীগঙ্গামাতা হইতে মঠের সকল মহান্তের অস্থি-সমাধি প্রদত্ত হইতেছে। পুরীর গৌড়ীয়বৈষ্ণব-মঠসমূহে ত্যক্তগৃহস্থগণেরও দেহ দাহ করিবার ও অস্থিসমাধি-প্রদানের প্রথা দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান মহান্ত শ্রীবনমালিদাস বলিলেন যে, শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া, শ্রীগঙ্গামাতা, শ্রীবনমালিদাস ও শ্রীগোপালদাস প্রভৃতি মহান্তগণের সমাধি সমুদ্রগর্ভগত হইয়াছে। শ্রীল গঙ্গামাতার পরিচয়ের সময় হইতে শ্রীমঠের শিষ্য-গণের মধ্যে শ্রীগৌরমন্ত্র ও শ্রীগৌরগায়ত্রী প্রচলিত আছে। শ্রীগঙ্গামাতার নিত্য পঠিত শ্রীমদ্ভাগবত-পুঁথিটী অদ্যাবধি মঠে পূজিত হইতেছেন। মহান্তগণের লিখিত বঙ্গাক্ষরী হস্তলিখিত বহু পুঁথি কীটদষ্ট হওয়ায় কিছুদিন পূর্ব্বে খেত-গঙ্গায় প্রদত্ত হইয়াছে। তালপত্রে উড়িয়া-অক্ষরে লিখিত শতাধিক প্রাচীন পুঁথি ও গোস্বামিশাস্ত্র এখনও শ্রীগঙ্গামাতা-মঠে সংরক্ষিত আছেন। এখানে পূর্ব্বে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ বালক-গণের জন্য একটী টোল ছিল; এখন আর তাহা নাই।

শ্রীমন্দিরের বরাবর যে নাটমন্দিরটী আছে, সেই স্থানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া হইতে মহান্ত-পরম্পরার একটী তৈলচিত্র নিত্য পূজিত হন। সেই তৈলচিত্রটী প্রত্যেক মহান্তের অপ্রকটের পর পরিবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ স্বধামগত শেষ মহান্তের চিত্র তাহাতে সংযোজিত হইয়া আর একটী নূতনচিত্র প্রকাশিত হয়। সেই তৈলচিত্রে গঙ্গামাতা-মঠের মহান্তগণের পরম্পরা এইরূপ ক্রমে সজ্জিত আছে,—(১) শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া, (২) শ্রীগঙ্গামাতা, (৩) শ্রীবনমালিদাস, (৪) শ্রীগোপালদাস (বঙ্গদেশীয়), (৫) শ্রীভগবান্‌দাস (বঙ্গদেশীয়), (৬) শ্রীমধুসূদনদাস, (৭) শ্রীনীলাম্বরদাস, (৮) শ্রীনরোত্তমদাস, (৯) শ্রীপীতাম্বরদাস, (১০) শ্রীমাধবদাস, (১১) শ্রীরাধাকৃষ্ণদাস। জীবিত মহান্তের চিত্রপট প্রকাশিত হয় না। এজন্য বর্ত্তমান মহান্ত শ্রীবনমালিদাসের চিত্র ইহাতে নাই। মহান্তের স্বধামপ্রাপ্তির পর চিত্রপটটী সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তৎস্থানে স্বধামগত শেষ মহান্ত পর্য্যন্ত নূতন তৈল-চিত্র পুনঃ প্রকাশিত হয়।

পুরীতে হাবেলী মঠ, গোপালমঠ ও কটকছেলার টাঙ্গী-নামক স্থানে শ্রীগোপালমঠ শ্রীগঙ্গামাতা-মঠের শাখামঠরূপে অবস্থিত আছে। ধরাকোট, সান-খেমণ্ডী, বিরূলী, আটগড়, সুয়াগড়ের রাজা শ্রীগঙ্গামাতা-মঠের শিষ্য। শ্রীগঙ্গামাতা-মঠের ভূসম্পত্তির বার্ষিক আয় প্রায় আশী হাজার টাকা।

১৪। খাজপিটা-মঠ

শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সহিত এই মঠের সংস্পর্শের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। পুরীর কুচাইবেন্টী-সাহীতে এই মঠ অবস্থিত। কটকের উকিল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সংগৃহীত বিবরণানুসারে অতি

পুরাতন কাগজ-পত্রের মধ্য হইতে একটি কস্তুলিপি উদ্ধার করিয়া যে তথ্য পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়, শ্রীক্ষেত্রে যখন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু আগমন করিয়াছিলেন, তখন 'আঞ্জপিটা-মঠে'র স্থানটি জনপদ ও লোকালয় হইতে বিচ্ছিন্ন অতি নির্জ্জন ছিল। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এই স্থানে শ্রীক্ষেত্রবাসী কতিপয় বালককে লইয়া শ্রীগৌর-প্রেম-আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমহাশয় যখন শ্রীগৌর-লীলাস্থলীসমূহ দর্শন করিবার মানসে শ্রীব্রজমণ্ডল ও শ্রীগৌড়মণ্ডল ভ্রমণানন্তর শ্রীক্ষেত্রে শুভবিজয় করেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত পূর্ব্বোক্ত স্থানটী দর্শন করিয়া ভাবাবেশে মগ্ন হন। তখন তাঁহার সঙ্গিজনে 'সেবা-দাস' * নামক এক শিষ্য ছিলেন। সেবা-দাসের যত্নে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় সজ্জা লাভ করিয়া ঐ স্থানটির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন এবং সেবা-দাসকে ঐ স্থানে ভজন করিবার আদেশ প্রদান করেন। সেবা-দাস 'ঝাঞ্জ' (বড় পাতলা করতাল) বাজাইয়া সর্ব্বদা উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনামকীর্ত্তন-ভজন করিতেন। একবৎসর রথযাত্রার সময় বঙ্গদেশ হইতে আগত এক বৈষ্ণব শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাকান্ত-যুগল-মূর্ত্তি ও তিনমূর্ত্তি শ্রীশালগ্রাম আনয়ন করিয়া সেবা-দাসকে প্রদান করেন। উৎকল-ভাষায় বড় করতালকে 'ঝাঞ্জ' বলে ও বাদনকে 'পিটা' বলে। এই ভাবে এই মঠের নাম 'ঝাঞ্জপিটা'-মঠ-নামে প্রচারিত হয়। শ্রীরাধাকান্তের সেবার্থ পুরীর রাজা কৃষ্ণাইবেণ্ট-সাহীর মঠের এই স্থানটী দেবোত্তর করিয়া দেন এবং শ্রীজগন্নাথদেবের এক হাঁড়ী মহাপ্রসাদ বৈষ্ণবসেবার্থ নিয়মিতভাবে প্রত্যহ প্রদান করিবার ব্যবস্থা করেন। কালক্রমে উড়িষ্যা ইংরাজ-শাসনাধীন হইলে উক্ত মঠস্থিত বিরক্ত সাধুগণের সেবার্থ গভর্ণমেণ্ট বার্ষিক ৫০০৲ পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা করিয়া সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

শ্রীসেবা-দাসের স্বধাম-গমনের পর তাঁহার শিষ্য শ্রীজগন্নাথদাস উক্ত সেবা সুচারুরূপেই পরিচালনা করিয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথদাস তাঁহার শিষ্য শ্রীভগবান্‌দাসকে সেবাইত নিযুক্ত করিয়া দেহরক্ষা করেন। ভগবান্‌দাসের শ্রীবিগ্রহ বা বৈষ্ণব-সেবায় প্রীতি ছিল না। এই সময় গভর্ণমেণ্টের প্রদত্ত সাহায্যও বন্ধ হইয়া যায়। ভগবান্‌দাস উইল করিয়া তাঁহার শিষ্য কৃষ্ণদাসকে সেবাইত-পদে নিযুক্ত করেন; গুরুর জীবিতকালেই কৃষ্ণদাস আপনাকে কর্ত্তা মনে করিয়া প্রভুত্ব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। তখন গুরু-শিষ্য-নামধারী উভয় ব্যক্তির মধ্যে রাজদ্বারে মোকদ্দমা আরম্ভ হয়, তৎফলে ঠাকুরের সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়। শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কারাদি, পূজার বাসনপত্র, ঠাকুর-মন্দির ও ভোগ-মন্দির-ভাড়িয়া পাথর বিক্রয় করিয়া গুরু ও শিষ্য উভয়েই জীবিকা-নির্ব্বাহ ও মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনা করেন। ইহা ব্যতীত কৃষ্ণদাস পুরী-জেলার মহাপুর-নিবাসী শ্রীবৃন্দাবন মিশ্র-নামক জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট ঠাকুরের সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিয়া পাঁচশত টাকার একখানি খৎ লিখিয়া দেন; ইহাতে চক্রবৃদ্ধি-সুদের কড়ার থাকে। মোকদ্দমা চলিবার সময় ভগবান্‌দাসের স্বধামপ্রাপ্তি ঘটে। বৃন্দাবন মিশ্র কৃষ্ণদাসের পক্ষে মামলায় সাহায্য করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস পুনরায় ফকির শতপথী নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীবিগ্রহের সম্পত্তি-সহ সেবাইতি-স্বত্ব-সমর্পণ-নামা লিখিয়া দেন। ঐ সমর্পণ-গ্রহিতা আদেশে ঋণ শোধ করিয়া মঠস্থ শ্রীবিগ্রহের সেবা চালাইয়া সাধু-সেবা করিবেন ও মহান্ত কৃষ্ণদাসকে তাঁহার জীবদ্দশা-পর্য্যন্ত অন্নবস্ত্র দিবেন,—এইরূপ কথা মৌখিকভাবে বলেন। এই সকল ব্যাপার বৃন্দাবন মিশ্র জানিতে পারিয়া কৃষ্ণদাসকে মূল বিবাদী ও ফকির শতপথীকে মোকাবেলা-বিবাদী করিয়া তিন হাজার পাঁচশত টাকার দাবীতে নালিশ করেন। আদালতে ফকির শতপথীর সমর্পণপত্র বেনামী সাব্যস্ত হইয়া মহান্ত কৃষ্ণদাসের নামে চারিহাজার টাকার ডিক্রী হয়। তখন মঠের চারিটি মাত্র ভগ্ন কুঠরী ছিল। এক কুঠরীতে ঠাকুর, আর একটিতে রন্ধন-কার্য্য ও অন্য দুইটিতে কৃষ্ণদাস ও একব্যক্তি থাকিতেন। এই অবস্থায় কৃষ্ণদাস দেহত্যাগ করেন।

এদিকে মহাজন বৃন্দাবন মিশ্র ডিক্রীদার কাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী জারি করিয়া টাকা আদায় বা সম্পত্তি হস্তগত করিবেন, তাহার উপায়-নির্দ্ধারণের জন্য যে কানুনগোর এলাকায় ঠাকুরের সম্পত্তি আছে, তাহার সহিত পরামর্শ ও বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। মহান্ত কৃষ্ণদাস অন্য ওয়ারিশ না রাখিয়া দেহ ত্যাগ করায় তাহার সম্পত্তি 'বেওয়ারিশী'

* ভক্তিরত্নাকরে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্যগণের যে তালিকা আছে তাহাতে 'সেবাদাস' নাম পাওয়া যায় না।

ধরিয়া বিশেষ করাইয়া লন। পুলিস-তদন্তে প্রকাশ পাইল যে, মৃত কৃষ্ণদাসের ত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে অস্থাবর সম্পত্তি কেবল শ্রীরাধাকান্তদেব-শ্রীবিগ্রহ ও কয়েকটি জানালা-কপাট, সুতরাং তাহা নীলাম হইল ও নীলামের টিন ধার্য্য হইল।

তখন শ্রীরাধাবল্লভ-চরণদাস বাবাজী তাঁহার অনুগত লোকের দ্বারা ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়া শ্রীবিগ্রহকে পুনরায় উক্ত মঠে স্থাপন করেন।

এদিকে নীলামের টিন অদ্বৈতদাস নামক জনৈক ব্যক্তিকে সেবাইত-স্বরূপে স্থাপন করিতে আপত্তির দরখাস্ত করান হয়। সরকারবাহাদুর অদ্বৈতদাসকে কৃষ্ণদাসের এত্তারিল সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার হস্তে সমস্ত প্রদান করেন। কিছুদিন পরে অদ্বৈতদাস তাঁহার গুরুভাই নিত্যানন্দ-দাসকে সেবাইত-পদে নিযুক্ত করিয়া স্থানান্তরে গমন করেন। ১৩১২ সালে শ্রীচরণদাস বাবাজী স্বধাম গমন করিলে নিত্যানন্দদাস উক্ত মঠের ঠাকুর-সেবা-সহ যাবতীয় সম্পত্তি শ্রীজগন্নাথদেবের সরকারে সমর্পণ করেন। তখন শ্রীরামদাস বাবাজী উক্ত মঠটী লইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। খরচা-বাবদ শ্রীজগন্নাথদেবের ষ্টেট্ হইতে এক হাজার টাকা দাবী হইলে তিনি ছয় শত টাকা দিয়া নিষ্পত্তি করেন। নিত্যানন্দদাস শ্রীরামদাস বাবাজীর নামে ঐ মঠ যথারীতি সমর্পণ করেন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরের শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলমূর্ত্তিসহ অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

১৫। শ্রীকুঞ্জ-মঠ

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর শিক্ষাশিষ্য শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু; তাঁহারই শিষ্য শ্রীরসিকানন্দপ্রভু এই মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। একবার শ্রীরসিকানন্দপ্রভু শ্রীরথযাত্রার পূর্ব্বে যাত্রাদর্শনার্থ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া যেন পবনবেগে শ্রী-নীলাচলের অভিমুখে চলিতেছিলেন। কিন্তু শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই শ্রীরথযাত্রা-মহোৎসব আরম্ভ হইল। শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলভদ্র ও শ্রীসুভদ্রা শ্রীরথে আরোহণ করিয়া 'বলগণ্ডি-স্থানে' উপস্থিত হইলেন। শ্রদ্ধাবালু ও অর্দ্ধাসনীদেবীর মধ্যবর্ত্তি-স্থানকে 'বলগণ্ডি-স্থান' বলে। বলগণ্ডি-স্থানে আসিয়া রথ আট্‌কাইয়া রহিল। লক্ষ লক্ষ যাত্রী রথের রজ্জু ধরিয়া টানিলেন, রথ একটুও বিচলিত হইল না; স্বয়ং রাজা, পাত্র, মিত্র, মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির সাহায্যে রজ্জু ধরিয়া টানিতে লাগিলেন; কিন্তু যে স্থানের রথ, সেই স্থানেই থাকিল। রাজা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। এই সময় শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহার 'মুদিরথ'-সেবকের • হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি করাইলেন যে, তাঁহার প্রিয় ভক্ত শ্রীরসিক-মুরারি—যিনি উৎকলে ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন-প্রচার, সাধু ও বৈষ্ণবের সেবায় লোককে নিয়োগ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-মহোৎসবাদি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবর শ্রীরথ-যাত্রা দর্শনার্থ আসিতেছেন, তিনি আসিয়া প্রভুর রথ স্পর্শ না করা পর্য্যন্ত প্রভু কিছুতেই বিচলিত হইবেন না।

মুদিরথের নিকট রাজা এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীরসিকানন্দপ্রভুকে আনিবার জন্য কএকজন দূত প্রেরণ করিয়া রাজা স্বয়ং অনুগমন করিলেন। আঠারনালাতে গিয়া রাজা শ্রীরসিকানন্দপ্রভুর দর্শন পাইলেন এবং আচার্য্যের শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইয়া তাঁহাকে বহু স্তব-স্তুতি করিলেন। বহু যাত্রীও শ্রীরসিকানন্দের দর্শনলোলুপ হইয়া তৎসন্নিধানে গমন করিলেন; শ্রীরসিকানন্দপ্রভু 'বলগণ্ডি-স্থানে' আসিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলেন এবং পঞ্চরত্ন, বস্ত্র, আভরণ ও বিভিন্ন দ্রব্য-সম্ভার—যাহা যাহা ভোগের জন্য আনিয়াছিলেন, তাহা সকলই সমর্পণ করিলেন। শ্রীজগন্নাথের শ্রীচক্রবদন দর্শন করিয়া শ্রীরসিকানন্দের নয়নে অশ্রু-গঙ্গাধারা ও শ্রীঅঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক-বিকার প্রকাশিত হইল। শ্রীরসিকানন্দ সংকীর্ত্তন-গোষ্ঠীর সহিত শ্রীরথাগ্রে নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

এদিকে প্রতিহারী শ্রীরসিকানন্দের নিকট আসিয়া জানাইলেন,—"আপনি রথের-দড়ি ধরিয়া না টানিলে কিছুতেই রথ চলিতেছে না।" ইহা শুনিয়া শ্রীরসিকানন্দ অত্যন্ত দৈন্যভরে রথস্তম্ভে মস্তক প্রদান-পূর্ব্বক রথ ঠেলিতে লাগিলেন। শ্রীরসিকের মস্তক স্পর্শ-মাত্রই তিনটী রথই চলিতে আরম্ভ করিল এবং বালিনয়-নামক স্থানে রথ আসিয়া উপনীত হইল। তথায় রথ নয়-দিন অবস্থান করিল। শ্রীরসিকানন্দ সমস্ত মহান্তের সহিত আলাপ-

• শ্রীজগন্নাথদেবের ছত্রিশ প্রকার সেবকের অন্যতম। শ্রীরথযাত্রার সময় ইঁহারা শ্রীবিগ্রহের অঙ্গসংস্কার, আরতি, ভোগনিবেদনাদি করেন। এই সব 'মুদ্রাহস্তে'র অপভ্রংশ।

সম্ভাষণাদি করিলেন। যত বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, পণ্ডিত—সকলেই শ্রীরসিকানন্দের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। স্বয়ং গজপতি শ্রীরসিককে মহাপুরুষরূপে অনুভব করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলেন। শ্রীরসিকানন্দ শ্রীনীলাচলের সমস্ত তীর্থ, মঠ ও শ্রীশ্রীগৌর লীলাস্থলীসমূহ দর্শন করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন

পুরীতে বালিসাহী পল্লীর মধ্যে শ্রীজগন্নাথদেবের 'ঘুলতোটা'-নামক একটি স্থান ছিল; 'তোটা' বা 'টোটা' শব্দের অর্থ—উদ্যান। পূর্ব্বে এই স্থান হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের পূজা ও শৃঙ্গারের জন্য যাবতীয় ফুল যাইত। শ্রীরসিকানন্দ একটি মঠ-স্থাপনের জন্য সেই স্থানটি রাজার নিকট হইতে যাচ্ঞা করিয়া লইলেন। শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের 'কূর্ম্মবেড়ে'র মন্দির-মধ্যে 'বটকৃষ্ণ'-নামক যে প্রসিদ্ধ নবনীতিরাম 'শ্রীবটকৃষ্ণ'বিগ্রহ ছিলেন, তাহাও রাজার নিকট হইতে ভিক্ষা করিলেন। রাজা সানন্দে শ্রীরসিকানন্দকে সেই 'ঘুলতোটা'-স্থান ও 'শ্রীবটকৃষ্ণ' শ্রীবিগ্রহ এবং তাঁহার স্থায়ি-সেবার জন্য ভূসম্পত্তি দান করিলেন। শ্রীরসিকানন্দ-প্রভু শ্রীকৃষ্ণের বামে শ্রীরাধা ও দক্ষিণে শ্রীললিতা-দেবীকে স্থাপন করিয়া মঠের প্রতিষ্ঠা করিলেন। শ্রীবিগ্রহের নাম রাখিলেন—**'শ্রীশ্রীরাধা-রসিকরায়'** এবং মঠ **'ঘুলতোটা-মঠ'**-নামে প্রসিদ্ধ হইল: পরে এই মঠের নাম—'শ্রীকুঞ্জমঠ' হয়। কোন্ সময় হইতে এই নামের পরিবর্ত্তন হইল, তাহার সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। হয় ত' এই পুষ্পোদ্যান শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব বা শ্রীশ্রীরাধা-রসিকরায়ের কেলিকুঞ্জের মত শোভমান হওয়ায় ভক্তগণ ইহাকে 'শ্রীকুঞ্জ-মঠ'-নামে অভিহিত করিয়া থাকিবেন। 'শ্রীরসিকমঙ্গল'-গ্রন্থে শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর প্রতিষ্ঠিত এই মঠ-সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ আছে,—

রাজা-স্থানে ভূমি মাগি' দক্ষিণ পারশে।
ঘুলতোটা-মঠ কৈল মনের হরিষে॥
যার হাত তিন যোগ্য মালা হয় নিতি।
নিয়োজিত কৈল দশ পাঁচ সেবাইত॥
দশ-বিশ আবড়া কৈল ভোগ নির্ব্বে।
গ্রাম নিয়োজিত করি' দিল নিজ-স্থানে॥
অনেক দিলেন দ্রব্য সর্ব্ব-দ্বিজগণে।
বস্ত্র-আভরণ দিল ক্ষেত্রবাসী জনে॥
সবাকারে সন্তুষ্ট করিলা রসিকেন্দ্র।
বিদায় করিল প্রভু মনের আনন্দ॥"

শ্রীরসিকমঙ্গল, ৬ বি ১০ম ল, ৪৯-৬২ সংখ্যা)

শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু ও শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর তিরোভাব-উৎসব এই স্থানে বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরস্থ গদ্দির অধীনেই এই মঠের পরিচালনা হয়। পুরী, বালেশ্বর ও মেদিনীপুর জেলায় শ্রীকুঞ্জ-মঠের ভূসম্পত্তি আছে। শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের বর্ত্তমান মহান্ত বহুগুণভাজন শ্রীযুক্ত গোবিন্দ-গোপালানন্দ দেবগোস্বামী মহাশয় এই মঠের মহান্ত। মহান্তের অধীনে স্থানীয় মঠ পরিচালনা করিবার জন্য একজন অধিকারী থাকেন। মহান্ত সকল স্থানে উপস্থিত হইতে পারেন না বলিয়া অধিকারিগণও শিষ্যাদি করেন। শ্রীকুঞ্জ-মঠের বর্ত্তমান অধিকারী শ্রীতুলসীচরণদাস: আমরা যখন শ্রীকুঞ্জমঠের এই বিবরণ সংগ্রহ করি, তখন মহান্ত মহারাজ তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে এই-সকল তথ্য প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীকুঞ্জমঠের শ্রীমন্দিরে পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া শ্রীশ্রীরসিক-রায়-শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত। শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগৌরবিগ্রহ নাই। তৎপরে শ্রীজগমোহন। জগমোহনের পর নাট্য-মন্দির। গর্ভমন্দিরটি শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর সময়ের; কিন্তু জগমোহনটি মেদিনীপুর-জেলার পলাশী নামক স্থানের একজন ভূম্যধিকারী বহু পূর্ব্বে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার নাম জগমোহন-মন্দিরের একটি প্রস্তরফলকে খচিত ছিল। কিন্তু উহার উপর পুনঃ পুনঃ চূণকাম হওয়ায় অক্ষরগুলি আর দৃষ্টিগোচর হয় না। শ্রীযুত মহান্ত মহারাজ জানাইলেন যে, এই মঠে অনেক হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি ছিল, কিন্তু অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে ইহার তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত থাকায় সমস্ত পুঁথি চুরি-গোপন করিয়াছে।

এই স্থান শ্রীজগন্নাথদেবের ঘুলতোটা বা পুষ্পোদ্যান ছিল, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে এখান হইতে শ্রীজগন্নাথ-দেবের সেবার জন্য প্রচুর ফুল যাইত। বর্ত্তমানে এখন সেই ফুলের বাগানের বিস্তৃতি ও সৌষ্ঠব না থাকিলেও প্রত্যহ বা বিশেষ বিশেষ উৎসবোপলক্ষে ফুলের মালা ও পূজার ফুল শ্রীমন্দিরে প্রেরিত হয়। সিংহারী পাণ্ডারা এখান হইতে বার্ষিক ২৲ দুই টাকা করিয়া বক্সনী পা'ন।

মঠের প্রাঙ্গণে শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের কোনও গোস্বামিনীর একটি সমাধি আছে। তিনি শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া শ্রীক্ষেত্রবাস: লাভ করিয়াছিলেন।

অন্যান্য মঠ

পূর্ব্বোক্ত মঠ-সমূহ ব্যতীত আরও কয়েকটি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মঠ শ্রীপুরুষোত্তমে দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই সকল মঠের পরবর্ত্তী সেবাইতগণের সেবা-শৈথিল্য জনিত অপরাধফলে তাহা সংলিষ্ট, মহৎসঙ্গ বা ভাগবতিক শিক্ষাদির অভাব নিবন্ধন মঠের অস্তিত্ব নাম মাত্রে, কোথাও বা স্থান-মাত্রে, কোথাও বা অতি অল্প ও অপরাধের সহিত শ্রীমূর্ত্তির সেবার অভিনয়-মাত্রে পর্য্যবসিত হওয়ায় মঠগুলি লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। মার্কণ্ডেয়র-সাহীতে **'জাবেলীমঠে'** প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাওয়া গেল, একটি পঞ্চবর্ষীয় বালক কৌপীন আটিয়া কেবল শ্রীমূর্ত্তির পাহারায় রহিয়াছে। অনেকক্ষণ অবস্থানের পর আর একটি অশেক্ষাকৃত বয়স্ক বালক আসিয়া শ্রীবিগ্রহের নাম শ্রীরাধাশ্যামসুন্দর, শ্রীরাধা-রসিকরায় ও শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বলিয়া জানাইলেন এবং তাঁহাদের গুরু-পীঠ শ্রীজগন্নাথ-মঠ ও বর্ত্তমান অধিকারী শ্রীজ্ঞানসুন্দরদাস—এই মাত্র বলিতে পারিলেন।

'বহুরিয়া-মঠ' নামে আর একটি মঠে শ্রীশ্রীরাধা-শ্যামরায় শ্রীবিগ্রহ আছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি নাই। মঠের বর্ত্তমান অধিকারী—শ্রীবৃন্দাবনদাস। অধিকারী উপস্থিত ছিলেন না, তিনি জমিদারীতে গিয়াছেন। মঠের কোন ব্যক্তি আর কোন তথ্যই দিতে পারিলেন না, তবে ভূসম্পত্তির আয় প্রায় পনরশত টাকা জানাইলেন। মঠের সংলগ্ন একটি বিস্তৃত উদ্যান আছে। মঠটী মার্কণ্ডেয়রসাহী পল্লীতে অবস্থিত।

হরচণ্ডীসাহীতে শ্রীরাধাবল্লভের-মঠ বা নাগা-প্রেমদাস-মঠের সংলগ্ন পূর্ব্বদিকে **'শ্রীরাধাবল্লভ-মঠ'**-নামে একটি সঙ্কীর্ণ মঠ-গৃহ দৃষ্ট হয়। ঐ মঠে প্রবেশ করিয়া জানা গেল যে, উক্ত মঠের অধিকারী নরসিংহদাসের স্বধাম-গমনের পর উক্ত অধিকারীর দুই জন চেলার মধ্যে মামলা-মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছে। ছোট চেলাটি নাবালক, পাড়ার লোকেরা তাহাকেই সমর্থন করিতেছেন। বড় চেলাটি যুবক ও বিলাসী। ঘরে তালা পড়িয়াছে, পুলিস দিবা রাত্র মোতায়েন আছে। একটি অত্যন্ত অন্ধকারময় গৃহে শ্রীবিগ্রহগণ অবস্থিত আছেন। এই মঠের সেবাইতগণ গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মঠসমূহ যাবতীয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মঠের সহিত পাংক্তেয় হইবার অভিলাষী কয়েকটি মঠের নামও এতৎপ্রসঙ্গে আলোচিত হওয়া আবশ্যক। ইহাদের মধ্যে প্রধান মঠ অতিবাড়ী শ্রীজগন্নাথদাসের প্রতিষ্ঠিত 'বড়-উড়িয়া-মঠ'। অতিবাড়ীগণের 'সান-উড়িয়া-মঠ'-নামে তৎসংলগ্ন আর একটি মঠ ছিল; কিন্তু উক্ত মঠের যুবক-অধিকারী অত্যন্ত বিলাসপরায়ণ হওয়ায় ঋণগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহাতে ঋণের দায়ে উক্ত মঠটি কিছুদিন হইল সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে। শুনা যায়, বড়-উড়িয়ামঠ উহা ক্রয় করিয়া লইয়াছেন।

বড়-উড়িয়া-মঠটি একটি দুর্গের ন্যায়। ৪৫ ভ' বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এইরূপভাবে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। মঠের মন্দিরে শ্রীরসিকরায়, শ্রীশ্যামরায় ও শ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীমূর্ত্তি এবং জগমোহনে ষড়ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গ-মূর্ত্তি আছেন। মঠের একটি প্রকোষ্ঠে উড়িয়া-মঠের গুরুপরম্পরা এবং প্রত্যেক মহান্তের চিত্রপট নিম্নে তাঁহাদের নামের সহিত ক্রমানুসারে লক্ষিত আছেন। সেই প্রকোষ্ঠে অতিবাড়ী শ্রীজগন্নাথদাসের গদি বা আসন রহিয়াছে। উড়িয়ামঠে এইরূপ গুরুপরম্পরা লিখিত আছে,—**শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, শ্রীহৃদয়ানন্দ পণ্ডিত, শ্রীবলরামদাস, অতিবাড়ী শ্রীজগন্নাথ-দাস,** অধিকারী শ্রীরামকৃষ্ণদাস, শ্রীমুরারিদাস গোস্বামী, শ্রীপুরুষোত্তমদাস গোস্বামী, শ্রীমুকুন্দদাস গোস্বামী, শ্রীমাধবা-নন্দদাস গোস্বামী, শ্রীশ্রীনাথদাস গোস্বামী, শ্রীবংশীবরদাস গোস্বামী, শ্রীশ্যামচরণদাস গোস্বামী, শ্রীনীলাম্বরদাস গোস্বামী, শ্রীরাসবিহারীদাস গোস্বামী, শ্রীরামকৃষ্ণদাস গোস্বামী, শ্রীবৃন্দাবনদাস গোস্বামী (বর্ত্তমান মহান্ত)।

শ্রীহৃদয়ানন্দপ্রভুর শিষ্য শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটলীলা দর্শন করেন নাই। অতিবাড়ী-গণের গুরুপরম্পরানুসারে শ্রীবলরামদাস, শ্রীহৃদয়ানন্দের শিষ্য অর্থাৎ শ্রীশ্যামানন্দের গুরুভ্রাতা হইলে সেই শ্রীবলরাম-দাসের শিষ্য অতিবাড়ী শ্রীজগন্নাথদাস কি করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, আশা করা যায়?

শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু বা শ্রীশ্যামানন্দের সমসাময়িক শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ইঁহারা কেহই শ্রীরূপ সনাতনের প্রকট-লীলা দর্শন করেন নাই, সুতরাং অতিবাড়ী শ্রীজগন্নাথদাস যে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিজের গোপীস্বরূপ দেখাইয়াছিলেন প্রভৃতি উক্তি আছে, ইহার সঙ্গতি কিরূপে হয়? কটক হইতে প্রকাশিত গত ১৮ই মার্চের (১৯৪৫) 'নিউ উড়িষ্যা' (New Orissa) নামক একটি ইংরাজী দৈনিক-পত্রে 'অতিবাড়ী জগন্নাথদাস' শীর্ষক প্রবন্ধে রেভেন্সা কলেজের অবসরপ্রাপ্ত সংস্কৃতাধ্যাপক রায়বাহাদুর আর্ত্তবন্ধু মহান্তী লিখিয়াছেন,—

"Mahapurush *Jaganath Das* was a *personal friend of Chaitanya.* It is written in Dibakar Das's Jaganath Charithamrith that Gaudiya Baishnavas did not like that Chaitanya should hold Jaganath Das, the Oriya Brahmin Saint, in high esteem. It was at their insistence that Chaitanya asked Balaram Das to formally initiate Jaganath Das though as a perfect being he required no formal inciation. After that, when they saw Chaitanya still loving Jaganath Das and addressing him all the while as "Atibadi", The Gaudiya Baishnavas had in a rage to leave Puri and go back to Bengal. They stayed for some time at Jajpur. Chaitanya went there to bring them back, but to their surprise they found Jaganath Das accompanying Chaitanya.

They were so arrogant that they did not listen to Lord Chaitanya and had to go to Banabishnupur and from there to Brindaban. It is a pity that there is no mention of the names of Jaganath Das and other four mahapurushas in Chaitanya Charitamrut by Krishna Das Kabiraj, Chaitanya Bhagabat dy Brundaban Das and Chaitanya Mangal by Lochan Das. They were all Bengali Baishnavas. The Gaudiya Baishnavas go so far as to say that Jaganath Das was a Mayabadi and was driven out by Chaitanya Chandra from his fold."

রায়বাহাদুর মহান্তী মহাশয়ের উক্তিগুলির মধ্যে যে মাৎসর্য্যের উদ্গার ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সুধীগণ বেশ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কিন্তু ঐতিহাসিক সঙ্গতির দিক্ হইতেও অতিবাড়ী মঠেরই স্বীকৃত গুরুপরম্পরানুসারে মহান্তী মহাশয়ের উক্তিগুলি নিরর্থক হইয়া পড়ে। ইহা যেন 'মাথা নাই, তা'র মাথা-ব্যথা'র মত নিরর্থক মাৎসর্য্যোত্থ বাগ্‌বেগ। অতিবাড়ী জগন্নাথদাস যত বড় পণ্ডিতই হউন না কেন, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে পঞ্চম অবস্থানের অন্তর্গত হইয়া নীলাচলে কিরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন? অতিবাড়ীগণের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, শ্রীদেবকীনন্দনদাসের ভণিতায় রচিত 'বৈষ্ণব-বন্দনা'য় উড়িষ্যা শ্রীবলরামদাস ও সঙ্গীত-পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথদাসের নামোল্লেখ আছে, সুতরাং তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ-মধ্যে গণিত। 'শ্রীসিদ্ধবকুল-মঠে'র বিজ্ঞ মহান্ত বলেন যে, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর হইতে শ্রীসিদ্ধবকুল-মঠের যে গুরুপরম্পরা আছে, তাহাতে সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথদাস শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের অনুগত ছিলেন জানা যায়। এই মহান্তগণ শ্রীসিদ্ধবকুল-মঠে ষড়ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গ-মূর্ত্তি ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। 'বৈষ্ণব-বন্দনা'য় যে সঙ্গীত-পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথদাসের নাম আছে, তাহা যে, এই সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথদাস নহেন, তাহা কে বলিতে পারে? এই শ্রীজগন্নাথদাস সঙ্গীতে পণ্ডিত ছিলেন ও শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে কীর্ত্তন করিতেন।

অধ্যাপক মহান্তীর অন্যান্য যুক্তিগুলি এত অসার যে, তাহা উচ্চার-মাত্রই সুধীগণের নিকট উহা আহম্মকী বলিয়া বিবেচিত হয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু, শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বা শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর কাল্পনিক ইতিহাস প্রস্তুত করিয়া অতিবাড়ী জগন্নাথদাসকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক করিতে পারেন না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক পণ্ডিতবর শ্রীবল্লভাচার্য্যের সম্বন্ধে নিরপেক্ষ সত্যকথা বলিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করেন নাই। রায়বাহাদুর মহান্তী মহাশয় শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবৃন্দকে হিংসুক ও উদ্ধত বলিয়াছেন,—এই কথার উত্তর—কেবল অট্টহাস্য। মহান্তী মহাশয় কি কামলা-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন? মহান্তী মহাশয় প্রাদেশিকতা ও জাতীয়তার গোঁড়ামিকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার পূজনীয় গুরু শ্রীজগন্নাথদাসকে উড়িষ্যা এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ও তদনুগত শ্রীব্রজপরিকরগণকে জাতি-সামান্যের গণ্ডিতে আনয়ন করিতে

চাহিয়াছেন ! ইহাই কল্পকড়চার্তবাদ—যাহার শেষ-পরিণতি মায়াবাদ। দিবাকর দাসের জগন্নাথ চরিতামৃতে যদি ঐতিহাসিক ভুল থাকে, তবে তাহার প্রমাণের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অস্তিত্ব-উৎপাটন (?) বা সত্যের পরিবর্ত্তন হইবে না। অনেক নিরপেক্ষ সজ্জন উৎকলবাসী স্বীকার করিয়াছেন যে, জগন্নাথদাসের ভাগবত পদ্যানুবাদের মধ্যে বহুস্থানে মায়াবাদগন্ধ আছে। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী না হয় রায়রামানন্দ বাঙ্গালী (?) বলিয়া ঈর্ষায় উড়িয়া মহাপুরুষের নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করেন নাই; কিন্তু এত বড় প্রসিদ্ধ মহাপুরুষের নাম এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর এত অতি-বড় বন্ধুর নাম কবিভূপতি শ্রীরায়রামানন্দ প্রভু, স্বয়ং শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব, উৎকল-কবি শ্রীগোবিন্দদেব বা শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী, শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী এবং উৎকলবাসী অন্যান্য শ্রীগৌরপরায়ণ মহাজনগণ কেহই করিলেন না কেন ? ইহা হইতে জানা যায় যে, শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত শ্রীজগন্নাথদাসের দেখাই হয় নাই এবং এই ঐতিহাসিক সত্য উড়িয়ামঠের গুরুপরম্পরার মধ্যদিয়াও প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। অসত্যকে সকল স্থানে জোড়াতালি দিয়া রাখা যায় না, একদিক্ না একদিক্ দিয়া তাহার স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

অতিবাড়ী শ্রীজগন্নাথদাসের শিষ্যসম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রদত্ত খেতাবটী (যদি তাহাদের কথাই ধরা যায়) গ্রহণ করিলেন, আর তাঁহারা শিক্ষার যে-সকল কথা আছে, তাহা গ্রহণ করিলেন না কেন ? শ্রীপুরীদাস শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামিপ্রভুই বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর এত অতি-বড় বন্ধুর সম্বন্ধে নীরব কেন ? একদিকে অতি-বড় বন্ধুটী, আর একদিকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত সমস্ত সেবকসম্প্রদায়কে রায়বাহাদুর তাঁহার যে তৌলদণ্ডে মাপিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তিনি তাঁহার গুরুদেবকে কার্য্যতঃ 'লঘু' করিয়াই ফেলিয়াছেন। অতি-বড় জগন্নাথদাস শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে কতটা কি লিখিয়াছেন আর কতটাই বা কি করিয়াছেন ? অতি-বড় বন্ধুটীর অনুগ্রহে শ্রীচৈতন্যদেবকে সমগ্র বিশ্ব কতটুকুই বা জানিয়াছেন, আর শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবৃন্দের দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের মহিমা জগতে কতটা প্রচারিত হইয়াছে, তাহা সুধী পাঠকগণ বিচার করিবেন। 'অতি-বড়'-খেতাবটী যে শ্লেষব্যঞ্জক ও তীব্র-কটাক্ষসূচক তাহা রায়বাহাদুর-খেতাবযুক্ত মহাভিমহাশয় কি ধরিতে পারেন নাই ? তিনি ত' সংস্কৃত-সাহিত্যে পণ্ডিত। 'বহুৎ' শব্দ কোন কোন স্থানে প্রধান করিলে বিপরীত অর্থও হয়। গুরুর উপর গুরুগিরি নিন্দা বলিয়াই কথিত হয়। 'অতি-ভাল ভাল নহে', 'অতি-বড় ভাল নহে'—সাধারণ নীতিশাস্ত্রেও ইহা শিক্ষা দেয়। শ্রীচৈতন্যদেব যদি কাহাকেও 'অতি-বড়' বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঔদ্ধত্য বা প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষাকেই 'অতি-বড় হওয়া' বলিয়াছেন। "সর্ব্বোত্তম আপনাকে মানে তৃণাধম" —ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা। সৈন্যমুখে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীহরিদাসঠাকুর তথা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমহাশয়-প্রভৃতি গৌড়ীয়-গুরুগণ সর্ব্বোত্তম হইয়াও আপনাদিগকে 'অতিনীচ,' 'পতিত', 'অস্পৃশ্য', 'অদৃশ্য', 'পামর', 'পুরীষের কীট হইতে লঘিষ্ঠ,' 'জগাই-মাধাই হইতে পাপিষ্ঠ,' 'অধম', 'চণ্ডাল' প্রভৃতি বলিয়া দৈন্যোক্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখনই তাঁহাদিগকে মান দান করিতেন, তখনই তাঁহারা জগদ্বিদারক দৈন্য প্রকট করিতেন। কিন্তু যদি 'অতিবাড়ী'-সম্প্রদায়ের গল্পগুলি বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের অধিনায়ককে প্রতিষ্ঠালোলুপ ব্যক্তিরূপেই দেখিতে হয়। তিনি 'অতি-বড়'-খেতাবকে বহুমানন করিয়াছিলেন, তিনি শ্রীপ্রতাপরুদ্রের নিকট নিজের গোপীস্বরূপ দেখাইয়া নিজের সাধুত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন—এই সকল কথা কখনও বিশ্বাসযোগ্য নহে। যদি বিশ্বাস করা যায়, তবে শ্রীজগন্নাথদাসের মহত্ত্বের হ্রাস হয়।

'অতি বড়' খেতাবটী যে জড়প্রতিষ্ঠাভিক্ষুক দাম্ভিক ব্যক্তিগণের প্রতি কটাক্ষ করিয়া ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রদত্ত হইত, তাহার সাক্ষ্য বহুস্থানে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের অতিবাড়ী রূপ-কবিরাজের নাম অনেকেই জানেন। শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণী এই রূপ-কবিরাজের গলার মালা ছিঁড়িয়া দিয়া 'অতিবাড়ী' খেতাব দিয়াছিলেন। ইহার পর রূপ-কবিরাজের এক-কণ্ঠী মালা হয়। অতিবাড়ী জগন্নাথ-সম্প্রদায়েও এতাবৎকাল এক-কণ্ঠী মালা ছিল। ইহারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুকরণে কিছুদিন হইল, দুই-কণ্ঠী মালা গ্রহণ করিতেছেন।

ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, অতিবাড়ী-সম্প্রদায়ের

ব্যক্তিগণ প্রাচীনকাল হইতে পুরীর প্রাচীন গৌড়ীয় বৈষ্ণব মঠসমূহের সহিত অপাংক্তেয়রূপে গণিত আছেন। যাঁহাদের সহিত শ্রীপুরুষোত্তমে পর্য্যন্ত শ্রীমহাপ্রসাদে ভোজন নিষিদ্ধ আছে, তাঁহারা যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কত বড় বন্ধু, তাহা আর অধিক করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। রাঘবাচার্য্যের মহান্তি-মহাশয় মহামহনীয় গৌড়ীয় গুরুবর্গের বিরুদ্ধে ঐরূপ অসংযত উক্তি না করিলে অতিবাড়ী-সম্প্রদায়ের কলঙ্কের গুপ্ত ইতিহাস উদ্ঘাটন করিবার আমাদের ইচ্ছা ছিল না।

উড়িয়া-মঠে আর একটি বিষয় লক্ষিতব্য যে, তথায় ষড়্ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি মূলমন্দির হইতে বাহিরে শ্রীজগন্মোহনে রক্ষিত আছেন, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সম-সিংহাসনে স্থাপিত নাই। পুরীর প্রত্যেক মঠেই দেখা যায়, গুরু বা ভক্তস্থানীয় ব্যক্তির শ্রীমূর্ত্তি ঐরূপভাবে শ্রীজগন্মোহনে রক্ষিত হন। উদাহরণস্বরূপ শ্রীরাধাকান্ত মঠ, শ্রীসিদ্ধবকুল-মঠ প্রভৃতি মঠে শ্রীজগন্মোহনস্থ শ্রীগোপালগুরুর শ্রীমূর্ত্তি বা শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। শ্রীসিদ্ধবকুলমঠে সিদ্ধ শ্রীল জগন্নাথদাসের প্রতিষ্ঠিত ষড়্ভুজ-শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সম-সিংহাসনেই আছেন। 'পুকণা-নহরে' শ্রীল প্রতাপরুদ্রের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরমূর্ত্তি শ্রীরাধাগোবিন্দের সহিত সম-সিংহাসনেই আছেন। এই সকল প্রমাণ হইতে সুস্পষ্ট-ভাবে জানা যায় যে, অতিবাড়ীগণ পরবর্ত্তিকালে উড়িয়া-মঠকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মঠের সহিত পাংক্তেয় করিবার জন্য ঐ সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।

কলিঙ্গিলক-মঠ

কেহ কেহ বলেন, এই মঠটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায় হইতে পরিত্যক্ত শ্রীরূপ-কবিরাজ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহা পুরীর মার্কণ্ডেশ্বরসাহী-পল্লীতে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এই মঠটি এককালে যে সমৃদ্ধিমান্ ছিল, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। এখনও মঠের যথেষ্ট ভূসম্পত্তি আছে। মঠের শেষ মহান্ত সদানন্দদাস কয়েক-দিবস হইল দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি শ্যামচরণদাসের শিষ্য ছিলেন। বর্ত্তমানে এক বৃদ্ধা মাতাজী ও এক পূজারী এখানে আছেন। তাঁহারা বলিলেন, পুরী-জেলার বাণপুরে সিংহেশ্বর-মঠ-নামে এক মঠ আছে, কলিঙ্গিলক-মঠ তাহারই শাখামঠ। এই মঠ খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হইল। একটি প্রকোষ্ঠে মহান্ত সদানন্দদাস হইতে উর্দ্ধতন পঞ্চদশ মহান্তের ১৫টি অস্থি-সমাধি ক্রমানুসারে সজ্জিত আছে। কিন্তু পূজারী বা মাতাজী উর্দ্ধতন দুই পুরুষের উপরে আর কাহারও নাম বলিতে পারিলেন না। ইহাদের গুরুপরম্পরা ও সিদ্ধ-প্রণালী বাণপুরে আছে, জানাইলেন।

একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে ধাতুময়ী শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন ও শ্রীশালগ্রাম আছেন।

বলভদ্রী আখড়া

পুরীর সর্ব্বত্রই উদাসীন সাধু-বৈষ্ণবের আসন ও তৎ-সংলগ্ন শ্রীমন্দিরসমূহ 'মঠ' নামে পরিচিত। কিন্তু মার্কণ্ডেয়-সরোবরের উত্তর-পশ্চিম-তীরে 'বলভদ্রী আখড়া' নামে একটী প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় ব্যক্তিগণের এবং এই আখড়ার বর্ত্তমান মহান্তের অভিমত এই যে, ভজন-পূজন অপেক্ষা ইহাদের বিশেষ কার্য্য—বৈষ্ণব-গণকে অবৈষ্ণব-সম্প্রদায় ও বিধর্ম্মি-সম্প্রদায়ের মূল আক্রমণ হইতে মূলভাবে রক্ষা করা। এইজন্য ইহা 'মঠ' নামে অভিহিত না হইয়া 'আখড়া'-নামে অভিহিত হইয়াছে। এই আখড়ার উৎপত্তি-সম্বন্ধে ইহারা বলেন যে, মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের কোন এক ব্যক্তি বহু পূর্ব্বে বৈষ্ণব-মত ধ্বংস (?) করিবার জন্য বৈষ্ণবগণের পুঁথিপত্র, মঠ-মন্দিরাদি বিনষ্ট ও দূষিত এবং প্রত্যহ বৈষ্ণব-চিহ্নধারী অন্ততঃ একটী ব্যক্তিকে হত্যা না করিয়া জল গ্রহণ করিত না। যদি কোনদিন দেহধারী বৈষ্ণব পাওয়া না যাইত, সেইদিন চিহ্নধারী বৈষ্ণবের মূর্ত্তি গড়িয়া ঐ মূর্ত্তিকে খণ্ড করিত। ঐ পাষণ্ডি-ব্যক্তির ঔদ্ধত্য সমূলে বিনাশ এবং বৈষ্ণবগণের দৈহিক রক্ষার জন্য বলভদ্রী আখড়ার সৃষ্টি হয়। শ্রীবৃন্দাবন, উজ্জয়িনী প্রভৃতি স্থানেও ঐরূপ আখড়া আছে। ইহারা সাধারণতঃ আপনাদিগকে 'গৌড়ীয়-সমাজের' বলিয়া পরিচয় দেন। ইহারা শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ, শ্রীনিম্বার্ক ও শ্রীমধ্বাচার্য্যের পদচিহ্ন তাঁহাদের আখড়ায় স্থাপন করেন। ইহারা দৈহিক বলের বিশেষ চর্চ্চা করেন। পুরীর বলভদ্রী আখড়ায় বীর-হনুমান-মূর্ত্তি, পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীগোপাল-মূর্ত্তি আছেন। বর্ত্তমান মহান্ত শ্রীরামদাসজী আপনাকে শ্রীবক্রেশ্বর-পরিবারভুক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। যে-কোন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ব্যক্তি এই মঠের মহান্ত হইতে পারেন। পুরীর সমস্ত বৈষ্ণব-

মঠের মহান্তগণ যখন যাঁহাকে মহান্ত বলিয়া স্থাপন করেন, তখনই তিনি মহান্ত-পদ লাভ করেন। পুরীর 'বলভদ্রী আখড়া'র শ্রীমধ্বাচার্য্যের চরণ-চিহ্ন আছে। বিভিন্ন স্থান হইতে বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বি ব্যক্তিগণ এখানে আসিয়া চারি-প্রকার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রণালী-অনুসারে পূজাদি করিতে পারেন। পুরীর সমস্ত মঠের মহান্তগণের সাহায্যে এই মঠের খরচ নির্ব্বাহ হয়। পূর্ব্বে এই আখড়ার সম্পত্তির আয় প্রায় এগার হাজার টাকা ছিল। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে এই গদির দুইজন মহান্তের মধ্যে মোকদ্দমা আরম্ভ হয়, তাহাতে সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়, এমন কি, আখড়ার বাস্তুভিটাও বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। পরে পুরীর সমস্ত মঠের মহান্তগণের সাহায্যে উক্ত আখড়ার বাস্তুভিটার উদ্ধার হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই আখড়ার কোন নিজস্ব সম্পত্তি নাই।

শ্রীপুরুষোত্তমোৎসব

আগামী ১১ই আষাঢ় (১৩৪২), ২৫শে জুন (১৯৩৫), সোমবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রাদিবস হইতে ২৭শে আষাঢ়, ১১ই জুলাই, বুধবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীরথযাত্রা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজ শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্য পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে গৌড়ীয়-মিশনের গড়পারবটির সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-মঠের বার্ষিক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ২৪শে আষাঢ়, ৭ই জুলাই, সোমবার দিবস বর্ত্তমানযুগে শুদ্ধভক্তি-সাম্রাজ্যের ধুরন্ধরাগ্রণী নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের একত্রিংশত্তম বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব। এতদুপলক্ষে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বর্ত্তমান শিষ্যবর্গ, গৌড়ীয়-মিশনের প্রাচীনতম সভ্য শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থগোস্বামী মহারাজের নেতৃত্বে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ব্যাখ্যা, শ্রীভাগবতধর্ম্মবিষয়িণী বক্তৃতা ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে।

শ্রদ্ধালু মহাশয়গণ উক্ত শ্রীভাগবত-সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসবে যোগদান করিয়া শ্রীভক্ত ও শ্রীভগবানের সেবা বরণ করুন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

উৎসব-পঞ্জী

১১ই আষাঢ়, ২৫শে জুন সোমবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা, শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুর ও শ্রীল শ্রীধর পণ্ডিতের বিরহোৎসব; ১২ই আষাঢ়, ২৬শে জুন, মঙ্গলবার—শ্রীল শ্যামানন্দ-প্রভুর তিরোভাব, শ্রীআলালনাথ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে মহোৎসবারম্ভ; ১৩ই আষাঢ়, ২৭শে জুন, শনিবার—শ্রীল রক্ষেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর আবির্ভাব; ২০শে আষাঢ়, ৩রা জুলাই, বুধবার—শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর বিরহোৎসব; ২২শে আষাঢ়, ৬ই জুলাই, শুক্রবার—যোগিনী একাদশীর উপবাস; ২৩শে আষাঢ়, ৭ই জুলাই, সোমবার—শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব; ২৬শে আষাঢ়, ১০ই জুলাই, মঙ্গলবার—শ্রীশ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনোৎসব; ২৭শে আষাঢ়, ১১ই জুলাই, বুধবার—শ্রীশ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভুর বিরহোৎসব, শ্রীশ্রী-জগন্নাথদেবের রথযাত্রা, শ্রীপুরুষোত্তমমঠের মহোৎসবের পূর্ণাহুতি।

স্বধাম-প্রাপ্তি

গত ১৬ই বৈশাখ, ২৯শে এপ্রিল, রাত্রি ১০ ঘটিকায় শ্রীমদনমোহনদাস ভক্ত মহাশয় শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে স্বধাম-গমন করিয়াছেন। ইনি ১৩১০ বঙ্গাব্দে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীপুরুষোত্তম-উৎসব-সংখ্যা

গৌড়ীয়

২৩শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২রা আষাঢ়, ১৩৫২ ; ১৬ই জুন, ১৯৪৫ { ৪৩শ-৪৮শ সংখ্যা

শ্রীপুরুষোত্তমধাম ও শ্রীচৈতন্যদেব

শ্রীপুরুষোত্তমধামের কথা শ্রুত হইবা মাত্রই শ্রীচৈতন্যদেবের কথা স্মৃতিপথে উদিত হয়, আর শ্রীচৈতন্যদেবের কথা কীর্ত্তিত হইবা-মাত্রই শ্রীপুরুষোত্তমধামের কথা হৃদয়ে জাগরিত হয়। পুরাণপুরুষ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসলীলার পর 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য'-নামে আত্ম-প্রকাশ করিয়া তাঁহার লীলাপরিশিষ্ট-পরাকাষ্ঠা শ্রীপুরুষোত্তম-ধামেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীস্বরূপ-রামরায় ও তাঁহাদের মিত্র শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীহরিদাস ও তদনুগবর শ্রীরঘুনাথ, শ্রীজীব, শ্রীকবিরাজ—সকলেই শ্রীপুরুষোত্তমবিহারী লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীচৈতন্যদেবকে তাঁহাদের অভীষ্টদেবতারূপে বরণ করিয়াছেন। এজন্য শ্রীনবদ্বীপবিহারী শ্রীগৌরহরি অপেক্ষা শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবরগণের নিকট শ্রীপুরুষোত্তমবিহারী শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য অনুভূত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব যেরূপ লীলাপুরুষোত্তম, শ্রীপুরুষোত্তম ধামও সেইরূপ সমস্ত ধামের মুকুটমণি ; কারণ, শ্রীক্ষেত্রে শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর গৌড়ীয়গণের প্রাণকোটি-সর্ব্বস্ব শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথ, মুক্তাচলরূপী শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীগিরিরাজ, শ্রীবংশীবট, শ্রীকালিন্দী, শ্রীগোপীনাথ-শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগোপীশ্বর-শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীবর্ষাণেশ্বর-শ্রীনামাচার্য্যের লীলাস্থল—সমস্তই প্রকটিত আছেন। তাই 'শ্রীকপিল-সংহিতা'-নামক পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র বলিতেছেন,—

"সর্ব্বেষাং চৈব ক্ষেত্রাণাং রাজা শ্রীপুরুষোত্তমঃ।
সর্ব্বেষাং চৈব দেবানাং রাজা শ্রীপুরুষোত্তমঃ॥"

নিখিল শ্রীবিষ্ণুক্ষেত্রের রাজা—শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম এবং নিখিল দেবতার ললাট—পুরুষোত্তম শ্রীমহাবিষ্ণু শ্রীঅদ্বিতীয় ও শ্রীঅধিদৈবত পুরুষোত্তমের অংশী—লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ; সেই শ্রী-সমন্বিত কৃষ্ণই—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যাঁহাকে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নরীবধারী' বলিয়া স্তব করিয়াছেন, তিনি শ্রীপুরুষোত্তম-শ্রীস্বরূপ-দামোদরের দ্বিতীয়স্বরূপ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীগৌর-হরি। তাঁহাকে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু 'নীলাচল-বিভূষণ' বলিয়া স্তব করিয়াছেন।

অচলব্রহ্ম বা দারুব্রহ্ম—শ্রীজগন্নাথদেবই সচলব্রহ্মরূপে শ্রীনীলাচল বিভূষণ শ্রীচৈতন্য-নিধি। শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভু সচল ও অচল শ্রীজগন্নাথকে 'শ্রীনীলাদ্রিতে' এইভাবে স্তুতি করিয়াছেন,—

"শ্রীজগন্নাথ নীলাদ্রি-শিরোমুকুটরত্ন হে।
দারুব্রহ্মন্ ঘনশ্যাম প্রসীদ পুরুষোত্তম॥
প্রফুল্লপুণ্ডরীকাক্ষ লক্ষ্মান্বিতচামর।
গুণ্ডিকোদর মাং পাহি নানাভোগপুরন্দর॥

নিজাধর-সুধাদ্যাদিস্নিগ্ধত্বাম্রফলাদিত।
সুভদ্রা-লালনব্যগ্র রামানুজ নমোঽস্তু তে ॥
ওড়িচা-রথযাত্রাদি-মহোৎসববিবর্দ্ধন।
ভক্তবৎসল বন্দে ত্বাং ওড়িচাধর্ম্মরক্ষক ॥
দীনহীনমহানীচ-দয়ার্দ্রীকৃতমানস।
নিত্যানূতনমাহাত্ম্য-দর্শিন্ চৈতন্যবল্লভ ॥"

ইহার অব্যবহিত পরেই শ্রীনীলাচলবিহারী শ্রীগৌর-হরিকে শ্রীল সনাতন এইভাবে স্তব করিয়াছেন,—

"শ্রীমচ্চৈতন্যদেব ত্বাং বন্দে গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
শচীনন্দন মাং ত্রাহি বহির্দুঃখমগাধ প্রভো' ॥
আজানুবাহো কেরাত নীলাচলবিভূষণ।
জগৎ-প্রবর্ত্তিত-স্বাদুচতুর্ভগবন্নামকীর্ত্তন ॥
অদ্বৈতাচার্য্য-সংস্থাবিন্ সার্ব্বভৌমাভিনন্দক।
রামানন্দ-কৃতপ্রীত সর্ব্ববৈষ্ণববান্ধব ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজ-প্রেমামৃত-মহাম্বুধে।
নমস্তে দীনলীনং মাং কদাচিৎ কিং স্মরিষ্যসি ?"

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন গাহিয়াছেন,—

"মহানন্দে সর্ব্বলোক 'জয় জয়' বলে'।
আইলা সকল-জগন্নাথ নীলাচলে ॥"
"আপনে শ্রীজগন্নাথ প্রকাশিরূপ ধরি'।
নিজে সংকীর্ত্তন-ক্রীড়া করে' অবতরি' ॥"
(চৈ ভা অ ৫।১২৯, ১৩৫)

শ্রীধামের নাম-বৈচিত্র্য

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-ধাম 'শ্রীক্ষেত্র', 'শঙ্খক্ষেত্র', 'দশাবতার-ক্ষেত্র', 'নীলাচল', 'পুরুষোত্তম,' 'পুরী' প্রভৃতি বিভিন্ন নামে প্রচারিত রহিয়াছেন। 'শ্রী'—লক্ষ্মীদেবী বা নীলাশক্তি-প্রকটিত ক্ষেত্র বলিয়া ইহা 'শ্রীক্ষেত্র'-নামে বিখ্যাত। এই ক্ষেত্রের আকার শঙ্খসদৃশ হওয়ায় ইহাকে 'শঙ্খক্ষেত্র' বলে। অনাদিকাল হইতে শ্রীক্ষেত্রে শ্রীবিষ্ণুর শ্রীদশাবতার-মূর্ত্তি পূজিত হইয়া আসিতেছেন বলিয়া ইহা 'দশাবতার-ক্ষেত্র'-নামে পরিচিত। কেহ কেহ বলেন,—'এই স্থানে নীলপর্ব্বত বিরাজিত ছিল, তাহা এক্ষণে বালুকারাশিদ্বারা আবৃত অথবা শ্রীনীলমাধব-ভাবুর উদয়াচল বলিয়া ইহা 'নীলাচল'-নামে খ্যাত হইয়াছেন।' মাদ্‌লা-পঞ্জিকায় (১) উক্ত হইয়াছে যে, জম্বুদ্বীপে ভরতখণ্ডের উত্তরদেশে লক্ষিণমহোদধির উত্তর-তীরে শ্রীপুরুষোত্তম-বৈকুণ্ঠে দশ-যোজন মধ্যে দক্ষিণাবর্ত্ত-শঙ্খের পঞ্চক্রোশব্যাপী নাভিমণ্ডলস্থ (২) নীলকন্দর-পর্ব্বতে পঞ্চচক্রশঙ্খপরক্ক নীলমণিপ্রতিষ্ঠিত নীলমাধব-মূর্ত্তি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহাপুরুষ (মহাবিষ্ণু বা পুরুষোত্তম) শ্রীজগন্নাথ বা লীলা-পুরুষোত্তম এই স্থানে অর্চ্চাবতাররূপে নিত্য অধিষ্ঠিত বলিয়া তাঁহার নামানুসারে এই ক্ষেত্র—'শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম'; ত্রিজগতের নাথ শ্রীবিষ্ণুর ধাম বা 'পুর' বলিয়া এই স্থান 'শ্রীজগন্নাথ' বা 'পুরী'-নামেও খ্যাতি হইয়াছেন।

তত্তদেকাত্মরূপের স্ব-স্ব-ধাম-সহ ব্রহ্মাণ্ডে অধিষ্ঠান

শ্রীধাম-পুরুষোত্তম গোলোক-বৈকুণ্ঠ। শ্রীভগবান্ কখনও বিভিন্ন-মূর্ত্তিতে নিজ পরিকর ও ধামসহ অবতীর্ণ হন, কখনও বা নিত্য-অর্চ্চাবতার স্ব-স্ব ধামসহ জগতে প্রকটিত করিয়া তথায় নিত্য অধিষ্ঠিত থাকেন।

"যদ্যপি পরব্যোম সবাকার নিত্যধাম।
তথাপি ব্রহ্মাণ্ডে কা'রো কাঁহো সন্নিধান ॥
মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান।
নীলাচলে পুরুষোত্তম—'জগন্নাথ'-নাম ॥
প্রয়াগে 'মাধব', বারাণসীতে 'শ্রীমধুসূদন'।
আনন্দারণ্যে 'বাসুদেব', 'পদ্মনাভ', 'জনার্দ্দন' ॥
বিষ্ণুকাঞ্চীতে 'বিষ্ণু' রহে, 'হরি' মায়াপুরে।
ঐছে আর নানা-মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে ॥
এইমত ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে সবার পরকাশ।
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে যাঁহার বিলাস ॥
সর্ব্বত্র প্রকাশ তাঁ'র—ভক্তে সুখ দিতে।
জগতের অধর্ম্ম নাশি' ধর্ম্ম স্থাপিতে ॥"
(চৈ চ ম ২০।২১২, ২১৫-২১৯)

(১) মাদ্‌লা-পঞ্জিকা—উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাস-স্বরূপ মাদ্‌লা-পঞ্জিকা। এই পঞ্জিকা লম্বালম্বিভাবে তালপত্রে লিখিত হইয়া মর্দ্দলাকারে বদ্ধ থাকায় ইহার নাম 'মাদ্‌লা-পাঞ্জী' হইয়াছে। ইহাতে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের ও উড়িষ্যার নৃপতিগণের ইতিবৃত্ত লিখিত হইয়াছে।—মঃ মঃ সদাশিব মিশ্র।

(২) দক্ষিণাবর্ত্ত-আকার শ্রীপুরুষোত্তমের নাভিমণ্ডলে শ্রীনীলমাধবের উদয়াচল—পঞ্চক্রোশব্যাপি ক্ষেত্র।

অধিষ্ঠানলীলা-প্রাকট্য

অপ্রাকৃত অন্বয়জ্ঞানতত্ত্বের আবির্ভাব কোন জড়ীয় কাল, জড়ীয় স্থান বা জড়ীয় পাত্রের অন্তর্গত হইতে পারে না। ইহা বুঝিতে না পারিয়া আধ্যক্ষিক, প্রত্নতাত্ত্বিক বা গবেষকগণ অনাদি-বস্তুর আদি, ঐতিহ্যের অতীত অপ্রমেয় পরব্রহ্মের ইতিহাস ও ব্যাভিচারী প্রমাণসমূহ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দিশাহারা হইয়া পড়েন এবং নানাপ্রকার অনুমান ও কল্পনার আশ্রয়ে স্বয়ং বঞ্চিত হ'ন এবং অপরকে বঞ্চিত বা বিপথগামী করেন। অনাদি-বস্তুর আদি অনুসন্ধান ও অপ্রাকৃতের প্রাকৃত-ইতিহাস নির্ণয় করিবার কৌতূহলরূপ বিপ্রলিপ্সা পরিত্যাগ করিয়া শ্রৌত-প্রমাণ আশ্রয় করিবার উপদেশই বেদ পুনঃ পুনঃ প্রদান করিয়াছেন। শাস্ত্রমূর্ত্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে শ্রৌত উপদেশ শ্রবণ করিতে হয়। এই পদ্ধতি লঙ্ঘন করিয়া যাহারা শ্রৌত-প্রমাণের আলোচনায় কৌতূহল প্রকাশ করে, তাহারাও বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে।

শ্রীনীলমাধব

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রাকট্য-সম্বন্ধে যে-সকল শ্রৌত-প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইতে জানা যায়, শ্রীব্রহ্মার প্রথম পরার্দ্ধে শ্রীনীলমাধব-মূর্ত্তিরূপে শ্রীচতুর্ব্যূহ-ভগবান্ শঙ্খ-ক্ষেত্র-নীলাচলে অবতীর্ণ হন। দ্বিতীয় পরার্দ্ধে মনু-সন্ধি এক-যুগ গত হইলে সত্যযুগ আরম্ভ হয়। সেই সময় ইন্দ্রদ্যুম্ন-নামে সূর্য্যবংশীয় এক পরম-বিষ্ণুভক্ত রাজা মালবদেশের অবন্তীনগরীতে রাজত্ব করিতেন। তিনি শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ-কার লাভ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। ভগবৎপ্রেরিত কোন এক বৈষ্ণব তখন শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নের রাজ-সভায় উপস্থিত হইয়া কথা-প্রসঙ্গে শ্রীনীলমাধবের কথা জ্ঞাপন করিলেন। রাজা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন ব্রাহ্মণকে শ্রীনীলমাধবের অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন। সকলেই বিফল-মনোরথ হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। একমাত্র রাজপুরোহিত শ্রীবিদ্যা-পতি বহু স্থান ভ্রমণ করিতে করিতে 'শবর'-নামক অনার্য্য-জাতিগণের একটি দেশে উপস্থিত হইলেন। সেই শবর-পল্লীতে উপনীত হইয়া 'বিশ্বাবসু'-নামক এক শবরের গৃহে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন; তথায় গৃহস্বামীর 'ললিতা'-নাম্নী একটি কুমারী কন্যাকে একাকিনী দেখিতে পাইলেন। কিছুক্ষণ পরে গৃহস্বামী শবর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক সেই ব্রাহ্মণ-অতিথির সেবা করিবার জন্য কন্যাকে আদেশ করিলেন। পরে শবরের বিশেষ অনুরোধে বিদ্যাপতি তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

বিদ্যাপতি দেখিতে পাইলেন, উক্ত শবর প্রত্যহ রাত্রিতে বাহিরে চলিয়া যান এবং তৎপর-দিবস মধ্যাহ্নে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; তখন শবরের শরীরে কর্পূর, কস্তুরী, চন্দনাদির গন্ধ পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি তাঁহার পত্নী ললিতা-কুমারীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ললিতা জানাইলেন, তাঁহার পিতা প্রত্যহ শ্রীনীলমাধবের পূজার্থ অন্যত্র গমন করেন।

এতদিন পরে শ্রীনীলমাধবের সন্ধান পাইয়া বিদ্যাপতির আনন্দের সীমা থাকিল না। শবরের আদেশ লঙ্ঘন করিয়াই ললিতা পতিকে শ্রীনীলমাধবের কথা জানাইয়া-ছিলেন। বিদ্যাপতি নীলমাধবের দর্শনপ্রাপ্তির জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অবশেষে একদিন কন্যার বিশেষ প্রার্থনায় বিশ্বাবসু বিদ্যাপতির চক্ষুঃ বন্ধন করিয়া তাঁহাকে শ্রীনীলমাধবের দর্শনে লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ পথ চিনিয়া রাখিতে না পারেন, এজন্যই বিশ্বাবসু ঐরূপ করিলেন; কিন্তু ললিতা তাঁহার স্বামীর অঞ্চলে কিছু তিল বাঁধিয়া দিলেন। শবর বিদ্যাপতিকে হাত ধরিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। শবরের অজ্ঞাতসারে বিদ্যাপতি আর এক হাতে পথে তিল ছড়াইতে ছড়াইতে চলিতে লাগিলেন। যখন শ্রীনীল-মাধবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন শবর বিদ্যাপতির চক্ষুর বন্ধন খুলিয়া দিলেন। বিদ্যাপতি শ্রীনীলমাধবের অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তিদর্শন-পূর্ব্বক আনন্দে নৃত্য ও স্তব করিতে লাগিলেন। শবর বিদ্যাপতিকে শ্রীনীলমাধবের নিকট রাখিয়া পূজোপকরণ কন্দমূল ও বনফুল আহরণার্থ অন্যত্র গেলেন। ইত্যবসরে ব্রাহ্মণ দেখিলেন, একটি নিম্নিত বাহুর নিকটস্থ একটি কূপে পতিত হইবা-মাত্র প্রাণত্যাগ করিল ও চতুর্ভুজমূর্ত্তি-ধারণপূর্ব্বক (সারূপ্য লাভ করিয়া) বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল। ইহা দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণও সেই বৃক্ষে আরোহণ-পূর্ব্বক উক্ত কূপে পতিত হইয়া প্রাণ-বিসর্জ্জনের চেষ্টা করিলেন। এমন সময় এইরূপ একটি আকাশবাণী হইল—"ব্রাহ্মণ! তুমি যে শ্রীনীলমাধবের দর্শন পাইয়াছ, তাহা সর্ব্বপ্রথমে ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজকে জ্ঞাপন কর।"

শবর বনমূল ও ফলমূল আহরণ করিয়া শ্রীনীলমাধবের পূজা আরম্ভ করিলেন; তখন শ্রীনীলমাধব শবরকে বলিলেন,—"আমি এতদিন তোমার প্রদত্ত বনমূল ও বনফল গ্রহণ করিয়াছি, এখন আমার ভক্ত শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের প্রদত্ত রাজসেবা গ্রহণ করিবার অভিলাষ হইয়াছে।"

শ্রীনীলমাধবের পূজা হইতে বঞ্চিত হইবেন, ভাবিয়া শবর নিজ জামাতা বিদ্যাপতিকে স্বগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, কিন্তু চতুরতার পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রীনীলমাধবের আবিষ্কারবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। রাজা মহানন্দে বহু লোকজন লইয়া শ্রীনীলমাধবকে আনয়ন করিবার জন্য অভিযান করিলেন। কিন্তু শ্রীনীলমাধব-বিগ্রহ দেখিতে না পাইয়া মহারাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন সৈন্য-সামন্তদ্বারা শবরপল্লী অবরোধ ও শবরকে বন্দী করিলেন। তখন রাজার প্রতি আকাশবাণী হইল—"শবরকে ছাড়িয়া দাও। নীলাদ্রির উপর একটি মন্দির নির্ম্মাণ কর; তথায় দারুব্রহ্মরূপে আমার দর্শন পাইবে, নীলমাধবমূর্ত্তিতে তুমি দর্শন পাইবে না।"

শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন-কর্ত্তৃক শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ

শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন প্রস্তরের দ্বারা শ্রীমন্দিরনির্ম্মাণার্থ 'বউলমালা'-নামক স্থান হইতে প্রস্তর আনয়ন করিবার ব্যবস্থা করিয়া তথা হইতে নীলকন্দরপর্য্যন্ত একটি পথ নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ পথে পাথর আনাইয়া সমুদ্রনাভিমণ্ডলে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন এবং 'রামকৃষ্ণপুর'-নামক একটি গ্রাম বসাইলেন। শ্রীমন্দির মাটির নীচে ৮০ হাত ও মাটির উপরে ১২০ হাত উচ্চ করা হইল। মন্দিরের উপর একটি কলস ও তাহার উপর একটি চক্র স্থাপিত হইল এবং মন্দিরকে সুবর্ণমণ্ডিত করা হইল। শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ শ্রীব্রহ্মার দ্বারা শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার অভিলাষ করিয়া ব্রহ্মার অপেক্ষায় বহুকাল যাপন করিলেন। এই সময়ের মধ্যে শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নের নির্ম্মিত মন্দির সমুদ্রের বালুকাদ্বারা আবৃত হইয়া গেল। ইতোমধ্যে 'সুরদেব', তৎপরে 'গালমাধব' প্রভৃতি কয়েকজন রাজা তথায় রাজত্ব করিলেন। গালমাধব বালুকাভ্যন্তর হইতে মন্দিরটি উদ্ধার করিলেন। এদিকে শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মার নিকট হইতে তাঁহার রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উক্ত মন্দিরটী তাঁহার রচিত বলিয়া দাবী করায় গালমাধব ঐ মন্দির নিজকৃত বলিয়া জানাইলেন। কিন্তু মন্দিরের নিকটবর্ত্তী কল্পবটস্থিত 'ঢুণ্ডি'কে—যিনি যুগ-যুগান্তর ধরিয়া শ্রীরামনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তথায় সমস্ত ব্যাপার দর্শন করিতেছিলেন, তিনি জানাইলেন যে, এই মন্দিরটী শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতে ইহা বালুকা-প্রোথিত হইয়া পড়িয়াছিল, গালমাধব রাজা তাহা উদ্ধার করিয়াছেন। গালমাধব-রাজা সত্যের অপলাপ করায় ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরের পশ্চিমে, শ্রীমন্দিরের বাহিরে ব্রহ্মার নির্দ্দেশানুসারে অবস্থান করিলেন। শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন শ্রীব্রহ্মাকে এই পরম-মুক্তিপ্রদায়ক ক্ষেত্র ও শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে শ্রীব্রহ্মা বলিলেন,—শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিদ্বারা প্রকাশিত এই শ্রীক্ষেত্র ও স্বপ্রকাশ শ্রীভগবান্‌কে প্রতিষ্ঠা করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। শ্রীজগন্নাথ ও তাঁহার শ্রীধাম এই প্রপঞ্চে শ্রীভগবৎকৃপায় নিত্য-অবস্থিত; তবে তিনি এই শ্রীমন্দিরের চূড়ায় একটি ধ্বজা বাঁধিয়া দিতেছেন, যাঁহারা দূর হইতে এই ধ্বজা দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন, তাঁহারা অনায়াসে মুক্তি লাভ করিবেন।

শ্রীদারুব্রহ্ম

শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ শ্রীনীলমাধবের দর্শন না পাইয়া অনশনব্রত অবলম্বন-পূর্ব্বক প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া কুশ শয্যায় শয়ন করিলেন। তখন শ্রীজগন্নাথদেব স্বপ্নে তাঁহাকে বলিলেন,—"তুমি চিন্তা করিও না, সমুদ্রের 'বাহিনুহান'-নামক স্থানে* দারুব্রহ্মরূপে ভাসিতে ভাসিতে আমি উপস্থিত হইব।" রাজা সৈন্যসামন্ত-সহ ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মাঙ্কিত শ্রীদারু-ব্রহ্মকে দর্শন করিলেন। রাজা বহু বলবান্ লোক ও হস্তী প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়াও সেই দারুব্রহ্মকে বিচলিত করিতে পারিলেন না। তখন শ্রীজগন্নাথদেব রাজাকে স্বপ্নে জানাইলেন,—"আমার পূর্ব্ব সেবক বিশ্ববসু—যিনি আমার শ্রীনীলমাধব-স্বরূপের পূজা করিতেন, তাঁহাকে এখানে আনয়ন কর এবং একটি স্বর্ণ-রথ দারুব্রহ্মের সম্মুখে স্থাপন কর।"

* এই স্থানটী চক্রতীর্থের সন্নিকটে অবস্থিত।

রাজা সেই স্বপ্নাদেশানুসারে কার্য্য করিলেন। বহু শবর আসিয়া শ্রীদারুব্রহ্মের একপার্শ্ব ধরিলেন, বিদ্যাপতি ব্রাহ্মণ অন্য পার্শ্ব ধরিলেন, চতুর্দ্দিকে সকলে হরিসংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রাজা শ্রীদারুব্রহ্মের চরণ ধারণ-পূর্ব্বক রথে আরোহণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শ্রীদারু-ব্রহ্ম রথে আরোহণ করিলে রাজা নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া আসিলেন। তথায় শ্রীব্রহ্মা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন; শ্রীনৃসিংহ-দেব যজ্ঞবেদীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। কথিত হয় যে, যে-স্থানে বর্ত্তমান শ্রীমন্দির বিরাজিত, সেই স্থানে ঐ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মুক্তিমণ্ডপের সংলগ্ন-পশ্চিমদিকে যে শ্রীনৃসিংহদেব বিরাজমান আছেন, তিনিই উক্ত 'আদি-নৃসিংহদেব' বলিয়া খ্যাত।

শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ দারু-ব্রহ্মকে শ্রীমূর্ত্তিরূপে প্রকট করিবার জন্য বহু দক্ষ শিল্পীকে আহ্বান করিলেন; কিন্তু তাহারা কেহই দারু-ব্রহ্ম স্পর্শই করিতে পারিল না, তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্র সমস্ত খণ্ড-বিখণ্ডিত হইয়া গেল। অবশেষে স্বয়ং ভগবান্ 'অনন্ত-মহারাণা'-নামে আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক একটি বৃদ্ধ-শিল্পীর ছদ্মবেশে তথায় উপস্থিত হইয়া ২১ দিনের মধ্যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া শ্রীবিগ্রহ প্রকটিত করিবেন,—এইরূপ প্রতিজ্ঞা দিলেন। এদিকে যে-সকল কারিকর রাজার আহ্বানে আসিয়াছিলেন, উক্ত বৃদ্ধ সূত্রধরের উপদেশানুসারে রাজা তাঁহাদের দ্বারা তিনটি রথ প্রস্তুত করাইলেন। সেই বৃদ্ধ কারিকর দারুব্রহ্মকে শ্রীমন্দিরের ভিতরে লইয়া গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া একাকী অবস্থান করিবেন এবং ২১ দিনের পূর্ব্বে কিছুতেই রাজা দরজা খুলিতে পারিবেন না,—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইলেন; কিন্তু দুই সপ্তাহ অতিবাহিত হইবার পর কারিকরের অস্ত্র-শস্ত্রাদির কোন প্রকার শব্দ না পাইয়া রাজা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। মন্ত্রীর পুনঃ পুনঃ নিষেধ-সত্ত্বেও রাজা রাণীর পরামর্শানুসারে বলপূর্ব্বক স্বহস্তে শ্রীমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। তথায় বৃদ্ধ কারিকরকে দেখিতে পাইলেন না, কেবল দেখিলেন, দারুব্রহ্ম তিনটী শ্রীমূর্ত্তিরূপে প্রকটিত রহিয়াছেন। সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—শ্রীমূর্ত্তির শ্রীহস্তের অঙ্গুলি-সমূহ ও শ্রীপাদপদ্ম প্রকাশিত হন নাই। বিচক্ষণ মন্ত্রী জানাইলেন,—ঔ[illegible] কারিকর আর কেহ নহেন, তিনি স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ; [illegible] তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া এক সপ্তাহকাল পূর্ব্বে শ্রীমন্দিরের দ্বার উন্মোচন করায় তিনি আপনাকে ঐ ভাবে প্রকটিত করিয়াছেন। রাজা তখন নিজেকে অত্যন্ত অপরাধি-জ্ঞানে প্রাণত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়া কুশ শয্যায় শয়ন করিলে অর্দ্ধরাত্রে শ্রীজগন্নাথদেব রাজাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়াছিলেন,—"আমি এইরূপ দারুব্রহ্মাকারেই 'শ্রীপুরুষোত্তম' নামে শ্রীনীলাচলে নিত্য অধিষ্ঠিত আছি। এই প্রসঙ্গে আমি আমার শ্রীধামের সহিত ২৪টি অর্চ্চাবতাররূপে অবতীর্ণ হই। আমি প্রাকৃত-হস্ত-পদরহিত হইয়াও অপ্রাকৃত হস্ত-পদের দ্বারা ভক্তের প্রদত্ত সেবোপকরণ গ্রহণ করি এবং ভুবনমঙ্গলার্থ বিচরণ করি,—বেদের এই নিত্য-প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য ও তুমি যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছ, তৎপ্রসঙ্গে একটি লীলা-মাধুরী প্রকট করিবার জন্য আমি এই মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়াছি। প্রেমাঞ্জনরঞ্জিত-ভক্তি-লোচনে আমার মাধুর্য্যরস-পূর্ণভক্তগণ আমাকে শ্রীকৃষ্ণসুন্দর-মুরলীবদনরূপে দর্শন করেন। আমার ঐশ্বর্য্যময়ী সেবায় যদি তোমার অভিলাষ হয়, তাহা হইলে তুমি স্বর্ণ বা রৌপ্য-নির্ম্মিত হস্তপদাদি-দ্বারা আমাকে কখনও কখনও ভূষিত করিতে পার; কিন্তু জানিও আমার শ্রীঅঙ্গ যাবতীয় ভূষণের ভূষণ-স্বরূপ।"

রাজা স্বপ্নযোগে শ্রীজগন্নাথদেবের এই বাণী শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন এবং প্রার্থনা জানাইলেন,—"যে বৃদ্ধ কারিকর এই শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিয়াছেন, তাঁহার বংশধরগণ যেন যুগে-যুগে জীবিত থাকিয়া তিনটী রথ নির্ম্মাণকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন।" শ্রীজগন্নাথদেব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"তাহাই হইবে।" তৎপরে শ্রীজগন্নাথদেব রাজাকে আরও বলিলেন,—"যে বিশ্বাবসু নীল-মাধবরূপী আমার সেবা করিতেন, তাঁহার বংশধরগণ যুগে-যুগে আমার 'দয়িতা'-সেবক নামে পরিচিত থাকিয়া সেবা করিবে। বিদ্যাপতির ব্রাহ্মণীপত্নী-গর্ভজাত বংশধরগণ আমার অর্চ্চক হইবেন; আর বিদ্যাপতির শবরীর গর্ভজাত সন্তানগণ আমার ভোগ-রন্ধনকার্য্য করিবেন। তাঁহারা 'সুয়ার' (সূপকার) নামে খ্যাত হইবেন।"

শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নের বর-প্রার্থনা

শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ শ্রীজগন্নাথদেবকে বলিলেন,—"আমাকে একটি বর দিতে হইবে। প্রত্যহ এক প্রহর অর্থাৎ তিনঘণ্টা মাত্র আপনার শ্রীমন্দিরের দ্বার বন্ধ

থাকিবে। আর জগদ্বাসী সকলের দর্শনের জন্য অবশিষ্ট সময় আপনার শ্রীমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে। সারাদিন আপনার ভোজন চলিবে, আপনার হস্তপল্লব কখনও শুষ্ক হইবে না।" শ্রীজগন্নাথ "তথাস্তু" বলিয়া সম্মত হইলেন এবং বলিলেন,—"এখন তোমার নিজের জন্য কিছু বর প্রার্থনা কর।" তখন রাজা বলিলেন,—"আমাকে এই বর দিন, যেন আমার কোন বংশধর না থাকে,—যে ব্যক্তি আপনার শ্রীমন্দিরকে নিজ-সম্পত্তি বলিয়া দাবী করিতে পারে। এজন্য আমি নির্বংশ হইতে চাই।" শ্রীজগন্নাথদেব "তথাস্তু" বলিয়া রাজাকে এই বরও দান করিলেন।

শ্রীজগন্নাথের সেবক রাজন্যবর্গ

শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ বহুকাল শ্রীজগন্নাথদেবের পূজা করিবার পর স্বধামে গমন করেন। কলির আরম্ভের পর অনেক রাজা শ্রীজগন্নাথদেবের পূজা করিয়াছিলেন। রাজন্য-বর্গের প্রদত্ত ভূসম্পত্তি ও দ্রব্যাদি-দ্বারা শ্রীজগন্নাথ-দেবের সেবা-বৈভব ক্রমশঃই বিস্তৃত হইতে লাগিল। 'মাদলা-পাঞ্জী'তে কোন্ রাজা, কি জন্য, কোথায়, কি ভূসম্পত্তি দিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। গ্রন্থ-বিস্তার-ভয়ে সেই সকল ভূসম্পত্তির নাম ও পরিমাণ উল্লেখ না করিয়া কেবলমাত্র ভূসম্পত্তি-অর্পণকারী রাজন্যবৃন্দের নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

(১) চূড়ঙ্গদেব, (২) বিড়গঙ্গ, (৩) একজটী কামদেব, (৪) মদন-মহাদেব, (৫) রাজরাজেশ্বরদেব, (৬) ছোট পুরুষোত্তম-দেব, (৭) অনঙ্গভীমদেব, (৮) নাহুল-নরসিংহদেব, (৯) কবি নরসিংহ, (১০) মাতা বিরজাদেবী, (১১) দ্বিতীয় ভানুদেব, (১২) দ্বিতীয় প্রতিভানু, (১৩) শ্রীবরাহদেব, (১৪) কপিলেন্দ্রদেব (১৪৩৫-১৪৭০ খৃষ্টাব্দ), (১৫) পুরুষোত্তম-দেব, (১৪৭০-১৪৯৭ খৃষ্টাব্দ), (১৬) শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব (১৪৯৭-১৫৪১ খৃষ্টাব্দ)।

শ্রীঅনঙ্গভীমদেব শ্রীজগন্নাথদেবের কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেবা-বৈভব বিস্তার করিয়াছেন। তিনি সমস্ত শ্রীক্ষেত্রকে শ্রীবিষ্ণু ও তাঁহার পার্ষদদেবতাগণের মন্দিরের দ্বারা বিভূষিত এবং তদুপযুক্ত ভূ-সম্পত্তি ও স্বর্ণ-ভাণ্ডারাদি অর্পণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যে শ্রীমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা শ্রীঅনঙ্গভীমের দ্বারাই প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষের উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। কথিত হয় যে, এই বৃহৎ শ্রীমন্দির শ্রীনীলকণ্ঠ-রাজগুরু-মহাপাত্র পরমহংস রাজদেবীর অধ্যক্ষতায় পনর লক্ষ স্বর্ণ-ষাড়-দ্বারে [১ ষাড়=২ তোলা] নির্ম্মিত হইয়াছিল। কেহ কেহ উক্ত সমগ্র মুদ্রার পরিমাণকে ৪০ হইতে ৫০ লক্ষ টাকা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হাণ্টার সাহেব "History of Orissa Vol. I." পুস্তকে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"In the midst of his grandeur he (Ananga Bhima Dev) was struck down by a great calamity. He unhappily slew a Brahman and the rest of his life became one grand expiation of guilt. Tradition relates that he built sixty stone temples to the gods, bridged ten broad rivers, dug forty great wells and encased them with solid masonry, constructed one hundred and fifty-two flights of stairs on the river-banks as bathing places and points of transit, founded four hundred and fifty colonies (sasans) of Brahmans upon lands granted out of royal demesne and excavated one million of tanks to protect the crops of the husbandmen. To him Lord Jagannath appeared in a dream and commanded him to journey to the sands of Puri and there to call on his name; so the king in the 12th year of his reign journeyed to Puri and offered up his prayers. He consulted his vassals and chief officers and addressed them at great length on the propriety of re-erecting the temple which he had in contemplation. So the great temple of Jagannath was built, as it now stands, all the chiefs and princes applauding the king's speech; gold and jewels to the value of a million and a half measures were set apart for the work being estimated at half a million sterling in the money of our time. Fourteen years the artificers laboured and the temple was finished in 1198 A. D."

শ্রীঅনঙ্গভীমের প্রদত্ত ভূ-সম্পত্তি

শ্রীঅনঙ্গভীমদেব যে যে ভূমি শ্রীজগন্নাথের সেবার্থ অর্পণ করিয়াছিলেন এবং যে সকল মঠাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া-

ছিলেন, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'মাদলাপাঞ্জী'-অনুসারে নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির—৪ বাটি *, মার্কণ্ডেশ্বর—১ বাটি, চক্রতীর্থ—৪ বাটি, ধর্মেশ্বর—১০ মাণ; শ্বেতমাধব, মৎস্যমাধব, শ্বেতগঙ্গাতীর্থ—২ বাটি, উগ্রসেনমাধব ও রুক্মিণী-মাধব—২ মাণ, দক্ষিণ-কালিকা—২ মাণ, চামুণ্ডা—২ মাণ, মরীচিকাদেবী—২ মাণ, সর্ব্বমঙ্গলা—৪ মাণ, শ্রীগুণ্ডিচামন্দির—২ বাটি, বালি-নৃসিংহ—৪ মাণ; নীল-মাধব, নীলকণ্ঠেশ্বর ও ইন্দ্রদ্যুম্ন—২ বাটি; আনন্দচণ্ডী—৪ মাণ, লাহিড়িত দেবদেবী—১০ মাণ, ব্রহ্মপুর—১৩৯বাটি, ৬ মাণ।

শ্রীঅনঙ্গভীমরাজা শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের চতুর্দ্দিকে বহু মঠ স্থাপন করিয়া মঠের অধ্যক্ষগণকে শ্রীজগন্নাথ-দেবের বিভিন্ন সেবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন—তাঁহার বিধানানুসারে মুদ্রাহস্ত বা মুদিরথ পুষ্পালক ব্রাহ্মণ-সেবকের সন্ধ্যা-পূজা ও স্নান-বিধি শিক্ষা দিবেন; শ্রীক্ষেত্রের সমস্ত লোকের অভিযোগ শ্রবণ করিয়া দণ্ড বিধান করিবেন। তিনি বিভিন্ন দেশের সন্ন্যাসিগণের দ্বারা শ্রীক্ষেত্রে মঠ স্থাপন করেন। আক্রমঠ—১২টি, মহারাষ্ট্র—৮টি, দ্রাবিড়—৮টি, কর্নাট—৪টি, হেম্বুরা—৩টি, উৎকল—১৩টি, গৌড়ীয়া ৪টি, একদণ্ডী—৩টি, মাণদণ্ডী—১৪টি ও ত্রিদণ্ডী—৭টি। প্রতি মঠকেই তিনি বাস্তুভিটা ও টোটা (বাগান) প্রভৃতির জন্য এক মাণ করিয়া ভূমি দিয়াছিলেন। সমুদ্রের তীরে আরও ২টি মঠকে বাস্তুভিটা, ভিহ (উচ্চ জমি) ও টোটার জন্য ১০ মাণ করিয়া ভূমি দিয়াছিলেন। শ্রীবলরামদেবের 'বায়-অগ্নিস্পর্শ'-মঠের জন্য ১০ মাণ ভূমি দিয়াছিলেন। মন্দির-প্রতিষ্ঠাকারী আত্রেয়-গোত্র পুরারথ আচার্য্যকে স্বজন-কুটুম্বাদি লইয়া থাকিবার জন্য মন্দিরের দক্ষিণ-পার্শ্বে রথসাহি-পল্লীতে ৪ বাটি ভূমি দিয়াছিলেন। উগ্রসেন শবরের ৪ পুত্র ৩ কন্যা ও কুটুম্বগণের বাসস্থানের জন্য দয়িতাপাড়া-সাহি ৮ বাটি; পতিবংশগণকে একত্র থাকিবার জন্য ভিখারিপাড়া—৮ বাটি; পাণিছড়া-পাণ্ডাদিগের বাসস্থানের জন্য চূড়ঙ্গসাহি—৩ বাটি; সিংহারী (পূজারকারী), পুষ্পালক ও মহাজনগণকে দোলমণ্ডপসাহি, বালিসাহি ও ধর্মেশ্বরপুর-সাহি—৩ বাটি; সোমার ও মহাসোমারকে বুদ্ধলিসাহি—২ বাটি; অন্যান্য সেবকগণকে বালিসাহি, কালিকাদেবী-সাহি, মাট-মণ্ডপ ও চূড়ঙ্গসাহি—২০ বাটি;—পড়িছা ও রাঁচকরণগণের থাকিবার জন্য —৩ বাটি; যবনের উপদ্রব হইতে রক্ষাকারী ব্যক্তিগণের থাকিবার জন্য—২০ মাণ ভূমি; জলচল প্রজাগণের থাকিবার জন্য—২০ বাটি; কুম্ভকারগণের জন্য—৩ বাটি; যাঁহারা যাত্রিগণকে স্নান-দানাদি করাইবেন—এইরূপ ব্রাহ্মণগণের জন্য—২১ বাটি; জলচ্ছত্র-স্থাপনের জন্য—১৯ বাটি; কুম্ভকারগণের গৃহের জন্য সসঙ্গ-গ্রাম হইতে ৭ বাটি ভূমি দান করিয়াছিলেন

শ্রীঅনঙ্গভীমদেব শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভোগরাগ ও যাত্রামহোৎসবাদির জন্য নিম্নলিখিত পরগণা ও চাকলার অন্তর্গত বহু ভূমি দান করিয়াছেন; 'মাদলাপাঞ্জী'তে প্রত্যেক ভূমির নির্দ্দেশ ও পরিমাণ লিখিত আছে। গ্রন্থ-বিস্তার-ভয়ে কেবলমাত্র সেই-সকল পরগণা ও চাকলার নাম উদ্ধৃত হইল।

লেখাই-দণ্ডপাট, দক্ষিণদিক্-দণ্ডপাট, রাহাঙ্গ-বিসে (চাকলা), কোট রাহাঙ্গবিসে, বাঁচাঘ-বিসে, অক্ষয়বট-বিসে, ডমার খণ্ডবিসে, কুকলোবিসে, কুলাহারবিসে, কাটেবিসে, সাইলোবিসে, সাইবিরিবিসে, কোটসেন্দ-দণ্ডপাট, পরঙ্গ-দণ্ডপাট, কোম্বরা-দণ্ডপাট, চব্বিলকুদ-দণ্ডপাট, আশিকাশী-দণ্ডপাট, কলিঙ্গ-দণ্ডপাট, ভদ্রক-দণ্ডপাট, লোরো-দণ্ডপাট, সণসরখণ্ডবিসে, কায়েস্থাবিসে, কুডেবিসে, জয়পুরবিসে, খাজুরীবিসে, সুনারীবিসে, তনিয়া-দণ্ডপাট, জলেশ্বর-চৌড, দাতনী-চৌড, মালজ্যাঠা-দণ্ডপাট, দক্ষিণ-দণ্ডপাট, রাহাঙ্গ-বিসে, ওলধারবিসে, পূর্ব্বদুয়াইবিসে, অন্তর্ভবিসে, ওজারখণ্ড-বিসে, কাদোরিজা, মরডাবিসে, চৌবিসে-দণ্ডপাট, সিয়াই-বিসে, কবরবিসে।

শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রদত্ত ভূ-সম্পত্তি

শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবা-পূজার জন্য নিম্নলিখিত ভূ-সম্পত্তি ও অর্থ দান করিয়াছিলেন,—*

রাহাঙ্গবিসে—শ্রীজলণ্ডমগ্রাম—২৯১ বাটি, সুবলগ্রাম—২৬০।৬, আমরডা—২১৪।৫, বাণপুর ৪৮।২ *, কমলপুর—২ বাটি, কোড়ি—৩৬৬ কাহন।

প্রতাপরুদ্রের পট্টমহিষী পদ্মাবতী ৩৬০ বাটি, ১৯ মাণ ভূমি দান করিয়াছিলেন।

* বঙ্গদেশের প্রায় তিন বিঘায় উড়িষ্যার এক মাণ বা একর (৪৩৫৬০ বর্গফুট) হয়। এই [illegible] এক বাটি হয়।

* প্রথম সংখ্যাটী বাটি ও দ্বিতীয়টী মাণ-নির্দ্দেশক।

পূর্ব্বে যে অনন্তমহাদেব বা নাগান্তর অনন্তমাধবদেবের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে কথিত হয় যে, তিনি আলালনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

গঙ্গেশ্বরদেবের নিম্নিত্ত মতবাদ

কেহ কেহ বলেন,—উৎকলরাজ যযাতি কেশরীর রাজত্বকালে শ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দির প্রথম নির্ম্মিত হয়—'মাদলাপাঞ্জী'তে এইরূপই বর্ণিত আছে। কোদিত লিপি প্রভৃতির বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, গঙ্গাবংশীয় রাজা অনন্তবর্ম্মণ চোড়গঙ্গদেব সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শ্রীমন্দিরের উত্তর-দ্বারের সম্মুখস্থিত ভিরমলমন্দিরে রাজা চতুর্থ নৃসিংহদেবের যে তাম্রলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে শ্রীজগন্নাথমন্দির যে গঙ্গেশ্বর বা রাজা অনন্তবর্ম্মণ চোড়গঙ্গদেব-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহা অবগত হওয়া যায়[1]।

"প্রাসাদং পুরুষোত্তমস্য নৃপতিঃ কো নাম কর্ত্তুং ক্ষম-
স্তুংহেত্যাদি নৃপৈরুপেক্ষিতমহঃ চক্রেশ্বরঃ গঙ্গেশ্বরঃ।
• • • •
নির্ব্বিঘ্নঃ পুরুষোত্তমঃ প্রমুদিতস্তদ্ধামলাভাদ্রম-
পোত্তর্ত্তুর্গৃহং বরং পিতৃগৃহাৎ প্রাপ্য প্রমোদান্বিতা॥"

অর্থাৎ শ্রীপুরুষোত্তমের এরূপ মন্দির নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, পূর্ব্বে এরূপ কোন্ নৃপতিরই বা নামোল্লেখ করা যাইতে পারে? প্রথম রাজগণ-কর্ত্তৃক অনাদৃত এই মন্দির গঙ্গেশ্বরই নির্ম্মাণ করেন • • • •। বিঘ্নবিধুর শ্রীপুরুষোত্তমদেব এই নবগৃহ প্রাপ্ত হইয়া তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং প্রমোদান্বিতা শ্রীলক্ষ্মীদেবীও পিতৃগৃহ হইতে ভর্ত্তার এই নূতন শ্রেষ্ঠতর ভবনেই অনুরাগিণী হইয়াছিলেন।

শ্রীঅনঙ্গভীম পরবর্ত্তিকালে প্রাকার ও পার্শ্বস্থিত মন্দির প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া মন্দিরের উন্নতিবিধান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নামের সহিত ঐরূপ প্রখ্যাতি বিজড়িত থাকিবে। শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজা-পদ্ধতিও তাঁহারই শাসনে যথারীতি প্রণালীবদ্ধ হইয়াছিল[2]।

গোপালচন্দ্র আচার্য্যচৌধুরীকৃত 'শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ'-নামক পুস্তকে (২০১ পৃঃ) বর্ণিত হইয়াছে, "শ্রীজগন্নাথমন্দিরের গাত্রে নিম্নলিখিত শ্লোকটী লিপিবদ্ধ আছে,—

শকাব্দে বসুসূর্য্যাব্জগণনক্ষত্রসংযুতে।
প্রাসাদং কারয়ামাসেঽনঙ্গভীমেন ধীমতা॥"

উক্ত গ্রন্থকার শেষ পঙ্‌ক্তির "প্রাসাদং কারয়ামাসেঽনঙ্গভীমেন ধীমতা" এই পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। লিপিটি নাকি রত্নবেদীর পশ্চাতে অবস্থিত। প্রচলিত প্রবাদানুসারে ১১৩১ শকাব্দে রাজা অনঙ্গভীমকর্ত্তৃক মন্দির-নির্ম্মাণকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়; রাজগুরু পরমহংস রাজপেরীর হস্তে শ্রীমন্দিরের তত্ত্বাবধান ও নির্ম্মাণের ভার অর্পিত হইয়াছিল।

ডক্টর আর, ডি, ভাণ্ডারকর বিদ্যাধর কবি-বিরচিত 'একাবলী'-নামক একখানি অলঙ্কার-শাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ আবিষ্কার করেন। 'মেঘদূত' ও 'রঘুবংশে'র বিখ্যাত টীকাকার মল্লিনাথ উক্ত 'একাবলী'র 'তরলা' নাম্নী একটী টীকা রচনা করিয়াছেন। 'একাবলী'তে নরসিংহ-নামক যে কলিঙ্গরাজের উল্লেখ আছে, ভাণ্ডারকর তাঁহাকে গঙ্গা-বংশোদ্ভব উৎকলরাজ দ্বিতীয় নরসিংহদেব বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন, যেহেতু 'একাবলী'তে বিদ্যাধর-কবি রাজা নরসিংহ-দেবের রাজসভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে এবং পুরীতে প্রাপ্ত তাম্রলিপিতে দেখা যায়—দ্বিতীয় নরসিংহদেব 'কবিপ্রিয়ঃ' ও 'কবিকুমুদচন্দ্রঃ' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। রায়বাহাদুর মনোমোহন চক্রবর্ত্তী 'একাবলী'র নরসিংহ-রাজাকে উৎকলাধিপ প্রথম নরসিংহদেব বলিয়া স্থির করিয়াছেন[3]।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি, আই, ই 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি'-কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত সংস্কৃত-ভাষায় প্রাচীন উৎকল অক্ষরে লিখিত 'গঙ্গাবংশানুচরিতম্'-নামক যে অপ্রকাশিত পুঁথির বিবরণ 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন (সাহিত্য ১৩২৭, অগ্রহায়ণ, ৪০০-৪০৪ পৃঃ), তাহাতে বিদ্যাধর-নামক কোনও স্তুতিপাঠকের সহীক শ্রীপুরুষোত্তম-তীর্থ দর্শন ও বিবিধ ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সংবাদ কাব্যচ্ছলে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থরচয়িতা 'বাসুদেব-রথ-সোমযাজী' [illegible] প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং মৈত্রেয়

1 J.A.S.B. LXIV, 1895, Page 139.
2 J.A.S.B, 1895, Page 135, No. 2.
3 J.A.S.B. Vol. [illegible], Pt.1, No.2, 1903, P.28.

মহাশয়ের মতে এগুলী গঙ্গাবংশীয় রাজা পুরুষোত্তমদেবের রাজত্বকালে লিখিত হইয়াছিল।

চোড়গঙ্গ হইতে গণনা করিলে দেখা যায়,—'গঙ্গাবংশানুচরিতম্' গ্রন্থের মতে পুরুষোত্তমদেব গঙ্গবংশের সপ্তবিংশতিতম নৃপতি। ঐ-সকল 'গজপতি'-বংশীয় রাজাদিগের নাম নিম্নলিখিত ক্রমে প্রদত্ত হইয়াছে,—

(১) কুড়ঙ্গ, (২) চূড়ঙ্গ, (৩) রাজরাজেশ্বর, (৪) অভিরথ, (৫) একজটী-কামদেব, (৬) মদন-কামদেব, (৭) অনঙ্গভীম, (৮) নৃসিংহ, (৯) ভীম-নৃসিংহ, (১০) পুরুষোত্তম নৃসিংহ, (১১) কবি-নৃসিংহ, (১২) অকটাসরটী-নৃসিংহ, (১৩) প্রতাপ-নৃসিংহ, (১৪) নিশঙ্কভানু, (১৫) বাতুলভানু, (১৬) বীরভানু, (১৭) রুচিকভানু, (১৮) মধরভানু, (১৯) কঙ্কলভানু, (২০) স্বর্ণভানু, (২১) কালখণ্ড, (২২) চূড়ঙ্গ, (২৩) নৃসিংহ, (২৪) অনন্ত, (২৫) পদ্মনাভ, (২৬) পীতাম্বর, (২৭) পীতাম্বর-বৈমাত্রেয় বাসুদেবের পুত্র পুরুষোত্তম।

রায়বাহাদুর মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বিভিন্ন তাম্রলিপির প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া গঙ্গবংশীয় নৃপতিগণের যে বংশমালা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, চোড়গঙ্গ হইতে চতুর্থ নৃসিংহদেব পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ জন রাজা উৎকলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন *। ইহাদিগের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

(১) চোড়গঙ্গ, (২) কামার্ণব (সপ্তম) অথবা মধুকামার্ণব, (৩) রাঘব, (৪) রাজরাজ (দ্বিতীয়), (৫) অনিয়ঙ্কভীম অথবা অনঙ্গভীম (দ্বিতীয়), (৬) রাজরাজ, (৭) অনঙ্গভীমদেব, (৮) নৃসিংহদেব (প্রথম), (৯) বীরভানুদেব (দ্বিতীয়), * * (১২) নৃসিংহ অথবা নরনারসিংহ, (১৩) বীরভানুদেব (তৃতীয়), (১৪) নৃসিংহদেব (চতুর্থ)। ইহার অব্যবহিত পরেই 'ভানুবংশাবতংস' কপিলেন্দ্রদেব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা প্রতাপপুরুষোত্তমদেব। এই তালিকায় গঙ্গবংশীয় পুরুষোত্তম-নামক কোনও রাজার নাম পাওয়া যায় না। সূর্য্যবংশীয় পুরুষোত্তমদেব বা প্রতাপপুরুষোত্তমদেবের শাসনকাল † খৃষ্টাব্দ ১৪৬৯-৭০ হইতে ১৪৯৬-৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। মাদলাপাঞ্জী-অনুসারে শ্রীপুরুষোত্তমদেবের রাজত্বের সপ্তম অঙ্কে (১৪৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দে) শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগ মণ্ডপ এবং নবম অঙ্কে (১৪৭৪-৭৫ খৃষ্টাব্দে) রন্ধনশালাদি নির্ম্মিত হয়। এই পুরুষোত্তমদেবই কাঞ্চী-অভিযানের অধিনায়ক ছিলেন।

মৈত্রেয় মহাশয় 'গঙ্গাবংশানুচরিতম্'-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, গঙ্গবংশে ছয়জন দেব, ছয়জন নৃসিংহ, ছয়জন ভানু—এই অষ্টাদশ নৃপতি ও তৎপরে অন্যান্য ক্ষিতিপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রায়বাহাদুর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তালিকা-অনুসারে গঙ্গপুরুষোত্তম পর্য্যন্ত মাত্র ষোলজন রাজার সন্ধান পাওয়া যায়; ইঁহার মধ্যে তিনজন 'ভানু' ও চারিজন 'নৃসিংহ'-নামবিশিষ্ট।

"দেবেষু চাবিরভবৎ প্রথমং কুড়ঙ্গো
যং চোড়গঙ্গ ইতি কেচন নির্দ্দিশন্তি।"

চোড়গঙ্গ যে বঙ্গবিজয়ী সম্রাট্ রাজেন্দ্রচোলের দৌহিত্র ছিলেন, তৎসম্বন্ধে 'গঙ্গাবংশানুচরিতম্'-গ্রন্থের সহিত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কোনও মতভেদ নাই। এই নবাবিষ্কৃত পুঁথির তালিকায় এগারটী অধিক নাম দৃষ্ট হয়। কবি প্রসঙ্গক্রমে এই সকল রাজার শাসনকালের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণন করিয়াছেন। তাহাতে অনঙ্গভীমকর্ত্তৃক শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির এবং প্রথম নৃসিংহদেব-কর্ত্তৃক কোণারকের সূর্য্যমন্দির-নির্ম্মাণের সময় এইরূপ উল্লিখিত আছে, যথা—

"অঙ্ক-ক্ষৌণী-শশাঙ্কেন্দু-সঙ্খ্যিতে শকবৎসরে।
অনঙ্গভীমদেবেন প্রাসাদঃ শ্রীপতেঃ কৃতঃ॥"

ইহাতে ১১১৯ শকাব্দ, ১১৯৭ খৃষ্টাব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অক্ষয় বাবুর কথিত পুঁথি হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে, কাব্যের নায়ক ও নায়িকা—বিদ্যার্ণব ও লীলাবতী পোতারোহণে পুরীধামের স্বর্গদ্বার-নামক বেলাভূমির উপকণ্ঠে উপনীত হইয়া, প্রতি-পোতারোহণে সমুদ্রতটে পদার্পণ করিবার পর তথায় অনেক প্রস্তর-চৈত্য দেখিয়াছিলেন এবং এই সকল চৈত্যের অনতিদূরে শ্মশান-ভূমির সমীপে 'শ্রীচৈতন্যমণ্ডলী'-নামক পরমভাগবতগণের আবাস ছিল।

"মনো দৈন্যবশীকৃতেন বিধিনা স্বর্দ্বারমারোপি কিং?
শ্রীচৈতন্যমতানুসারী সুজনশ্রেণীতি নিঃশ্রেণিকা॥"

পুরীর সমুদ্রতটে এখনও শ্মশানভূমির উপর এই জাতীয় সমাধিমন্দির দৃষ্ট হয়।

* J.A.S.B. August 1903, Pp. 44[illegible]45.
† J.A.S.B. Vol. XIX, P[illegible] No.

কেহ কেহ বলেন, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির, যাহা মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নদেব নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহা কালক্রমে জীর্ণ হওয়ায় গঙ্গাবংশের রাজা চোড়গঙ্গদেব (১০৭৮ খৃঃ ?) পুরাতন মন্দিরের ভগ্নপীঠে একটি নূতন মন্দির নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করেন। সম্ভবতঃ তিনি মন্দিরের কিয়দংশ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিবেন। কিন্তু রাজা অনঙ্গভীমই প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীমন্দিরকে সম্পন্ন করেন। কেহ কেহ বলেন, ১১৮২-১২২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীঅনঙ্গভীম-কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মূল-মন্দিরের পশ্চিমে অবস্থিত শ্রীবিমলাদেবীর মন্দির এবং উত্তর-পশ্চিমদিকে অবস্থিত শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মন্দিরও শ্রীঅনঙ্গভীমের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হয়। রাজা পুরুষোত্তমদেবের রাজত্বকালে (১৪৭০-১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে) * ভোগমণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন,—নাটামন্দির রাজা প্রতাপরুদ্রদেব (১৪৯৭-১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে) অথবা তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা গোবিন্দবিদ্যাধরদেবের আমলে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন একটি গৃহে ভোগ রন্ধন হইত, কিন্তু ইহা বিরাট্ ভোগের দ্রব্যাদি-রন্ধনের পক্ষে ক্ষুদ্র-পরিসর হওয়ায় এবং মন্দিরের মধ্যে ঘৃত প্রবেশ করায় বর্ত্তমান ভোগ-রন্ধনাগার নির্ম্মিত হইয়াছে এবং মন্দিরের সহিত একটি আবৃত পথের দ্বারা রন্ধনাগার সংশ্লিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীমন্দিরের বিভাগ-চতুষ্টয়

শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরকে সাধারণতঃ প্রধান প্রাসাদ-চতুষ্টয়ে বিভক্ত করা যায়। এই অট্টালিকা-শ্রেণী পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিমদিকে সমশ্রেণীতে বিস্তৃত। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া শ্রীমন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। তিনি যে গর্ভ-মন্দিরে অবস্থান করেন, তাহা 'মণিকোঠা' নামে প্রসিদ্ধ এবং যে উচ্চ-বেদীর উপর আসীন আছেন, তাহা 'রত্নবেদী' নামে কথিত। এই মূল-মন্দিরটী 'বড় দেউল' নামে অভিহিত হয়।

শ্রীমন্দির-প্রাসাদের পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিমদিকে বিস্তারের প্রথমেই—

(১) ভোগ-মণ্ডপ—এখানে ছত্রভোগের দ্রব্য সজ্জিত করা হয়। পুরীর বিভিন্ন মঠ ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের দেবোপকরণই 'ছত্রভোগ' নামে পরিচিত।

(২) ভোগমণ্ডপের পরেই জগমোহন বা নাট্যমন্দির; তথায় শ্রীগরুড়স্তম্ভ বিরাজিত। এই গরুড়স্তম্ভের অগ্রে মধ্যাহ্নকালে ও মধ্যরাত্রিতে শ্রীভগবানের শয়নের পূর্ব্বে দেবদাসীর নৃত্য হয়। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগরুড়স্তম্ভের পশ্চাদ্দেশে অবস্থান করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন করিতেন। প্রতিদিন নির্নিমেষ-নেত্রে যেস্থানে ভগবান্ হইয়া শ্রীকমল-নয়নকে দর্শন করিতেন, সেই পাষাণময় স্থান ব্রহ্ম-শিবাদি-বন্দিত রাহুল-শ্রীচরণ-স্পর্শে বিগলিত হইয়া শ্রীচরণ-চিহ্নে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। সেই শ্রীচৈতন্যচরণ-চিহ্নযুগল গৌড়ীয়-ভক্তগণের নিত্য-আরাধ্যরূপে অদ্যাপি বিরাজিত রহিয়াছেন।

(৩) শ্রীজগমোহনের পর শ্রীমুখশালা। এই স্থান হইতে সাধারণ যাত্রিগণ শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখচন্দ্রিকা দর্শন করেন। কিন্তু শ্রীগৌরগতপ্রাণ শ্রীগৌড়ীয়গণ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে লঙ্ঘন করিয়া শ্রীকমলনয়নের দর্শনার্থী হ'ন না। শ্রীগৌর-সুন্দর যেরূপ শ্রীবিষ্ণুপার্ষদ শ্রীগরুড়ের পশ্চাতে থাকিয়া শ্রীবিষ্ণুজনের আনুগত্যে বিষ্ণু-দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইতেন, শ্রী-গৌড়ীয়গণও সেইরূপ শ্রীগৌরপদাঙ্কিত-পথে তাঁহার শ্রীপাদ-পদ্মের পশ্চাতে থাকিয়া এবং সেই আনুগত্যময়ী স্থিতিতে উদ্ভাসিত হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন-প্রার্থী হইয়া থাকেন।

(৪) শ্রীমুখশালার পরেই বড় দেউল বা গর্ভ-মন্দির। এই মন্দিরে রত্নবেদীর উপরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, শ্রীশ্রীবলরাম, শ্রীশ্রীসুভদ্রাদেবী ও শ্রীসুদর্শনচক্র বিরাজিত। শ্রীশ্রীজগন্নাথ পূর্ব্বমুখী হইয়া উত্তরভাগে, শ্রীশ্রীবলরাম দক্ষিণভাগে এবং উভয়ের মধ্যস্থলে শ্রীশ্রীসুভদ্রাদেবী বিরাজিতা।

শ্রীসুভদ্রাদেবী

শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে 'সুভদ্রা-জীবন-নাথ' বলিয়া স্তব করিয়াছেন। শ্রীসুভদ্রা-দেবীর সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডে (১৯।১০।১৭) লিখিত আছে,—

"সুভদ্রা চারুবদনা বরাভয়ধারিণী।
লক্ষ্মীঃ প্রাদুর্ভবেদ্যঃ সর্ব্বচৈতন্যরূপিণী।
ইয়ং কৃষ্ণাবতারে হি রোহিণীগর্ভসম্ভবা।
[illegible] সুভদ্রাং ভদ্ররূপিণীম্।

* রাজত্বের তারিখগুলি রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের History of Orissa Vol. I, P. 305, 324 অনুসারে প্রদত্ত হইল।

সর্ব্বদেবাবনীং পালসাগরোদ্ধারকারিণীম্।
শ্বিকচাম্ভোজবদনাং বরাভয়ধারিণীম্।
কৃষ্ণবামাঙ্গদেহাং তাং সাক্ষান্নারীমিবাপরাম্॥
(উৎকলখণ্ড ১৯।৩৫-৪১)

নীলাদ্রিমহোদয়ে এইরূপ উক্তি আছে—

ভক্তানামবনার্থায় তথা স্তোত্রাপি ভদ্রদা।
অযোনিসম্ভবস্তস্যা কৃষ্ণস্যাভা ভবিষ্যতি॥
(নীলাদ্রিমহোদয়, ৪র্থ অঃ)

শ্রীসুভদ্রাদেবী শ্রীজগন্নাথের ভগিনী বলিয়া পৌরাণিকী কথা থাকিলেও তিনি তাঁহারই শক্তি-স্বরূপা। উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে,—

"বলভদ্রাকৃতির্জাতা বলরূপস্য চিন্তনাৎ।
ক্ষণং ন সহতে সা হি মোক্তুং নীলাবতারিণম্॥
ন ভেদয়ন্তি কে বিপ্রাঃ কৃষ্ণস্য চ বলস্য চ।
একগর্ভপ্রসূতত্বাদ্ব্যবহারোঽপি লৌকিকঃ॥
ভগিনী বলদেবস্য হোষা পৌরাণিকী কথা।
পুংরূপেণ স্ত্রীরূপেণ লক্ষ্মীঃ সর্ব্বত্র তিষ্ঠতি॥
পুংনাম্না ভগবান্ বিষ্ণুঃ স্ত্রীনাম্না কমলালয়া।
দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদৌ বিদ্যতে নৈতয়োঃ পরম্॥
কো হ্যন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষাদ্ভুবনানি চতুর্দ্দশ।
ধারয়েত্তু ফণাগ্রেণ সোঽনন্তো বলসংজ্ঞিতঃ॥
তস্য শক্তিস্বরূপেয়ং ভগিনী শ্রীপ্রবর্ত্তিকা।
সুদর্শনস্তু যচ্চক্রং সদা বিষ্ণুকরে স্থিতম্॥

শ্রীসুভদ্রাদেবী শ্রীবলভদ্রের চিন্তাহেতু শ্রীবলভদ্রের ন্যায় আকৃতি পাইয়াছিলেন। তিনি শ্রীনীলাবতারীকে ত্যাগ করিয়া কদাপি অল্পসময়ও অবস্থান সহ্য করেন না। হে বিপ্রবর্গ! শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের মধ্যে কোনরূপ ভেদ নাই। একই গর্ভে প্রসূত হওয়ায় লোকপ্রসিদ্ধ ব্যবহারই হইয়াছে। শ্রীসুভদ্রা শ্রীবলদেবেরই ভগিনী, ইহা পৌরাণিকী কথা। শ্রীলক্ষ্মীদেবী সর্ব্বস্থানে পুরুষরূপে ও স্ত্রীমূর্ত্তিতে অবস্থান করেন। তিনি পুরুষনামে ভগবান্ বিষ্ণু ও স্ত্রীনামে শ্রীলক্ষ্মীদেবী (পদ্মালয়া), তিনি দেব, তির্য্যগ্‌জাতি (পক্ষ্যাদি) ও মনুষ্যগণের মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করিতেছেন। এই দুই ব্যতীত [illegible] কিছুর অস্তিত্ব নাই।

শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ ব্যতীত অপর কেহ বা কাহার অগ্রভাগে চতুর্দ্দশ ভুবন ধারণ করিতে পারেন? তিনিই 'বল'-নামে শ্রীঅনন্তদেব। এই সুভদ্রা তাঁহারই শক্তিস্বরূপা ও তিনি শ্রী-(লক্ষ্মী বা শোভা)-প্রদানকারিণী। ['শ্রীপ্রবর্ত্তিকা' পাঠ পাকিলে শ্রী বা শক্তির আকরস্বরূপ ও প্রবর্ত্তনকারিণী—এইরূপ অর্থ করা যায়।]

সুদর্শন-নামক চক্র সর্ব্বদাই শ্রীভগবানের হস্তে বিরাজমান থাকেন।

ষষ্ঠম—শ্রীবুদ্ধাবতার-তত্ত্ব

শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের অধীশ্বর শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রা শ্রীমূর্ত্তিত্রয়কে কেহ কেহ বৌদ্ধ-কল্পিত প্রতীক-বিশেষ বলিয়া বর্ণিয়া করেন, বস্তুতঃ তাহা নহে। সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণে লিখিত আছে,—

"আপো যদাক প্রবতে নিঘ্নোঃ পারে অপূরুষম্।
তদা দভস্ব দৃংহ্নো তেন যাহি পরং স্থলম্॥"*

সাংখ্যায়ন ভাষ্য:—"আপো বিপ্রকৃষ্টদেশে বর্ত্তমানং যদাক, দারুময়ং পুরুষোত্তমাখ্যদেবতাশরীরং প্রবতে, জলস্যোপরি বর্ত্ততে, অপূরুষং নির্ম্মাতৃরহিতত্বেন অপূরুষং তৎস্থানত্বং। দৃংহ্নো হে ছোড়ঃ তেন দারুময়েন দেবেন উপাস্যমানেন পরং স্থলং বৈষ্ণবং লোকং গচ্ছেত্যর্থঃ।"

* পাশ্চাত্য-দেশীয় আধুনিক পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ এবং তাঁহাদের উচ্ছিষ্টভোজী ভারতীয় কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, অথর্ব্ববেদে যে দারু-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই দারু কিন্তু প্রতিমান বলিয়া বর্ণিত নহে। (Macdonell and Keith's Vedic Index, Vol. I. p. 353) আবার কেহ কেহ বলেন, (Whitney's Atharva Veda, Vol. I. p. 37.) রজ্জু, মৃত্তিকা ও মন্ত্র-বাচক শব্দাদির সহিত ঐ দারু বন্ধন-প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই-সকল মতবাদিগণের পরস্পর বিরুদ্ধমান মতবাদের অন্ত নাই। কিন্তু সাংখ্যায়ন ভাষ্যকার তথা মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, 'বাচস্পত্য'-নিষ্পাতা তারানাথ প্রভৃতি সকলেই উক্ত বাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন, কোন সুধীব্যক্তিই সেই অর্থ পরিত্যাগ করিয়া বেদ-বিরোধিগণের মতবাদকে বহুমানন করিতে পারেন না। যেহেতু স্বয়ং বেদই বলিয়াছেন,—বেদের তাৎপর্য্য আচার্য্যবান্ পুরুষের নিকটই প্রকাশিত হয়।

অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে বিরজাহৈদেশে যে অশৌকবেদ দারুব্রহ্ম সমুদ্রতীরে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার উপাসনা করিলে লোকসমূহ পরম-বৈষ্ণব লোকে গমন করেন।

স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য ও 'বাচস্পত্য'-নির্মাতা তারানাথও অথর্ববেদের নামোল্লেখ করিয়া উক্ত বাক্যটি উদ্ধার করিয়াছেন। স্কন্দপুরাণান্তর্গত উৎকলখণ্ডে ২১।৩ শ্লোকেও এইরূপ বাক্যেরই প্রতিবচন দেখিতে পাওয়া যায়। উৎকলখণ্ডে ২১শ অধ্যায়ে "এই দারুব্রহ্ম অর্দ্ধাবতারটী শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। এই শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেব নিত্যকাল বাস করিতেছেন। এই বাস্তু কখনই বা প্রলয়দ্বারা আক্রান্ত হ'ন না।"—এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে আর্য্যদিগের যে-সকল তীর্থস্থান ছিল, ঐ-সকলও বৌদ্ধগণ-কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া বৌদ্ধপ্রায় হইয়া গেল; এমন কি সনাতন বৈদিক-ধর্মের প্রায় সকল চিহ্নই লুপ্ত হইতে থাকিল। উৎকল রাজ্যেও বৌদ্ধদিগের অধিকার বিস্তৃত হইল। তাহাতে সুদীর্ঘকাল শ্রীদারুব্রহ্ম-বিষ্ণুর মাহাত্ম্য সনাতনধর্ম-জগতে অপ্রকাশিত রহিল। বৌদ্ধগণ আর্য্য-গণের তীর্থ ও দেবতাকে 'দূষিত' (?) করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে 'দন্তপীঠ'* (?) স্থাপন ও শ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা-মূর্ত্তিকে 'বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ' আখ্যা প্রদান করিতে পারেন। এমন কি, আর্য্যগণের অনুকরণে বৌদ্ধ-গণও শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার ন্যায় ঐ ত্রিমূর্ত্তির রথাদি উৎসবও করিতে পারেন।

দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে কেরল ও চোলরাজ্যের প্রান্তভাগে পাণ্ড্যপ্রদেশ-নামে একটী প্রসিদ্ধ জনপদ আছে। এই দেশে পাণ্ড্যবিজয়-নামে একজন প্রবলপরাক্রান্ত নৃপতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহার 'দেবেশ্বর'-নামে একজন সুবুদ্ধি বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও পুরোহিত ছিলেন। এই মন্ত্রীর পরামর্শে পাণ্ড্যবিজয় বৌদ্ধগণের হস্ত হইতে উৎকলরাজ্য অধিকার এবং পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র হইতে বুদ্ধ-পূর্ব্বকালে বৌদ্ধপ্রভাব বিদূরিত করেন। পাণ্ড্যবিজয় দেবেশ্বরের সহিত পুরুষোত্তমে আসিয়া শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রা-মূর্ত্তিকে মন্দির হইতে অন্যত্র লইয়া তথায় শ্রীবিগ্রহের যথাশাস্ত্র অভিষেক ও উৎসবাদি করেন। এখনও 'পাণ্ড্যবিজয়' নামে একটী উৎসব শ্রীপুরুষোত্তমে প্রচলিত আছে। সিংহাসন হইতে রথারোহণকে 'পাণ্ড্যবিজয়' বা উৎকল ভাষায় 'পহণ্ডি' বলে। 'পণ্ডা'-শব্দে বেদোক্তমন্ত্রীবৃদ্ধি।

পঞ্চম শতাব্দীতে 'ফাহিয়ান'-নামক প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক পুরুষোত্তমক্ষেত্র দর্শন করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত লিখিয়াছেন যে, ঐ স্থানে তখন বৌদ্ধধর্ম অমিশ্রিত-রূপে প্রচারিত রহিয়াছে এবং ব্রাহ্মণদিগের কোনও পৌরোহিত্য নাই। ইহা হইতে জানা যায়—তদানীন্তন প্রবল প্রতাপ-শালী বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণগণের ধর্মক্ষেত্র অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা সেইস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইবার ভয়ে ভীত থাকিতেন। এখনও দেখিতে পাওয়া যায়,—শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদের প্রকাশিত গৌড়ীয়গণের ঠাকুর শ্রীগোপালকে কোন সম্প্রদায়বিশেষ পরবর্ত্তিকালে নিজসম্প্রদায়ের সম্পত্তি-রূপে (!) পরিগণিত করায় তাঁহারা গৌড়ীয়গণ হইতে ভীত হ'ন। অতএব বৌদ্ধধর্মপ্রসারের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণের সনাতন বৈদিক ধর্ম অর্থাৎ বৈষ্ণবধর্মই প্রকাশিত ছিল, প্রমাণিত হয়।

সপ্তম শতাব্দীতে আচার্য্য শঙ্কর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ প্রচার করেন। তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের সংলগ্ন স্থানে 'ভোগবর্দ্ধন' বা 'গোবর্দ্ধন' নামে একটী মঠ স্থাপন করেন। সপ্তম শতাব্দীতে 'হুয়েন-সাং' নামক দ্বিতীয় চৈনিক পরি-ব্রাজক পুরুষোত্তম দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন যে, "সেই সময় বুদ্ধদন্ত সিংহলে নীত হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণগণ-কর্তৃক ঐ তীর্থ সম্পূর্ণরূপে দূষিত হইয়াছে।"

কোনও পাশ্চাত্য গবেষক পণ্ডিত লিখিয়াছেন,—

"There are weighty reasons for rejecting the theory of a Buddhist origin. The legend of Buddha's tooth is after all only a legend, the historical basis of which has not been proved; and it is very doubtful whether Dantapura, the city of the tooth, can be identified with Puri. Modern scholars hold that the town the Dantakura of the Mahabharata and the capital of Kalinga, should

* শ্রীপুরুষোত্তমে দন্তপীঠ-স্থাপনের প্রসঙ্গ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও কল্পিত বলিয়া খণ্ডন করিয়াছেন।

with greater probability be identified with Pliny's Dandagula near the Godavari river. • • • Again, the similarity between the form of the image and the Buddhistic symbols of an open trisula on a wheel, though curious, is not convincing; for such symbols are as common to Hinduism as Buddhism, the trisula being a well-known symbol of Saivism and the wheel of Vaishnavism. • • • At Mukhalingam in the Ganjam district, there is a larger temple of Siva, called Mukhalingeswar, to which is ascribed a connection with the Savaras similar to that given in the legend about Jagannath.

As regards the Car Festival, it is noticeable that cars are used not only in Puri for the worship of Jagannath, but also in Bhubaneswar for the worship of Siva, in Jajpur for the worship of the goddess Biraja, and also in many temples to the south. Moreover, the procession of cars of the gods is, as shewn above, mentioned in one of Asoka's Edicts, and is probably pre-Buddhistic. The eating of mahaprasad by all castes from the same plate is a custom also found in Bhubaneswar and outside Orissa, while the substitution of Jagannath for Buddha as the ninth avatara is purely local, Balaram and Krishna being substituted in other instances. Lastly one of the strongest arguments, the finding of relics, can be traced to the vedic period as a very old custom."

—*'Puri Gazetteers' (1929), Chapter IV. Page 102-3. Edited by L. S. S. O' Malley, I. C. S.*

উৎকলপণ্ডিতের অভিমত

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীসদাশিব মিশ্র কাব্যকণ্ঠ ১৩১৮ বঙ্গাব্দে "শ্রীজগন্নাথমন্দির" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"আধুনিক উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাস-স্বরূপ মাদলা-পঞ্জিকা। • • • মন্দিরকে লইয়াই মাদলা-পঞ্জিকার সৃষ্টি। উহাতে যে-সকল রাজাদিগের [illegible] ছিল, তাঁহাদিগের চরিত মাদলা-পঞ্জিকায় লিখিত আছে। ইহাতে বোধ হয়, ইহা মন্দিরের সমকালীন। সুশৃঙ্খলভাবে লিখিত হয় নাই সত্য, কিন্তু যযাতির সময় হইতে যদাবধি লিখিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভব। • • • উক্ত পঞ্জিকার লেখা হইতে বোধ হয় যে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন হইতে ভারতের যে যে রাজা যে-সময়ে রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাদিগের অধীনে মন্দির ছিল। এইরূপে অশোক প্রভৃতি যে যে বৌদ্ধ-রাজা, চক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের তত্ত্বাবধানে বৌদ্ধমতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অর্চ্চনাদি হইবার কথা উক্ত পঞ্জিকায় প্রকাশ। যদি বৌদ্ধমত স্থাপন করিবার জন্য হিন্দুরা যত্নবান হইতেন, তাহা হইলে এ মতের উল্লেখ মাদলা-পঞ্জিকায় হইত না। এই হেতু পঞ্জিকা প্রকৃত সত্য ঘটনার বিবরণ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহা সম্পূর্ণ অনুমেয়। এই সময় হইতে ভগবান বুদ্ধাবতাররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া জনশ্রুতি এ প্রদেশে শুনা যায়। এই মতে জাতিভেদ না থাকায়, সমস্ত জাতিকে উক্ত ভেদ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ব্বিকল্পভাবে এখানে অন্ন ভক্ষণ করিতে দেখা যায়। এখানে বৌদ্ধমত অবস্থিতির এই একটি প্রধান হেতু বলিয়া ধরা যায়। এ বিষয়ে আমাকে বেশী কিছু পরিশ্রম করিতে হইবে না; কারণ, শাস্ত্র-প্রমাণানুসারে বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্বে এই স্থান স্থাপিত বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। তবে অন্নমহাপ্রসাদ সম্বন্ধের প্রমাণসমূহ যে যে গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই গ্রন্থের নাম এ-স্থানে উল্লেখ করা হইল; যথা পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, বরাহপুরাণ, গরুড়পুরাণ, বিষ্ণুযামলতন্ত্র, ভত্ত্বযামল, ঋগ্বেদচতুর্বিংশি, কন্দ্রযামল, চতুর্বর্গ-যোগীশ্বর, ব্রহ্মপুরাণ, বায়ুপুরাণ, স্কন্দপুরাণান্তর্গত পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য প্রভৃতি গ্রন্থ-সমূহে বর্ণিত আছে যে, জাতি এবং স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যক্তি একত্রে অন্ন-মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবে, দূরদেশে লইয়া গেলেও অন্নমহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য লঘু হইবে না।"

কেহ কেহ বলেন যে, বৌদ্ধমতে মূর্ত্তিত্রয়ের অর্থাৎ বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের পূজা হইতেছিল, তাহারই অনুকরণে উক্ত ধর্ম্মের নাম লোপ করার অভিপ্রায়ে মূর্ত্তিত্রয় স্থাপন করিয়া নিজ নিজ মত দৃঢ় করিবার নিমিত্ত হিন্দুদিগের বদ্ধপরিকর হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভব এবং বৌদ্ধদিগের রথযাত্রাকে অনুকরণ

করিয়াও ভুবনেশ্বরের এবং জগন্নাথদেবের বর্ণনায় আসিয়া হইয়াছে। এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না; কারণ, সনাতনধর্ম বৌদ্ধমতের বহুসহস্র-বৎসর পূর্ব্ব হইতেই ভারতে বিদ্যমান; শ্রীজগন্নাথ—স্বয়ংরূপ ভগবান্। শ্রীবলদেব—স্বয়ংপ্রকাশ ও শ্রীসুভদ্রাদেবী—স্বরূপশক্তি-রূপিণী। বৈষ্ণবধর্ম্মের সর্ব্বত্রই শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবান্—এই ত্রিবিধমূর্ত্তি স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীজগন্নাথ—স্বয়ংরূপ শ্রীভগবান্, শ্রীবলদেব—স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব শ্রীগুরুদেব স্বরূপ ও শ্রীসুভদ্রাদেবী—স্বরূপশক্তিরূপিণী বৈষ্ণবী মূর্ত্তি। বৌদ্ধগণ যদি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের ত্রিমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া থাকে, তবে তাহা বৈষ্ণবগণের অনুকরণেই পরবর্ত্তি-কালে করিয়া থাকিবে।

রথের ব্যবহার বৈদিক যুগ হইতেই প্রচলিত আছে এবং মহাভারতেও শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি ইহার ব্যবহার করিয়াছেন, দেখা যায়। বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে যদি রথযাত্রার উল্লেখ থাকে, তাহা হইলে বৌদ্ধেরা হিন্দুধর্ম্মের অনুকরণে রথযাত্রা করিয়া থাকিবে; কারণ, সকার্য্যসমূহ পূর্ব্বানুগামী হয়। তাহাদিগের মতের মূলভিত্তিস্বরূপ 'ললিতবিস্তর', 'মহাবস্তুপুরাণ' ও 'অষ্টসাহস্রিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রতি দৃষ্টি-পাত করিলে দেখা যায় যে, সেগুলি হিন্দুদিগের পুরাণের আদর্শে রচিত হইয়াছে।

একাদশ-শতাব্দীতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীরামানুজ শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা-সৌষ্ঠবের উন্নতি সাধন করিয়া শ্রীলক্ষ্মীর মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করেন। তিনি এই পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের নিকটবর্ত্তী স্থানে একটি মঠ স্থাপন করেন। উহা সম্প্রতি 'শ্রীরামানুজ-কোট' বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীরামানুজাচার্য্যের কনৈক প্রিয়-শিষ্যের নাম—শ্রীগোবিন্দ। শ্রীগোবিন্দের সন্ন্যাসের নাম তামিল ভাষায় 'এম্পেরুমানার'। 'এম্পার' শব্দের অর্থ 'স্বামী'। এই শব্দটীর পূর্ব্বার্দ্ধ ও শেষার্দ্ধে একত্র করিয়া 'এম্প-আর' বা 'এমার' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রীরামানুজীয়গণ শ্রীগোবিন্দের নামানুসারে তাঁহাদের মঠের নামকরণ করিয়াছেন। কেহ বলেন,—রিউয়ার রাজার প্রতিষ্ঠিত মঠ বলিয়া উহা সাধারণতঃ 'রেওয়া'-শব্দ স্থানে 'এমার'-শব্দ ব্যবহৃত হয়।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের পূর্ব্বে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহের সন্নিকটে একটি কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত গরুড়বাহন কৃষ্ণের মূর্ত্তি ছিল। শ্রীরামানুজাচার্য্য ঐ কৃষ্ণের মূর্ত্তিকে শ্রীবিগ্রহের নিকট হইতে অপসারিত করেন এবং শ্রীমন্দিরের সেবার সৌষ্ঠব বিধান করেন।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের পরে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণও শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন।

কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ষোড়শ-শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে পদার্পণ করেন। তাঁহার সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এবং পরে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, ঠাকুর শ্রীল হরিদাস, শ্রীল স্বরূপদামোদর ও তদনুগত শ্রীগোস্বামিগণ ও সমস্ত গৌড়ীয়ভক্ত নীলাচলে বিজয় করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে পুরাণপুরুষের পরিশিষ্টলীলা-পরাকাষ্ঠা বিস্তার করেন। মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীনব-দ্বীপচন্দ্রের চরণে আপনাকে চিরবিক্রীত করিয়াছিলেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্রের দক্ষিণহস্তস্বরূপ শ্রীল রায়-রামানন্দই সর্ব্ব-প্রথমে শ্রীনীলাচলবিহারী শ্রীগৌরহরিতে রসরাজমহাভাব-মিলিতধাম সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন। নীলাচলবাসী তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীশ্রীনীলাচলবিহারী শ্রীগৌরহরিকে সচ্চিদানন্দরূপে অনুভব করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসলীলা প্রদর্শন করিবার পর চব্বিশ বৎসরের মধ্যে,—

"অষ্টাদশবর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি' জীবে শিখাইলা ভক্তি॥"

(চৈ চ ম ১।২৮)

পূর্ব্ব ছয় বৎসরের মধ্যেও শ্রীগৌরহরি নীলাচলে গমনাগমন করিয়াছেন। সেই সময় সুকৃতিমন্তগণ মূলপুরুষ চলাচল দুই রূপকে গৌর-শ্যামরূপে দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। সাগরে নদ নদী-মিলনের ন্যায় বহুদেশস্থ ভক্তগণ শ্রীনীলাচলবিহারীর পদাম্বুজসমুদ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন।

শ্রীগৌরলীলাস্মৃতিবিভূষিত শ্রীপুরুষোত্তম

শ্রীপুরুষোত্তমের বহু প্রাচীন শাসন-ব্রাহ্মণ ওথা রাজ-গুরুগণের মুখে আমরা শ্রবণ করিয়াছি,—শ্রীপ্রতাপরুদ্রের সময় হইতে শ্রীপুরুষোত্তম বিশেষতঃ শ্রীজগন্নাথদেবের

শ্রীমন্দিরের সর্ব্বত্র শ্রীশ্রীগৌর-স্মৃতিচিহ্ন বিভূষিত ছিল। কূর্ম্মবেড় বা দ্বিতীয় প্রাকারের মধ্যে শ্রীমন্দিরের চতুর্দ্দিকে যে বিরাট্ চত্বর আছে, তাহা এখনও 'শ্রীচৈতন্য-মণ্ডল' বা 'শ্রীচৈতন্য-মণ্ডপ'-নামে খ্যাত রহিয়াছে। শ্রীপুরুষোত্তমবাসী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ পরস্পর সম্ভাষণকালে এখনও "আপনারা কি শ্রীচৈতন্য মণ্ডপে বসিয়াছিলেন ?"—এইরূপ জিজ্ঞাসাদি করিয়া থাকেন। মুক্তিমণ্ডপ সঙ্কীর্ণ নির্দ্দিষ্ট স্থান মাত্র; তাহা শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ দরজার সংলগ্ন-প্রদেশে যোগ্য শাসনের নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণগণের অধ্যুষিত স্থান। কিন্তু শ্রীমন্দিরের চতুর্দ্দিক্স্থ বিরাট্ চত্বরের সর্ব্বত্র সকলেই যেখানে জাতি ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সচল ও অচল শ্রীজগন্নাথের দর্শনার্থী হইয়া ভ্রমণ বা উপবেশন করিতেন, সেই বিস্তৃত ক্ষেত্র অদ্যাপি 'শ্রীচৈতন্য-মণ্ডল' বা 'শ্রীচৈতন্য-মণ্ডপ'-নামে খ্যাত রহিয়াছে। এখনও 'বাইশ পহাচ' অতিক্রম করিয়া কূর্ম্মবেড়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবামাত্র দক্ষিণ-হস্তে উত্তরদিকে একটি প্রকোষ্ঠ-মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দারুময়ী শ্রীমূর্ত্তি 'ভগ্নগৌরাঙ্গ' নামে খ্যাত হইয়া বিরাজিত আছেন। শ্রীমূর্ত্তি মুণ্ডিতমস্তক ও উপবিষ্ট। কথিত হয় যে, এই শ্রীমূর্ত্তি শ্রীপ্রতাপরুদ্র মহারাজ কূর্ম্মবেড়ের মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন। পরবর্ত্তিকালে পূজারিগণের সেবা-শৈথিল্যে এই সেবা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল; কিন্তু সেই শ্রীমূর্ত্তি তথায় বিরাজমান ছিলেন। কিছুদিন হইল শ্রীরাধাকান্ত-মঠের যত্নে শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গরাগ, শ্রীমন্দিরের সংস্কার ও সেবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীজগন্নাথদেবের মূল-মন্দিরের বহির্ভাগে শ্রীমন্দিরসাত্তে দক্ষিণাভিমুখী ষড়্ভুজ-শ্রীমূর্ত্তি, নাটমন্দিরের মধ্যে উত্তরদিকে প্রাচীর-গাত্রে পূর্ব্বাভিমুখী ষড়্ভুজ শ্রীমূর্ত্তি, দক্ষিণ-দ্বারের সংলগ্ন পূর্ব্বদিকে একটি প্রকোষ্ঠে পশ্চিমাভিমুখী প্রমাণাকার ভক্ত-নৃত্যাভিরাম ষড়্ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি বিরাজিত। এই শেষোক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ-মূর্ত্তি সূপকার-নিয়োগের স্থানে অবস্থিত। সূপকার-ব্রাহ্মণগণ শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত না হইলে তাঁহারা এই স্থানে ষড়্ভুজ-মূর্ত্তি প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হইতেন না, বা তদ্বিষয়ে বাধা দিতেন। উড়িষ্যার স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত গোঁড়া। এজন্যই তাঁহারা পরবর্ত্তিকালে বিদেশ হইতে আগত শাক-সব্জী, ফল-মূল এমনও নৈবেদ্যাদিতে ব্যবহার করেন না। বৈদ্যুতিক আলোক এখনও গর্ভ-মন্দিরে প্রবেশ করে নাই। কূর্ম্মবেড়ের মধ্যে ঐ আলো-প্রবেশের সময় বড় আপত্তি হইয়াছিল। এখনও সেজন্য অনেক প্রাচীনপন্থী ব্যক্তি উহার নিন্দা করিয়া থাকেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্রের কুলগুরু-বংশীয় রাজগুরু-উপাধিক কোন কোন কুলীন, পণ্ডিত ও প্রাচীন ব্রাহ্মণের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, স্থানীয় বিশেষ ক্ষমতাশালী শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের মঠসমূহের অধ্যক্ষগণ বহু লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া শ্রীমন্দিরের উত্তরদিকে শ্রীলক্ষ্মীমন্দিরের সম্মুখে যে কূপটিতে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণোদক পতিত হয়, তৎসংলগ্ন উচ্চ-বেদীতে আচার্য্য শ্রীরামানুজের শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সমৃদ্ধিশালী মঠসমূহের প্রবল প্রতাপ, তথা বিপুল অর্থ-ভাণ্ডারের আকর্ষণ, কিছুই রাজা বা স্থানীয় সেবক-সম্প্রদায়কে বশীভূত করিতে পারে নাই। কোন রাজগুরুবংশীয় পণ্ডিত ব্যক্তির মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, পুরীর কোন রাজা সম্প্রদায়-বিশেষের মহান্তগণকে বলিয়াছিলেন,—"যদি এই কূর্ম্মবেড়ের মধ্যে কোন আচার্য্যের নূতন মূর্ত্তি স্থাপনে প্রয়াসী হ'ন, তাহা হইলে আপনাদের কপালের তিলক লুপ্ত হইবে।" অথচ এই কূর্ম্মবেড়ের মধ্যে মূল-মন্দিরের ললাটে, অভ্যন্তরে শ্রীশ্রী-গৌরাঙ্গদেবের শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীপাদপদ্ম নির্ব্বিবাদে পূজিত হইতেছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা-শক্তি শ্রীমন্দিরের সর্ব্বত্র প্রকাশিত থাকিবার আর একটি নিদর্শন এই যে, শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির ব্যতীত কূর্ম্মবেড়ের মধ্যে যে-সকল অসংখ্য পার্শ্বদেবতার মন্দিরসমূহ বিরাজিত রহিয়াছে, তন্মধ্যে কোথায়ও কখনও ঘণ্টাদিবাদ্যের ধ্বনি হইতে পারে না; কেবল দুর্গোৎসবের কএকদিন শ্রীবিমলা-দেবীর মন্দিরে সাময়িকভাবে বাদ্য-ভাণ্ড বাজিয়া থাকে। কিন্তু এই নিয়ম ষড়্ভুজ-শ্রীগৌরাঙ্গের মন্দিরে ভঙ্গ হইয়াছে। তথায় সকল সময় ঘণ্টা-বাদ্যাদি হইতে পারে এবং বাদ্যাদি-যোগে কীর্ত্তনাদি হইতে পারে।

শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের সময় হইতে বর্ত্তমান পুরীর মহারাজ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রদেবের পিতৃদেব শ্রীমুকুন্দদেব পর্য্যন্ত সকলেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের নিকট হইতে দীক্ষাদি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসক ছিলেন; কেবল বর্ত্তমান মহারাজ তাঁহার বিদিত কোনও কারণের বশবর্ত্তী হইয়া 'এমারমঠে'র শিষ্যত্ব স্বীকার

করিয়াছেন। প্রাচীনগণ বলেন,—এযাবৎকাল শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের ললাটে গৌড়ীয়গণের তিলক অঙ্কিত ছিল; কিন্তু অতি অল্পদিন পূর্ব্ব হইতে তথায় সম্প্রদায়-বিশেষের তিলক দৃষ্ট হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত প্রাচীন রাজপ্রাসাদের (পুরুষা বহরের) ভগ্নাবশেষের মধ্যে এখনও শ্রীপ্রতাপরুদ্র ও তদীয় অন্যতম পত্নীর মূর্ত্তিত মূর্ত্তাপরাধ শ্রীশ্রীগৌর-নিতাইয়ের-মূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। এখনও উড়িষ্যার প্রত্যেক ভাগবত টুলিতে শ্রীচৈতন্যদেবের সংকীর্ত্তনানুযায়ী কীর্ত্তন হইয়া থাকে এবং কোথায় কোথায়ও বা শ্রীশ্রীগৌর-নিতাইয়ের শ্রীমূর্ত্তি পূজিত হইতেছেন। এখনও শ্রীপুরুষোত্তমের সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ের বহু মঠের নিদর্শন দৃষ্ট হয়।

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রেই শ্রীপুরুষোত্তমদেবের শ্রীমন্দিরের অতি সন্নিকটস্থ পবিত্র ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র শুদ্ধভক্তি প্রচার করিয়াছেন। শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল-পুরুষ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই স্থানে 'ভজনলীলা' প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারই ভজনস্থলীতে পরবর্ত্তিকালে 'শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে 'শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ' শ্রীটোটাগোপীনাথের সন্নিকটে চটকপর্ব্বতে অবস্থিত রহিয়াছেন। কিন্তু বহির্ম্মুখতার নৈসর্গিক রুচিচালিত হইয়া বাঙ্গালার কোনও ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন,—

"Chaitanya was one of the principal causes of the political decline of the empire and the people of Orissa. Not only that, the acceptance of Vaishnavism or rather Neo-Vaishnavism was the real cause of the Musulman conquest of Orissa twenty eight years after the demise of Prataprudra.

• • Neo-Vaishnavism became fashionable and powerful officers of Prataprudra, like Ramananda Raya, the governor of Rajmahendri before its final loss and Gopinath Barajena that of the Maljyatha Dandapata or Medinipur, were the most notable converts after the king himself.

• • • •

The decline of the power and prestige of Orissa is solely due to the national adoption of the sublime Bhakti-marga of Chaitanya."

(History of Orissa by R. D. Banerjee Vol. I, P 330-31, 350.)

আধ্যক্ষিক ঐতিহাসিকের যুক্তি এই,—"সূর্য্যবংশীয় কপিলেন্দ্র ও তাঁহার পুত্র পুরুষোত্তমদেব উড়িষ্যার বিশেষ পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের রাজ্যের সীমা গঙ্গার দক্ষিণতীর হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণানদীর উত্তরতট পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তমদেব কাঞ্চিপর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যসীমা বিস্তৃত করিয়া বিজয়নগরের রাজধানী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি বিজয়নগর-রাজা হইতে 'রত্নবেদিসিংহাসন' প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যসম্ভার পুরীতে আনিয়াছিলেন। কিন্তু পুরুষোত্তমের পুত্র রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যদেবের পাল্লায় পড়িয়া পরিবার-পরিজন, অমাত্য-তুল্য, রাজ্যৈশ্বর্য্য যথাসর্ব্বস্ব পরমার্থের নিকট বিনা-শুল্কে চিরবিক্রয় করিয়া ভিখারী সাজিলে বিজয়নগরের সম্রাট্ কৃষ্ণদেবরায় সাধু প্রতাপরুদ্রের রাজধানী পুনঃ পুনঃ আক্রমণ এবং গোদাবরীর দক্ষিণস্থ যে-সকল প্রদেশ প্রতাপ-রুদ্রের অধিকারে ছিল, তাহা বিজয়নগর-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। অবশেষে প্রতাপরুদ্র বিজয়নগর-রাজের হস্তে তাঁহার দুহিতাকে প্রদান করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এইরূপ ধর্ম্মোন্মত্ততা (?) কেবল ব্যক্তিগত অধঃপতন নহে, জাতীয় অধঃপতন ও অধীনতার কারণ।"

ব্যষ্টিগত, জাতিগত বা রাষ্ট্রগত অধঃপতনের স্বরূপের পরিচয় আমরা জড়ের উন্নতি ও অবনতির তৌলদণ্ডেই করিয়া থাকি। সর্ব্বগ্রাসী জড়বাদ, যাহা ভূঁই ও ভুঁড়িকে কেন্দ্র করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা সমগ্র মানবজাতির, তথাকথিত সভ্যসমাজের ও রাষ্ট্রের জাতীয়তার শরীরে কতটা বিষাক্ত-বীজাণু প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে, তাহা নানা প্রত্যক্ষ উদাহরণেও যদি এখনও আমাদের উপলব্ধির বিষয় না হয়, তবে বলা যাইতে পারে যে, এই মানবজাতির ধ্বংস অনিবার্য্য। সমাজ ও রাষ্ট্রের তথাকথিত প্রগতির ভাবী পরিণাম প্রত্যক্ষ করিবার জন্য দুইটী সমসাময়িক

মহাযুদ্ধের ইতিহাস আমাদের হাতে যে রত্নরশ্মি দিয়াছে, তাহাতেও যাঁহারা সতর্ক হইবেন না, তাঁহারা নিশ্চয়ই জ্ঞাত ও অজ্ঞাত আত্মহত্যার সেনাদল।

জড়বাদ ভারতের নিজস্ব নহে—ভারতের কেন, বিশ্বের কোন চেতনেরই নিজস্ব নহে; তাহা আমাদের নিজস্ব সত্তার উপর বৈদেশিক আক্রমণমাত্র। সেই আক্রমণই আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ। সেই মেরুদণ্ডটি ভাঙ্গিয়া গেলে সমস্তই অধঃপতিত হইল, বিনষ্ট হইল। এইরূপ বৈদেশিক আক্রমণে অভিভূত হইয়াই আমরা হিতকে বিপরীত মনে করিতেছি,—বুঝি উন্মুখতার বিকাশ—উন্মুখতার যৌবন—উন্মুখতার অনুশীলনদ্বারাই আমাদের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত অধঃপতন হইয়াছে! বুঝি বাঁচিবার উপায়-সন্ধানই আমাদের মৃত্যুর কারণ হইয়াছে! বস্তুতঃ কি ব্যক্তিগত, কি জাতিগত, কি সমাজগত—যাবতীয় অধঃপতন একমাত্র পরতত্ত্বের প্রতি উন্মুখতার অনুশীলনের অভাবেই সংঘটিত হইয়া থাকে, ইহা ঐতিহাসিক বাস্তব সত্য।

যাঁহারা বলেন,—শ্রীচৈতন্যদেব কোন দেশ বা জাতির উন্নতির বিনাশকারী ও অধঃপতনের কারণ, তাঁহারা ন্যূনাধিক অধঃপতনের প্রপাতধারার মুখে পতিত হইয়াই ঐরূপ উক্তি করিতেছেন, ইহা চন্দ্র-সূর্য্যের অস্তিত্ব অপেক্ষাও অধিকতর সত্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়া ভবিরখাস ও সাকরমল্লিক যে তদানীন্তন গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহের প্রধান-মন্ত্রিত্ব, শ্রীরামরায় রাজ্য-শাসনকার্য্য, কিংবা শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু 'ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, অপ্সরাসম ভার্য্যা' পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; কিংবা মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র যুদ্ধ-বিগ্রহাদির প্রতি উদাসীন হইয়াছিলেন, তদ্দ্বারা জাতীয় অধঃপতন না হইয়া কতটা প্রকৃত জাতীয়-উন্নতি ও সুসভ্যতার আনুষঙ্গিক পরিপুষ্টি হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান যুগ ও ভাবী যুগের মনীষিগণের ভাবিবার বিষয় হইয়াছে এবং হইবে। ঐরূপ লোক-নেতৃত্ব লাভ করিবার জন্য জগতের মনীষিগণ কত অযৌক্তিক দক্ষিণা-প্রদান, জীবনপণ, প্রতিষ্ঠার বিনিময়ে কারাবরণ, ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবজগৎকে প্রভুত্ব-কামনার যূপকাষ্ঠে বলিদান করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীল সনাতন সমগ্র মানবজাতির বা জীবজগতের স্বাধীনতার অর্থাৎ অনাদিকালের বন্ধনমোচনের প্রকৃত পথ প্রদর্শন করিবার জন্য কারা বরণ করিয়াছিলেন এবং গৌড়ের বাদশাহের মন্ত্রিপদ পরিত্যাগের জন্য সাত হাজার মুদ্রা সঙ্কোচ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীসনাতনের ব্যবহার হুসেন শাহকেও চমৎকৃত করিয়াছিল।

জাগতিক সম্পদ, জাগতিক স্বাধীনতা, জড়বিলাস, ভোগবৈচিত্র্য-বিস্তার-প্রভৃতি ব্যাপারে আধুনিক বিভিন্ন পাশ্চাত্য-জাতি আমাদের আদর্শস্থানীয়; কিন্তু তাঁহাদের ঐরূপ জাতীয় অভ্যুদয় ও স্বাধীনতার শেষ পরিণাম কি আমাদের চক্ষু উন্মীলন করিবে না? তথাকথিত জাতীয় অভ্যুদয় ও সভ্যতার চরম শিখরে আরোহণ করিয়া জাতিকে হয় চরমে খণ্ড খণ্ড বিশ্ব-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়, না হয়, সাময়িক অস্ত্র-নিরোধ আইনের কোন কৃত্রিম উপায় বা ভাবী কাল্পনিক নিরাপত্তার আকাশ-কুসুমের উপর নির্ভর করিতে হয়। এক একটী মানবের প্রাণ কত মূল্যবান্, এক একটী মানবের প্রাণের জন্যই জগতের সমস্ত ধনসম্পদ্ বা জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় উন্নতির পরিকল্পনা, অথচ ঐরূপ লক্ষ লক্ষ সমর্থ মানবকে একসঙ্গে একমুহূর্ত্তে কিরূপে বিনাশ করা যায়, তাহার কল-কৌশল বা উপায়োদ্ভাবন যে সভ্যতা, যে বিজ্ঞান, যে রাজনীতি, সমাজ-নীতি বা অর্থনীতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিক্ষা দিয়া থাকে, যে সভ্যতা মানবজাতিকে হিংসার সেবা করিয়া তোলে, তাহার চরম ফল ধ্বংস ব্যতীত আর কি? বাস্তব অকৃত্রিম অহিংসনীতির শিক্ষাদীক্ষা শ্রীচৈতন্যদেবের সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীপ্রতাপরুদ্র ঐরূপ জঘন্য ধ্বংসকারিণী রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া সমস্ত রাজনীতিকে শ্রীচৈতন্যের শ্রীপাদপদ্মসেবায় নিযুক্ত করিয়া দেশের, সমাজের ও রাষ্ট্রের প্রকৃত উন্নতি করিয়াছেন। বস্তুতঃ অধুনা শ্রীচৈতন্যদেব ও তদ্দাসগণের প্রভাবেই উড়িষ্যার কেন, সমগ্র বিশ্বের প্রকৃত উন্নতির পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উড়িষ্যার প্রকৃত সভ্যতা, শিক্ষা, কৃষ্টি, সাহিত্য, শিল্পকলা, বিজ্ঞান-প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করিয়াই অধিকতর উন্নত হইয়াছিল। পরমার্থকে বা পরতত্ত্বকে নির্ব্বাসিত করিলে জগতের কোনও দেশ বা জাতির কোনই অর্থলাভ হইতে পারে না। লিঙ্গরাজ শ্রীভুবনেশ্বরের মন্দির, শ্রীঅনন্তবাসুদেবের মন্দির, পুরীর শ্রীজগন্নাথের মন্দির-প্রভৃতি শিল্পকলাচাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া পাশ্চাত্য সুদক্ষ স্থপতিবিদ্‌গণেরও বিস্ময় উৎপাদন

করিয়াছে। শ্রীরায়-রামানন্দ, উৎকল-কবি শ্রীগোবিন্দদেব প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যদেবকে অবলম্বন করিয়াই সাহিত্যের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন। এমন কি, যে অতিভক্তী জগন্নাথদাস কবির-প্রতিভায় উৎকলবাসীর চিত্তরঞ্জন করিয়াছেন, তিনিও, যে কোনভাবে হউক, শ্রীচৈতন্যদেব ও তদনুগত সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে ঐ উদ্দীপনা লাভ করিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করেন। শ্রীমাধবী-দেবী, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীজগদীশ* প্রভৃতি ভক্ত-মহিলাগণ কত কত জীবের নিত্য উন্নতির পথ প্রদর্শনকারিণী হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার ভক্ত-সম্প্রদায়ের প্রভাব উৎকলের নৈতিক উন্নতিকে কতটা বিশুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাও সুধীগণ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা বা জাতীয়তার বিচার পারমার্থিকতার মুক্ত-প্রদেশে নাই।

প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায়ই পরমার্থরাজ্যের চরমকথা উৎকল হইতে সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হইয়াছে। যে পরমসত্যের সন্ধান এখনও বিশ্বের সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য ও উন্নত জাতিগণ প্রাপ্ত হন নাই, সেই পরম-চরমধনের গুপ্ত খনি শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীপুরুষোত্তমে আবিষ্কার করিয়াছেন।

মনে করুন, যদি শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ আশ্রয় না করিতেন, যদি শ্রীচৈতন্যদেব উৎকলে না আসিতেন বা জগতে তাঁহার অবতার না হইত, তাহা হইলে তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বের ঐতিহাসিক ইতিহাস কি প্রমাণ করিয়া দিত? পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রবণপরাক্রান্ত নৃপতিগণের কথা দূরে থাকুক, যে বিজয়নগর-রাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই সোণার লঙ্কাই অক্ষত থাকিল কি? কৃষ্ণদেবাচার্য্যের অবস্থন অচ্যুতাচার্য্য, রামরাজ-প্রভৃতির সময় বিজয়নগরকে অধীনতার রাহু গ্রাস করিয়া বসিল। টালিকোটের যুদ্ধে মুসলমানগণ হিন্দুগণকে পরাজিত করিয়া রামরাজকে নিহত ও বিজয়নগরকে বিনষ্ট করিল; বিজয়নগরের স্বর্ণরত্ন-সৌধরাজি ও প্রাসাদ ধূলিসাৎ হইল—হিন্দুসাম্রাজ্য বা জাতির উন্নতির (?) উদয়াচলই আবার অস্তাচলে পরিণত হইল। জাগতিক অভ্যুদয়ের সৌরব-রবির পরমায়ুঃ কতক্ষণ?

"যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা।"

যে পরমার্থকে আশ্রয় করিয়া শ্রীঅম্বরীষ, শ্রীপৃথু-প্রভৃতির ন্যায় সার্ব্বভৌম-সম্রাট্ উদিত হইয়াছেন, যে পরমার্থকে আশ্রয় করিয়া দাক্ষিণাত্যের শ্রীমন্দিরগাত্রে শিল্পকলা-চাতুর্য্য এখনও মূর্ত্তিমৎ রহিয়াছে, যে পরমার্থকে আশ্রয় করিয়া বেদ, স্মৃতি, রামায়ণ, শ্রীমহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত-সাহিত্যের অভ্যুদয় হইয়াছে এবং পরবর্ত্তিকালে শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীপাদপদ্মকে কেন্দ্র করিয়া যে শ্রীগৌড়ীয়-সাহিত্যকল্পতরুর বিস্তার হইয়াছে, যে পরমার্থকে কেন্দ্র করিয়া যাবতীয় রসশাস্ত্র ও গীতশাস্ত্রের অদ্বিতীয়-রসধ্বনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই পরমার্থই জাতীয় অধঃপতনের কারণ,—এই সিদ্ধান্ত(?) অধঃপতিতগণের মুখেই শোভা পায়। তবে এ-কথা ঠিক যে, ঐ-সকল পরতত্ত্বের ভোগ্যবস্তু জীবজগতের ভোগের ইন্ধনরূপে পর্য্যবসিত হইলেই তাহা জাতীয় ধ্বংসের কারণ হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান সভ্যতা, শিক্ষা, কৃষ্টি, তথাকথিত প্রগতি বা উন্নতি ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিকে, সমষ্টির বিরাড়্রূপ জাতি-বিশেষকে মধুরপুচ্ছযুক্ত বিষাক্তভোজী বায়সের ন্যায় আসুরিক ভোক্তা সাজাইয়া ধ্বংসের অভিযানের সৈন্য করিয়াছে, কামের ইন্ধন যোগাইয়া—লোভের তৈল খাওয়াইয়া জাতিকে ইন্দ্রিয়যজ্ঞবহ্নিতে আহুতি দিতেছে। এই নরমেধযজ্ঞই কি সভ্যতা ও প্রগতির তন্ত্রমন্ত্র ও উপাসনা?

কৃত্রিম ধার্ম্মিক-সম্প্রদায়ের বিচারের সহিত অকৈতব পারমার্থিক-সম্প্রদায়ের বিচারকে তুল্য গণনা করায় এবং ঐ-সকল ধর্ম্মধ্বজিগণের ধর্ম্মের ধারণায় আমাদের মস্তক ভরপুর করিয়া রাখায় আমরা প্রকৃতসত্য-নিরূপণে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি। পারমার্থিকগণ কৃত্রিম ধার্ম্মিক-সম্প্রদায়ের ন্যায় জগৎ বা প্রাণিজাতিবিদ্বেষী নহেন, আবার তাহাদের বহির্মুখতায় অনুমোদকও নহেন। যে 'ডিমাঘাইট্' মানব-জাতির ভোগের পথ পরিষ্কার করিবার পরিবর্ত্তে হরিনেবার

---

* শ্রীসিখিমাহিতির ভগ্নী শ্রীমাধবীদেবী সংস্কৃতভাষায় গ্রন্থ ও উৎকলভাষায় প্রেমভক্তি-সূচক গীত রচনা করিয়াছেন; শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর কন্যা শ্রীবঙ্কিমীদেবী শ্রীপুরুষোত্তমে মঠ স্থাপন করিয়া প্রেমভক্তি-প্রচার এবং পুরীর রাজদুহিতা শ্রীজগদীশা শ্রীবেতসপুরীর তীরে মঠ-স্থাপনপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন ও প্রচার করিয়াছেন।

বিরচন পাহাড়পর্বতগুলিকে সরাইয়া দেয়—হরিকথা-কীর্তনে সুযোগ করিয়া দেয়, যে 'প্লায়োপ্লেন' (aeroplane) ভোগসুখের বা নরমেধযজ্ঞের সহায়ক হইয়া জাতির ধ্বংস সাধন করিবার পরিবর্তে হরিকথা-প্রচারের আনুকূল্য করিয়া মৃত জীবজগৎকে অমর, দুঃখীকে নিত্যসুখী করিবার সহায়তা করে, সেরূপ বিজ্ঞানের অবদানগুলির প্রতি পরমার্থিকগণ বিদ্বেষী হ'ন না। চরমে জাতিধ্বংসকারিণী স্বৈরিণী প্রগতির মুখ ফিরাইয়া উহাকে হরিসেবার আনুকূল্যকারিণী এবং আনুষঙ্গিকভাবে সমগ্র প্রাণিজাতির কল্যাণদায়িনী করিতে একমাত্র শ্রীভাগবত-ধর্মই সমর্থ।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির দুইটি বিভিন্ন ঐক কেন্দ্রিক প্রাকারের মধ্যে অবস্থিত। বহিঃপ্রাকারটি 'মেঘনাদ-প্রাচীর' ও অন্তঃপ্রাকার বা দ্বিতীয় প্রাকারটি 'কূর্মবেড়'-নামে কথিত। বহিঃপ্রাকার দৈর্ঘ্যে ৬১৫ ফিট্, প্রস্থে ৬৭০ ফিট্ ও উচ্চতায় ২০ হইতে ২৪ ফিটের মধ্যে। চারিদিকে চারিটি প্রবেশ-দ্বার। প্রত্যেকটি প্রবেশ-দ্বার বিস্তৃত তোরণ-যুক্ত। প্রথম দ্বারের তোরণ অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় প্রাকারের তোরণে উঠিবার সোপানাবলী আছে। তৎপরে দ্বিতীয় প্রাচীর-বেষ্টনীর মধ্যে পার্শ্বদেবতাগণের মন্দির। তৎপরে চতুর্দিকে বিরাট্ চত্বর, মধ্যস্থলে পশ্চিমদিক্ হইতে পূর্বাভিমুখী মন্দির চারিটি ভাগে বিভক্ত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন—(১) মূল-মন্দির, (২) মুখ-শালা, (৩) নাট্য-মন্দির ও (৪) ছত্রভোগ-মণ্ডপ। নাট্যমন্দিরের পূর্ব-সীমানায় ও ছত্র-ভোগ-মণ্ডপের সম্মুখে শ্রীগরুড়স্তম্ভ বিরাজমান। একটি উচ্চ স্তম্ভোপরি ভগবৎপার্ষদ শ্রীগরুড় করযোড়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলভদ্র ও শ্রীসুভদ্রার স্তুতি-নিরত-মূর্তি প্রকট করিয়া অবস্থান করিতেছেন। এই গরুড়স্তম্ভের পশ্চাৎ হইতেই দর্শনার্থিগণের শ্রীভগবদ্দর্শনের বিধি আছে। মূল-মন্দির 'বড়দেউল'-নামে পরিচিত। মূল-মন্দিরের গর্ভগৃহস্থ বেদী "রত্নবেদী"-নামে খ্যাত। এই রত্নবেদীর উপরই শ্রীশ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলভদ্র ও মধ্যস্থলে শ্রীসুভদ্রাদেবী বিরাজমান আছেন। রত্নবেদীর পর যে গর্ভমন্দিরের দ্বার আছে এবং তৎপরে যে চন্দন-অর্গল (চন্দনকাষ্ঠ-নির্মিত সাধারণের প্রবেশরোধক অর্গল) দৃষ্ট হয়, তাহারই মধ্যবর্তি-স্থান 'মুখ-শালা'-নামে পরিচিত; তৎপরে নাট্যমন্দির। এই স্থানে শ্রীভগবানের প্রীতিকর নৃত্য-সংকীর্তনাদির অনুষ্ঠান হয় এবং দর্শনার্থিগণ সমবেত হন। নাট্যমন্দিরের পর ছত্রভোগ-মণ্ডপ। ছত্রভোগ-মণ্ডপে কেবলমাত্র পুরীর বিভিন্ন মঠাধিপগণের ও সাধারণের ব্যবস্থা-দেওয়া ভোগ হইয়া থাকে; কিন্তু রাজ-প্রদত্ত ভোগসমূহ মূল-মন্দির-মধ্যেই হয়। রত্নবেদীর মধ্যে পূর্বোক্ত শ্রীবিগ্রহ-ত্রয় ব্যতীত শ্রীসুদর্শনচক্র এবং শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীসরস্বতীর শ্রীমূর্তি বিরাজমানা আছেন।

মূলমন্দির মালার উত্তরে ও দক্ষিণে পার্শ্বমন্দির সমূহ বিরাজমান আছে। দক্ষিণে শ্রীমদনমোহনের মন্দির ও শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মার্জন মণ্ডপ (এইস্থানে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীলক্ষ্মীদেবী স্নান করেন), উত্তর পার্শ্বে 'ভাণ্ডার-লোকনাথে'র মন্দির (ইনি শ্রীজগন্নাথদেবের ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ), এতদ্ব্যতীত উত্তর পার্শ্বে 'দেউলকরণে'র কার্য্যালয় আছে। দেউলকরণ 'মাদলা-পাঞ্জী' দেখিয়া প্রত্যহ তিথি ও নক্ষত্র-অনুযায়ী পূজাদির বিধান-প্রদান করেন। মূল-মন্দিরের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণে তিনটি পিঢ় দেউল। এই তিনটি মন্দির মূল-মন্দিরের গাত্রে উচ্চভাগে সংলগ্ন আছে। ইহাতে যথাক্রমে শ্রীবরাহ, শ্রীনৃসিংহ ও শ্রীবামনদেব অবস্থান করিতেছেন। মূল মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্বভাগে উচ্চ-প্রদেশে শ্রীশ্রীষড়ভুজ-মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ বিরাজমান আছেন। ষড়-দেউল বা মূল মন্দিরের বিমানাংশ উচ্চতায় ২০০ ফিট্ ও পরিধিতে ৪২ ফিট্ বলিয়া কেহ কেহ নিরূপণ করেন। শুনিতে পাওয়া যায়, সর্বোপরি যে 'নীলচক্র'-নামক সুদর্শন-চক্রটি শোভা পাইতেছে, তাহা অষ্ট-ধাতুবিনির্মিত। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে খুরদার রাজা রামচন্দ্রদেব এই চক্রটির জীর্ণ-সংস্কার করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্দিরের বহির্গাত্রে মিথুনীভূত নরনারীর মূর্তি-সম্বন্ধে ষড়রিপু-তাড়িত গবেষকগণ অনেক কিছু স্বকপোল-কল্পিত অযাচিত অভিমত প্রকাশ করেন; কিন্তু ঐরূপ অশ্লীলতা-ব্যঞ্জক-মূর্তি কেবল পুরীর মন্দিরে নহে, উৎকলের অন্যান্য অংশে এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানের, এমন কি, কোনও কোনও রোমান-ক্যাথলিক-গির্জার উপরেও দৃষ্ট হয়। প্রাচীন স্থপতিবিদ্‌গণ বজ্র-পতনাদি-নিবারণের জন্য মিথুনী-ভূতমূর্তি-স্থাপনের বিধান প্রদান করিয়াছেন। এতৎ-সম্পর্কে

কয়েকটি শাস্ত্রীয় প্রমাণ ঐ-স্থানে উদ্ধৃত হইল,—

বস্ত্রপাতাদি-ভীত্যাদি-বারণার্থং ধ্বজোচ্ছিতম্।
শিল্পশাস্ত্রেঽপি ধ্বজাদি-বিন্যাসঃ পৌরুষাকৃতিম্॥
(উৎকলখণ্ডম্)

অধঃশাখা চতুর্থাংশো প্রতিহারৌ নিবেশয়েৎ।
দ্বিখুনৈরথ বল্লীভিঃ শাখা সেয়ং বিভূষয়েৎ॥
(অগ্নিপুরাণম্)

দ্বিখুনৈঃ পঞ্চবল্লীভিঃ শ্রমখেদোপশোভয়েৎ।
(বৃহৎসংহিতা)

ধ্বজা

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের শিখরদেশস্থ নীলচক্রে যে ধ্বজা উড্ডীন হয়, তাহা যাত্রিগণও স্থানীয় পাণ্ডাগণের সাহায্যে দর্শন করিতে পারেন। পাণ্ডাগণ ধ্বজা উড্ডীন করিবার আনুকূল্যস্বরূপ তীর্থযাত্রিগণের নিকট হইতে পাঁচসিকা হইতে সাতসত টাকা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীমন্দিরের চূড়ায় উঠিয়া ধ্বজা বন্ধন ও প্রদীপ দান করিবার জন্য একশ্রেণীর সেবক নির্দ্দিষ্ট আছেন; তাঁহারা পুরুষানুক্রমে ঐ কার্য্য করেন। বর্ত্তমানে তাঁহাদের সংখ্যা পঁচিশ ঘরের অধিক নহে। ইঁহারা সামান্য কিছু পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া অনায়াসে দ্রুতগতিতে শ্রীমন্দিরের শিখরে আরোহণপূর্ব্বক ধ্বজা বন্ধন করেন।

মহাদীপ

প্রতি একাদশীর রাত্রিতে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের শিখরদেশে নীলচক্রের নিম্নে এবং শ্রীজগমোহন ও শ্রীনাট-মন্দিরের চূড়ায় তিনটী ঘৃত-প্রদীপ প্রদান করা হয়। তাহাদিগকে 'মহাদীপ' বলে। দীপদানের সময় চতুর্দ্দিক হইতে জয়ধ্বনি উচ্চারিত হইতে থাকে।

অহিন্দুগণের আক্রমণ

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির-গর্ভগৃহ ও চূড়ার কলসীর মধ্যে নিহিত অগণিত ধন-রত্ন-মণি-মাণিক্যের কথা প্রবাদের মত প্রচারিত ছিল। ক্রমশঃ ইহা বিধর্ম্মীরাজগণের লোলুপ-দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে; সুতরাং বহু অহিন্দু শাসক এই মন্দির আক্রমণ করিয়া ধন-রত্ন-লুণ্ঠনে বদ্ধপরিকর চেষ্টা করিয়াছে। লিখিত বিবরণের মধ্যে যে-সকল বিধর্ম্মীর অভিযানের কথা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের বাদশাহ হুসেনসাহের অভিযানই সম্ভবতঃ অগ্রণী। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি-গ্রন্থেও ইহার আভাস পাওয়া যায়। শ্রীমন্দিরের পূজারিগণ অভিযানের ইঙ্গিত পাইয়াই তৎপূর্ব্বে চিল্কা-হ্রদের নিকট নৌকায় করিয়া শ্রীবিগ্রহগণকে স্থানান্তরিত করেন। হুসেনসাহ বিফলমনোরথ হইয়া মন্দিরের বিভিন্ন স্থান ভগ্ন করে এবং দক্ষিণদেশ হইতে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রত্যাবর্ত্তনে হুসেনসাহ পলায়ন করে।

১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে কালাপাহাড় উড়িষ্যার মন্দিরসমূহ আক্রমণ করে। কালাপাহাড় ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভীষণ অপরাধ-কলে আধ্যাত্মিক হইয়া পড়ে এবং অহিন্দু-ধর্ম্ম গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহার ধারণার হিন্দুধর্ম্মের বিদ্বেষী হয়। মাৎসর্য্যানল পরিতৃপ্ত করিবার জন্য কালাপাহাড় উৎকলের সমস্ত স্থানের শ্রীমন্দির (?) ও শ্রীবিগ্রহ (?)-সমূহ বিনাশের চেষ্টা করিয়া 'পৃথিবীর মানচিত্র বিনষ্ট করিয়া পৃথিবী হইতে যা করিয়াছি' এইরূপ বৃথা আস্ফালনের ন্যায় আত্মবিনাশই বরণ করে। শ্রীজগন্নাথদেবের পূজারিগণ স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাদের আরাধ্যদেবকে 'পরিকুদ'-নামক স্থানে স্থানান্তরিত করেন এবং পুনরায় চিল্কা-হ্রদের নিকট গুপ্তভাবে সংরক্ষণ করেন। কালাপাহাড় অনুসন্ধানের ফলে ইহা জানিতে পারিয়া রাবণের মায়াসীতা-স্পর্শের ন্যায় শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহকে মর্ত্ত্যবস্তু-বোধে অবমাননা করিবার চেষ্টা করিলে অতি ভয়াবহভাবে কালাপাহাড়ের জীবনান্ত হয়।

পুরুষোত্তমদেবের রাজত্বকালে চারিবার, মুকুন্দদেবের রাজত্বকালে দুইবার, দিব্যসিংহদেবের রাজত্বকালে একবার এবং রামচন্দ্রদেবের রাজত্বকালে (১৭৩১-১৭৪২ খৃঃ) পুনরায় একবার শ্রীবিগ্রহগণ স্বেচ্ছাক্রমে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। দুইজন অহিন্দু-শাসক মন্দিরের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়াছিল। অন্য আর একজন সেই উদ্দেশ্যে 'পিপিলি' পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, কিন্তু পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। অহিন্দু-শাসক-গণ যাত্রিগণের নিকট কর ধার্য্য করিয়া অথবা পূজার ছাড়পত্রের মাশুলরূপে বাৎসরিক নয় লক্ষ টাকা (সিকা) মন্দির হইতে আদায় করিত।

রাজা মানসিংহ যখন উড়িষ্যা জয় করিলেন, তখন হইতে খুরদার রাজা শ্রীমন্দিরের তত্ত্বাবধায়করূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। রাজা রামচন্দ্রদেবের উত্তরাধিকারিগণও সেই পদবীতে নিযুক্ত ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় শাসকগণের

আমলে তাঁহারা তত্ত্বাবধায়ক বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্যতীত মন্দিরের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ইংরাজগণ উড়িষ্যা দখল করিলে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্যতীতই শ্রীমন্দিরের কার্য্য নির্ব্বাহ হইত।

মহারাষ্ট্রীয়গণ শ্রীমন্দিরের সেবা-পূজা-সংরক্ষণে যথেষ্ট সহায়তা ও সহৃদয়তা আনুকূল্য প্রদান করিয়াছিলেন। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে 'সাতাইশহাজারি-মহাল'-নামে সাতাইশ হাজার টাকার বাৎসরিক আয়ের একটি সম্পত্তি মহারাষ্ট্র-রাজ দান করেন।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লি লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল্ কেয়েল্‌কে (যিনি উড়িষ্যার বৃটিশ-সৈন্যগণের অধ্যক্ষ ছিলেন) নিম্নলিখিত আদেশ প্রদান করেন,—

"On your arrival at Jagannath you will employ every possible precaution to preserve the respect due to the Pagoda and to the religious prejudices of the Brahmins and pilgrims. You will furnish the Brahmins with such guards as shall afford perfect security to their persons, rites and ceremonials, and to the sanctity of the religious edifices, and you will strictly enjoin those you command to observe your orders on this important subject with the utmost degree of accuracy and vigilance.

The Brahmins are supposed to derive considerable profits from the duties levied on pilgrims; it will not, therefore, be advisable at the present moment to interrupt the system which prevails for the collection of those duties.

You will assure the Brahmins at the Pagoda of Jagannath, that they will not be required to pay any other revenue or tribute to the British Government than that which they may have been in the habit of paying to the Mratha Government, and that they will be protected in the exercise of their religious duties."

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১০ নং আইনের দ্বারা যাত্রিকর (Pilgrim-Tax) রহিত করা হয় এবং শ্রীমন্দিরের তত্ত্বাবধানের ভার 'খুরদা'র রাজার উপর ন্যস্ত করা হয়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে একটী দেবোত্তর সম্পত্তি সেবা-পূজাদির ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রদত্ত হয়। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে খুরদার রাজার দেহত্যাগের পর তাঁহার কৃত উইলের সর্ত্ত অনুসারে তাঁহার বিধবা পত্নী মন্দির-সংক্রান্ত কার্য্যের ব্যবস্থা-বিষয়ে অধিকারিণী হন। তাঁহার পোষ্যপুত্র সাবালক হইয়া পূজাদির ব্যবস্থাভার গ্রহণ করেন; কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তাঁহাকে কদাচারদোষে নির্ব্বাসিত হইতে হয়। ইহার পর রাজা মুকুন্দদেবের নাবালক অবস্থায় তাঁহার পিতামহী অভিভাবকরূপে থাকিয়া একজন ম্যানেজারের সাহায্যে মন্দির-সংক্রান্ত কার্য্য পরিচালনা করেন। পরে রাজা স্বয়ং সাবালক হইয়া মন্দিরসংক্রান্ত যাবতীয় তত্ত্বাবধানের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আশানুরূপ সুব্যবস্থা করিতে কৃতকার্য্য না হওয়ায় তাঁহার সম্মতি-ক্রমে শ্রীজগন্নাথদেবের সম্পত্তি ও মন্দিরের তত্ত্বাবধান-সংক্রান্ত কার্য্যসমূহ সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাহ করিবার জন্য একজন উৎকলবাসী ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট্ নিযুক্ত হ'ন। তাঁহার অধীনে কতিপয় ইন্‌স্পেক্টর, ওভারসিয়ার ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ নিযুক্ত হ'ন। তাঁহারা কতকগুলি পদাতিক পরিচারকের সাহায্যে শ্রীমন্দিরে পূজাদি-কার্য্যের ব্যবস্থা করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে রায়বাহাদুর রাজকিশোর দাস উড়িষ্যা ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট্ প্রথম ম্যানেজার হ'ন।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে রাজা মুকুন্দদেব স্বধামে গমন করিলে তাঁহার পোষ্যপুত্র রামচন্দ্রদেব-নাম গ্রহণ করিয়া মন্দির-সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যের পরিচালনভার গ্রহণ করেন। ইনি রাজাসন গ্রহণ করিবার পর গভর্ণমেণ্টের নিযুক্ত ম্যানে-জারের দ্বারা মন্দিরের পরিচালনকার্য্য প্রত্যাহার করেন।

শ্রীজগন্নাথদেবের বিপুল ভূসম্পত্তির আয় ব্যতীত বিভিন্ন প্রকারে শ্রীমন্দিরের বর্ত্তমানে যে আয় হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল,—

(ক) সিংহিকা অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে নৈবেদ্যস্বরূপ প্রদত্ত দ্রব্য; যথা—মণিরত্নাদি, স্বর্ণ ও রৌপ্যের গহনা, টাকা-পয়সা-প্রভৃতি, রেশম ও সুতার বস্ত্রাদি, শাল, খালা-বাটি-প্রভৃতি তৈজসপত্র, ছাতা, পাখা-প্রভৃতি দ্রব্য।

(খ) মন্দির-ভাণ্ডারের আয় 'কোঠভোগ'-নামক দৈনিক নৈবেদ্য বা মহাপ্রসাদ-বিক্রয়লব্ধ অর্থ।

(গ) রথে যে কাষ্ঠ ও বস্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ।

(ঘ) মন্দিরাভ্যন্তরে মিষ্টান্ন-মহাপ্রসাদ ও নির্ম্মাল্য (শুষ্ক-মহাপ্রসাদ)-বিক্রয়কারিগণকে অনুমতিপত্র-দেওয়া-বাবদ যে দর্শনী বা অর্থ সংগৃহীত হয় এবং যোতিষীকৃত, শুভিচাবেরী ও পাকশালা-দর্শন-বাবদ যাত্রিগণের নিকট হইতে পয়সা আদায় করিবার জন্য যে-সব লোক নিযুক্ত আছে, তাহাদের নিকট হইতে ঐ অনুমতি-বাবদ যে অর্থ সংগৃহীত হয়।

(ঙ) সেবাইতগণের প্রথম নিয়োগ-জন্য, পাকশালার চুল্লী-বিলি-বাবদ অথবা বহ্নিবেদীর সম্মুখে ভোগপ্রদানের জন্য সেবাইতগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(চ) যাত্রিগণের নিকট হইতে বিভিন্নবাবদে আদায় অর্থ, যথা—মশাল জ্বালাইবার অধিকার-প্রদান-বাবদ, পাখা-ব্যবহার-বাবদ, ধ্বজা-পতাকা অথবা বিভিন্ন বর্ণের বস্ত্র মন্দিরের উপরে প্রদান-জন্য, মন্দিরপ্রাঙ্গণাভ্যন্তরে মর্ম্মর-প্রস্তর-স্থাপনের অনুমতি-বাবদ এবং চন্দনযাত্রা ও রথযাত্রার সময়ে যে 'পশ্চিভোগ' (পশ্চিমদ্বারে যে ভোগ প্রদান করা হয়)-প্রদানে অনুমতির জন্য। ইং ১৯২৪ সাল হইতে ১৯২৮ সাল পর্য্যন্ত গড়পড়তা বাৎসরিক আয় ও ব্যয় মোট ২৮০০০০৲ টাকা হইয়াছিল।

অরুণস্তম্ভ

শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের পূর্ব্বদ্বার বা সিংহদ্বারের সম্মুখে যে বিস্তৃত চত্বর আছে, তাহারই মধ্যে 'অরুণস্তম্ভ'-নামক একটি উচ্চ স্তম্ভ দণ্ডায়মান আছে। পূর্ব্বে এই স্তম্ভটি কোণার্কের সূর্য্যমন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত ছিল। 'বাবা ব্রহ্মচারী'-নামক মহারাষ্ট্রীয়জন গুরু রাজা দ্বিতীয় নিবাসিংহদেবের (১৭৭৯-১৭৯৭ খৃষ্টাব্দ) সময়ে এই স্তম্ভটী কোণার্ক হইতে আনিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের সম্মুখে স্থাপন করেন। পূর্ব্বের প্রাচীন সিংহদ্বারও জীর্ণ হইয়া পতনোন্মুখ হইয়াছিল। উক্ত 'বাবা ব্রহ্মচারী' যাত্রিগণের নিকট হইতে মাধুকরী ভিক্ষা-সংগ্রহের দ্বারা বর্ত্তমান সিংহমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

অরুণস্তম্ভের উপরে অরুণের মূর্ত্তি বিরাজমান। অনেক সময় পাণ্ডাগণ অজ্ঞতাবশে ইহাকে হনুমান্ বা গরুড়-মূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। পৌরাণিক বিবরণানুসারে কশ্যপ ও বিনতার পুত্র অরুণ পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই জন্মগ্রহণ করেন। সূর্য্যের প্রখর রশ্মি পাছে কোণার্কের রথ প্রতিম সূর্য্যমন্দিরের অশ্ব-সমূহকে দগ্ধ করে, এই আশঙ্কায় অশ্ব ও সূর্য্যের মধ্যস্থলে অরুণ-মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিলেন। কোণার্ক-মন্দিরের সূর্য্য-প্রতিমা রাজা নরসিংহদেবের সময়ে (১৬২১-১৬৪৬ খৃষ্টাব্দ) শ্রীজগন্নাথ-দেবের প্রাকারের মধ্যস্থিত ইন্দ্রদেবের মন্দিরে আনিয়া স্থাপন করা হয়।

মেঘনাদ-প্রাচীর

শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের বিরাট্ প্রাঙ্গণ ও চতুর্দ্দিকস্থ বিবিধ মন্দিরাদিকে বেষ্টন করিয়া যে বহিঃপ্রাকার বিরাজমান, তাহাই 'মেঘনাদ-প্রাচীর'-নামে খ্যাত। এই প্রাচীর ৬১৪ × ৪৪০ ফিট্ পরিমাণ স্থান বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। প্রাচীরের উচ্চতা কোথাও ২০ ফিট্, কোথাও ২৪ ফিট্। ইহা পূর্ব্বে আরও বৃহদাকার ছিল এবং রাস্তার কোন কোন স্থান হইতে ভিতরের সমস্ত ব্যাপার দেখা যাইত। রাজা পুরুষোত্তমদেবের রাজত্বকালে বিধর্ম্মী শত্রুর আক্রমণ হইতে মন্দিরকে রক্ষা করিবার জন্য বর্ত্তমান প্রাচীর নির্ম্মিত হয়।

কূর্ম্মবেড়

শ্রীমন্দিরের বহিঃপ্রাকার বা মেঘনাদ-প্রাচীরের পরে যে দ্বিতীয় প্রাকার আছে, তাহা 'কূর্ম্মবেড়'-নামে কথিত হয়। এই কূর্ম্মবেড়ের পরে পার্শ্ব বা আবরণদেবতাবৃন্দের মন্দির-সমূহ বিরাজমান।

চতুর্দ্বার

শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের প্রথমপ্রাকার অতিক্রম করিতে হইলে চারিদিকে চারিটি দ্বার আছে। প্রধান দ্বার, যাহা অরুণস্তম্ভের সম্মুখে অবস্থিত, তাহাই পূর্ব্বদ্বার বা সিংহদ্বার। দ্বারের সম্মুখে দুইটি প্রকাণ্ড সিংহমূর্ত্তি বিরাজমান। পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণদ্বার যথাক্রমে ব্যাঘ্রদ্বার, হস্তীদ্বার ও অশ্বদ্বার-নামে পরিচিত। এক দক্ষিণদ্বার ব্যতীত অন্যান্য দ্বারের সম্মুখে তত্তৎ প্রাণীর মূর্ত্তি অর্থাৎ ব্যাঘ্র ও হস্তীর মূর্ত্তি বিরাজমান আছে। দক্ষিণদ্বারের অশ্বদ্বয়ের দুই পার্শ্বে দুইটি ক্ষুদ্রকায় অশ্বমূর্ত্তি ছিল, বর্ত্তমানে একটি ভগ্ন হইয়াছে। পশ্চিম দ্বার বা ব্যাঘ্রদ্বার 'খাঞ্জা-দ্বার'-নামেও পরিচিত। কারণ, এই দ্বারের মধ্য দিয়া খাঞ্জা অর্থাৎ ভোগের বিবিধ-দ্রব্য শ্রীমন্দিরের ভেতরে মধ্যে আনীত হয়।

পূর্ব্বদ্বারের তোরণ ও প্রাঙ্গণ

পূর্ব্ব-দ্বার বা সিংহদ্বারের প্রথম তোরণে প্রবেশের পথে দক্ষিণদিকে পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথ, শ্রীসুগ্রীব এবং বামভাগে 'ফতে হনুমান্' ও গণেশ-মূর্ত্তি আছেন। তৎপরে 'বাইশ-পাহাছে'র তৃতীয় সোপানে শ্রীকাশী-বিশ্বনাথের মন্দির, কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে বামভাগে শ্রীনৃসিংহদেব বিরাজমান। শ্রীগৌর-সুন্দর ইহারই সম্মুখে নৃত্য-গীতাদি করিয়াছিলেন।

পশ্চিমদ্বারের প্রাঙ্গণ

পশ্চিমদ্বারের প্রবেশ-পথের দক্ষিণদিকে শ্রীরামেশ্বর-মহাদেব, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীদ্বারিকানাথ ও শ্রীবদ্রিনাথ—এই চারি ধামের ঈশ্বর আছেন। পশ্চিমদ্বারের দ্বিতীয় তোরণে প্রবেশের পথে বাম ও দক্ষিণ উভয়দিকে শ্রীজগন্নাথদেবের 'ফুলতোটা' বা ফুলের বাগান আছে। বাগানের পূর্ব্ব-উত্তর-কোণে একটি গৃহে শ্রীবিগ্রহের পুষ্পমালিকা ও আভরণাদি নির্ম্মিত হয়। বাগানের ভিতরে দক্ষিণদিকে চক্র-নারায়ণ ও সিদ্ধেশ্বর, আর বামদিকের বাগানে প্রবেশের পথে নবলেশ্বর-মহাদেব বিরাজমান।

উত্তরদ্বারের প্রাঙ্গণ

উত্তরদ্বারের প্রথম তোরণ অতিক্রম করিয়া প্রবেশের পথে দক্ষিণদিকে শীতলাদেবীর মন্দির ও তৎসংলগ্ন চত্বরে 'সোণা কূপ'। এই কূপ হইতে স্নান-যাত্রার দিন একশত আট কলস জল স্নান-বেদীতে লইয়া গিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-উৎসব হয়। এই কূপ বৎসরব্যাপী অব্যবহৃত থাকে, স্নানযাত্রার পূর্ব্বদিবস ইহার সংস্কার করা হয়। উত্তর-দ্বারের দ্বিতীয় তোরণের সংলগ্ন পূর্ব্বদিকে একটি দ্বার অতিক্রম করিলে একটি বিস্তৃত বটবৃক্ষ দৃষ্ট হয়। এই ঘেরার মধ্যে একটি উচ্চ-স্থানে 'কৈবল্য-বৈকুণ্ঠ'-নামক একটি স্থান আছে। কিংবদন্তী এই যে, এস্থানে পূর্ব্বে শ্রীনীলমাধব ছিলেন। এস্থানে 'আটিকা'-বন্ধন করা হয়।

দক্ষিণ-দ্বারের প্রাঙ্গণ

দক্ষিণদ্বার দিয়া প্রবেশের মুখেই দক্ষিণদিকে উত্তরাভিমুখী শ্রীনৃসিংহদেব বিরাজমান। ইনি কএক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের মহান্ত শ্রীযাদুদেব রামানুজদাস মহারাজ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তৎপরে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া পশ্চিমাভিমুখী ষড়ভুজ মহাপ্রভু একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে অধিষ্ঠিত আছেন। ইহার ঠিক বরাবর পশ্চিমদিকে বর্ত্তমান শ্রীবাসুদেব রামানুজদাসজীর ভজনগৃহ। ইহার মধ্যে সাতভাই 'হনুমান্' আছেন। আরও অগ্রসর হইয়া দ্বিতীয় তোরণে উপনীত হইবার পূর্ব্বে দক্ষিণদিকে শ্রীশ্রী-জগন্নাথদেবের রন্ধনশালা ও বামহস্তে শ্রীবুড়ীমা-ঠাকুরাণী পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া বিরাজমানা রহিয়াছেন এবং তৎসংলগ্ন-স্থানে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ঢোটা বা ফুলবাগান দৃষ্ট হয়।

পতিতপাবন

শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীনীলমাধব-স্বরূপে বিশ্বাবসু-শবরের পূজা ও নৈবেদ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। শবর-জাতি বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত প্রাচীন অন্ত্যজ-জাতিবিশেষ *। ইহারা পতিত বলিয়া বিদিত। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব সমগ্র জগতের প্রভু। পতিত ব্যক্তিও শ্রদ্ধালু হইলে তাঁহার অহৈতুকী কৃপার অধিকারী হইতে পারেন। তিনি পতিতের ত্রাণকর্ত্তা। যে-সকল পতিত-জাতির শ্রীমন্দির-অভ্যন্তরে প্রবেশের অধিকার নাই, তাঁহারাও যাহাতে বহির্দ্দেশ হইতে প্রভুর দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন, তজ্জন্য সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়াই উচ্চবেদীর উপরে পূর্ব্বাভিমুখে পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথ-মূর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছেন। সিংহদ্বারে প্রবেশ না করিয়া রাজপথ হইতেই এই শ্রীমূর্ত্তির দর্শন-লাভ ঘটে। কেহ কেহ বলেন,—রাজা রামচন্দ্রদেব এই মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন; আবার কেহ শ্রীচৈতন্যদেবের নামে ইহা আরোপ করেন।

নোলিয়া (তেলেগু মৎস্যজীবী), কওরা, বুচি, বাউড়ী, কেওট (মৎস্যজীবী), কুয়োল, কাহার, সিয়াল (মদ-বিক্রেতা), চণ্ডাল, ডোম, হাড়ি, গোখা, কোল, দহ্যল, শবর, পাণ (মূর্চ্ছিবিশেষ), রজক, কুম্ভকার, সাধারণ বারবনিতা এবং অন্যান্য প্রদেশের পূর্ব্বোক্ত জাতির তুল্য জাতিগণের সিংহদ্বার অতিক্রম করা নিষিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত বিধর্ম্মী, শ্রীমূর্ত্তি-বিদ্বেষী ও অবিশ্বাসী ব্যক্তিগণের পক্ষেও সিংহদ্বার অতিক্রম করা নিষেধ। কথিত হয় যে, এক

* 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে'র বর্ণনানুসারে বিশ্বামিত্র হইতে যে-সকল দস্যুজাতির উদ্ভব হইয়াছিল, শবরেরা তাহাদের অন্যতম। মহাভারতে শবর-জাতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অমরসিংহ, বরাহমিহির, বাণভট্ট প্রভৃতিও শবরজাতির উল্লেখ করিয়াছেন।

সহস্র পাশ্চাত্যদেশীয় কোন একজন বিধর্মী ছদ্মবেশে মন্দিরের বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু নাট্য-মন্দিরে প্রবেশের পূর্ব্বেই লোকে তাহাকে চিনিয়া ফেলে। ঐরূপ বিধর্মী ব্যক্তি মন্দিরে প্রবেশ করায় শ্রীজগন্নাথদেবকে মহা-স্নান করাইতে হয়। অভক্তানু নাস্তিকগণের কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার জন্য মন্দিরে প্রবেশের চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কেবলমাত্র ভক্তানু পতিতগণই বহির্দ্দেশ হইতে 'পতিতপাবন'কে দর্শন করিয়া বৈষ্ণবভরে তাঁহার কৃপা যাচ্ঞা করিবেন। অকপট বৈষ্ণবই শ্রদ্ধার লক্ষণ। গায়ের জোরে মন্দিরে প্রবেশের দাবী করা প্রভুত্ব-কামনা বা নাস্তিকতার লক্ষণ। লোককে এই মর্য্যাদা-শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য নিখিলব্রহ্মাণ্ডের আদিগুরু শ্রীব্রহ্মা শ্রীগৌর-লীলায় শ্রীল ঠাকুর হরিদাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া এবং কর্ণাট-ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত ও ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণের প্রপূজ্যচরণ শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু 'নীচজাতি' অভিমান করিয়া কখনও সিংহ-দ্বার অতিক্রম করেন নাই। তাঁহারা অতিদূর বৈষ্ণবভরে দূর হইতে শ্রীমন্দিরের চূড়া ও ধ্বজা দর্শন করিবার লীলা প্রকট করিয়াছেন।

বাইশ পাহাছ

'পাহাছ'-শব্দে সোপান। সিংহদ্বার হইতে শ্রীমন্দিরের দ্বিতীয় বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে বাইশটি সোপান অতিক্রম করিতে হয়। উৎকলভাষায় উহাকে 'বাইশ-পাহাছ' বলে। অক্ষয়বটের চত্বর হইতে দ্বিতীয় প্রাকারের তোরণ পর্য্যন্ত অথবা 'আনন্দ-বাজারে' প্রবেশের তোরণ পর্য্যন্ত বাইশটি সোপান আছে। রাজপথ হইতে শ্রীমন্দির বহু উচ্চে অবস্থিত। বহিঃপ্রাকারের পর এই বাইশটি সোপান অতিক্রম-পূর্ব্বক উচ্চে উঠিয়া শ্রীমন্দিরের চত্বরে উপনীত হওয়া যায়। তথা হইতে আবার কতিপয় সোপান অতিক্রম করিয়া শ্রীনাটমন্দিরে প্রবেশের দক্ষিণ ও উত্তর দ্বার দিয়া যাত্রিগণ জগন্মোহনে প্রবেশ করেন। চতুর্দ্দ্বার দিয়া মন্দিরের দ্বিতীয় প্রাকারের অন্তর্গত চত্বরে উঠিবার জন্য সকলদিকেই সোপান আছে। কিন্তু সিংহদ্বারের পথ যে বাইশ পাহাছ বা সোপান, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃত। ফলকামিগণ তাঁহাদের শিশু-সন্তানকে এই বাইশ-পাহাছ দিয়া গড়াইতে গড়াইতে শ্রীমন্দিরের উপর আরোহণ করায় এবং ইহার দ্বারা সন্তানের দীর্ঘজীবন লাভ হইবে, মনে করেন। আবার ভগবদ্ভক্তগণ বাইশ-পাহাছে বৈষ্ণবের পদধূলিতে গড়াগড়ি দিতে দিতে দ্বিতীয় প্রাকার অতিক্রম-পূর্ব্বক ছত্রভোগ-মন্দিরের নিম্নে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া তৎপরে শ্রীপ্রতাপরুদ্র স্থাপিত শ্রীচৈতন্য-মূর্ত্তি ও শ্রীচৈতন্য-শ্রীচরণচিহ্ন দর্শন করিয়া নাট্যমন্দিরের দক্ষিণদ্বার দিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ-পূর্ব্বক গরুড়স্তম্ভের পশ্চাতে থাকিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন প্রার্থনা করেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমন্দিরে প্রবেশ-কালে প্রত্যহ সিংহদ্বারের নিকটে উক্ত বাইশ পাহাছের তলে গর্ত্ত-মধ্যে পাদ প্রক্ষালন করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিতেন।

"সিংহদ্বারের উত্তরদিকে কপাটের আড়ে।
বাইশ-পহাছ-তলে আছে এক নিম্ন গাড়ে॥
সেই গাড়ে করেন প্রভু পাদ-প্রক্ষালনে।
হেন করিবারে যার ঈশ্বর-স্বরূপনে॥"

(চৈ চ অ ১৬।৯১-৯২)

শ্রীমন্দির-পরিক্রম

অক্ষয়বটের পশ্চাদ্ভাগ হইতে শ্রীমন্দিরের ধ্বজ-শেখর ও শ্রীচক্রকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম এবং বহিঃপ্রাকার বা মেঘনাদ-প্রাচীরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত সিংহদ্বারের উত্তর-দিকে কপাটের আড়ে বাইশ-পাহাছ-তলে যে নিম্নগর্ত্তমধ্যে শ্রীগৌরহরি শ্রীপাদপদ্ম প্রক্ষালন করিতেন, সেইস্থানে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে তদভ্যন্তর তোরণমধ্যে প্রবেশের মুখে দক্ষিণদিকে প্রথমে দক্ষিণাভিমুখী শ্রীনৃসিংহদেব, তৎপরে শ্রীমুদ্গরীশ, তৎপরে পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন হয়। পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথ পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া রাজপথের পতিত জীব-গণকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিতেছেন। প্রথমতোরণের প্রবেশপথে বামদিকে উত্তরাভিমুখী হইয়া 'ভক্ত হনুমান্' বিরাজমান। পাণ্ডাগণ বলেন,—এই শ্রীহনুমানের কৃপায় শ্রীজগন্নাথদর্শন 'ভক্ত' অর্থাৎ সিদ্ধ হয়। তৎপরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ এবং সেবাবিষয়ে সিদ্ধিদাতা শ্রীগণেশের লেপ্যা-মূর্ত্তি। বাইশ-পাহাছ দিয়া শ্রীমন্দিরের অভিমুখে উঠিবার সময় বামভাগে তৃতীয় সোপানে কাশীর শ্রীবিশ্বনাথশিবলিঙ্গ। ইনি কাশী হইতে অহঙ্কারযুক্ত হইয়া শ্রীজগন্নাথদর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন, এজন্য শ্রীমন্দিরে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হ'ন নাই; তাই তৃতীয় সোপানের উপরে থাকিয়া

নীলচক্র দর্শন করিতেছেন। তৎপরে শ্রীরামচন্দ্রের সেখা অভিষেক-মূর্ত্তি; তাঁহারই সংলগ্ন পশ্চিমাংশে শ্রীনৃসিংহদেব উত্তরাভিমুখী হইয়া বিরাজমান। শ্রীগৌরসুন্দর এইস্থানে শ্রীনৃসিংহদেব-দর্শন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"বাইশ-পাহাছ'-পাছে উপর দক্ষিণ-দিকে।
এক নৃসিংহমূর্ত্তি আছেন উত্তরিতে বামভাগে॥
প্রভুদিন তাঁ'রে প্রভু করেন নমস্কার।
নমস্তবি' এই শ্লোক পড়ে বার বার॥
'নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃশিলাটঙ্ক-নখালয়ে॥
ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে॥

(চৈ চ অ ১৬।৪০-৪৩)

'বাইশ-পাহাছ' ও দ্বিতীয় প্রাকারের ব্রহ্মাদিদেবতার মূর্ত্তি-খচিত মর্ম্মরতোরণ অতিক্রম করিবার পর বরাবর ছত্রভোগ-মণ্ডপ দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় তোরণের মধ্যে পূর্ব্বাভিমুখে 'পাতালপুর-মহাবীর'। গৌড়ীয়-ভক্তগণ ছত্রভোগ-মণ্ডপের নিম্নস্থ চত্বরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের উদ্দেশে প্রণত হইয়া, পরিক্রমের পথের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইলেও উত্তর-পূর্ব্বদিকে শ্রীপ্রতাপরুদ্র-প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যদেব ও উত্তর-দিকে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম দর্শনানন্তর পুনরায় দক্ষিণাভিমুখে শ্রীমন্দিরকে দক্ষিণহস্তে রাখিয়া পরিক্রম আরম্ভ করেন। ভোগমণ্ডপে রন্ধনশালা হইতে ভোগ আনয়ন করিবার জন্য যে আবৃত পথ আছে, সেই পথের সংলগ্ন স্থানে দক্ষিণদিকে পূর্ব্ব-দক্ষিণ-কোণে 'শ্রীশ্রীঅগ্নীশ্বর-মহাদেব' বা আগ্নেয়েশ্বর (শিবলিঙ্গ) পাতালে বিরাজমান। কথিত হয় যে, শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগরন্ধনের জন্য যে অগ্নি প্রজ্বালিত হয়, ইনি তাহা পর্য্যবেক্ষণ করেন। অগ্নির অধিনায়ক বলিয়া ইহার নাম 'অগ্নীশ্বর' হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন,—অগ্নিকোণের অধীশ্বর বলিয়া ইহার 'অগ্নীশ্বর'-নাম হইয়াছে। আরও দক্ষিণে কল্পবটের নিকটে নিম্নলিখিত কয়েকটি মন্দির আছে,—

(১) **শ্রীসত্য-নারায়ণ**—ইনি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি। ইহার দক্ষিণ নিম্নহস্তে পদ্ম, কেহ কেহ বলেন—অভয়, ঊর্দ্ধ-হস্তে চক্র; বাম-ঊর্দ্ধ হস্তে শঙ্খ ও নিম্ন হস্তে গদা। সিদ্ধার্থ-সংহিতার মতে ইনি শ্রীজনার্দ্দনমূর্ত্তি। ইনি উত্তরাভিমুখী হইয়া বিরাজমান। এই শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তির বামদিকে শ্রীলক্ষ্মী-দেবী, দক্ষিণে শ্রীবিজয়া, নিম্নে শ্রীগরুড়। কেহ কেহ বলেন—এই শ্রীজনার্দ্দন-বিষ্ণুমূর্ত্তিকে 'সত্যনারায়ণ'-নামে অভিহিত করিবার কারণানুসন্ধানে জানা যায় যে, অহিন্দু শাসকগণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এইরূপ নামকরণ করা হইয়াছিল। উড়িষ্যায় শ্রীসত্যনারায়ণ-পূজা-প্রবর্ত্তন এবং শ্রীসত্যনারায়ণ-পালা-রচনা মুসলমান-অভিযানের পর সংঘটিত হইয়াছে। (২) **বটগোপাল**—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দবিগ্রহ; (৩) **বটবিহারী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ**; (৪) **বটকৃষ্ণ**; (৫) **বালমুকুন্দ**; (৬) **হরিসহদেবশিব**—ইনি শ্রীজগন্নাথ-দেবের যাবতীয় গোধনের পর্য্যবেক্ষক; (৭) **বটবিহারী জগন্নাথ**; (৮) **শ্বেতগণেশ**—ইনি কল্পবটবৃক্ষের ছায়ার নিম্নে একটি মন্দিরে অবস্থিত। ইহার সম্মুখে একটি স্তম্ভের উপর তাঁহার বাহন মূষিক আছেন। (৯) **কল্পবট**—কল্পবট-নামক একটি সুবিস্তৃত বটবৃক্ষ শ্রীজগন্নাথদেবের নাট্য-মন্দিরের দক্ষিণদ্বারে প্রবেশ করিবার চত্বরোপরি উচ্চ-বেদীতে ও মুক্তিমণ্ডপের সংলগ্নস্থানে অবস্থিত। এই কল্পতরুর নিম্নে ফলকামিগণ ফল কামনা করেন, আর শুদ্ধ-ভক্তগণ শ্রীভগবৎপ্রীতি প্রার্থনা করেন। (১০) **পঞ্চপাণ্ডব-শিব**—মার্কণ্ডেশ্বর, লোকনাথ, কপাল-মোচন, নীলকণ্ঠ ও যমেশ্বর—এই পঞ্চশিবের পাঁচটী মন্দির। ইহারা পঞ্চ-পাণ্ডবের পূজিত। (১১) **বটমঙ্গলা**—দেবীমূর্ত্তি। শ্রীজগন্নাথ-দেবের এইসকল পার্শ্বদেবতার মন্দির কল্পবটের চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেছে। শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন দক্ষিণে **শ্রীবট-বালকৃষ্ণ** (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি) বিরাজমান।

ষড়্ভুজ-শ্রীমহাপ্রভু

শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ-দ্বার (অধরদ্বার) দিয়া শ্রীমন্দিরাভিমুখে যাইতে দক্ষিণদিকে (শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে) শ্রীমন্দিরের পাণ্ডাগণ শ্রীশ্রীষড়্ভুজ-মহাপ্রভুবিগ্রহ পশ্চিমাভিমুখী করিয়া স্থাপন করিয়াছেন। পুরীর অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট ও শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ রায়সাহেব শ্রীযুক্ত গৌরহরি মহান্তি

মহাশয়ের চেষ্টায় বর্ত্তমানে অনেকটা সেবাসৌষ্ঠবের ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন দক্ষিণদিকে শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের বিরক্ত-বৈষ্ণব শ্রীল বাসুদেব রামানুজদাস মহাশয় একটি নৃসিংহমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। তিনি শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরের বরাবর একটি প্রকোষ্ঠে বাস করিয়া ভজন করিতেন। ইহার ভজনগৃহে 'বারভাই হনুমান'-বিগ্রহ আছেন।

শ্রীজগন্নাথ-মহাপ্রভুর প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে যে-কেহ প্রবেশ করিয়া পরিক্রম ও স্পর্শাদি করে; কখনও বা শ্রীবিগ্রহের পাদস্পর্শ-প্রভৃতি করে; ইহা বড়ই অপরাধের কথা। সেবকগণের এ-বিষয়ে সাবধান হওয়া আবশ্যক।

শ্রীজগন্নাথ-মহাপ্রভুর দর্শনান্তে কতকটি সোপান অতিক্রম করিয়া পশ্চিমদিকে পূর্ব্বাভিমুখী শ্রীবুড়িমা-ঠাকুরাণী; শ্রীমন্দিরের পশ্চিম-দক্ষিণদিকে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের ভোগ বা ফুলবাগান, আর শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে রন্ধনশালা; ইহাতে নাকি ৭৫২টি চুল্লী আছে। দক্ষিণ-দ্বারের দ্বিতীয় প্রাকারের তোরণ অতিক্রম করিয়া পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইলে শ্রীশেষশায়ি-ভগবান্, শ্রীসূর্য্য-নারায়ণদেব, শ্রীক্ষেত্রপাল-শিব ও শ্রীমুক্তীশ্বর-শিব—ইনি মুক্তিমণ্ডপের পূর্ব্ব-দক্ষিণ-কোণে অবস্থিত এবং মুক্তিমণ্ডপের ঈশ্বর বা অধিনায়ক। তৎপরে মুক্তিমণ্ডপ।

মুক্তিমণ্ডপ

মুক্তিমণ্ডপের অপর নাম—ব্রহ্মাসন বা ব্রহ্মপীঠ। কথিত হয় যে, যখন অনঙ্গভীমদেব শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করেন, সেই সময় মুক্তিমণ্ডপও নির্ম্মিত হইয়াছিল। মুক্তি-মণ্ডপ-সভার বর্ত্তমান পরিচালকগণ ইহা খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞাপন করেন। পুরীর শঙ্কর-মঠের সন্ন্যাসিগণ ও ষোড়শ-শাসনস্থ * ব্রাহ্মণগণ এই স্থানে উপবেশন করেন। এতদ্ব্যতীত অন্য কাহারও এস্থানে উপবেশন করিবার অধিকার নাই। মহামহোপাধ্যায় সদাশিব মিশ্র লিখিয়াছেন,—"মুক্তিমণ্ডপে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও নির্ব্বাচিত শাসনের পণ্ডিতদের একটি সভা আবহমান কাল হইতে অবস্থিত। মন্দিরের স্মৃতিবিষয়ক যাবতীয় কার্য্য এই সভা-দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবার পর মন্দিরে প্রচলিত হয়। উড়িষ্যা-প্রদেশের স্মৃতি-বিষয়ক যাবতীয় ব্যবস্থার এই সভা-দ্বারা মীমাংসিত হয়। ভারতের অন্যান্য স্থান হইতে যে যে স্মৃতি-বিষয়ক প্রশ্ন উপস্থিত হয়, উহার মীমাংসিত উত্তর এই সমাজ হইতে প্রেরিত হয়। মন্দিরের পাণ্ডা, সেবক-প্রভৃতি এই সমাজে পরীক্ষা প্রদান করিয়া উত্তীর্ণ হইলে মহারাজের দ্বারা সেবের যথাযোগ্য কার্য্যে নিযুক্ত হন।"

("শ্রীজগন্নাথ-মন্দির" প্রবন্ধ)

উৎকলের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শঙ্কুকর বাজপেয়ী, বিদ্যাকর বাজপেয়ী, নৃসিংহ বাজপেয়ী, গদাধর-রাজগুরু ও স্মৃতি-নিবন্ধ-লেখক অন্যান্য পণ্ডিতগণ মুক্তিমণ্ডপ-সভার সভ্য ছিলেন। পুরীর শঙ্করাচার্য্য-মঠের সন্ন্যাসিগণ মুক্তিমণ্ডপ-সভার সভাপতি হইয়া থাকেন।

আমরা মুক্তিমণ্ডপ-পুস্তকাগার-দর্শনের জন্য উক্ত পুস্তকাগারের বর্ত্তমান রক্ষক বালিসাহি-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুত রঘুনাথ মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন,—"এই গ্রন্থাগারে রক্ষিত তালপাতার হস্ত-লিখিত পুঁথিগুলি অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যেগুলি আছে, তাহাও বিপর্য্যস্তভাবে আছে।" উক্ত সভার গ্রন্থাগারে পনরশত মুদ্রিত পুস্তক ও মাত্র কুড়িটি হস্তলিখিত পুঁথি ছিল। শ্রীরঘুনাথ মিশ্র বলিলেন,—মাত্র ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে মুক্তিমণ্ডপ-সভার গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হয়। উড়িষ্যার প্রত্যেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের গৃহে ঐ মঠসমূহে বহু হস্তলিখিত শাস্ত্র-পুঁথি ছিল, তাহার একটি তালিকা এসিয়াটিক্-সোসাইটির তত্ত্বাবধানে পুরীর খটুয়াসাহিপল্লী-নিবাসী শ্রীযুত বিশ্বনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; উহা বর্ত্তমানে কটক রেভেন্সা কলেজে রক্ষিত আছে। দশজন সভ্য লইয়া মুক্তিমণ্ডপ-সভার একটি ম্যানেজিং কমিটি গঠিত আছে।

---

* ১। গৌরীনাথপুর, ২। হরেকৃষ্ণপুর, ৩। বলভদ্রপুর, ৪। বীরকিশোরপুর, ৫। নরসিংহপুর, ৬। বীরপ্রতাপপুর, ৭। বিশ্বনাথপুর, ৮। শ্রীরামচন্দ্রপুর, ৯। বীররামচন্দ্রপুর, ১০। বীরপুরুষোত্তমপুর, ১১। দামোদরপুর, ১২। বাসুদেব-পুর, ১৩। জগন্নাথপুর, ১৪। বিজয়-রামচন্দ্রপুর, ১৫। রাম-চন্দ্রপুর, ১৬। সোমেশ্বরপুর—এই ১৬টী 'শাসন'। এই সকল স্থানে পুরীর রাজার শাসন-পদ্ধতির আদর্শ বা নমুনা প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাদিগকে 'শাসন' বলে। রাজার শাসনকার্য্যে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণই বুদ্ধিদাতা বা মন্ত্রিত্ব ছিলেন।

শঙ্করানন্দ-মঠের বাল-ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী মহাশয় বর্ত্তমানে এই সভার সভাপতি এবং পণ্ডিত নারায়ণ মিশ্র ইহার সেক্রেটারী। এই সভা ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে একটি বেদ-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। গভর্ণমেণ্ট্ ইহার জন্য মাসিক ২২৲ উড়িষ্যার আটগড়-ষ্টেটের রাজা ও মেদিনীপুরের অন্তর্গত নাড়াজোলের রাজা প্রত্যেকে মাসিক ১০৲ করিয়া সাহায্য করেন এবং ঐ বিদ্যালয়ের দুইজন পণ্ডিতের মাসিক বেতন-বাবদ ৪০৲ চাঁদা করিয়া উঠান হয়। এই বিদ্যালয় পূর্ব্বে জেপুর-মঠের প্রাঙ্গণে অবস্থিত ছিল; পরে গোপালপুর ও বামড়ার রাজা, কাশীমবাজারাধিপতি স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর-প্রভৃতির অর্থানুকূল্যে একটি নূতন দালান প্রস্তুত হইয়াছে। শঙ্করমঠের মধুসূদন তীর্থ কিছুদিন এই সভার সভাপতি ছিলেন।

মুক্তিমণ্ডপ ও শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের মধ্যে যে একটি বিস্তৃত বারান্দা দৃষ্ট হয়, তাহা এমারমঠের মহান্তমহারাজ শ্রীসদাধর-রামানুজদাস প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

মুক্তিমণ্ডপের দক্ষিণদিকে শ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনগৃহ। এইস্থানে শ্রীভগবানের সেবার চন্দন ঘষা হয়। মুক্তি-মণ্ডপের পশ্চিমে পূর্ব্বাভিমুখী শ্রীনৃসিংহদেব। সর্ব্বপ্রথমে এই শ্রীনৃসিংহমূর্ত্তি যজ্ঞবেদীতে স্থাপন করিয়া শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ শ্রীব্রহ্মার পৌরোহিত্যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ইহাই আদি শ্রীনৃসিংহমূর্ত্তি। শ্রীজগন্নাথদেবের নাট্যমন্দিরের দক্ষিণদ্বারের সংলগ্ন চত্বরের উপর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে শ্রীবিজয়-বিগ্রহগণ বিরাজমান আছেন, যথা—শ্রীমদনমোহন, শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ, শ্রীনৃসিংহ, শ্রীদোলগোবিন্দ, শ্রীশ্রীরাম-লক্ষ্মণ, শ্রীনারায়ণ (চতুর্ভুজমূর্ত্তি) ও হনুমান্। শ্রীমদনমোহন ও শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ-বিজয়বিগ্রহ চন্দনযাত্রার সময়ে শ্রীনরেন্দ্রসরোবরে বিজয় করেন। শ্রীনৃসিংহদেব শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশীতে শ্রীজগন্নাথ-বল্লভে বিজয় করেন। শ্রীদোলগোবিন্দ দোলযাত্রার সময় দোলমঞ্চে বিজয় করেন। শ্রীশ্রীরামলক্ষ্মণ শ্রীরামনবমীতে শ্রীজগন্নাথবল্লভে বিজয় করেন; আর শ্রীনারায়ণ প্রতি অমাবস্যার সময়ে বিজয় করেন। শ্রীহনুমান্‌জী চৈত্র-সংক্রান্তিতে শ্রীজগন্নাথবল্লভ হইয়া চক্রতীর্থে বিজয় করেন।

শ্রীজগন্নাথদেবের জলক্রীড়ামণ্ডপ—ইহা রোহিণীকুণ্ডের নিকটে দক্ষিণদিকে অবস্থিত।[৪] চন্দনযাত্রার ২১ দিন পরে বিজয়বিগ্রহ শ্রীমদনমোহন এইস্থানে বিজয় করিয়া জল-ক্রীড়া করেন। রোহিণীকুণ্ড—এই কুণ্ডে সুদর্শনচক্র ও বৃষভি-কাকের মূর্ত্তি এবং তৎসংলগ্ন পশ্চিমদিকে শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্ন আছে। 'ষড়দেউলে'র পশ্চিম-দক্ষিণকোণে শ্রীবিমলা-দেবী পূর্ব্বাভিমুখিনী হইয়া অবস্থিতা; ইনি চতুর্ভুজা। ইহার দক্ষিণ-নিম্নহস্তে অক্ষমালা, দক্ষিণ-ঊর্দ্ধহস্তে অমৃতকলস; বাম-ঊর্দ্ধহস্তে নাগবালি (নাগকন্যা) ও বাম-নিম্নহস্তে অভয়বর। তৎপরে শ্রীবেণীমাধব—শ্রীজগন্নাথমূর্ত্তি, তৎপরে শ্রীনন্দমহারাজ বা শ্রীব্রজলীলা, অহল্যোদ্ধার শ্রীরামপাদপদ্ম, শ্রীবৃন্দাদেবী, শ্রীসাক্ষিগোপাল। পাণ্ডাগণ বলেন,—এই-স্থানে পূর্ব্বে সাক্ষিগোপাল ছিলেন। তৎপরে ভণ্ডগণেশ (কাকিগণেশ) অবস্থিত; কথিত হয় যে, শ্রীপুরুষোত্তমদেব কাকি হইতে ইহাকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছেন। তৎপরে পশ্চিমদরজা বা ব্যাঘ্রদ্বার অবস্থিত, উত্তরদিকে শ্রীবলেশ্বর মহাদেবের মন্দির এবং তৎসংলগ্ন উত্তরে দক্ষিণাভি-মুখী বীরহনুমান্ বা 'কানপাতা হনুমান্'। কথিত হয় যে, শ্রীমন্দিরে সমুদ্রগর্জ্জন প্রবেশ করিয়া শ্রীজগন্নাথের বিশ্রাম-সুখ ভঙ্গ করিতে না পারে, এজন্য ইনি সর্ব্বদা কান পাতিয়া আছেন; তাই মন্দিরের মধ্যে এখনও সমুদ্রগর্জ্জন শুনিতে পাওয়া যায় না। পশ্চিমদরজার দক্ষিণদিকে পূর্ব্বাভিমুখে শ্রীরামেশ্বর শিব; তৎপরে শ্রীজগন্নাথদেবের উদ্যান, তন্মধ্যে শ্রীচক্রনারায়ণ ও সিদ্ধেশ্বর মহাদেব আছেন। তৎপরে উত্তরদিকে গমন করিয়া ক্ষীরচোরা-গোপীনাথ (শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ); তৎপরে শ্রীবটবিহারী (ইনিও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণবিগ্রহ)। শ্রীসরস্বতী, শ্রীসত্যভামা, শ্রীষষ্ঠী, শ্রীসাবিত্রী ও শ্রীগায়ত্রী একটি মন্দিরে অবস্থিত। ইহা সাধারণতঃ 'শ্রীসরস্বতীর মন্দির' নামে খ্যাত। তৎপরে শ্রীনীলমাধবের মন্দির। ইনি পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া শ্রীগৌরপাদপদ্মের নিকটস্থ আনন্দ-বাজারের যে পূর্ব্বাভিমুখি দ্বার, তাহার ঠিক্ বরাবর অবস্থিত রহিয়াছেন। বিশ্ববিজয়-শবর সর্ব্বপ্রথমে এই শ্রীনীলমাধবের পূজা করিয়াছিলেন এবং শ্রীবিদ্যাপতি-ব্রাহ্মণ ইহার দর্শন পাইয়াছিলেন; ইনি অপূর্ব্বদর্শন, চতুর্ভুজ-জনার্দ্দন (?)-মূর্ত্তি। তৎপরে ভদ্রকালী ও কেদারনাথের মন্দির। ষড়দেউলের উত্তর-পশ্চিমকোণে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মন্দির; ইনি পূর্ব্বাভি-মুখিনী হইয়া বিরাজমানা। চতুর্ভুজা শ্রীলক্ষ্মীদেবী নিম্নের দক্ষিণ ও বামহস্তে যথাক্রমে অমৃত ও পদ্ম এবং ঊর্দ্ধ-দুইহস্তে গদা ধারণ করিয়া বিরাজমানা আছেন। শ্রীলক্ষ্মী-

দেবীর মন্দিরের উত্তরপশ্চিমদিকে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর ভাণ্ডার-গৃহ, তৎপরে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর রন্ধনগৃহ আছে। শ্রীলক্ষ্মী-দেবীর মন্দিরের পূর্ব্ব-উত্তরদিকে নবগ্রহের মন্দির, তৎপরে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির। কেহ কেহ বলেন,—ইন্দ্রের মন্দিরের অভ্যন্তরে 'সূর্য্যনারায়ণ' আছেন। এই সূর্য্য-বিগ্রহ খুলনার রাজা নরসিংহদেবের রাজত্বকালে কোণার্কের মন্দির হইতে আনীত হইয়াছেন।* মূর্ত্তির দুইহস্তে সনাল পদ্ম রহিয়াছে। সূর্য্যনারায়ণ-বিগ্রহের পশ্চাতে ইন্দ্রের যে ভগ্ন-মূর্ত্তি আছে, তাহাকে ভুলক্রমে ব' অভিসন্ধিবশতঃ কেহ কেহ বুদ্ধদেবের ভগ্নমূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তৎপরে শ্রীসরিবাধন; তৎপরে শ্রীশ্রীরামসীতা ও শ্রীলক্ষ্মণের মন্দির। তৎপরে পাতালেশ্বর; ইনি 'বলি-পাতালেশ্বর-মহাদেব'-নামে খ্যাত। পাতালেশ্বরের মন্দিরটী খুব গভীর। তৎপরে উত্তর-দ্বার বা হস্তিদ্বারের অন্তঃপ্রাকারের তোরণ। তোরণ অতিক্রম করিয়া পশ্চিমভাগে কৈবল্য-বৈকুণ্ঠ; তৎপরে বৈকুণ্ঠেশ্বর মহাদেব বটবৃক্ষের নিম্নে বিরাজমান আছেন। ছিতলের উপরে বৈকুণ্ঠ। এইস্থানে অন্নদান বা 'আটিকা বন্ধন' হয়। এইস্থানে শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ বিগ্রহ আছেন। তৎসংলগ্ন উত্তর-পশ্চিমকোণে উদ্যানের মধ্যে শ্রীজগন্নাথ-দেবের শ্রীকলেবর-স্থাপনস্থান ও শ্রীতুলসীকানন। উত্তর-পশ্চিমভাগে সোপানাবলীর পার্শ্বে বর্দ্ধমান মহারাজের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, তৎপরে তপস্বী মহাবীর, তৎপার্শ্বে উত্তরায়ণীদেবী, তৎপরে শীতলা, শীতলার সম্মুখে সোনাকূপ ও পারেশ্বরীদেবী (উত্তর-দরজার তোরণের পশ্চিমপার্শ্বে); তৎপরে লোকনাথ মহাদেব, ধবলেশ্বর, ঈশানেশ্বর ও পূর্ব্ব-দিকে আনন্দবাজারের পথ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মের শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন পূর্ব্বোত্তর-কোণে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মালিকা, পুষ্পাভরণ-প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা হয়। বাঁকুড়া জেলার নারায়ণ ব্রহ্মচারি-নামক এক ব্যক্তির বংশধর—সোনা-গোঁসাই-নামে খ্যাত এক ব্রাহ্মণ এইসকল পুষ্পাভরণ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ইনি নাকি পাণ্ডাগণের গুরু-বংশ এবং মৈত্রবংশোদ্ভূত। বঙ্গদেশীয় বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ শ্রীজগন্নাথদেবের সেবাধিকার লাভ করায় ইনি 'ব্রহ্মচারী' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

* Puri Gazetteer P. 283.

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম

শ্রীমন্দিরের উত্তর-পূর্ব্বদিকে একটি নাতি-উচ্চ-মন্দিরে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম একটি পদ্মাকৃতি মর্ম্মর-পীঠের উপর বিরাজমান আছেন। এই শ্রীপাদপদ্ম-যুগল শ্রীগরুড়-স্তম্ভের পশ্চাতে অবস্থিত ছিলেন। শ্রীগৌরহরি শ্রীগরুড়-স্তম্ভের পশ্চাদ্দেশ হইতে একপার্শ্বে থাকিয়া দর্শন-লীলা প্রকট করিতেন। প্রত্যহ ঐ স্থানে অবস্থান করিয়া মহা-ভাবাবেশে শ্রীশ্রীজগন্নাথের সম্মুখে আর্ত্তি-নিবেদন জ্ঞাপন করিতেন। যে শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্মস্পর্শাভাসে বজ্রকঠিন হৃদয় পর্য্যন্ত বিগলিত হয়, সেই শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া সাধারণ পাষাণ বিগলিত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যে-সকল আধ্যক্ষিক ব্যক্তি কলিযুগপাবনা-বতারীকে সাধারণ মনুষ্য জ্ঞান করে, তাহারা ইহাতে অবিশ্বাসী হইতে পারে; কিন্তু শ্রীগৌরহরির-অংশাংশস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শে পাষাণী 'অহল্যার উদ্ধার হইয়াছিল। ক্রমাগত বারিধারা-পতনে পাষাণের ক্ষয় হয়, আর যাঁহার নয়নদ্বয় হইতে মহা-ভাবসিন্ধু অবিশ্রান্তভাবে অশ্রুধারাকারে বিগলিত হইত, যিনি গলিতকুষ্ঠ বাসুদেবের ত্রাতা, শ্রীসার্ব্বভৌমের উদ্ধারকারী, শ্রীব্রহ্ম-শিবাদি-বন্দিত-চরণ, তাঁহার শ্রীচরণ-স্পর্শে যে প্রস্তর বিগলিত হইয়া সেই রাতুল-চরণের চিহ্ন-বিভূষিত হইবে, ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু গাহিয়াছেন,—

"গরুড়ের সন্নিধানে, রহি' করে' দরশনে,
সে আনন্দের কি কহিব ব'লে?
গরুড়-স্তম্ভের তলে, আছে এক নিম্ন খালে,
সে খাল ভরিল অশ্রু-জলে।"

(চৈ চ ম ২।৫৪)

শ্রীশ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্মাঙ্কিত সেই প্রস্তরটি শ্রীগরুড়-স্তম্ভের পশ্চাদ্ভাগ হইতে পূর্ব্বোক্ত শ্রীমন্দিরে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ এই শ্রীগৌরপাদপদ্মযুগল-সম্বন্ধে একটি স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন এবং এই শ্রীগৌরপাদপদ্ম-যুগলের প্রকাশ মূর্ত্তিসমূহ তিনি শ্রীগৌরপদাঙ্কিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের শ্রীমন্দিরের ঠিক্ বরাবর ছত্রভোগমণ্ডপের সংলগ্ন উত্তরদিকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির।

কথিত হয় যে, ঐ স্থানেই শ্রীশ্রীরাধাকান্ত (কাঞ্চি হইতে শ্রীপুরুষোত্তমে কর্ত্তৃক আনীত শ্রীবিগ্রহ) পূর্ব্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন ; পরে শ্রীকাশীমিশ্র এই শ্রীবিগ্রহ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের নিকট হইতে যাচ্ঞা করিয়া লইয়া তাঁহার গৃহে স্থাপন করেন। সেই শ্রীরাধাকান্তদেবের নামানুসারেই শ্রীগোপাল-গুরু গোস্বামী 'শ্রীরাধাকান্ত-মঠ' স্থাপন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত শ্রীরাধাকান্তমন্দির-সংলগ্ন পশ্চিমদিকস্থ আর একটি ক্ষুদ্র মন্দিরেও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীবিগ্রহ আছেন।

আনন্দবাজার

শ্রীমন্দিরের উত্তর-পূর্ব্বদিকে মহাপ্রসাদ-বিপণি বা 'আনন্দবাজার' অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিভিন্ন ভোগের অন্ন-মহাপ্রসাদ, ছাপ্পান্ন-ভোগের মিষ্ট-প্রসাদাদি বিক্রয় হয়। বাজারের যেটুকুর মধ্যে রাজভোগের প্রসাদ বিক্রয়ের জন্য রাজার একটি দোকান আছে। প্রত্যেক প্রসাদের মূল্য নির্দ্ধারিত আছে।

আনন্দ-বাজারে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদের কোনপ্রকার স্পর্শ-দোষ বা উচ্ছিষ্টাদির বিচার নাই। সমগ্র সাত্বতগণ উর্দ্ধবাহু হইয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীউদ্ধব বলিতেছেন (ভা ১১।৬।৪৬),—

"স্বয়োপযুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি॥"

শ্রীপদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

"শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা॥
ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ॥"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন,—

"তা'তে 'বৈষ্ণবের ঝুটা' খাও ছাড়ি' ঘৃণা-লাজ।
যাহা হৈতে পাইবা বাঞ্ছিত সব কাজ॥
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম।
ভক্তশেষ হৈলে মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান॥
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্তশেষ—এই তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ঢুকারিয়া কয়॥
তা'তে বার বার কহি, শুন, ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর' এ তিন সেবন॥"

(চৈ চ অ ১৬।৪৮-৫২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠে জানা যায়,—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে সিংহদ্বারের সমীপেই শ্রীমহাপ্রসাদের বিপণি-সমূহ অবস্থিত ছিল. শ্রীচৈতন্যভাগবত বা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে 'আনন্দবাজার'-শব্দের উল্লেখ নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু সিংহদ্বারে আগমন করিয়া শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসবার্থ মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়াছিলেন। এখনও সিংহদ্বারে শুষ্ক মহাপ্রসাদ ও মিষ্ট-প্রসাদের বিপণি আছে। পরবর্ত্তিকালে হয় ত' মেঘনাদ-গাঢ়ীচোরের অত্যাচারে মহাপ্রসাদ-বিপণিসমূহ স্থানান্তরিত হইয়া থাকিবে। বাইশ-পাহাচ অতিক্রম করিয়া আনবেলীর নিকটে মহাপ্রসাদের যে বিপণি-শ্রেণী আছে, তাহাই এখন 'আনন্দ-বাজার'-নামে প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছে। কেবল যে-সকল অন্যান্য-জাতির শ্রীমন্দিরে প্রবেশাধিকার নাই, তাহাদের জন্যই বর্ত্তমানে সিংহদ্বারের দক্ষিণভাগে কিছু মহাপ্রসাদ বিক্রয় হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দৃষ্ট হয়,—

"সিংহদ্বারে আসি' প্রভু পসারির ঠাঁই।
আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিলা তথাই॥
'হরিদাসঠাকুরের মহোৎসবের তরে।
প্রসাদ মাগিরে, ভিক্ষা দেহ' ত' আমারে॥'
শুনিয়া পসারি সব চাঙ্গড়া উঠাঞা।
প্রসাদ দিতে আগে ভা'রা আনন্দিত হঞা॥
স্বরূপ-গোসাঞি পসারিকে নিষেধিল।
চাঙ্গড়া লঞা পসারি পসারে বসিল॥
স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুরে ঘর পাঠাইলা।
চারি বৈষ্ণব, চারি সিছাড়া সঙ্গে রাখিলা॥
স্বরূপ-গোসাঞি কহিলেন সব পসারিরে।
'এক এক দ্রব্যের এক এক পুঞ্জা দেহ' মোরে॥'
এইমতে নানা প্রসাদ ঝোঁকা বান্ধাঞা।
লঞা আইলা চারিজনের মস্তকে চড়াঞা॥"

(চৈ চ অ ১১।৭৩-৭৯)

আনন্দবাজারের ভূমিতে মহাপ্রসাদ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে। বিষ্ণুবস্তুকে পদদলিত করা অত্যন্ত অপরাধজনক।

এ-বিষয়ে সাবহিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। ইংরাজী ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে 'জগন্নাথমন্দির-সংস্কার-কমিটি'-নামে একটি সমিতি পুস্তকাদির প্রচারের দ্বারা মন্দিরের সেবাপূজার একদেশী সংস্কার করিবার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু ইহা শ্রীশ্রীনীলাচল-চন্দ্রের সুখকরবিধানরূপে পরিণত করিতে হইলে মহতের আনুগত্যময় আচরণ আবশ্যক।

শ্রেষ্ঠ রাজকুমার বাজর আনন্দবাজারে মহাপ্রসাদ-বিক্রয়ের জন্য উচ্চ পাকা বেদী ও মণ্ডপসমূহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সকল সময়েই মণ্ডপের বাহিরেই মহাপ্রসাদ বিক্রয় হয়।

গোলআলু, কপি, চেঁড়শ, লাউ, উচ্ছে, লঙ্কা, পুঁই, সজিনা-ডাঁটা, ডাঁটা, টম্যাটো, কাঁকরোল প্রভৃতি কতকগুলি শাকসব্জী, সিঙ্গাড়া ইত্যাদি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভোগে ব্যবহৃত হইতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন ভেজিটেবল-ঘি ব্যবহৃত হইতেছে; এমন কি, প্রদীপের মধ্যে ঘৃতের পরিবর্তে ভেজিটেবল-ঘি দিয়া 'ঘৃতদীপ'-নামে বিক্রয় হইতেছে।

ভোগ সাধারণতঃ দুই প্রকার—(১) 'কোঠভোগ' ও (২) 'ছত্রভোগ'। কোঠভোগ শ্রীমন্দিরের অর্থভাণ্ডার ও রান্নাঘর হইতে প্রদত্ত হয়, আর ছত্রভোগ পুরীর বিভিন্ন মঠের ও ব্যক্তিগত অর্থ হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকে। কোঠভোগ রাজা অথবা মন্দিরাধ্যক্ষগণ প্রাপ্ত হন। ইহার কিয়দংশ মন্দিরের সেবক ও পূজারিগণকে প্রদান করা হয় এবং অবশিষ্ট প্রসাদ-বিক্রয়লব্ধ-অর্থ রাজার অর্থভাণ্ডারে যায়। শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ-পূর্বাংশে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভোগরন্ধনগৃহ আছে। তাহাতে নির্দিষ্ট 'সুয়ার' বা সূপকারগণ মৃন্ময় পাত্রবিশেষের দ্বারা ভোগ রন্ধন করেন এবং তাহা আবৃত পথের দ্বার দিয়া শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে কিংবা ছত্রভোগমণ্ডপে লইয়া যাওয়া হয়। ভোগরন্ধনকালে ও ভোগ লইয়া যাইবার সময় মুখমণ্ডল ও নাসিকারন্ধ্র বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া রাখা হয়, যেন ভোগের পূর্বেই শ্রীভগবানের ভোগ্যবস্তুর কোনরূপ ঘ্রাণ জীবের নাসিকায় প্রবেশ না করে। ছত্রভোগমণ্ডপে যখন ভোগ হয়, তখন ভোগগৃহের দ্বার উন্মুক্ত থাকে। তিনজন পূজারী উত্তরাভিমুখী হইয়া ভোগ নিবেদন করেন এবং শ্রীভগবান্ দৃষ্টিদ্বারা দূর হইতে সেই ভোগ গ্রহণ করেন। তখন জগমোহন বা নাটমন্দিরের মধ্যে সাধারণ দর্শকগণ দুইপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারেন, কিন্তু নাটমন্দিরে উপবেশন বা গমনাগমন করিতে পারেন না। কোঠভোগের সময় মূলমন্দিরের অভ্যন্তরের ভোগশালায় ভোগ হয়, তখন ভোগমন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকে এবং ঘণ্টা বাজিতে থাকে।

আনন্দবাজারে উচ্ছিষ্ট বা উচ্ছিষ্ট-পাত্রের কোনও বিচার নাই। এক উচ্ছিষ্টপাত্রে শত শত ব্যক্তি প্রসাদ গ্রহণ করিতে দ্বিধা-বোধ করেন না।

দৈনিক পূজাপদ্ধতি

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রাতঃকাল হইতে রাত্রিতে শয়ন পর্য্যন্ত যথাক্রমে নীতি-প্রকরণ—'পাহাড়ি (প্রাতঃ)-অবকাশ' বা মঙ্গলারাত্রিক, তৎপরে 'রোজুই-ধো-পখাল' অর্থাৎ রন্ধন-গৃহ ধৌত-মার্জ্জন, অবকাশ-স্নান (দন্তধাবন-স্নান-বেশপরিবর্ত্তনাদি), ভোগ-রন্ধনের প্রারম্ভিক হোম, সূর্য্যপূজা, দ্বারপাল-পূজা, ধ্বজ পূজা, 'সকাল-ধূপ' বা বালাভোগ, 'মইলম-লাগি' (বেশ-পরিবর্ত্তন), মণ্ডপ-ভোগ, দ্বিপ্রহর-ধূপ (ভোগ), 'দিন-পহুড়' (শয়ন), 'মইলম-লাগি' (বেশ-পরিবর্ত্তন), সন্ধ্যা-রাত্রিক, সন্ধ্যা-ধূপ (ভোগ), চন্দন-লাগি (চন্দন-লেপন), বড়সৃঙ্গার-বেশ, বড়পূজার-ভোগ, পুষ্পাঞ্জলি ও সর্ব্বশেষে শ্রীবিগ্রহের শয়ন—এইরূপ ক্রমানুসারে দৈনিক 'নীতি' বা সেবা-পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

প্রাতঃকালে প্রথমে 'ভিতরছো-মহাপাত্র' জয়-বিজয়-দ্বারের মুক্তা পরীক্ষা করেন। তৎপরে তিনি 'পালিয়া-মেকাপ,' 'পড়িয়ারি' বা প্রতিহারী, 'অখণ্ড-মেকাপ' ও 'মুহুনি'—এই উপাধিধারী চারিজন সেবকের সহিত জয়-বিজয়-দ্বার উন্মোচনপূর্ব্বক প্রদীপ-সহ 'ছামুদ্বার' (যে প্রকোষ্ঠে শ্রীবিগ্রহ নিত্য বিরাজমান থাকেন, সেই প্রকোষ্ঠের দ্বার) পর্য্যন্ত কোন অপবিত্র দ্রব্য পতিত আছে কিনা, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গর্ভগৃহের দ্বারের মুক্তা ভাঙ্গিয়া তাহা উন্মোচন করেন। সকলে 'মহিমা, মহিমা' (ঈশ্বরের প্রতি সম্বোধন-বাচক) শব্দ উচ্চারণ-পূর্ব্বক সিংহাসনের নিকট গমন করেন এবং দুই পার্শ্বে প্রদীপ স্থাপনপূর্ব্বক শয়নের পালঙ্ক, পূর্ব্বরাত্রিতে শয়নকালে প্রদত্ত তাম্ব, সুবাসিত জল ও তাম্বূল সরাইয়া ভাণ্ডার-গৃহে রাখেন। অতঃপর ২১টি

ঘৃত-বর্ত্তিকায় শ্রীবিগ্রহের মঙ্গল-নীরাজন ও তৎপরে 'পিষ্টকারতি' হয়। একটী মনুষ্যের তালের উপর ঘৃতসিক্ত প্রদীপকাঠি রাখিয়া আরতি করা হয় বলিয়া ইহাকে 'পিষ্টকারতি' বলে। তৎপরে পুষ্পালক শ্রীবিগ্রহগণের শ্রীঅঙ্গ হইতে বড়শৃঙ্গার-বেশ উন্মোচন করিয়া শ্বেতবর্ণের সূক্ষ্মবস্ত্র ও উত্তরীয় প্রদান করেন। অতঃপর অবকাশ অর্থাৎ দন্তধাবন, স্নান ও শ্রীঅঙ্গ-মার্জ্জন-প্রভৃতির জন্য পুষ্প, চন্দন, আমলকী, কর্পূর, দধি ও দন্তধাবনকাষ্ঠ প্রভৃতি আবশ্যক পদার্থ আনীত হয়। অতঃপর রৌপ্যপাত্রস্থিত তিনটী দর্পণে শ্রীবিগ্রহগণকে প্রতিবিম্বিত করিয়া স্নান করান হয়।

স্নান সম্পন্ন হইলে বিভিন্ন ঋতুর উপযোগী বস্ত্র, স্বর্ণালঙ্কার ও পুষ্পমাল্যদ্বারা শ্রীবিগ্রহগণের শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত করা হয়। মঙ্গলারাত্রিকের পর ভোগ-রন্ধনগৃহ পরিষ্কার করিয়া তথায় হোম অনুষ্ঠিত হয়। তৎপরে, সূর্য্যপূজা ও দ্বারপালপূজা অনুষ্ঠিত হইলে 'অবসর-পিণ্ডি'র(পীঠের) উপর 'বল্লভ-পূজা' (থালাভোগ) সম্পন্ন হয়। বল্লভপূজায় দুগ্ধ, সর, মাখন, ঘৈ, নারিকেল-ক্ষোরা, দধি, সর-পাপুড়ি, ডাব, বিভিন্ন ঋতুর উপযোগী ফলসমূহ ভোগে নিবেদন করা হয়। বল্লভ-পূজা সমাপ্ত হইলে গর্ভগৃহের দ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া 'চন্দন-অর্গল' পর্য্যন্ত স্থানটি ধৌত করা হয়। অতঃপর চন্দন-অর্গলে পরদা দেওয়া হইলে সকাল-ধূপ (ভোগ) আরম্ভ হয়। এই ভোগে অন্ন, ডাল, তরকারী, খেচরান্ন, শাক, হংসকেলি, কাজি, সানপিঠা এবং মঠপুলি-প্রভৃতি ভোগোপকরণ ছত্রভোগ-মণ্ডপের উপর নিবেদন করা হয়। এই ভোগে সর্ব্বসাধারণের অর্পিত দ্রব্যসমূহও নিবেদন করা যায়। তৎপরে 'মইলম-নীতি' (বেশ-পরিবর্ত্তন) শেষ হইলে দ্বিপ্রহর-ধূপ আরম্ভ হয়। ঘৃতসিক্ত আতপ অন্ন, মুগের ডাল, মরিচ-পানি, ঝিলি, সরপুলি, আরিষা-বড়পিঠা, বড়ফড়া, সানবড়া, কাকরা, সানপিঠা, তিপুরি, লাড্ডু, বড়-মনোহর, ক্ষেনি, বউলা, সান-মনোহর, দুগ্ধের সর-পানা, বড়-নাড়ি, সান-নাড়ি, দধি-পখাল, ঘৃত-কড়ুয়া-প্রভৃতি দ্রব্যসম্ভার এই দ্বিপ্রহর-ভোগে নিবেদিত হয়। তৎপরে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া তিনটি পালঙ্ক শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে আনয়ন করা হয়। পালঙ্কের নীচে ডাব, তাম্বূল ও 'ঘবাজল' (সুবাসিত জল) রাখা হয়। অতঃপর কর্পূর-আরতি শেষ হইলে সন্ধ্যা হয়। তৎপরে দ্বার বৃত্তাঙ্কিত করা হয়। সন্ধ্যার পূর্ব্বে 'ভিতর ছৌ মহাপাত্র' মুদ্গ পরীক্ষা করিলে পর প্রাতঃকালের ন্যায় দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়। সন্ধ্যায় প্রথমে কর্পূর-আরতি, পরে ২১টি বর্ত্তিকায় আরতি এবং তৎপরে 'সজকাহালি'-আরতি (জয়বিজয়-দ্বার হইতে যে আরতিটী হয়)—এইরূপ তিনবার আরতি হয়। তৎপরে আবার বেশপরিবর্ত্তন করিয়া সন্ধ্যা-ধূপ আরম্ভ হয়। এই ভোগে দধি-পখাল, পাকেরা, সুহারি, পারিজাতক, মাধুরা, মঠপুলি, খড়াইনদা, বড়পিঠা, কর্ণল (ফোরল)-পুলি, সানপিঠা, বউলা, থালিপকা, মনোহর, মরিচ-লাড্ডু-প্রভৃতি নিবেদিত হয়। অতঃপর দুইবার ধূপ-আরতি হয় এবং তৎপরে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে পরদা দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পরে পরদা সরাইয়া তিনবার আরতি করা হয়। একাদশী-দিবস এই সময় শ্রীমন্দিরের উপর মহাদীপ দেওয়া হয়। সন্ধ্যা-রাত্রিকের সময় তিনটি রৌপ্যকুম্ভ বা প্রদীপের দ্বারা আরতিক হয়। তৎপরে 'চুনরা' (যিনি শ্রীমন্দিরের উপর মহাদীপ দেন) ঐ রৌপ্য প্রদীপ হইতে মহাদীপ জ্বালাইয়া শ্রীমন্দিরের উপর দেন। এই সময় সাতটি বর্ত্তিকার দ্বারা শ্রীমুদর্শনের পৃথক্ আরতি করা হয়। সন্ধ্যা-ধূপের পর শ্রীবিগ্রহগণকে রেশমী বস্ত্র পরিধান করাইয়া শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন করা হয়—ইহাকে 'চন্দন-লাগি' বলে। 'ছত্রপনায়ক' তাম্বূল প্রদান করেন। তৎপরে 'পালিয়া-ঘুণ্টিয়াগণ' 'মণিমা, মণিমা'-শব্দ উচ্চারণ করেন। অতঃপর বীণাবাদ্য-সহযোগে 'শ্রীগীতগোবিন্দ' গান করা হয়। তৎপরে বড়শৃঙ্গার-বেশ হয়। এই সময় পুষ্পের মুকুট, চন্দ্রিকা, নাকুরাসি (শ্রীবিগ্রহের নাসায় যে পুষ্পমাল্য দেওয়া হয়), কুণ্ডল, করপল্লব ও তুলসী-মালা-দ্বারা শ্রীবিগ্রহগণের শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত করা হয়। তৎপরে ভূর্ণবেড়-প্রাচীরের (অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রাকারের) অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীগণের ভোগরাগ শেষ হইলে শ্রীবিগ্রহগণের বড়শৃঙ্গার-ভোগ আরম্ভ হয়। এই ভোগে সুবাসিত পখাল, বড়া, কলা, নানাপ্রকার পিঠা, সরপুলি, ঘৃত ও পায়স-প্রভৃতি নিবেদিত হয়। অতঃপর গর্ভগৃহে তিনটি পালঙ্ক এবং প্রত্যেক পালঙ্কের নীচে ডাব, সুবাসিত জল ও তাম্বূল রাখা হয়। পুষ্পালক পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলে পর শ্রীজগদীশ পালঙ্কোপরি বিজয় করেন। তৎপরে ডাব ও তাম্বূল নিবেদন করা হয় এবং কর্পূর-আরতি ও মঙ্গ-

কাহালি-আরতি সম্পন্ন হইলে দেবদাসীগণ বীণাবাদ্য-সহযোগে 'শ্রীগীতগোবিন্দ' গান ও নৃত্য করেন। সেই-সময় রাজপ্রতিনিধি স্বর্ণযষ্টিহস্তে তথায় উপস্থিত থাকেন। তৎপরে দেবদাসীগণ শ্রীজগন্নাথের নিদ্রাকর্ষক পীঠ গান এবং 'প্রহররাজ' বেশ পাঠ করেন। পুষ্পাঞ্জলি-ঠাকুর শ্রীজয়-বিজয়-দ্বারের নিকটে তদ্রূপ-আকারে নির্দ্মিত আসনে পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিবার জন্য শুভবিজয় করেন। তৎকালে তাঁহার মস্তকোপরি ছত্র ধারণ করা হয়। তাম্র ও তাম্বূল অর্পিত হইলে কর্পূর-আরতি, সপ্তকাহালি-আরতি ও পুষ্পাঞ্জলি সম্পন্ন হয়; পুষ্পাঞ্জলি-ঠাকুর স্বস্থানে বিজয় করেন এবং প্রদীপ নির্ব্বাপিত করা হয়। 'পালিয়া-মেকাপ' মণিকোঠার দ্বারদেশে 'মণিমা, মণিমা'-শব্দ উচ্চারণ করেন। ছামুদ্বার ও জয়বিজয়দ্বারের জালা বন্ধ করা হয়। জয়-বিজয়-দ্বারের লোহার কড়া দুইটী দড়ির দ্বারা বন্ধন করিয়া সেই বন্ধনের উপর 'তলিচ্ছা'-উপাধিধারী সেবক বর্দ্ধমান লাগাইয়া তাহার উপর 'জগন্মোহন-মুদ্রা' অঙ্কন করেন। প্রাতঃকালে 'ভিতরছো মহাপাত্র' সেই মুদ্রাই প্রথমে পরীক্ষা করিয়া পরে দ্বারোদ্ঘাটনের অনুমতি প্রদান করেন। জয়বিজয়-দ্বারের বাহিরে সমস্ত রাত্রি প্রদীপ জ্বলিতে থাকে। 'পালিয়া-মুহুলি' ও 'পালিয়া-মেকাপ'-প্রভৃতি সেবকগণ বাহিরে পাহারা দেন।

প্রত্যহ যথাক্রমে বল্লভভোগ, সকালধূপ, দ্বিপ্রাহ্নধূপ, সন্ধ্যাধূপ ও বড়শৃঙ্গারধূপ—এইরূপে ষোড়শোপচারে পাঁচবার ভোগ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সকালধূপের পর 'ছহ-ভোগ' হয়।

বারবিশেষে নীতি—প্রত্যেক রবিবারে মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীবিগ্রহের বেশ পরিবর্ত্তন করা হয়। তৎপরে তিনজন 'ভক্তসেবক' রৌপ্যপাত্রে কর্পূরজল লইয়া শ্রীবিগ্রহগণের শ্রীমুখ মুছিয়া দেন। তৎপরে দন্তধাবন ও স্নানাদি-সেবা সম্পন্ন হয়।

বৃহস্পতিবারে শ্রীজগন্মোহন, শ্রীলক্ষ্মীদেবী ও শ্রীসরস্বতী-দেবী মণিকোঠার 'মার্জ্জনামণ্ডপে' শুভবিজয় করেন। তৎপরে শ্রীবিগ্রহগণের দন্তধাবন ও শ্রীঅঙ্গমার্জ্জন-প্রভৃতি প্রাতঃ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে 'চন্দন-লাগি' (অগুরু, চন্দন, গোরোচনা, কস্তুরী ও কেশর-সংমিশ্রিত লেপের দ্বারা গাত্র-লেপন), শীতলভোগ ও কর্পূর-আরতি হয়। তৎপরে শ্রীজগন্মোহন ও শ্রীলক্ষ্মী-সরস্বতী স্বমন্দিরে বিজয় করেন। অতঃপর 'খটিয়া-মেকাপের' উপস্থিতিতে ভক্তসেবকগণ শ্রীজগন্নাথের মনঃকল্পনা করেন। মধ্যাহ্ন, পুষ্পাভ, সন্ধ্যারাত্রিক, বেশ-পরিবর্ত্তন ও সন্ধ্যাধূপের পর শ্রীজগন্মোহন ও শ্রীলক্ষ্মীদেবী বহির্দ্দেশীর সন্নিকটে শুভবিজয় করেন। ঐদিবস শ্রীজগন্নাথ-দেবের শ্রীঅঙ্গে দুইটী অধিক পুষ্পমালা প্রদত্ত হয়। পরে উহা তাঁহার শ্রীঅঙ্গ হইতে লইয়া শ্রীজগন্মোহন ও শ্রীলক্ষ্মী-দেবীর গলদেশে আজ্ঞামালারূপে অর্পিত হয়। তৎপরে শ্রীজগন্মোহন ও শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীসরস্বতীর শ্রীমন্দিরে বিজয় করেন। অতঃপর শ্রীজগন্মোহন শ্রীলক্ষ্মীদেবীর শ্রীমন্দিরে আসিয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে প্রসাদমালা অর্পণ করিয়া পালঙ্কের উপর শুভবিজয় করেন। পরে 'কর্পূরলাগি' সেব হইলে শ্রীজগন্মোহন স্বমন্দিরে শুভবিজয় করেন।

নক্ষত্রবিশেষে নীতি—রোহিণীনক্ষত্রে তিন বিগ্রহের নিকট 'অক্ষতলাগি' (আতপচাউল ও দূর্ব্বা-নিবেদন) হয়। তৎপরে কর্পূর-আরতি, কেবল শ্রীজগন্নাথদেবের নিকট জয়মঙ্গল-আরতি ও সপ্তকাহালি-আরতি হয়। জ্যেষ্ঠা-নক্ষত্রে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলভদ্র ও শ্রীসুভদ্রার নিকট একই সময়ে 'অক্ষতলাগি,' কর্পূর-আরতি, জয়মঙ্গল-আরতি ও সপ্তকাহালি-আরতি হয়। শ্রবণা-নক্ষত্রে মধ্যাহ্নধূপের পর শ্রীজগন্মোহন সিংহাসনে বিজয় করেন। তৎপরে শ্রীবিগ্রহ-ত্রয়ের সম্মুখে অক্ষতলাগি হয়, পরে কর্পূর-আরতি এবং শ্রীবলদেবের জয়মঙ্গল-আরতি ও সপ্তকাহালি-আরতি হয়।

তিথি ও পর্ব্বাবিশেষে নীতি—একাদশীর দিন শ্রীজগন্মোহন শ্রীজগদীশের আজ্ঞামালা প্রাপ্ত হইয়া শিবিকারোহণে কল্পবটমূলে কিছুক্ষণ অবস্থান করেন, তৎপরে শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণপূর্ব্বক জয়বিজয়দ্বারে শুভবিজয় করেন। সেখানে প্রসাদচন্দন-লাগি, শীতলভোগ ও 'বন্দাপনা' (আরতি) শেষ হইলে দক্ষিণঘরে (স্বমন্দিরে) ফিরিয়া আসেন। অতঃপর শ্রীজগদীশ সর্ব্বাঙ্গশোভিত হন, পরে সন্ধ্যাধূপ হয়। সোমবারে একাদশী পড়িলে শ্রীজগন্মোহন সিংহাসন হইতে আজ্ঞামালা পাইয়া শিবিকারোহণে শ্রীলোকনাথ-মন্দিরে শুভবিজয় করেন। তথায় শীতল-ভোগ অর্পিত হইলে শ্রীলোকনাথের সঙ্গে জয়বিজয়দ্বারে গমন করেন। তথায় আরতি, বন্দনা ও শীতলভোগ শেষ হইলে শ্রীজগন্মোহন স্বমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। 'শ্রীহস্তিনী-হরণ'-একাদশী হইতে 'বাহুড়া'-একাদশী (উল্টা রথের

পরের একাদশী) পর্য্যন্ত সকল একাদশীতে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পূজা হয়। বৃহস্পতিবারে একাদশী পড়িলে শ্রীজগদীশ সুবর্ণভূঙ্গশোভিত হইয়া বড়পূজার ও পত্রচ্ছত্র-প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত হন। তৎপরে বড়পূজারূপ হয়।

অপরাহ্ণ-তিথিতে শ্রীমদনমোহন সমুদ্রে বিজয় করেন। সেই সময় চটকপর্ব্বতে শ্রীপুরুষোত্তমমঠের দ্বারে ও শ্রীটোটা-গোপীনাথে কৃপাপূর্ব্বক শুদ্ধবিজয় করিয়া ভক্তগণকে দর্শন দান করেন। সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ লাগিবার পূর্ব্বে প্রথম চারি প্রহরেই সমগ্র পূজা শেষ করিবার বিধি আছে। গ্রহণ-সময়ে খৈ ও কোরা-প্রভৃতি বালভোগ দেওয়া যায়। গ্রহণ ছাড়িলে মহাস্নান ও দৈনন্দিন পূজা হইয়া থাকে।

মহাস্নানবিধি—নির্দ্দিষ্ট-সেবক ব্যতীত অপর কেহ শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিলে শ্রীবিগ্রহকে মহাস্নান করাইতে হয়। জয়বিজয়-দ্বার হইতে রত্নবেদী পর্য্যন্ত স্থানে যদি কোন সময় মল, মূত্র, রক্ত, অস্থি, চর্ম্ম, নিষ্ঠীবন-প্রভৃতি অপবিত্র ও অমেধ্য বস্তু দৃষ্ট হয় বা কোন সময় ঐস্থানে কুক্কুর প্রবেশ করে অথবা পূজার সময় ভোগসামগ্রী অপবিত্র হয়, তবে শ্রীবিগ্রহের 'বড় মহাস্নান' হইয়া থাকে। যাত্রার সময় যে মহাস্নান হয়, তাহার নাম 'যাত্রা-মহাস্নান'। প্রত্যহ অবকাশসময়ে যেভাবে স্নান হয়, মহাস্নানাদিতে ঐভাবেই স্নান হইয়া থাকে। সিংহাসন হইতে জয়বিজয়-দ্বার ও দক্ষিণ-দ্বার পর্য্যন্ত ধৌত করা হয়। ভোগের কোন দ্রব্য অপবিত্র হইলে সিদ্ধ ও অসিদ্ধ সমস্ত ডাল-তরকারী-প্রভৃতি মাটির মধ্যে গর্ত্তে পুঁতিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে হোম করিয়া পুনর্বার চুল্লী জ্বালিয়া রন্ধন করা হয়। স্নান, মহাস্নান-প্রভৃতিতে যে অধিক খরচ হয়, তাহা যে ব্যক্তির অনবধানতার জন্য ঐরূপ ঘটিয়াছে, তাহার নিকট হইতেই জরিমানা-স্বরূপ আদায় করা হয়।

সেবা-উপাধিধারী সেবকগণ সূয়ার পণ্ডাগণকে রন্ধন-কার্য্যের জন্য যথাসময়ে আহ্বান করেন। রন্ধনের পূর্ব্বে তাঁহারা হোম করিয়া অগ্নিস্থাপন করেন। মহাসূয়ার ও পিঠাসূয়ার রন্ধন করেন। 'রোষ-মেকাপগণ' দ্রুত সরবরাহ করেন; 'সমর্থীগণ' ডাল ভাঙ্গেন, ডাল বাছেন ও চাউল পরিষ্কার করেন। 'মহাভোই' দধি, দুগ্ধ, ছানা ও পাপড়ি-প্রভৃতি সরবরাহ করেন। 'রোষ-পাইক' রন্ধনের সময় উপস্থিত থাকিয়া পরিদর্শন করেন এবং 'শুদ্ধ-পাইক' রন্ধনগৃহের দ্বারে থাকিয়া রন্ধনসামগ্রী পরীক্ষা করিয়া ভিতরে পাঠাইতে থাকেন। রন্ধনসামগ্রীর মধ্যে পিঁয়াজ, লসুন, চিনি, সাদা-লবণ, সিদ্ধচাউল, কলাপেষা আটা, গোল-আলু, কাঁচড় (ফলবিশেষ), ভেণ্ডি (চেঁড়স), কপি, কুড়ুঙ্গ (সজিনা-ডাঁটার মত), লাউ, ডাঁটা, পুঁই, সজিনা-ডাঁটা, পল্তা, উচ্ছে —এই সকল দ্রব্য যাহাতে না থাকে, তাহা শুদ্ধ-পাইক ভালভাবে দেখিয়া দেন। কোন দ্রব্যের মধ্যে ঐ-সকল নিষিদ্ধ বস্তুর কোন একটী খণ্ড পাওয়া গেলেও তাহা সমস্তই নষ্ট করিয়া পুনর্বার নূতন দ্রব্য ক্রয় করা হয়। নষ্ট দ্রব্যসমূহ মাটির নীচে পুঁতিয়া দেওয়া হয়।

বিভিন্ন ভোগে প্রদত্ত ভোগ-সামগ্রীর একটি তালিকা নিম্নে প্রকাশিত হইল—

বল্লভভোগ—খৈ, সরপাপড়ি, মাখন, দধি, খোয়াময়া, কোরা, খণ্ডময়া, নাড়িয়া পুরি ও শুক্ল-উপযোগী ফলসমূহ এই ভোগে নিবেদিত হয়।

সকালধূপ—এই ভোগে এলুরি, খেচরান্ন, অদাগা-চেলি, মাঠপুলি, হংসকেলি, খিলি, কাকাতুয়া-পাগ, চন্দ্র-কান্তি, মিঠা-কাণিকা, শাক, পিঠাপুলি, আট-খেচড়ি, ঘেণ্টা-মুণ্ডিয়া, বুন্দিয়া-খিরি, মাহাদেঈ, ঘুসুরা-খেচড়ি প্রভৃতি দ্রব্য নিবেদিত হয়।

দ্বিপ্রহর-ধূপ—বিরিবড়া, বউলা, মনোহর, সরপণা, সুবাস-পখাল, আরিষা, পাগ-আরিষা, লুণ্ডুরমা, বড়িখিরিষা, মরিচপানি, বড় নাড়ি, সরা-কাকর, ফেণি, গজা, ভিপুরী, খিলি-রহণী, লেবরাখিলি, বড়পিঠা, আটপিঠা, মরিচলাড়ু, মাঠপুলি, ভজা, শাকুয়া, ছেনাপিঠা, ওরিয়া, মনোহর, গুড়খিরিষা, কাকরা, মোহনভোগ, বড়-মাণ্ডুয়া, সানমাণ্ডুয়া —এই দ্রব্যসমূহ ভোগ হয়।

সন্ধ্যাধূপ—এই সময় জেমামনি, মাঠপুলি, কর্জ্জলপুলি, সুয়ারী, মাণ্ডুয়া, রসাবলী, টাকুয়া, দধিপখাল, পারিজাতক, অমালু, শাকর, মরিচলাড়ু, খইরচুন, হংসবল্লভ, চুলিয়া-চুপুড়া, পানিপখাল—এই দ্রব্যসমূহ নিবেদিত হয়।

বড়পূজারধূপ—খিরিখিরিয়া, টাপখাল, কদলীবড়া, সুয়ারপিঠা, সুবাসপখাল, কাজী, কেলী, সরপুলি—এই দ্রব্যসমূহ বড়পূজারধূপের সময় নিবেদিত হয়।

পহুড় বা শয়নের সময় ধসা-জল (সুবাসিত জল), ডাব ও তাম্বূল অর্পিত হয়।

বরাভিভোগ—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের উপর্য্যুক্ত নিত্যিই ভোগপ্রকরণ প্রত্যহ বা তিথিবিশেষে শ্রীপুরীধামের বিভিন্ন মঠ, দেবালয়ের ব্যক্তিগণ বরাত বা ফরমাস দিয়া সক অন্ন, বগড়া অন্ন, মিষ্টান্নাদিকা, নড়িয়াখেচড়ি, মুগ, অড়হর, ছোলা, চানা ও খেসারীর ডাল, মহুর, বেসর, বলিবামন, ভজা, শাকরা, রাই, রাইচা, ঘটেই, ছানা-চকটা, কদলী, খিরিয়া, অটকলি, জগন্নাথবল্লভ, খজা, মগজলাড়ু, সাদা খাজাগজা, মদকলাড়ু, মুগপুরমা, নিমকি, ডালিম্ব (দরভাজা), খইচুন, লক্ষ্মীবিলাস, লড্ডুমোড়িচুন, লুচি, কাট, পুরি, পরটা, চিতউ, চকুলি, মণ্ডা, পুলি, গইঠা, ছেনামণ্ডা, অতরছমণ্ডা, পোড়পিঠা, সাতপুরি, সেউ, চুঙ্কিপত্র, সক-চকুলি-প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত করাইয়া ভোগ দিয়া থাকেন।

যাত্রা ও পর্ব্বভোগ—দৈনিক ভোগ ব্যতীত বিভিন্ন ঋতু ও বিভিন্ন মাসে ঋতু-উপযোগী ফল ও মিষ্টান্ন ভোগ হইয়া থাকে।

শ্রীজগন্নাথদেবের নিত্যিই ভোগ ব্যতীত প্রত্যহ পুরীর ঠাকুররাজার বাড়ী হইতে যে নিত্যিই ভোগ দেওয়া হয়, তাহাকে 'কোঠভোগ-পসরা' বলে।

দাণ্ডপত্তি-ভোগ—শ্রীজগন্নাথদেব রথারোহণপূর্ব্বক শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে শুভবিজয় করিবার সময় রাস্তায় যে-সকল ভোগ দেওয়া হয়, তাহাকে 'দাণ্ডপত্তি'-ভোগ বলে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ছাপ্পান্নভোগ

প্রচলিত একটি সঙ্গীতে 'ছাপ্পান্ন-ব্যঞ্জন নানা জাতি, ভোগ লাগে দিবারাত্তি'—শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগের সম্বন্ধে এইরূপ একটি উক্তি পাওয়া যায়। শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে 'ছাপ্পান্নভোগ'-নামে রাজদত্ত মিষ্টদ্রব্যভোগের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ছাপ্পান্ন-প্রকার মিষ্টদ্রব্যের তালিকা অতিক্রম করিয়াও অনেক সময় ভোগের প্রকার বৃদ্ধি হয়। কোন-কোন পাণ্ডা বলেন,—'ছাপ্পান্ন-ভোগ' বলিতে বহু প্রকার মিষ্ট-দ্রব্যের ভোগ বুঝায়। শ্রীজগন্নাথমন্দির হইতে সংগৃহীত ছাপ্পান্নভোগের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

(১) জগন্নাথবল্লভ, (২) কাণিকা, (৩) কেণা, (৪) গুণকেশী, (৫) বহুরূপ, (৬) বড়-পুরি, (৭) সান-পুরি, (৮) খড়িকামরা, (৯) বড়-নাড়ী, (১০) সান-নাড়ী, (১১) কাকরা, (১২) ঘনকেলি, (১৩) চন্দ্রকান্তি, (১৪) পণওয়া, (১৫) বড়া, (১৬) বড়-খিলি, (১৭) সান-খিলি, (১৮) কাকাতুয়া-খিলি, (১৯) আরিষা, (২০) পাপ-আরিষা, (২১) মরিচ-লাড্ডু, (২২) খিরিষা, (২৩) মেণ্ডাশিখিয়া, (২৪) তিপুরি, (২৫) অরখজুল, (২৬) চউতাপুরি, (২৭) নরকুপ্পা, (২৮) সক্কচকুলি, (২৯) গজা, (৩০) খজা, (৩১) মগজলাড়ু, (৩২) ডালিম্ব (দরভাজা), (৩৩) নিমকি, (৩৪) সরভাজা, (৩৫) সরমণ্ডা, (৩৬) খোয়ামণ্ডা, (৩৭) পারিজাতক, (৩৮) অমালু, (৩৯) ঘাবুয়, (৪০) বল্লভকোরা, (৪১) অমৃত-রসাবলী, (৪২) বড়-খিরিষা, (৪৩) গুয়ারি, (৪৪) ছানা-ঘাবুয়া, (৪৫) চড়েই-নদা, (৪৬) কড়ুয়া, (৪৭) সর, (৪৮) দাতপুরি, (৪৯) নারিকেল-লাড্ডু, (৫০) হুসেবল্লভ, (৫১) ছানাপিঠা, (৫২) সেবতি-খিলি, (৫৩) মাঠপুলি, (৫৪) খোয়ামণ্ডা, (৫৫) সরপাপুড়ি, (৫৬) খণ্ডমণ্ডা, (৫৭) নড়িয়া-পুলি, (৫৮) এলুরি, (৫৯) পিঠাপুলি, (৬০) শ্রীহস্তকোরা, (৬১) বুঁদিয়া-খিরি, (৬২) মহাদেউ, (৬৩) সরকাকরা, (৬৪) গুড়খিরিষা, (৬৫) মোহনভোগ, (৬৬) জেনামণি, (৬৭) খইচুন, (৬৮) কর্পূরপুলি, (৬৯) লক্ষ্মীবিলাস, (৭০) দুধ পুরুষা, (৭১) চুলিয়া-চুপড়া, (৭২) বলি-বামন, (৭৩) ছানাচকটা, (৭৪) অটকালি, (৭৫) চিতউপিঠা, (৭৬) চুঙ্কিপত্র, (৭৭) পোড়পিঠা, (৭৮) সেউ, (৭৯) অতরছমণ্ডা, (৮০) গইঠা পিঠা, (৮১) সরপানা, (৮২) মাখন, (৮৩) খলি-কাট, (৮৪) মালপোয়া, (৮৫) রাধাবল্লভী (৮৬) ক্ষেণামণ্ডা, (৮৭) অবরপনা—শ্রীজগন্নাথদেব যখন রথে বিজয় করেন, রথ চলিবার পূর্ব্বে এই 'পনা' (পানা) ভোগ দেওয়া হয়; ইহাতে দ্রব্যের মূল্যানুযায়ী একহাজার টাকা হইতে তিন হাজার টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু এই প্রসাদ বিতরিত না হইয়া রথের উপর ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে রথের শান্তি হয়। ভূতপূর্ব্ব জনৈক মন্দিরাধ্যক্ষ (Temple Superintendent) এই অবরপনা রথের উপর না ভাঙ্গিয়া সাধারণকে বিতরণ করায় সেই বৎসর পুরীতে ভীষণ কলেরা হয়। তদবধি আর বিতরণ করা হয় না—রথের উপরই ভাঙ্গা হয়।

অন্ন, ডাল ও তরকারী

সক অন্ন, বগড়া অন্ন, খেচরান্ন, ভাটখিচুড়ী, মুগুরা-খিচুড়ী, কদ্মাবাই-খিচুড়ী, লোণাথালি-খিচুড়ী, সুবাস-পখাল, টক্কা-পখাল, মরিচপানি, বেসর, মহুর, শাকর, শক্তলা, রাইতা, কদলীবড়া, ঘটেই, কাঞ্জী, রহণি, ঘৃত-পখাল, ভজা, শাক, দই-কড়ি, পরমান্ন, কাণিকা (সুপার) ইত্যাদি।

আটিকা-বন্ধন

উৎকল ভাষায় 'আটিকা'-অর্থে মৃৎপাত্রবিশেষ বা হাঁড়ি বুঝায়। আটিকার মধ্যে ভোগ রন্ধন করিয়া তাহা নিবেদন করা হয়। যাত্রিগণের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করিয়া সেই আয়ানতের সূত্র হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগপ্রদান করা হয় এবং তাহা পাণ্ডা বা ব্রাহ্মণগণ গ্রহণ করেন। এই ভোগ প্রত্যহ নিয়মিতভাবে ৬ বৎসর, ১২ বৎসর ও যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর চলিতে থাকে, এইরূপ স্থির হয়।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভোগান্নদান-আটিকা-বন্ধনের নিয়মাবলী

১। মাখন-মিশ্রির ভোগ—এক সেরের, ১৩২০০০৲ টাকা, আধ সেরের ৬৬০০০৲ টাকা, এক পোয়ার ৩৩০০০৲ টাকা, আধ পোয়ার ১৬৫০০৲ টাকা, এক ছটাকের ৮২৫০৲ টাকা।

২। ছাপ্পান্নভোগের ভোগ—এক সেরের ৪৮০০০৲ টাকা, আধ সেরের ২৮০০০৲ টাকা, এক পোয়ার ১৪০০০৲ টাকা, আধ পোয়ার ৭০০০৲ টাকা, এক ছটাকের ৩৫০০৲ টাকা।

৩। মোহনভোগের ভোগ—এক সেরের ১৪৪০৲ টাকা, আধ সেরের ৭১৫৲ টাকা, এক পোয়ার ৩৭৫৲ টাকা, আধ পোয়ার ১৮৭৷৷০ আনা, এক ছটাকের ৯৩৷৷০ আনা।

৪। খাজা-লাড়ুর ভোগ—এক সেরের ১৫০০৲ টাকা, আধ সেরের ৭৫০৲ টাকা, এক পোয়ার—৩৭৫৲ টাকা, আধ পোয়ার ১৮৭৷৷০ আনা, এক ছটাকের ৯৩৷৷০ আনা।

৫। সিরা-পূরির ভোগ—এক সেরের ৭৪০৲ টাকা, আধ সেরের ৩৭৫৲ টাকা,-এক পোয়ার ১৮৭৷৷০ আনা, আধ পোয়ার ৯৩৷৷৵ আনা, এক ছটাকের ৪৬৷৷৵০ আনা।

৬। বালপোয়ার ভোগ—এক সেরের ৫৬২৲ টাকা, আধ সেরের ২৮১৲ টাকা, এক পোয়ার ১৪০৷৷৵০ আনা, আধ পোয়ার ৭০৷৷০ আনা, এক ছটাকের ৩৫৷৵০।

৭। কর্পূরবাসী-মিষ্টি-খিচুড়ী—এক সেরের ৪০৪৲ টাকা, আধ সেরের ২০২৲ টাকা, এক পোয়ার ১০১৲ টাকা, আধ পোয়ার ৫০৷৷০, এক ছটাকের ২৫৷৷০।

৮। ঘৃতসূত্র খিচুড়ীর ভোগ—এক সেরের ৩৬০৲ টাকা, আধ সেরের ১৮০৲ টাকা, এক পোয়ার ৯০৲ টাকা, আধ পোয়ার ৪৫৲ টাকা, এক ছটাকের ২২৷৷০।

৯। কাঁচা-ডাল-ভাতের ভোগ—এক সেরের ১৩২৲ টাকা, আধ সেরের ৬৬৲ টাকা, এক পোয়ার ৩৩৲ টাকা, আধ পোয়ার ১৬৷৷০, এক ছটাকের ৮৷৷০।

ছত্রিশ-নিয়োগ (ছত্রিশ-প্রকার সেবক)

শ্রীজগন্নাথদেবের ছত্রিশ প্রকার সেবক আছেন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি পরিচালক, তাঁহার উপাধি 'ছত্রিশ-নিয়োগনায়ক'। তিনি সমস্ত সেবা ও সেবকের নিয়মন ও তত্ত্বাবধান করেন।

মুদিরথ বা মুদ্রাহস্ত—ইহারা দুই শ্রেণীর, যথা—অগ্নি-শর্ম্মা ও বিষ্ণুশর্ম্মা। শ্রীবলদেবকে অগ্নিশর্ম্মা ও শ্রীজগন্নাথ-দেবকে বিষ্ণুশর্ম্মা-উপাধিধারিগণ সেবা করেন। ইহারা ভোগের পূর্ব্বে চন্দন, পত্তনী, দমনপুষ্পের মালা নিবেদন করেন। যাত্রার সময় তাঁহারা শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গ-সংস্কার-প্রভৃতি কার্য্য, আরতি, ভোগ-নিবেদন, স্নানযাত্রায় শ্রী-বিগ্রহের স্নান, সোণাকুপের জলসংস্কার, পহাণ্ডিবিজয়, পর্ব্ব-উপযোগী বন্দনা ও যাত্রাপর্ব্ব-সময়ে রাজার অনুপস্থিতিতে প্রতিনিধির কার্য্য করেন। তাঁহাদের দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম-কালে উপনয়ন-সংস্কার হয়। তাঁহারা অবিবাহিত থাকা-কালেই এই সকল সেবার অধিকার পাইয়া থাকেন। বিবাহ হইলে তাঁহারা আর এই সকল সেবা করিতে পারেন না। তাঁহাদের পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তি সেবা গ্রহণ করেন।

ষড়পণ্ডা—পূজাপণ্ডা অর্থাৎ যাঁহারা পূজা করেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা তত্ত্বাবধায়ক, তাঁহারাই ষড়পণ্ডা। পূজাপণ্ডাগণ ষোড়শোপচারে ভোগ নিবেদন করেন।

পুষ্পালক—ইহারা বেশ-পরিবর্ত্তন ও পূজার করেন। ত্রিদ বিগ্রহের নিকট তিনজন পুষ্পালক থাকেন।

পত্তি-মহাপাত্র—শ্রীজগদীশের শ্রীনীলমাধব-অবতারের সময় বিদ্যাপতির যে ব্রাহ্মণবংশধরগণ শ্রীনীলমাধব-শ্রীমূর্ত্তির পূজা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই পত্তি-মহাপাত্র। দেবস্নান-পূর্ণিমার পর শ্রীবিগ্রহ গুণ্ডিচামন্দির হইতে শুভবিজয় করা

পর্য্যন্ত যত পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সকলই পতি-মহাপাত্রগণ করিয়া থাকেন :

ভণ্ডার-মেকাপ—ইঁহারা ভাণ্ডারগৃহের রক্ষক। পূজার-সময়ে নির্দ্দিষ্ট সেবকগণকে মূল্যবান্ অলঙ্কারসমূহ প্রদান করেন এবং হিসাব রাখেন।

চাঙড়া-মেকাপ—শ্রীবিগ্রহের যাবতীয় বিচিত্র বসন ইঁহাদের তত্ত্বাবধানে থাকে।

পালিয়া-মেকাপ—ইঁহারা ভণ্ডার-মেকাপের নিকট হইতে অলঙ্কার লইয়া পুষ্পালকের নিকট দেন এবং পূজা-শেষ হইলে আবার সেই অলঙ্কারসমূহ যথাস্থানে ফেরৎ দেন। পূজার চন্দন যথাস্থান হইতে লইয়া পুষ্পালকগণকে দেন। শয়নের সময় রত্নসিংহাসনের দুই পার্শ্বে যে দুইটী প্রদীপ থাকে, তাহা নির্ব্বাপণ করেন।

পালিয়া-খুঁটিয়া বা ছামুখুঁটিয়া সেবক—প্রত্যেক পূজার সময় সংগৃহীত পুষ্প ও তুলসী পুষ্পালকের নিকট দেন। চন্দন-লাগির সময় ভাণ্ডারগৃহ হইতে সিংহাসন পর্য্যন্ত চন্দন-জল সেচন করেন এবং লোক-যাতায়াত নিবারণ করেন।

গরাবন্ধু—পূজার সময় পুষ্পালকের হস্তে আবশ্যক জল প্রদান করেন।

পত্রিবন্ধু—পূজার পূর্ব্বে ধূপ ও দীপ-প্রভৃতি আয়োজন করিয়া রাখেন।

সুয়ার বন্ধু *—ভোগের পূর্ব্বে সিংহাসন হইতে চন্দন-অর্গল পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান ধৌত করেন। রন্ধন-চুল্লী হইতে অগ্নি আনিয়া আরতির জন্য পূজারীদের হস্তে অর্পণ করেন।

পালিয়া-পড়িয়ারী—ইঁহারা তিন প্রকার; প্রথম দল ভোগের সময় চন্দন-অর্গলে পর্দ্দা দেন, প্রত্যেক ভোগে কি কি আনয়ন করিতে হইবে, তাহা ক্রমানুসারে আনয়ন করিবার জন্য সংবাদ দেন এবং ভোগের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া বেত্র-হস্তে যাত্রিগণকে সতর্ক করেন। দ্বিতীয় দল ভোগের সময় দক্ষিণ-জিতর-দ্বারে পাহারা দেন। ইঁহাদের উপাধি—'বড়-দ্বার-পড়িয়ারী'। তৃতীয় দল জয়বিজয়-দ্বারে পাহারা দেন।

ভিতরছোঁ-মহাপাত্র—প্রত্যেক দিন প্রাতে ছামুদ্বার ও জয়বিজয়-দ্বারে মুদ্রা পরীক্ষা করিয়া তালা খুলিবার অনুমতি প্রদান করেন।

তলিছোঁ—প্রত্যহ রাত্রিতে শয়নের পরে ছামুদ্বার ও জয়বিজয়-দ্বারে মুদ্রা দেন।

সুয়ার—ইঁহারা পাঁচ শ্রেণীর; (১) মহাসুয়ার—ইঁহারা অন্য সুয়ারদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন, ভোগ-পায়স করেন; (২) পিঠা-সুয়ার—ইঁহারা পিষ্টকাদি তৈয়ার করেন; (৩) ভাত-সুয়ার—ইঁহারা অন্ন ও তরকারী রন্ধন করেন এবং ভোগের স্থানে রাখেন; (৪) পত্তিবন্ধু—ইঁহারা সিংহাসনের সম্মুখে পত্তি পাতি বা সারি সারি করিয়া ভোগ সাজাইয়া রাখেন; (৫) ভোলা-বন্ধু—ইঁহারা রাত্রে রন্ধন-গৃহ হইতে মণিকোঠার ভোগ আনয়ন করিবার সময় প্রদীপ ধারণ করেন।

দয়িতা—শ্রীভগবানের শ্রীনীলমাধব-অবতার-কালে শ্রীবিশ্ববসু দয়িতা, প্রভুর সেবা করিয়াছিলেন। ইঁহার বংশধরগণ দারুব্রহ্ম-অবতারে সূপ-সেবক হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণতঃ পুষ্পালক বা পূজা-পাণ্ডাগণই শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিতে পারেন। কিন্তু স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা-সময়ে ও নবকলেবর-কালে তাঁহারা শ্রীবিগ্রহের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া নির্দ্দিষ্ট সেবা করেন। দয়িতা শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলভদ্র ও শ্রীসুভদ্রাকে পট্টডোরে বন্ধন করিয়া সিংহদ্বারের সমীপস্থ রথে উঠাইয়া দেন—ইহাকে পহাণ্ডি বা পাণ্ড-বিজয় বলে। এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (ম ১৩।৮-১২) এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"বলিষ্ঠ দয়িতাগণ—যেন মত্ত হাতী।
জগন্নাথ বিজয় করায় করি' হাতাহাতি॥
কতক দয়িতা করে' স্কন্ধ আলম্বন।
কতক দয়িতা ধরে' শ্রীপদ্ম-চরণ॥
কটিতটে বস্ত্র, দৃঢ়, স্থূল পট্টডোরী।
দুই দিকে দয়িতাগণ উঠায় তাহা ধরি'॥
উচ্চ দৃঢ় তুলী সব পাতি' স্থানে স্থানে।
এক তুলী হৈতে ধরায় আর তুলী আনে॥
প্রভু-পদাঘাতে তুলী হয় খণ্ড-খণ্ড।
তুলা সব উড়ি' যায়, শীঘ্র হয় প্রচণ্ড॥"

ইঁহারা শ্রীজগন্নাথদেবকে অনবসরকালে মিষ্টান্নের ভোগ দেন এবং প্রত্যহ প্রাতঃকালে বালভোগ-মিষ্টান্ন অর্পণ করেন। ইঁহারা অনবসর-কালে 'জগন্নাথদেবের জ্বর হইয়াছে' বলিয়া ঔষধ ও পাচন (মিষ্টরসের পানা) অর্পণ করেন। শুনা যায়, দয়িতাগণ কিছুদিন হইতে উপবীত ধারণ করিতেছেন।

* 'বন্ধু'র অপভ্রংশ বন্ধু; সুয়ার-অর্থে সূপকার।

ছায়ু-পুঁছিয়া-সেবক—ইহারা সিংহাসন পাছাড়া দিয়া থাকেন; 'ফুলবাগান-মালাকার' হইতে প্রত্যহ ফুল, চুল, কর-পল্লব ইত্যাদি আনিয়া ভাণ্ডারে রাখেন; অবকাশ-সময়ে সিংহারীকে (পূজারীকে) ডাকিয়া আনিয়া ফুল দিয়া থাকেন; 'ভণ্ডার-মেকাপ' হইতে কর্পূর আনিয়া থাকেন; ডাকা-হাঁকা ইত্যাদি কার্য্য করেন; অনবসরকালে দ্বারে পাহারা দিয়া থাকেন।

শ্রীমুখ-সিংহারি-সেবক—ইহারা শ্রীবিগ্রহের শ্রীমুখ মুছাইয়া তাহা চিত্রিত করেন এবং তাহাতে 'বনক' লাগাইয়া থাকেন; নেত্রোৎসবের সময় 'কালভোলা' (কনীনিকা) দিয়া থাকেন।

মুহুরি—ভাণ্ডার-ঘরে পাহারা দেন এবং নিত্যব্যবহার্য্য খুচরা দ্রব্য নিজ-তত্ত্বাবধানে রাখেন।

শুদ্ধ সুয়ার—যাত্রাপর্ব্বের সময় নিলকড়ি-ভোগ আয়োজন করেন। আরতির প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করেন; প্রাতে চন্দন-অর্গল হইতে ছায়ুঘার পর্য্যন্ত স্থানে কোন অপবিত্র দ্রব্য পড়িয়াছে কিনা, পরীক্ষা করেন।

সেবা—যত-প্রকার সেবক আছেন, তাঁহাদিগকে যথা-সময়ে সেবাকার্য্যে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করেন।

চাউল-বছা—চাউল ও ডাল বাছিয়া পরিষ্কার করেন।

শুদ্ধ পাইক—রন্ধন-গৃহের দ্বারে পাহারা দেন; রন্ধনগৃহে ভোগের জন্য নীত দ্রব্য-সকল পর্য্যবেক্ষণ করেন।

চর্চ্চাইত—ভোগরাগ ও পূজার খবর লইয়া থাকেন অর্থাৎ যাহাতে যথাসময়ে ভোগরাগ ও পূজা হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখেন।

প্রধানী—প্রত্যেক ধূপের সময় রন্ধনগৃহে গিয়া ভোগ আনিবার জন্য বলেন এবং পূজার সময় হইলে 'পূজা-পণ্ডা'দিগকে সংবাদ দেন।

মহাভোই—দধি, দুগ্ধ, লুনু, ছানা, পাপুড়ি ও ঘৃতাদি ইহার তত্ত্বাবধানে থাকে।

ঘণ্টুয়া—ভোগের ও শ্রীবিগ্রহের বিজয়ের সময় ঘণ্টা বাজাইয়া থাকেন।

চুমরা—প্রত্যহ গরুড়স্তম্ভের নিকট, জয়-বিজয়-দ্বারের নিকট, প্রত্যেক একাদশী ও পৌর্ণমাসী অমাবস্যার রাত্রে শ্রীমন্দিরের উপর যে দীপ দেওয়া হয়, তাহা তাঁহারা জ্বালাইয়া থাকেন; মীনচক্রে স্বয়ং রোপণ করিয়া থাকেন। শ্রীমন্দিরের ভিতর চন্দ্রাতপ টানাইয়া থাকেন।

করণ—(যাহারা লেখালেখি করে)—ইহারা ৮ প্রকার, যথা—মেউলকরণ, বৈঠকরণ, তহাটিকরণ, ভণ্ডারকরণ, চাউকরণ, চাদড়াকরণ, কোঠকরণ ও খরসুধাকরণ।

পুরোহিত—যাত্রাপর্ব্বাদির সময় অগ্নিহোত্র করেন।

রোষপাইক—ইহারা রন্ধনের সময় যাহা যাহা কম পড়ে বা আবশ্যক হয়, তাহা 'দেহরণ হাকিমকে' জানান।

রোষ-মেকাপ—প্রত্যেক ভোগে মদলা, ঘৃত ও নবাত-প্রভৃতি যাহা যাহা 'মহাভোই'র নিকট হইতে রন্ধনের জন্য রন্ধনগৃহে আনয়ন করা হয়, সেই-সকল দ্রব্য ইহাদের তত্ত্বাবধানে থাকে।

খট-শেষঘর-মেকাপ—দিনে ও রাত্রে শয়নের সময় রত্নবেদীর সম্মুখে পালঙ্ক রাখেন; যাত্রাপর্ব্বাদিবস ঠাকুর অন্যত্র বিজয় করিলে ইহারা রথ, বিমান ও শিবিকা সাজাইয়া থাকেন।

বিমানিবন্ধু ও হান্দোলাবন্ধু—ইহারা শ্রীবিগ্রহ বিজয়ের সময় রথ, শিবিকা ও বিমান স্কন্ধে বহন করিয়া থাকেন এবং রন্ধনগৃহ পরিষ্কার করেন।

দণ্ডনী—রথ, শিবিকা ও বিমান-প্রভৃতির সাজপোষাক ইহাদের তত্ত্বাবধানে থাকে এবং প্রয়োজন-সময়ে রথ, বিমান ও শিবিকা সাজাইয়া থাকেন।

অখণ্ড-মেকাপ—সিংহাসনের দুই পার্শ্বে যে দুইটী প্রদীপ থাকে, তাহাতে তৈল দিয়া জ্বালাইয়া থাকেন।

ছত্রপনায়ক—প্রত্যেক ধূপের (ভোগের) পরে তাম্বূল প্রদান করেন।

দত্ত—প্রয়োজন-সময়ে শ্রীবিগ্রহের শ্রীমুখশূঙ্গার করেন।

পানিয়াপট—চন্দন-অর্গল ও ভোগের থালা ধুইবার জন্য আবশ্যক জল সরবরাহ ও ভোগের বাসন পরিষ্কার করেন।

ঘটুয়ারী—প্রত্যেক পূজায় চন্দন ঘসিয়া 'পত্রিবন্ধু'কে দিয়া থাকেন। কর্পূর, কস্তুরী, চন্দন, কেশর, চুয়া-প্রভৃতি পিষিয়া 'পালিয়া-মেকাপে'র নিকট দেন। যে পথে শ্রীভগবানের ভোগ লইয়া যাওয়া হয়, সেই পথে প্রদীপ জ্বালাইয়া দেন।

দর্পণিয়া-সেবক—শ্রীবিগ্রহগণকে দর্পণ প্রদর্শন করেন।

পুরাণপণ্ডা-সেবক—ইহারা পুরাণ পাঠ করেন।

ঝলাধরা-সেবক—ইহারা ভোগের সময় ঝকড়ঝজ, তালঝজ ও পত্রঝজ ধারণ করেন।

চামর-সেবক—ইহারা চামর-সেবা করেন।

আলট-সেবক—ইহারা আলটের (বীজন-বিশেষের) দ্বারা ব্যজন করেন।

খটিবিছা-সেবক—ইহারা খটি অর্থাৎ বিছানার চাদর বিছাইয়া থাকেন।

যোগাড়মাজা-সেবক—ইহারা সেবার বাসনাদি মাজিয়া থাকেন।

রত্নকার্য্য-বিছানী—ইহারা রত্নখচিত অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণ করেন।

বীণাকার—শ্রীগীতগোবিন্দ গান করেন এবং 'চন্দন-লীলা'র সময় বীণা বাদন করেন।

প্রহরাজ—শ্রীভগবানের শয়নের সময় বেদ পাঠ করেন।

খুরি-নায়ক—নির্দ্দিষ্ট সময়ে ব্যজন করেন।

জ্যোতিষরায়—প্রত্যহ পঞ্জিকা দেখিয়া গণনা করিয়া দৈনন্দিন অবকাশ ও ঘুমের সময় নির্দ্দেশ করিয়া দেন।

পানিয়া—রন্ধন-গৃহে যত জল দরকার হয়, তাহা সর-বরাহ করেন এবং ভরকারী আনয়ন করেন।

দিহড়িয়া—শ্রীজগন্নাথের বিজয়ের সময় আলোক জ্বালাইয়া থাকেন।

ছত্তার—শ্রীবিগ্রহের উপরে ছত্র ধারণ করেন।

তরাসিয়া—তরাস (শ্রীবিগ্রহের বিজয় বা যাত্রাকালে ব্যবহৃত সজ্জা-বিশেষ) ধারণ করেন।

কাহালিয়া—কাহালি (তুবিরজাতীয় বাদ্যবিশেষ) বাজাইয়া থাকেন।

পাইক—'সেজা'গণের মত সেবকগণকে যথাসময়ে কার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য আহ্বান করেন।

চূণাকুটা—পিষ্টক প্রস্তুত করিবার জন্য চাউল-ডালের চূর্ণ প্রস্তুত করেন।

মাহারী—শ্রীভগবানের শয়নের প্রাক্‌কালে নিদ্রাকর্ষক গীত গান করেন ; চন্দনযাত্রার সময় চাপের উপর (নৌকার চত্বরে) নৃত্যগীত করেন।

মহারাণা (শিল্পী), বিভিন্ন প্রকারের—ঘড়েই মহারাণা, পাখুরিয়া মহারাণা, কাষার মহারাণা, রূপকার মহারাণা, চিত্রকার মহারাণা, তাম্বরা মহারাণা, কাংসারি মহারাণা, অষ্টলোহী মহারাণা, করতি মহারাণা ও কাচড়া মহারাণা, সিপুটি মহারাণা (ইনি কাপড়ের বরাত দেন) ইত্যাদি।

ঘণ্টাবাজা-সেবক, বীরভাহাড়িসেবক, শেষরাত্রে শ্রী-ভগবানের নিদ্রালস-লীলা ভাঙ্গাইবার জন্য শঙ্খবাদ্যকার, ভোগের সময় শঙ্খবাদ্যকার, মাদলমৃদঙ্গ-সেবক, জোড়া-কাহালি-সেবক, উপাদিয়া-সেবক, চৌষট্টি-মহান্ত মধ্যে ২০ মাচোয়ালী, বীন-নায়ক (ইনি নর্ত্তকীগণকে গৃহ হইতে ডাকিয়া আনেন), গীত-গায়ক, যন্ত্রকার-সেবক, রবজি (এক-প্রকার বাদ্য)-সেবক, পাটারা-বিছানী, সুগন্ধ ঘটয়ারী, রান্নার ছত্রিশ-নিয়োগ, পিঠা-সুয়ার, বগড়া-পিঠা-সুয়ার, মহা-সুয়ার, ক্ষীরী-সুয়ার, তরকারী-সুয়ার, পানা-সুয়ার, পাচেড়ি-সুয়ার, তোড়াবেড় (মুখে কাপড় বান্ধিয়া ভোগ বহন করেন), পত্রিঘড়ু, ভিতরবঢ়া, ঘৃতপরিবেশনকারী সেবক, ব্রাহ্মণ সমর্থা (বাটাঘষা করেন), শূদ্রসমর্থা (আটা, বিরি, মুগ ভাঙ্গিয়া থাকেন, হলুদ, বেসর বাটেন), রান্নাঘরের যেকাপ, কাকতাড়ান-সেবক, ভূলাবতি-সেবক, রান্নাঘরের দ্বারে পাহারা দেওয়ার জন্য ব্রাহ্মণ ও শূদ্র পাইক, রান্নাঘর-ধোওয়া সেবক, ছাই ফেলিবার সেবক, 'বাহার-ভণ্ডার-যেকাপ' (পিতল, কলসী ও ঘটী ইত্যাদি ভাণ্ডারে রাখেন), পাহারা-ঘর-যেকাপ, দুয়ার-নায়ক, ছাতা-সেবক, সোয়াসিয়া-সেবক, সোয়াসরঘর-যেকাপ, যেণ্টবিছা রাউত, ভাণ্ডার পাহারা-দেওয়া সেবক, বারিশা পাহারা-দেওয়া সেবক, ভাণ্ডার-অপহরণ ও অপচয় না হয়—ইহার পর্য্যবেক্ষক ও আয়-ব্যয়-সঙ্কোচ-সেবক।

ভণ্ডার-যেকাপ যখন সেবাকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গৃহে গমন করেন, তখন তাঁহাকে কাপড়-চোপড় ঝাড়িয়া যাইতে হয়। যাত্রার সময় তিনি দয়িতাগণকে ঘর হইতে ডাকাইয়া আনেন। যদি চুরি হয়, তবে ক্ষতিপূরণ-বাবদ যেকাপ তিন ভাগ দেন, আর ভাণ্ডারী এক ভাগ দেন।

সিংদুয়ারে পরিহারি-বিয়োগু, আস্তান-পরিহারী, বৃন্দাবন-নায়ক, মণ্ডনী-খুঁটিয়া, রথদড়ি-নির্ম্মাণকারি-সেবক, চাপ-দড়াই সেবক, ভাট-সেবক, পঙ্কজলাভোটা-সেবক, ভোটামালী, ক্ষেত্রবৈদ্য, শাস্ত্র-বৈদ্য, ছত্রগৃহসেবক, গোষ্ঠ-সেবক, গোপাল-সেবক, কুম্ভকার-নিয়োগ-সেবক, নবন-বিবরী, সুপারি-বিবরী, পট্টহস্ত-মহান্ত, বাহ্যগৃহ সেবক,

তাড়নিয়া-মুদ্গলি-সেবক, বাস্তঘর-পাহারা-সেবক, মন্দির-পরিষ্কারকারী, কাচাপানিসেবক, তীর্থমাটিয়া-সেবক (কূপ হইতে মাটি কাটিয়া থাকে)-প্রভৃতি বহু সেবক আছেন।

দেবদাসী

রসিকশেখর অধিতীয় ভোক্তা শ্রীজগন্নাথদেবের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-বিধানের জন্য উৎকলরাজ চূড়ান্তদেব শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে নৃত্য-গীতাদির ব্যবস্থা করেন। ভাণ্ডীমালসাহি, মার্কণ্ডেশ্বর, নয়েন্দ্রপট্টনা ইত্যাদি পল্লীর কন্যাগণ দেবদাসীর কার্য্য করেন। পণ্ডিতজাতিগণের কন্যাগণ বা অসংযত ললনাগণ দেব-দাসীর কার্য্য করিতে পারে না। যেদিন শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে যে দেবদাসীর নৃত্য-গীত করিতে হইবে, সেইদিন তাঁহাকে উপবাস করিতে হইবে। নৃত্য-গীতাদির পর গৃহে ফিরিয়া মহাপ্রসাদ-সেবন ও ভগবদ্গুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে রাত্রি যাপন করিতে হইবে। শ্রীজগন্নাথই তাঁহাদের একমাত্র পতি, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে তাঁহারা চির-বিক্রীতা,—এই অনুভবের সহিত তাঁহারা কোন প্রাকৃত পুরুষকে পতিত্বে বরণ না করিয়া ভগবৎ-সুখানুসন্ধান-চিন্তায় রত থাকিবেন।

কেহ কেহ বলেন,—প্রাচীনকালে উৎকলের কোন ভক্ত নৃপতি শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীঅঙ্গ ধূলিধূসরিত দেখিয়া অনুসন্ধানকালে জানিতে পারেন যে, শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীজয়দেব কৃত শ্রীগীতগোবিন্দগীতি শ্রবণ করিবার জন্য একটি কুঞ্জবনে গমন করিয়াছিলেন। কোন একটি ভক্ত-ললনা শ্রীগীতগোবিন্দ-গীতি গান করিয়াছিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া সেই রাজা উক্ত ললনাকে শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে গান করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। ইহা হইতেই দেবদাসীর প্রথার সৃষ্টি হইল। পরবর্ত্তিকালে সম্ভ্রান্ত-বংশের ব্যক্তিগণ তাঁহাদের অবিবাহিতা কন্যাগণকে শ্রীভগবানের এই সেবা করিবার জন্য শ্রীভগবৎপাদপদ্মে অর্পণ করিতেন। প্রত্যহ শ্রীভগবানের প্রাতর্ভোজনের সময় এবং রাত্রিকালে শয়নের সময় একজন মাত্র দেবদাসী একটি বাদ্যের সহযোগে শ্রীগরুড়স্তম্ভের অগ্রে গান ও নৃত্য করেন।

চন্দনযাত্রার সময় বাহির-চন্দন ২১ দিন ও ভিতর-চন্দন ২১ দিন—এই ৪২ দিন প্রত্যহ মধ্যরাত্রে শ্রীবিগ্রহের শয়নের পূর্ব্বে রত্নবেদীর সমীপস্থ সমস্ত প্রদীপ নির্ব্বাপিত করা হয়। অন্ধকারের মধ্যে তিনজন সেবক শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া বীজন করেন। একজন দেবদাসী চন্দন-অর্গলের নিকট শ্রীগীতগোবিন্দ গান ও নৃত্য করেন।

দেবদাসী দুই প্রকার—বাহির-দেবদাসী ও ভিতর-দেবদাসী। ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণেতর কুলোৎপন্না বাহির-দেবদাসী হইতে পারেন। তাঁহারা কেবল শ্রীগরুড়স্তম্ভের সম্মুখে নৃত্য গীত করেন। ভিতর-দেবদাসীগণ শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে পালঙ্কের নিকট নৃত্য-গীত করেন। কেবল ব্রাহ্মণ-কুলোৎপন্না যুবতীগণই ভিতর-দেবদাসী হইতে পারেন। অতীত-যৌবন ললনাগণ ভিতর-দেবদাসী হইতে পারেন না; তাঁহারা বাহির-দেবদাসী হইতে পারেন। চন্দন-যাত্রায় শ্রীশ্রীমদনমোহনের নৌকাবিহারের সময় একজন বা দুইজন দেবদাসী নৌকার উপর নৃত্য-গীত করিয়া থাকেন।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Antiquities of Orissa (Vol. II. Page 165-167) গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে দৃষ্ট হয় যে, তিনি পণ্ডিত-ক্ষীরোদচন্দ্র রায়ের সাহায্যে শ্রীজগন্নাথ-দেবের শ্রীমন্দিরের জগমোহনের প্রবেশদ্বারের দুইপার্শ্বে খোদিত শিলালিপিগুলির পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন। রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর জয়-বিজয়-দ্বারের দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে যে বাদশটি লিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, তন্মধ্যে কপিলেশ্বরদেব, পুরুষোত্তমদেব, শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব ও মানগোবিন্দ-গোবিন্দদেব কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ লিপিসমূহের পরিচয় পাওয়া যায় (J. A. S. B.—1893, Page 88)। পূর্ব্বোক্ত লিপির মধ্যে কএকটি ইহার অন্তর্গত।

শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের চতুর্থ অঙ্কের ১৭ই জুলাই, ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে মহারাজের এইরূপ আদেশ আছে,—

"বড় ঠাকুর (বলরামদেবের) 'ভোগকালে' শ্রীগীত-গোবিন্দ গীত হইবে। সন্ধ্যাকালে ধূপদান হইতে "বড়-সিঙ্গার" পর্য্যন্ত এই গীতই চলিতে থাকিবে। ঠাকুরের শয়ন হইলে তৈলঙ্গী (তেলেগু) গায়কগণ কপিলেশ্বর-ঠাকুরের "খিল" গীতাদি গান করিবেন। তাঁহাদিগকেও শ্রীগীতগোবিন্দ গান শিক্ষা করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা অন্য গান করিবেন না বা অন্য নাটকাদির অভিনয় করিবেন না। যে উনপঞ্চাশজন বৈরাগী আছেন, তাঁহারাও কেবল শ্রীগীতগোবিন্দের সঙ্গীতাদি শুনিবেন।

তাঁহাদিগের নিকট অধিকিতেরা তাল-লয়-মানে শ্রীগীত-গোবিন্দ গান করিতে শিখিবে, অপর কিছুই শিখিতে পাইবে না। যে 'পঞ্চিছা' (মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারী) এই আদেশ পালন না করিয়া, অন্য 'গীতনাট্য' করাইবে, সে জগন্নাথ-দ্রোহী বলিয়া বিবেচিত হইবে।"

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'History of Orissa' (Vol. I, 1930) পুস্তকের ২২৭ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"Prataprudra is known from a number of inscriptions discovered at Puri and other places. The earliest of them are to be found on the left-hand side of the Jaya-Vijaya gate of the Jagamohana of the temple of Jagannatha. In the 4th Anka, Wednesday the 17th July, 1499, orders were issued for the performance of dancing at the time of Bhoga of Jagannatha and Balarama from the end of the evening dhupa to the time of the Barasingar or bed-time. The dancing girls of Balarama and of Kapilesvara, the old batch and the Telinga batch, all of them were to learn the singing of the Gitagovinda only. Besides dancing, four other Vaishnava singers were also to sing from the same work of Jayadeva. It is stated at the end of the record that the Superintendent who allows any other song except those in the Gitagovinda will cause a violation of the orders of God Jagannatha."

শ্রীজগন্নাথদেবের বেশ

পূজারী ও পুষ্পাদক সেবকগণ শ্রীজগন্নাথদেবের বেশ-ভূষা করেন। শ্রীশ্রীভগবানের বিভিন্ন লীলা অবলম্বন করিয়া সময়োচিত বেশ রচনা করা হয়। শ্রীজগন্নাথ-দেবের বিজয়বিগ্রহ শ্রীমদনমোহনদেবও শ্রীচন্দনযাত্রার সময় অনেক-প্রকার বেশ ধারণ করেন।

বিজয়াদশমীতে শ্রীজগন্নাথদেবের 'রাজবেশ' হয়। একাদশী হইতে পরবর্ত্তী দশমী পর্য্যন্ত একমাস-ব্যাপী 'শ্রীরাধা-দামোদর-বেশ' হয়। একাদশী দিবস 'ত্রিবাকিয়া-বেশ' হয়। ইহাতে স্বর্ণনির্ম্মিত কেয়াফুল শ্রীবিগ্রহত্রয়ের মস্তকে টিয়া (দস্তাবমান) করিয়া রাখা হয়। দ্বাদশীতে 'তালিকিয়া-বেশ' হয়। এই বেশে স্বর্ণনির্ম্মিত কেয়াফুল ও মধ্যে মধ্যে সোণ্ডি-নির্ম্মিত পাখা-দ্বারা শ্রীবিগ্রহের মস্তক সুশোভিত করা হয়। ত্রয়োদশীর দিন 'খাজচূড়া-বেশ' হয়। এই বেশে পুষ্পদ্বারা চূড়া তৈয়ারী করিয়া শ্রীমস্তকে বাঁকা করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়। চতুর্দ্দশীতে 'নৃসিংহবেশ' ও পূর্ণিমায় 'রাজবেশ' হয়।

অগ্রহায়ণ-মাসে শুক্লদ্বাদশী বা ওড়নষষ্ঠী হইতে শ্রীজগন্নাথ-দেবের শ্রীঅঙ্গে শীতবস্ত্র দেওয়া হয়; পৌষী পূর্ণিমাতে রাজ-বেশ হয়। এই মাসে সমস্ত ভোগের প্রথমে একটী ভোগ বেশী হয়: পৌষী পূর্ণিমা-তিথিতে অষ্টোত্তরশত তাম্রঘট-পরিপূর্ণ পঞ্চামৃতদ্বারা শ্রীবিগ্রহের অভিষেক হয়। মাঘ-মাসে বসন্তপঞ্চমীতে শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গ হইতে শীতবস্ত্র উন্মোচন করা হয়। এই দিবস রাত্রিকালে ষড়-ঋতুর সময় 'ষড়ঋতাবটে'র অর্থানুকূল্যে 'পদ্মবেশ'-নামক এক-প্রকার বেশ রচনা করা হয়। শ্রীবিগ্রহগণ সমস্ত রাত্রি এই বেশে ভূষিত থাকেন। অন্যান্য বেশ হইতে এই বেশের বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্যান্য বেশ শয়ন-সময় থাকে না, কিন্তু এই বেশ শয়নের সময়ও থাকে। শ্রীভগবান্‌কে উক্ত বেশে ভূষিত করিয়া মিষ্টান্ন ও অন্নপূপ ভোগ দেওয়া হয়।

মাঘী পূর্ণিমায় শ্রীবিগ্রহের 'গজোদ্ধারণ-বেশ' হয়। এই বেশে ১৯০০৲ টাকা খরচ হয়। এজন্য শ্রীল বাসুদেব রামানুজদাস স্বধাম-গমনকালে দুই লক্ষ টাকার ভূসম্পত্তি শ্রীজগন্নাথদেবের সেবায় লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাহাতে তিনজন ট্রাষ্টী নিযুক্ত আছেন। সেই জমির আয় হইতে এই গজোদ্ধারণ-বেশ, শ্রীমকালে জলছত্র ও দৈনিক ছত্রের ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়। এখানকার মহান্ত শ্রীযুত রামানুজদাসজী, রমেশচন্দ্র মিত্র (জজ্), রায়বাহাদুর লোকনাথ মিত্র—এই তিনজন বর্ত্তমানে ট্রাষ্টীরূপে নিযুক্ত আছেন। বসন্তপঞ্চমী হইতে দোলপূর্ণিমা পর্য্যন্ত শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গে কাণ্ড বা আবীর দেওয়া হয়। শিবরাত্রিতে শ্রীজগন্নাথদেবের বিজয়বিগ্রহ শ্রীলোকনাথ-মন্দিরে শুভ-বিজয় করেন। সেখানে হরিহরপূজা হয়। প্রত্যেক অমাবস্যাতে শ্রীমদনমোহন স্বীয় খড়্গালয় সমুদ্রে স্নান করিতে যান। দোলপূর্ণিমার পূর্ব্বে দশমী হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত 'কুণ্ডলবেশ' এবং দোলপূর্ণিমাতে 'রাজবেশ' হয়।

শ্রীরামনবমী হইতে বৈশাখী কৃষ্ণত্রিতীয়া পর্য্যন্ত বড়-দেউলে ও শ্রীজগন্নাথবল্লভে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম হইতে অভিষেক পর্য্যন্ত লীলার অভিনয় হয়। পূর্ব্বে শ্রীরামনবমীতে

শ্রীজগন্নাথদেবের 'যমরাজা-বেশ' হইত। তাহাতে আট হাজার টাকা খরচ হইত। প্রায় তিনশত বৎসর হইল, সেই পূজাটী আর হয় না।

স্নানযাত্রাদিবস স্নানের পর শ্রীজগন্নাথদেবের 'গণেশবেশ' হয়। অনবসরের শেষদিন 'নবযৌবনবেশ' এবং রথযাত্রা-সমাপ্তির পর গুণ্ডিচামন্দির হইতে বড়দেউলের সম্মুখে শ্রীবিগ্রহত্রয় উপনীত হইলে রথের উপর অবস্থানকালে তাঁহাদের 'রাজবেশ' হয়। জ্যৈষ্ঠী শুক্লা একাদশীতে 'রুক্মিণীহরণ-বেশ' ও শ্রাবণী অমাবস্যায় 'চিতালাগি-বেশ' ('চিতা'-শব্দে তিলক বা পুষ্পাদিরচিত টীকাজাতীয় অলঙ্কার) হয়। রথারোহণের পূর্ব্বে শ্রীমুখের চিতা খুলিয়া রাখা হয়। শ্রাবণী অমাবস্যায় তাহা পুনঃ শ্রীমুখে প্রদান করা হয়। শ্রাবণী শুক্লা পঞ্চমীতে 'বাহুরেখালাগি বেশ' হয়। স্নানযাত্রার সময় বর্ণপত্র খুলিয়া রাখা হয়; তাহা এই দিবস বর্ণে দেওয়া হয়।

জন্মাষ্টমীর পর দশমী হইতে দ্বাদশী পর্য্যন্ত 'ঘনভোজন-বেশ', 'কালিয়দমন-বেশ' ও 'প্রলম্ববধবেশ' হয়; তৎপর-দিবস 'বামন-বেশ' হয়।

বিভিন্ন উৎসব বা যাত্রা

শ্রীচন্দনযাত্রা

শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিয়াছিলেন,—"আমি জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমায় অবতীর্ণ হইয়াছি, সুতরাং ঐ দিবস আমার পবিত্র জন্মদিন। সেইদিন আমার মহা-স্নান ও পূজাদি করিয়া পঞ্চদশ-দিবস পর্য্যন্ত আমার শ্রীমন্দির বন্ধ থাকিবে। পুনরায় আষাঢ়ী শুক্লা একাদশীতিথিতে আমার শয়ন, শ্রাবণী পূর্ণিমাতে ঝারোৎসব, ভাদ্র শুক্লা একাদশীতে আমার পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন, কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশীতে আমার উত্থান, অগ্রহায়ণী শুক্লা ষষ্ঠীতে পূজাব, পৌষ-পূর্ণিমাতে পুষ্যাভিষেক, উত্তরায়ণ-মকর-সংক্রান্তিতে মাঘোৎসব, ফাল্গুনী পূর্ণিমা-তিথিতে হিন্দোলোৎসব, চৈত্রী শুক্লা চতুর্দ্দশীতে দমনকার্পণ ও বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়ায় চন্দনযাত্রা-মহামহোৎসবের যথারীতি অনুষ্ঠান করিবে।

বৈশাখস্য সিতে পক্ষে তৃতীয়াক্ষয়সংজ্ঞিতা।
তত্র মাং লেপয়েদ্গন্ধলেপনৈরতিশোভনম্॥

(স্কন্দপুঃ উৎকলখণ্ড, ২৯শ অঃ)

অর্থাৎ বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষে অক্ষয়তৃতীয়া নাম্নী তিথিতে সুগন্ধি চন্দনদ্বারা আমার অঙ্গ লেপন করিবে।"

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে,—

"অনুলেপনমুখ্যস্তু চন্দনং পরিকীর্ত্তিতম্।"

অর্থাৎ অনুলেপন-দ্রব্যগণের মধ্যে চন্দনই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।

শ্রীনারদপুরাণে লিখিত আছে,—

"যথা বিষ্ণোঃ সদাশ্রীষ্টং নৈবেদ্যং শালিসম্ভবম্।
শুকেনোক্তং পুরাণে চ তথা তুলসীচন্দনম্॥"

পুরাণসমূহে ও শ্রীশুকদেব-কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যে, যেরূপ শালিধান্যোৎপন্ন অন্ন শ্রীহরির প্রীতিকর, তুলসী-চন্দনও সেইরূপ প্রীতিকর।

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে,—

"দেবং মলয়জাভাবে শীতলত্বাৎ কদম্বজম্।
যথাকিঞ্চিৎসুগন্ধিত্বাচ্চন্দনং দেবদারুজম্॥"

গারুড়ে,—"হরের্মলয়জং শ্রেষ্ঠমভাবে দেবদারুজম্॥"

মলয়জ-চন্দনের অভাব হইলে কদম্ব-কাষ্ঠোদ্ভব চন্দনও দেওয়া যাইতে পারে। কেননা, ঐ চন্দনও শীতল। কিঞ্চিৎ সুগন্ধ থাকা-হেতু দেবদারুর চন্দনকেও চন্দন বলা যাইতে পারে। বিষ্ণুসেবায় মলয়জ-চন্দনই শ্রেষ্ঠ; তদভাবে দেব-দারুচন্দন গ্রাহ্য।

শ্রীপুরুষোত্তমদেব তৎসেবক বৈষ্ণবরাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন-দেবকে বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষের অক্ষয়তৃতীয়া নাম্নী তিথিতে নিজ-শ্রীঅঙ্গে সুগন্ধি-চন্দন-লেপনের আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন; সেই অদ্যও তদনুসারে অক্ষয়-তৃতীয়া হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা অষ্টমী তিথি পর্য্যন্ত প্রত্যহ শ্রীজগন্নাথদেবের বিজয়বিগ্রহ-স্বরূপ শ্রীমদনমোহনদেবকে শ্রীমন্দির হইতে বিমানে আরোহণ করাইয়া শ্রীনরেন্দ্র-সরোবরকূলে আনয়ন করা হয়। শ্রীমদনমোহনদেব স্বীয় মন্ত্রী শ্রীলোকনাথ-মহাদেবাদির সহিত সরোবরে নৌকাবিলাস করেন। শ্রীমদনমোহনের শ্রীচন্দনযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া শ্রীনরেন্দ্রসরোবরকে 'চন্দনপুকুর'ও বলা হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

"এই মতে বৈকুণ্ঠ সহ নীলাচলে আইলা।
দৈবে জগন্নাথের সেদিন জল-লীলা॥
নরেন্দ্রের জলে 'গোবিন্দ' নৌকাতে চড়িয়া।
জলক্রীড়া করে' সব ভক্তগণ লঞা॥
সেইকালে মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নরেন্দ্রে আইলা দেখিতে জলকেলি রঙ্গে॥
• • •
গৌড়ীয়-সম্প্রদায় সব করেন কীর্ত্তন।
প্রভুর মিলনে উঠে প্রেমের ক্রন্দন॥
জলক্রীড়া, বাদ্য, গীত, নর্ত্তন, কীর্ত্তন।
মহাকোলাহল তীরে, সলিলে যেমন॥
গৌড়ীয়া-সঙ্কীর্ত্তনে আর যেন মিলিয়া।
মহা-কোলাহল-শব্দ হৈল ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া॥
সব ভক্ত লঞা প্রভু নামিলেন জলে।
সবা লঞা জলক্রীড়া করেন কুতূহলে॥"

(চৈ চ অ ১০।৪১-৪৩, ৪৬-৪৯)

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা-লীলা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

"মহাপ্রভু আইলেন নরেন্দ্রের কূলে॥
হেনকালে রামকৃষ্ণ শ্রীযাত্রা গোবিন্দ।
জলকেলি করিবারে আইলা নরেন্দ্র॥
হরিধ্বনি-কোলাহল, মৃদঙ্গ, কাহাল।
শঙ্খ, ভেরী, জয়ঢাক বাজয়ে বিশাল॥
সহস্র সহস্র ছত্র, পতাকা, চামর।
চতুর্দ্দিকে শোভা করে' পরম সুন্দর।
মহা-জয়-জয়-শব্দ, মহা-হরিধ্বনি।
ইহা বই আর কোন শব্দ নাহি শুনি॥
রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ মহা-কুতূহলে।
উত্তরিলা আসি' সবে নরেন্দ্রের কূলে॥
জগন্নাথ-গোষ্ঠী শ্রীচৈতন্য-গোষ্ঠী-সনে।
মিলাইলা তাঁরাও চৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তনে॥
দুই গোষ্ঠী এক হই' কি হইল আনন্দ।
কি বৈকুণ্ঠ-সুখ আসি' হৈল মূর্ত্তিমন্ত॥
চতুর্দ্দিকে লোকের আনন্দ অন্ত নাই।
সব করেন, করায়েন চৈতন্য-গোসাঞি॥
রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ উঠিলা নৌকায়।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ চামর ঢুলায়॥
রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ নৌকায় বিজয়।
দেখিয়া সন্তোষ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয়।
প্রভুও সকল ভক্ত লই কুতূহলে।
ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন নরেন্দ্রের জলে॥"

(চৈ ভা অ ৮।১০১-১১২)

ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন শ্রীচন্দনযাত্রার দিনে মহাপ্রভু ও ভক্তগণের নরেন্দ্রজলবিহার-লীলা এইভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"শুন ভাই, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-অবতার।
যেরূপে নরেন্দ্রজলে করিলা বিহার॥
পূর্ব্বে যমুনায় যেন শিশুগণ মেলি'।
মণ্ডলী হইয়া করিলেন জলকেলি॥
সেইরূপ সকল বৈষ্ণবগণ মেলি'।
পরস্পর করে ধরি' হইলা মণ্ডলী॥
• • •
শ্রীগোবিন্দ-রামকৃষ্ণ-বিজয় নৌকায়।
লক্ষ লক্ষ লোক জলে হরিষে বেড়ায়॥
সেই জলে বিষয়ী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী।
সবেই আনন্দে ভাসে জলক্রীড়া করি'॥
হেন সে চৈতন্যমায়া সে-স্থানে আসিতে।
কারো শক্তি নাহি, কেহ না পায় দেখিতে॥
• • •
যে প্রসাদ পাইলেন জাহ্নবী যমুনা।
নরেন্দ্রজলেরও হইল সেই ভাগ্য-সীমা॥
এসকল লীলা জীব-উদ্ধার-কারণে।
কর্ণবন্ধ ছিণ্ডে ইহা শ্রবণে পঠনে॥"

(চৈ ভা অ ৮।১১৩-১১৫, ১২৭-২৯, ১৪০-৪১)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচন্দনযাত্রা-দিবসে শ্রীচন্দন-পুষ্করিণীতে জলকেলি করিয়া শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিবার জন্য সকল ভক্তের সহিত উপস্থিত হইলেন,—

"তবে প্রভু জলক্রীড়া সম্পন্ন করিয়া।
জগন্নাথ দেখিতে চলিলা সবা' লঞা॥
জগন্নাথ দেখি' প্রভু সর্ব্বভক্তগণ।
লাগিলা করিতে সবে আনন্দে রোদন॥
• • •
জগন্নাথ দেখি', জগন্নাথ নমস্করি'।
বাসায় চলিলা গৌরসঙ্গে গৌরহরি॥

যে ভক্তের যেন-রূপ চিত্তের বাসনা।
সেইরূপ সিদ্ধ করে' সবার কামনা॥
পুত্রপ্রায় করি' সবে রাখিলেন কাছে।
নিরবধি ভক্ত-সব থাকে প্রভু-পাছে॥
যতেক বৈষ্ণব—গৌড়দেশে নীলাচলে।
একত্র থাকেন সবে কৃষ্ণ-কুতূহলে॥"

(চৈ ভা অ ৮।১৪২-৪৩, ১৬৩-৬৬)

অক্ষয়-তৃতীয়া হইতে প্রত্যহ অপরাহ্ণে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রতিনিধি শ্রীমদনমোহন শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীসরস্বতীদেবীর * সহিত বিমানারোহণে শ্রীনরেন্দ্রসরোবরতীরে গমন করেন। কিংবদন্তী এই যে, তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গাধিপ প্রতাপাদিত্য উৎকলজয়ার্থ যাত্রা করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের প্রতিনিধি শ্রীগোবিন্দদেবকে শ্রীপুরুষোত্তম হইতে টাকোর সন্নিকটে রাঘপুরে স্থাপন করেন। তদবধি শ্রীচন্দনযাত্রায় শ্রীনরেন্দ্রসরোবরে শ্রীগোবিন্দদেবের পরিবর্ত্তে শ্রীমদন-মোহনের বিজয় হইয়া থাকে; আর একটি বিমানে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ, অপর একটিতে শ্রীলোকনাথ, শ্রীবটেশ্বর, শ্রীকপালমোচন, শ্রীমার্কণ্ডেয়েশ্বর ও শ্রীনীলকণ্ঠেশ্বর—এই পঞ্চমহাদেবের বিজয়মূর্ত্তি বিজয় করেন। একবিংশ-দিবস-ব্যাপী এই যাত্রা অনুষ্ঠিত হয় এবং শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির হইতে শ্রীনরেন্দ্রসরোবর পর্য্যন্ত রাজপথের স্থানে স্থানে পত্রপুষ্পফলাদি-শোভিত ছায়ামণ্ডপ নির্ম্মিত হয়। শ্রীমদনমোহন বিমানারোহণে শ্রীনরেন্দ্রসরোবরে গমনকালে সেই সকল ছায়ামণ্ডপে উপনীত হইয়া বিশ্রাম, পঙ্‌ক্তি-ভোগগ্রহণ ও নৃত্যগীতাদি দর্শন ও শ্রবণ করেন। এইরূপে ভোগ গ্রহণ করিতে করিতে শ্রীনরেন্দ্রসরোবর-সমীপে উপনীত হন। শ্রীনরেন্দ্রের বক্ষে একটি সুসজ্জিত নৌকায় শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-সরস্বতীর সহিত শ্রীমদনমোহন এবং আর একটি পৃথক্ নৌকায় মন্ত্রী পঞ্চ-মহাদেবের সহিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আরোহণ করেন। প্রথমটীতে দেবদাসীগণের নৃত্য ও দ্বিতীয়টীতে 'নাটুয়া পিলা'র (নৃত্যকারী বালকের) নৃত্য হয়।

সরোবরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে যে তিনটী মন্দির আছে, তাহার মধ্যে বৃহত্তমটীর মধ্যভাগে একটি কূপ আছে। সেই কূপোদকে শ্রীমদনমোহন, শ্রীলক্ষ্মীদেবী ও শ্রীসরস্বতীকে স্নান করান হয়। দ্বিতীয় মন্দিরে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ ও তৃতীয়টীতে পঞ্চ-মহাদেব বিরাজ করেন। এখানে তাঁহাদের পূজা ও ভোগ হয়। সরোবরের উত্তর-তট ও উক্ত মন্দির-সমূহ দীপমালায় বিভূষিত করা হয়। উৎসব সম্পন্ন হইলে পূর্ব্ববৎ তিনটী বিমানে আরোহণ করিয়া শ্রীমূর্ত্তিগণ শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। গন্তব্যস্থানে উপনীত হইতে প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহর হয়। একবিংশদিবসই এই প্রকার গমনাগমন হইয়া থাকে। এই চন্দনযাত্রার নামান্তর 'গন্ধলেপন-যাত্রা'।

স্নানযাত্রা

জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-জগন্নাথের স্নান-যাত্রা-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলভদ্র ও শ্রীসুভদ্রাদেবী স্নানবেদীতে 'পহাণ্ডি'-বিজয় করেন। রত্নবেদীতে সুদর্শনের সহিত শ্রীবিগ্রহত্রয়ের অষ্টোত্তরশত সুবর্ণকুম্ভপূর্ণ সুশীতল-সলিলে মহাস্নান হইয়া থাকে। স্নানানন্তর শ্রীভগবান্ রত্নবেদীতে গণেশরূপ ধারণ করেন। সমুদয় ব্রহ্মর্ষি ও সমুদয় দেবতা জগন্নাথকে মহাস্নান করাইবার জন্য পারিজাত সুবাসিত সুরতরঙ্গিণীর পূত সলিল শিরে বহন করিয়া ব্রহ্মার সহিত শ্রীপুরুষোত্তমে আগমন করেন এবং ব্রহ্মার আনুগত্যে মকর শ্রীভগবান্‌কে স্নান করান এবং 'জয়'-শব্দপূর্ণ বিচিত্র স্তুতিবাদ-দ্বারা বন্দনা করেন।

দেবতাগণ যাহাতে স্বচ্ছন্দে বিরাজমান হইয়া ভগবানের স্নানযাত্রা দর্শন করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে স্নানযাত্রা-কালে মহাভাগবত মহারাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন স্নানবেদীর পার্শ্বি-পার্শ্বিক স্থানসমূহ চন্দ্রাতপশোভিত ও মহামরকতমণি-খচিত সুবিস্তৃত আবরণবস্ত্র-দ্বারা আচ্ছাদিত করিতেন। ঐ স্নান-বেদী কালক্রমে জীর্ণ হইলে মহারাজ শ্রীঅনঙ্গভীমদেব বর্ত্তমান স্নানবেদী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

শ্রীস্নানযাত্রাদিবস শ্রীজগন্নাথের স্নানমঞ্চ নানাবিধ মণি, মুক্তা, মালা, চামর, পতাকা ও তোরণাদি-দ্বারা বিভূষিত, চন্দন-সংমিশ্র সুগন্ধ ও সুশীতল পবিত্র জল-দ্বারা সংসিক্ত এবং সুগন্ধি ধূপ-গন্ধ-দ্বারা সুরভিত করা হয়। তৎপরে জগন্নাথের সেবকগণ দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী কূপ হইতে স্বর্ণকুম্ভে জল উত্তোলন-পূর্ব্বক সেই জল সুগন্ধদ্রব্যে সুবাসিত

---

* কেহ কেহ এই শ্রীসরস্বতীদেবীকে 'শ্রীসত্যভামা' বলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের স্বরূপশক্তি শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীসরস্বতী যে প্রাকৃত ধনাধিষ্ঠাত্রী বা প্রাকৃত বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী নহেন, ইহা বলাই বাহুল্য।

করিয়া 'পাবমানী'-মন্ত্র জপ করিতে করিতে সুবর্ণকলসসমূহ পরিপূর্ণ করেন এবং শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে মন্দিরাভ্যন্তরে ভগবানের অধিবাস করিয়া থাকেন। অনন্তর হোলিদান-পূর্ব্বক শ্রীজগদীশকে শ্রীবলরাম, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীসুদর্শনের সহিত স্নানমঞ্চে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হন।

রাজার নিকট সম্মান ও সমাদরপ্রাপ্ত সেবকগণ চামর ও তালবৃন্তের দ্বারা ভগবানের 'পহাণ্ডি'কালে বীজন করিতে থাকেন। শ্রীজগদীশকে স্নানমঞ্চে লইয়া যাইবার কালে অনবসরত'-প্রযুক্ত পাছে কোনদোষ ঘটে—এই আশঙ্কায় সেবকগণ সুন্দর পট্টবস্ত্রাদি-দ্বারা শ্রীপতির সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন-পূর্ব্বক তাঁহাকে দূরবর্ত্তী স্নানমঞ্চে লইয়া যান। তৎকালে অখিল-জগৎ-পূজনীয় শ্রীজগদীশকে দূর গমন নিমিত্ত উত্তানাস্ত করিয়া লইয়া যাইতে হয় বলিয়া স্বর্গস্থ দেবগণ মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া থাকেন,—"শ্রীজগদীশ বোধ হয় রথ স্বর্গধামে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন'। ইহা বিবেচনা করিয়া দেবতাগণ শ্রীপতির দিকে দৃষ্টি স্থাপন, পূর্ব্বক "হে রাম! হে কৃষ্ণ! আপনাদিগের জয় হউক, জয় হউক," বলিতে থাকেন। এইরূপ লীলাসহকারে ভগবানের জন্ম জ্যৈষ্ঠীতে রত্নবেদীতে বিজয়-অভিষেক হইয়া থাকে।

ভগবান্ শ্রীজগদীশ বলিয়াছেন যে, স্বায়ম্ভুব মনুর সত্যাদি চতুর্যুগাদ্যিত দ্বিতীয়াংশে এবং সত্যযুগের ভগবদ্দর্শনপ্রদ এই প্রথমাংশে স্বায়ম্ভুবমনুর যজ্ঞপ্রভাবেই তাঁহার আবির্ভাব। তিনি জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমাতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইজন্য ঐ-দিবসই শ্রীজগদীশের পুণ্য জন্মদিবস। তাঁহারই আজ্ঞাবশে ঐ-দিবস জগদীশকে অধিবাস-পুরঃসর মহাস্নান-বিধানানুসারে মহাসমারোহে রত্নবেদীর উপর তাঁহার স্নানসেবা অনুষ্ঠিত হয়।

মহাভাগবত ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ এই বিধানে শ্রীজগদীশ-জন্মতিথি জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় স্নানযাত্রা-মহোৎসব করিতেন। শ্রীজগদীশ মহারাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিয়াছিলেন,—"সিন্ধুকূলে যে অক্ষয়বট আছে, তাহার উত্তরে সর্ব্বতীর্থময় এক কূপ বিরাজিত আছে। কিন্তু উহা এক্ষণে বালুকারাশিদ্বারা আবৃত হইয়া গিয়াছে। স্নানার্থ পূর্ব্বে উহা নির্ম্মাণ করাইয়া পরে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি। অতএব সেই কূপ আবিষ্কার করা প্রয়োজন। রক্ষক ক্ষেত্রপাল ও দিক্‌পালগণের উদ্দেশে যথাবিধানে বলি প্রদানপূর্ব্বক শঙ্খ, কাহাল, মুরজাদি বাদ্য-যন্ত্র বাদিত করিয়া চতুর্দ্দিকে ঐ কূপের সংস্কার করিতে হইবে। দ্বিজগণ স্বর্ণকুম্ভদ্বারা সেই সর্ব্বতীর্থময় কূপ হইতে পূতজল উত্তোলন করিবেন এবং সেই জল-দ্বারা জ্যৈষ্ঠী-পূর্ণিমার প্রাতঃকালে ব্রহ্মার সহিত শ্রীজগদীশ, শ্রীবলভদ্র ও শ্রীসুভদ্রার স্নানসেবা করিতে হইবে।" মহাভাগবত ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি সাক্ষাৎ ভগবানের এই আদেশানুসারে আজও শ্রীপুরুষোত্তমে এইভাবে স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

মহাভাগবত মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি শ্রীজগদীশের আদেশ ছিল যে, এই মহাস্নান করাইয়া পঞ্চদশ-দিবস শ্রীভগবান্‌কে অঙ্গরাগ-বিহীন বিরূপাবস্থায় কেহ কদাচ দর্শন করিবে না,—

ততঃ পঞ্চদশাহানি ন্যাপয়িত্বা তু মাং নৃপ।
অচিত্রং বা বিরূপং বা ন পশ্যেত কদাচন॥

শ্রীজগদীশের আজ্ঞানুসারে এই পঞ্চদশ দিবসকাল শ্রীমন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকে। এই সময় শ্রীভগবানের দর্শন হয় না বলিয়া ইহাকে 'অনবসরকাল' বলা হয়। এই অনবসর-কালে বিপ্রলম্ভাশ্রিত গৌড়ীয়-ভক্তগণ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের লীলানুস্মরণে শ্রীআলালনাথ-দর্শনার্থ গমন করেন।

স্নানযাত্রার সময় শ্রীলক্ষ্মীদেবী চাহনী-মণ্ডপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া স্নানোৎসব দর্শন করেন এবং শ্রীজগন্মোহনের পার্শ্বস্থ 'বিরোধন'-গৃহে তিনি একপক্ষকাল অবস্থান করেন। এই একএকদিবস শ্রীমন্দিরের ভোগ-রন্ধনকার্য্য স্থগিত থাকে।

স্নানযাত্রার সময় স্নান করিয়া শ্রীজগন্নাথদেব নরলীলা-মাধুর্য্য বিস্তার করিবার জন্য জ্বরলীলা প্রকাশ করেন। দয়িতাপাণ্ডাগণ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের জ্বর হইয়াছে বলিয়া পাচন (মিষ্টরসের পানা-বিশেষ) ভোগ প্রদান করেন এবং অনবসরকালে প্রত্যহ মিষ্টান্ন ভোগ দেন। শ্রীজগন্নাথ-দেবের স্নানমঞ্চ বহিঃপ্রাঙ্গণমধ্যে এত উচ্চে স্থাপিত যে, বড়দাণ্ড (পুরীর প্রশস্ত রাজপথ) হইতেও যাত্রিগণ শ্রীজগন্নাথ-দেবের স্নানযাত্রা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন।

অবসরোচিত ও অবকাশসেবা

স্নানযাত্রার পরে প্রতিবৎসর শ্রীশ্রীজগন্নাথ-শ্রীবলভদ্র-শ্রীসুভদ্রাদেবীর শ্রীঅঙ্গরাগ-সেবা হয়। অঙ্গরাগের সময় একপক্ষকাল শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন হয় না। তৎপরে শ্রীজগন্নাথদেব যখন নবমূর্ত্তিতে প্রকটিত ও নানাবেশ-ভূষায়

সজ্জিত হইয়া দর্শন দান করেন, তখন সেই উৎসবকে 'নেত্রোৎসব' বা 'নবযৌবনোৎসব' বলা হয়।

সাধারণতঃ প্রতি দ্বাদশবৎসরান্তে শ্রীবিগ্রহগণ নবকলেবরে প্রকটিত হন। কিন্তু এই নবকলেবর-উৎসব সকল সময়ে এই নিয়মে সম্পন্ন হয় না। আষাঢ়-মাসে যদি দুইটী পূর্ণিমা বা পুরুষোত্তমমাসের (স্মার্তগণের কথিত মলমাসের) সঞ্চার হয়, তাহা হইলে নবকলেবর হইয়া থাকে। শ্রীজগন্নাথের নূতন কলেবর 'শ্রীনীলাদ্রি-মহোদয়ে'র বিধানানুসারে সম্পন্ন হয়। ভীবিশ্বাপতির বংশধর পতি-মহাপাত্র শ্রীমূর্ত্তি হইতে 'ব্রহ্মমণি' গ্রহণ করিয়া নবকলেবরে অধিষ্ঠাপিত করেন এবং পূর্ব্বকলেবরকে 'মাধবনাট্যা'র মধ্যে স্থাপন করা হয়। 'ব্রহ্মমণি' নবকলেবরে স্থাপন করিবার সময় এখান পাণ্ডার চক্ষু আবৃত করিয়া দেওয়া হয়। এই ব্যাপার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দর্শন করিলে অমঙ্গল ও মৃত্যু অনিবার্য্য। কথিত হয়, বর্ত্তমানের কোন ভূম্যধিকারী নবকলেবর কিরূপে সম্পন্ন হয়, তাহা চর্ম্মচক্ষে দর্শন করিয়া কৌতূহল পরিতৃপ্তি করিবার ইচ্ছায় প্রধান পাণ্ডাকে অনেক অর্থ প্রদান করিয়া স্বয়ং আনয়ন করিয়াছিলেন। ইহাতে উক্ত ভূম্যধিকারী তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। 'মাদলা-পাঞ্জী'তে লিখিত আছে—কোন কোন পুরীরাজের রাজত্বকালে দুই-তিনবার পর্য্যন্ত নবকলেবরোৎসব সম্পন্ন হয়। এই সময়ে তীর্থযাত্রীর সংখ্যা খুব বেশী হয়। নব-কলেবরোৎসবের যে লিপিবদ্ধ ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতে জানা যায়, ১৮৩০, ১৮৬৯ ও ১৯১২ খৃষ্টাব্দে নবকলেবর-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অক্ষয়-তৃতীয়া-তিথিতে অর্থাৎ শ্রীচন্দনযাত্রাদিবসে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আজ্ঞা লইয়া দণ্ডকারণ্যে অথবা প্রাচী-তীরে অত্যন্ত সংযত ও উপবাসী থাকিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে শঙ্খচক্রাদি চিহ্নিত তিনটি নিম্বতরু নির্ব্বাচন এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানপূর্ব্বক তাহা-দিগকে ছেদন ও সেই দারু বস্ত্রাবৃত করিয়া শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে আনয়ন করিতে হয়; অবশিষ্ট শাখাপ্রশাখা মৃত্তিকা-মধ্যে প্রোথিত করা হয়।

গুণ্ডিচামার্জ্জন

শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির হইতে পূর্ব্বোত্তরে প্রায় একক্রোশ ব্যবধানে গুণ্ডিচামন্দির অবস্থিত। জনশ্রুতি, শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের মহিষীর নামানুসারে ঐ মন্দিরের নাম 'গুণ্ডিচামন্দির' হইয়াছে। গুণ্ডিচামন্দিরের কিয়দ্দূরেই 'ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর'-নামে একটী প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা বিরাজমানা। শ্রীরথযাত্রা-দিবস শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রা-দেবী শ্রীমন্দির হইতে রথে আরোহণ করিয়া গুণ্ডিচামন্দিরে গমন করেন।

শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিতত্ব শ্রীগৌরহরির স্বরূপতত্ত্বভাব এই যে, শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন গোকুলবাসিনীগণকে ত্যাগ করিয়া গৌরলীলায় মত্ত হইয়াছিলেন। পরে কুরুক্ষেত্রে উভয়ের মিলন হইলে ব্রজবাসিনীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ঐশ্বর্য্যময় স্থান শ্রীকুরুক্ষেত্র হইতে শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব মাধুর্য্যলীলা-ধাম শ্রীবৃন্দাবনে লইয়া যাইতে ব্যাকুলা হন। এদিকে শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপ শ্রীজগন্নাথদেবকে শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর ঐশ্বর্য্যলীলাভূমি শ্রীক্ষেত্র নীলাচল হইতে মাধুর্য্যলীলাভূমি সুন্দরাচল বা গুণ্ডিচার দিকে রথে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যান।

শ্রীনীলাচলে শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিয়া বিপ্রলম্ভমূর্ত্তি শ্রীরাধাভাববিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দর রথাগ্রে নর্ত্তন করিতে করিতে এইরূপ মিলন-গীতি গাহিয়াছিলেন,—

সেই ত' পরাণনাথ পাইনু।
যাঁহা লাগি' মদন-দহনে ঝুরি' গেনু॥
(চৈ চ ম ১৩।১১৩)

শ্রীক্ষেত্ররূপ শ্রীকুরুক্ষেত্র ও শ্রীসুন্দরাচলরূপ শ্রীবৃন্দাবনের বৈশিষ্ট্যসম্বন্ধে আরও গাহিয়াছিলেন,—

ইহা লোকারণ্য, হাতী, ঘোড়া, রথধ্বনি'।
তাঁহা পুষ্পারণ্য, ভৃঙ্গ-পিকনাদ শুনি॥
এই রাজবেশ, সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ।
তাঁহা গোপবেশ, সঙ্গে মুরলী-বাদন॥
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ আস্বাদন।
সেই সুখসমুদ্রের ইহা নাহি এক কণ॥
* * *
অন্যের হৃদয়—মন, মোর মন—বৃন্দাবন,
'মনে' 'বনে' এক করি' জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥
(চৈ চ ম ১৩।১২৮-৩০, ১৩১)

শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচামন্দিরে বিজয়ের পূর্ব্বে শ্রীমন্দির, জগমোহন, সিংহাসন, রত্নবেদী - সমস্তই মার্জ্জন-ঘর্ষণ-দ্বারা

পরিষ্কার করা হয়। ভক্তলীলাঙ্গীকারকারী লোকশিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর জীবজগৎকে সেবা শিক্ষা দিবার জন্য প্রতি-বৎসর সপার্ষদে গুণ্ডিচামন্দির-মার্জনলীলা প্রকট করিতেন।

শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমাত্মভূত্যৈঃ সংমার্জয়ন্ স্বানয়তঃ স গৌরঃ।
স্বচিত্তবজ্জীতলমুজ্জ্বলঞ্চ কৃত্বোপবেশোপযিকং চকার॥

(চৈ চ ম ১২।১)

শ্রীগৌরসুন্দর আত্মীয় ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীগুণ্ডিচামন্দির সম্মার্জন-পূর্ব্বক স্বীয় শীতল ও উজ্জ্বল চিত্তের ন্যায় পরিষ্কার করিয়া তাহা শ্রীকৃষ্ণের উপবেশনযোগ্য করিয়াছিলেন।

শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার দিন নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রথমেই শ্রীকাশীমিশ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও পড়িছাপাত্রকেও ডাকাইলেন। বৈষ্ণবের আদেশ ও অনুজ্ঞা ব্যতীত ভগবৎসেবার অধিকার নাই, ইহা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীসার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যাদির নিকট হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু—

"গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন"-সেবা মাগি' নিল॥

(চৈ চ ম ১২।৭৩)।

পড়িছা শ্রীগৌরসুন্দরের সম্মুখে একশত সম্মার্জ্জনী ও একশত ঘট আনিয়া রাখিলেন। পরদিন প্রভাতে শ্রীমন্মহা-প্রভু শ্রীহস্তে ভক্তগণের অঙ্গে চন্দন লেপন করিয়া দিলেন এবং প্রত্যেকের হস্তে একটি করিয়া মার্জ্জনী প্রদান করিলেন। এইরূপে ভক্তগণ-সহ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরে উপনীত হইলেন। প্রথমে শ্রীগৌরসুন্দর নিজহস্তে সম্মার্জ্জনী লইয়া শ্রীমন্দিরের বহির্ভ্যন্তর মার্জ্জন করিয়া পরিষ্কার করিলেন। সিংহাসন মার্জ্জন-পূর্ব্বক পুনরায় উহাকে যথাস্থানে সংস্থাপন করিলেন, ক্ষুদ্র-বৃহৎ মন্দির-সকল ধৌত করিয়া পরিষ্কার করিলেন, পরে শ্রীজগমোহন পরিষ্কার করিলেন।

"চারিদিকে শত ভক্ত সংমার্জ্জনী-করে।
আপনি গোবেন প্রভু, শিখা'ন সবারে।
প্রেমোল্লাসে গোবেন, লয়েন কৃষ্ণনাম।
ভক্তগণ 'কৃষ্ণ' কহে, করে' নিজকাম॥

(চৈ চ ম ১২।৮৪-৮৫)

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমকান্তি উজ্জ্বল তনুখানি ধূলায় ধূসর, কিন্তু তাহাতে যেন আরও অধিক শোভা ফুটিয়া উঠিয়াছে; ভক্তগণেরও সেইরূপ অবস্থা। কখনও কখনও প্রেমাশ্রুদ্বারা মন্দির সংমার্জ্জন করিতেছেন—কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! এইরূপে ঘোল-মন্দির ও তৎপরে সমস্ত প্রাঙ্গণাদিও ঘসিয়া মাজিয়া পরিষ্কার করিলেন। অতঃপর শ্রীগৌরসুন্দর,—

তৃণ, ধূলি, কাঁকুর সব একত্র করিয়া।
বহির্ব্বাসে লঞা ফেলায় বাহির করিয়া॥

(চৈ চ ম ১২।৮৮)

ভক্তগণও জগদ্গুরুর আচরণ অনুবর্ত্তন করিলেন।

"প্রভু কহে,—কে কত করিয়াছ সংমার্জ্জন।
তৃণ, ধূলি দেখিলে জানিব পরিশ্রম॥"

(চৈ চ ম ১২।৯০)

সকলের ঝাঁটান আবর্জ্জনা একত্র করা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাগই অধিক হইল।

জগদ্গুরুলীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরহরি এই লীলাটীর দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন যে, শ্রীগুরুকে যদি কোন সৌভাগ্য-বান্ জীব স্বীয় হৃদয়-সিংহাসনে বসাইতে ইচ্ছা করেন, তবে সর্ব্বাগ্রে হৃদয়টীকে নির্ম্মল, শান্ত, স্বচ্ছ ও ভক্ত্যনুকূল করা আবশ্যক। হৃদয়ক্ষেত্রে কণ্টকপূর্ণ তৃণ বা আগাছা, ধূলি ও কঙ্করাদিরূপ অন্যাভিলাষ কিছুমাত্র থাকিলেও ভগবান্ তথায় আসন স্থাপন করেন না। হৃদয়ের ঐ-সকল মল—অন্যাভিলাষ, ফলভোগপর কর্ম্ম, নির্ব্বেদজ্ঞান ও ভক্তিহীন যোগাদি চেষ্টার প্রতীক। শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু বলেন,—"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"—অন্যাভিলাষ কণ্টকময় তৃণের ন্যায় সুকোমলা কেবলা ভক্তিকে বিদ্ধ করে। কর্ম্মাবর্ত্তের ঘূর্ণিবায়ুতে বাসনারূপ ধূলিরাশি আমাদের স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হৃদয়দর্পণকে আবৃত করিয়া দেয়। হস্তীকে স্নান করাইয়া দিলে যেমন হস্তী আবার তদ্মুহূর্ত্তে গাত্রে ধূলি মাখিয়া থাকে, তদ্রূপ ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্ম-বাসনা বিদূরিত হয় না। একমাত্র প্রীতিময়ী ভক্তিদ্বারাই জীবের সমস্ত অসুবিধা দূর হয়। তখন তাহার সেই নির্ম্মল হৃদয়-সিংহাসনেই শ্রীভগবান্ বিশ্রামযোগ্য স্থান লাভ করিয়া থাকেন।

ভক্তিহীন নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান ও ভক্তিহীন কৈবল্যযোগ কঙ্করের ন্যায়। শ্রীগৌরসুন্দর ঐ-সকল তৃণ, ধূলি-প্রভৃতি আবর্জ্জনারাশি ভগবন্মন্দিরের চতুঃসীমানার অভ্যন্তরে

রাখিলেন না ; নিজ বহির্বাসে উঠাইয়া তৎসমুদয় বহির্ভাগে নিক্ষেপ করিলেন, পাছে বাতাস সহায়তায় ঐ-সকল জঞ্জাল কোনরূপে শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে।

অনেক সময় ভক্তিহীন কর্ম্মজ্ঞানাদি মূল আবর্জ্জনা বিদূরিত হইলেও হৃদয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কষায় থাকিয়া যায়। উহাকে 'কুটিনাটি', 'প্রতিষ্ঠাশা', 'জীবহিংসা', 'বিধিবিচার', 'লাভ', 'পূজা'-প্রভৃতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

এইরূপে বহুদিনের সঞ্চিত বড় বড় কচর, তৃণ, ধূলিরাশি-প্রভৃতি একবার ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিয়া শ্রীগৌরসুন্দর দুই দুইবার করিয়া মন্দিরের সমগ্রাংশ মার্জ্জন ও জলধারা প্রক্ষালন করিবার পর যদি কোথাও আবার কোনও সূক্ষ্ম দাগ লাগিয়া থাকে, তজ্জন্য নিজের পরিধেয় শুষ্কবস্ত্রের দ্বারা ঘসিয়া ঘসিয়া শ্রীমন্দির ও তদন্তর্গত পীঠস্থানরূপ সিংহাসন মার্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এত করিয়া প্রক্ষালন-মার্জ্জন-ঘর্ষণাদির পর শ্রীমন্দিরে আর ধূলিকণার লেশ বা একটী সূক্ষ্ম দাগও থাকিল না ; শ্রীমন্দিরটী স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ হইল। সাধকের হৃদয়টী বিষয়ভোগবাসনাজনিত জ্বালা হইতে মুক্ত, অন্যাভিলাষ ও কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি-চেষ্টাস্বরূপা ভুক্তিমুক্তিকামনা-বর্জ্জিত হইলে এইরূপই স্বচ্ছ ও সুশীতল হয় অথবা ভুক্তিমুক্তিবিকারী প্রীতির উপরে ভক্তচিত্তের সংস্কারবৈচিত্র্য প্রকাশিত হয়।

অনেক সময় সমস্ত কামনা-বাসনা বিদূরিত হইলেও হৃদয়ের কোনও কোনও অজ্ঞাতস্থানে এক-একটী সূক্ষ্ম দাগ বা কষায় লাগিয়া থাকে। সাত্ত্বিক কষায়কেও পরিত্যাগ করিয়া নিরুপাধিকী কেবলা প্রীতির গ্রাহক হইবার জন্য শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর জীবজগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন।

সাধক স্বীয় হৃদয়কে শ্রীবৃন্দাবনরূপে প্রকাশিত বা স্বরাট্ শ্রীকৃষ্ণের স্বচ্ছন্দ-বিহারস্থল করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধানের সহিত উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণনাম করিতে করিতে স্ব-হৃদয় মার্জ্জন করিবেন—ইহা জীবের মঙ্গলার্থে লোকশিক্ষকলীল শ্রীগৌরহরি শিক্ষা দান করিলেন ; প্রতি ভক্তের নিকট গিয়া হাতে ধরিয়া মন্দির-মার্জ্জনসেবা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। যাঁহার কার্য্য ভাল হইতেছে, তাঁহাকে প্রশংসা এবং যাঁহার সেবা আশ্রয়বিগ্রহশিরোমণির সুখানুসন্ধানাবেশময়ী হইতেছে না, তাঁহাকে পবিত্র ভর্ৎসনাপূর্ব্বক হাতে ধরিয়া কৃষ্ণসেবা-প্রণালী শিক্ষা দিলেন। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের লক্ষ্যজনকৌশল, অন্যস্থানে ভক্তিযোগযুক্ত শুষ্কজ্ঞান ভক্তগণকে অপর বিমুখ জীবগণের প্রতি কৃপা বিস্তার করিবার জন্যও উৎসাহান্বিত করিলেন। যিনি যত বেশী পরিমাণ জীবের হৃদয় হইতে কষায় দূর করিয়া জীবজগৎকে কৃপা করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি তত বেশী প্রভুপ্রিয় হইবেন, ইহাও অন্যাভিলাষপরম্পরানিধি শ্রীগৌরহরি শিক্ষা দান করিলেন।

শ্রীরথযাত্রা

শ্রীরথযাত্রা-উৎসব শ্রীপুরুষোত্তমধামের সর্ব্বপ্রধান উৎসব ; ইহার অপর নাম—'নবযাত্রা', 'গুণ্ডিচাযাত্রা' 'নন্দীঘোষযাত্রা', 'পতিতপাবনযাত্রা' বা 'মহাবেদী-উৎসব'। শ্রীজগন্নাথদেব মহারাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিয়াছিলেন,—"আষাঢ়-মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে সুভদ্রার সহিত আমাকে ও বলরামকে রথে আরোহণ করাইয়া নবযাত্রা-উৎসব সম্পন্ন করিবে। যেখানে আমি আবির্ভূত হইয়াছিলাম এবং যে-স্থানে তোমার সহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞের মহাবেদী বর্ত্তমান, সেই গুণ্ডিচামন্দিরে আমাকে লইয়া যাইবে।"

বৈশাখ-মাসের শুক্লা তৃতীয়া-তিথি হইতে রথ-নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয়। রথের কাষ্ঠাদি উৎকল-নৃপতিগণ প্রতিবৎসর প্রেরণ করিয়া থাকেন। সূত্রধর, চিত্রকর ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট-কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য প্রচুর অর্থের সম্পত্তি প্রদত্ত আছে। শ্রীমন্দিরের পূর্ব্বদিকে অক্ষয়বট হইতে গুণ্ডিচামন্দির পর্য্যন্ত যে সুবিস্তৃত রাজপথ প্রসারিত আছে, তাহাকে 'বড়দাঁড়' বা 'বড়দাণ্ড' বলে। ইহার উপর দিয়াই রথ টানা হয়। প্রতিবৎসর নূতন রথ প্রস্তুত হয়।

শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলভদ্র ও শ্রীসুভদ্রার জন্য পৃথক্ পৃথক্ তিনখানি রথ প্রস্তুত হয়। শ্রীজগন্নাথের রথের নাম—"নন্দীঘোষ"। উহার চূড়ায় চক্র ও গরুড় অধিষ্ঠিত ; এজন্য সেই রথকে চক্রধ্বজ বা গরুড়ধ্বজ-রথও বলে। ইহা ২৩ হাত উচ্চ এবং ইহাতে ৪ হাত পরিধি-বিশিষ্ট ১৬টি চাকা থাকে। শ্রীবলরামের রথ শ্রীজগন্নাথদেবের রথ অপেক্ষা এক হাত ছোট। এই রথের শীর্ষভাগে তালচিহ্ন আছে ; এজন্য ইহার নাম 'তালধ্বজ'। ইহার অপর নাম 'হলধ্বজ'। ইহা ২২ হাত উচ্চ এবং ইহাতে সাড়ে চারি হাত পরিধিবিশিষ্ট ১৪টি চাকা থাকে। শ্রীসুভদ্রাদেবীর রথের

নাম 'পদ্মধ্বজ' বা 'দর্পদলন'। ইহা ১১ হাত উচ্চ ও ইহাতে ৩ হাত পরিধিবিশিষ্ট ১২টি চাকা থাকে; রথের চূড়া হইতে চাকার উপরিভাগ পর্য্যন্ত সমগ্র স্থানটিকে বিচিত্রবর্ণের বস্ত্রাদির দ্বারা সুশোভিত করা হয়। রথের শিরোভাগে বহু বিচিত্র বর্ণের পতাকা উড্ডীন হয়; রথের উপর অপূর্ব্ব আকারের ঘোটক ও তৎপশ্চাতে সারথি (চালক) দৃষ্ট হয়। চালকের নির্দ্দেশে 'কালবেড়িয়াগণ' রথ টানিয়া থাকে। রথারোহণার্থ শ্রীমন্দির হইতে শ্রীমূর্ত্তিত্রয়ের বিজয়কে 'পহাণ্ডিবিজয়' বলে। প্রথমে শ্রীবলরামের, তৎপরে শ্রীসুভদ্রার ও তৎপশ্চাতে শ্রীজগন্নাথদেবের পহাণ্ডি হইয়া থাকে।

সুদর্শনচক্র শ্রীজগন্নাথদেবের রথে অবস্থান করেন। শ্রীসুভদ্রাদেবী পরিচারগণের কোড়াবলম্বনে রথারোহণ করেন। শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলরামকে পরিচারগণ রজ্জুদ্বারা আকর্ষণ করিয়া রথে উত্তোলন করেন। ইহাদিগকেই 'কালবেড়িয়া' বলা হয়। উহারা যাত্রীদের সঙ্গে রথ টানেন। পূর্ব্বে শ্রীজগন্নাথদেবের রথে চৌদ্দশত, শ্রীবলরামের রথে বারশত ও শ্রীসুভদ্রাদেবীর রথে বারশত 'বেড়িয়া' নিযুক্ত হইত।

পুরীর রাজা স্বর্ণ-সম্মার্জ্জনী-দ্বারা রথের সম্মুখস্থ স্থান পরিষ্কার করেন। স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও পুলিশ সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্টের অনুমতি-অনুসারে রথের আকর্ষণকার্য্য আরম্ভ হয়। প্রত্যেক রথের চতুর্দ্দিকে রজ্জুদ্বারা বেষ্টিত গণ্ডির মধ্যে সেবাইতগণ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকেন। বিশেষ বিশেষ শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মঠের সংকীর্ত্তন-মণ্ডলী সমোল্লাসে শ্রীগৌরসুন্দরের পদাঙ্কানুসরণে নৃত্যকীর্ত্তন করেন। পূর্ব্বে সিংহদ্বার হইতে গুণ্ডিচা-মন্দির পর্য্যন্ত গমন করিতে দুই-তিন দিন বা ততধিক সময় লাগিত, কিন্তু এক্ষণে একদিনেই সেই কার্য্য সম্পন্ন হয়।

শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির ও গুণ্ডিচার মধ্যপথে বর্ত্তমান বলগণ্ডি-নামক স্থানে পূর্ব্বে নদীস্রোত প্রবাহিত ছিল; বর্ত্তমানে তাহার অস্তিত্ব নাই। উহার এক তীরে গুণ্ডিচামন্দির ও অপর তীরে অর্দ্ধাসনীর মন্দির বর্ত্তমান ছিল। অর্দ্ধাসনীকে সাধারণতঃ লোকে 'মাসীমা' বলে। জনশ্রুতি আছে যে, পূর্ব্বে রথযাত্রার জন্য দুইটী রথ প্রস্তুত হইত। গুণ্ডিচামন্দির হইতে নদীতীর পর্য্যন্ত শ্রীজগন্নাথদেব তিনটী রথে আগমন করিয়া নৌকাযোগে নদী উত্তীর্ণ হইয়া অপর-পারস্থিত অপর তিনটী রথযোগে শ্রীমন্দিরে গমন করিতেন। বলগণ্ডির একদিকে বহু ব্রাহ্মণের বাস এবং অপরদিকে শ্রীজগন্নাথবল্লভোদ্যান। উক্ত নদীর সৈকত "নারেরা" বলিয়া খ্যাত। মাতৃষসার নিকট তদুলকণা-পিষ্টক ভোজন না করা পর্য্যন্ত শ্রীজগন্নাথদেব গুণ্ডিচামন্দিরে গমন করেন না। শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবের সাতদিন অবস্থিতি-কালে তথায়ই ভোগ হয়। পুনর্যাত্রার দিন রথত্রয়কে নীলাচলাভিমুখী করিয়া রাখা হয়, ইহাকে 'দক্ষিণ-মুণ্ডি' বলে। সেইদিনই শ্রীমূর্ত্তিত্রয় শ্রীসুন্দরাচল হইতে শ্রীনীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ব্রজগোপীগণের দাস্যাভিলাষী শ্রী-গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীজগন্নাথকে শ্রীকুরুক্ষেত্র-শ্রীনীলাচল হইতে শ্রীসুন্দরাচল-শ্রীবৃন্দাবনে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহবিশিষ্ট হন; পুনর্যাত্রায় তাঁহাদের আগ্রহ নাই।

আধ্যাত্মিক শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের ধারণা—এই রথযাত্রা-উৎসবটী বৌদ্ধদের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব-উপলক্ষে রথযাত্রার উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার প্রমাণস্বরূপ ডক্টর মিত্র চীন-পরিব্রাজক ফাহিয়ানের প্রদত্ত বিবরণ উদ্ধার করিয়াছেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ফাহিয়ান বুদ্ধের রথযাত্রা বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন যে, ফাহিয়ান পাটলি-পুত্রে যেদিন রথোৎসব দর্শন করিয়াছিলেন, সেদিন বুদ্ধের জন্মদিন ছিল বটে, তথাপি বুদ্ধের জন্মোৎসব-উপলক্ষে রথযাত্রার সৃষ্টি হয় নাই; কারণ, ফাহিয়ানের পূর্ব্বতন বৌদ্ধদিগের মধ্যে এক সময়ে এই উৎসবের প্রচলন ছিল না, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই উৎসব হইত। প্রাচীন শৈব ও জৈনগণের মধ্যেও রথযাত্রার প্রচলন ছিল ও আছে। এমন কি, এক সময়ে য়ুরোপেও রথযাত্রা প্রচলিত ছিল। অদ্যাপি ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র য়ুরোপের অন্তর্গত সিসিলী-দ্বীপে 'রথযাত্রা'র অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ভারতীয় বেদশাস্ত্রে সূর্য্যদেবের রথে যেরূপ জ্যোতিশ্চক্র ও নবগ্রহের মূর্ত্তির সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, সিসিলী-দ্বীপের সুবৃহৎ রথেও সূর্য্যচন্দ্রাদি নবগ্রহ ও জ্যোতিশ্চক্র রচিত হইয়া সেইরূপ রথোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শ্রীমতী কারাসিওলো (Madam Henrietta Caraciolo) এই রথোৎসবের কথা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

A colossal car is dragged by a long team of buffaloes through the irregular and ill-paved streets. Upon this are erected a great variety of objects, such as Sun, Moon and principal planets, set in rotary motion and diminishing proportionately in size as they approach the summit of the structure. This erection is in itself really imposing; sumptuously decorated and put in movement in honour of her who gave birth to the God of Charity. But its functions recall to mind the famed car of Jagannath.

(Memoirs of Henrietta Caraciolo P. 21.)

সুদীর্ঘ মহিষ-শ্রেণী দ্বারা একটী বিরাট্ রথ প্রস্তর-নির্ম্মিত বন্ধুর পথের উপর-দিয়া আকর্ষণ করা হয়। এই রথোপরি বিবিধ বৃত্তাবলী সজ্জিত থাকে, তন্মধ্যে ঘূর্ণ্যমান চন্দ্র-সূর্য্যাদি প্রধান প্রধান গ্রহরাজি উল্লেখযোগ্য। এই গ্রহসমূহ ঘুরিতে ঘুরিতে রথের শীর্ষ-দেশের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে ক্রমশঃ উহারা ক্ষুদ্র দেখাইতে থাকে। এই বৃত্তটী বস্তুতঃই মনোহর। ক্ষমাশীল বদান্য-দেবতার জননীর প্রতি সম্মান-প্রদর্শন কল্পে ইহা নির্ম্মিত ও বহু অর্থ-ব্যয়ে সজ্জিত হইয়া চালিত হয়। কিন্তু এই উৎসবটী প্রসিদ্ধ জগন্নাথের রথের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

উক্ত বিলাতী রথযাত্রা যদিও মেরীর উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তথাপি উহা যে দেশ, কাল ও অবস্থানুযায়ী সুপ্রাচীন সূর্য্যদেবের রথযাত্রার রূপান্তর, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

পুরী হইতে প্রায় ১৯ মাইল উত্তরে সমুদ্রের তীরে কোণার্কের মন্দির অবস্থিত। ইহা কৃষ্ণ-প্রস্তরে নির্ম্মিত অপূর্ব্ব কারুকার্য্য-খচিত সূর্য্যমন্দির। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় সাড়ে সাতশত বৎসর পূর্ব্বে এই সূর্য্যমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরটীকে একটী সূর্য্যদেবের রথ বলিতে পারা যায়। ঠিক রথের আকারেই এই মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের নিম্নভাগে কৃষ্ণপ্রস্তরের সুবৃহৎ চক্র ও প্রস্তর-নির্ম্মিত ঘোটক দৃষ্ট হয়।

এই সূর্য্য-মন্দিরের অভ্যন্তরে মূল-প্রদেশে অপূর্ব্ব-কৌশলে সংযোজিত নবগ্রহের মূর্ত্তি ছিল। তাহা হইতে সমস্ত মন্দিরের অভ্যন্তরটী প্রোজ্জ্বলালোকে দিবারাত্র আলোকান্বিত থাকিত এবং তাহার চতুর্দ্দিকে গ্রহ-উপগ্রহগণ বিরাজিত থাকিয়া যাত্রীর সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় শোভা বিস্তার করিত। সূর্য্যদেবের এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি ও গ্রহোপগ্রহগণের আদর্শ-সমূহ ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। শুনা যায়,—পোর্টুগীজগণ ঐ সূর্য্যমণ্ডলের বাপার দেখিয়া এতটা চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে, উহা তাঁহাদের দেশে বাণিজ্যের জাহাজে করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সূর্য্যমণ্ডলের উপকরণ-গুলিকে বিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিলে উহা বিকল হইয়া গেল। আধুনিককালে আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্য ব্যতীত কোণার্কের মন্দিরে দিবারাত্র যে প্রোজ্জ্বল আলোক স্বতঃই প্রকাশমান দেখা যাইত, তাহা সমস্তই নষ্ট হইয়া গেল।

যাহা হউক, উৎকলে কোণার্কের মন্দিরটীকে সূর্য্যের রথই বলিতে পারা যায়। শ্রীভুবনেশ্বরেও শ্রীরথযাত্রা-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পুরীতে আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়ায় রথযাত্রা-উৎসব হয়; কিন্তু ভুবনেশ্বরে চৈত্রী শুক্লাষ্টমী-তিথিতে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় এবং দ্বাদশ দিবস (পঞ্চম-দিবসে) তাঁহার পুনর্যাত্রা হইয়া থাকে।

নেপালে রথযাত্রা

নেপালে বৌদ্ধ ও শৈবগণের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার রথ-যাত্রোৎসব প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

The Buddhist Festival is evidently adopted from the Hindu Festival of Jagannath, in honour of Jagannath and his brother Balaram, and the Kumari representing their sister Subhadra.—(Oldfield's sketches from Nepal Vol II. P. 316.)

হিন্দুদিগের রথযাত্রা বলিতে সকলেরই হৃদয়ে শ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রার কথা উদিত হয়। এই রথযাত্রোৎসব যে কতকাল হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব।

পৃথিবীর সর্ব্বপ্রাচীন শাস্ত্র বেদে 'রথ'-শব্দের উল্লেখ আছে। কঠোপনিষদের তৃতীয় বল্লীর ৩য় মন্ত্রে দেখিতে পাই,—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥

যদিও এখানে রথ, সারথি-প্রভৃতি শব্দ রূপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, তথাপি রথের অস্তিত্ব ইহার দ্বারা

প্রমাণিত হয়। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, রথ প্রাচীনকালের রাজন্যবর্গের যুদ্ধাদিতে ব্যবহৃত যান-বিশেষ। শ্রীরামায়ণ, শ্রীমহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত-প্রভৃতি প্রাচীন পুরাণ-গ্রন্থেও যুদ্ধে রথাদির ব্যবহারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জুনের রথের সারথি হইয়াছিলেন। বেদে বিষ্ণু ও সূর্য্যের রথের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বিষ্ণুর রথারোহণ উৎসব যে বৌদ্ধগণের নিকট হইতে হিন্দুগণ অনুকরণ করিয়াছেন, ইহার কোন যুক্তিযুক্ত প্রমাণ নাই। ব্রহ্মপুরাণ, শ্রীভবিষ্য-পুরাণ, শ্রীস্কন্দপুরাণ-প্রভৃতি গ্রন্থে ভগবান বিষ্ণু ও কৃষ্ণের রথারোহণের অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে প্রাচীন দ্রাবিড়ের সর্ব্বদক্ষিণ অংশ—পাণ্ড্যদেশে 'পাণ্ড্যবিজয়' বা 'পাণ্ডুবিজয়'-নামে এক মহাপরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। পাণ্ডুবিজয় রাজার আবির্ভাবকালে বৌদ্ধবিপ্লবে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার ক্ষীণপ্রভ হইয়াছিল। পাণ্ড্যবিজয়ের এক বিষ্ণুভক্ত পুরোহিত ছিলেন, তাঁহার নাম—শ্রীদেবেশ্বর। দেবেশ্বরের মন্ত্রণায় পাণ্ড্যরাজ্য বৌদ্ধবিপ্লবে বিপর্য্যস্ত সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণের আচার ও অনুষ্ঠানের পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। যখন বৌদ্ধরাজগণ নীলাচল অধিকার করিলেন, তখন শ্রীনীলমাধবমূর্ত্তি-সহ শ্রীবলভদ্র ও শ্রীসুভদ্রা বৌদ্ধগণের দ্বারা বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ-নামে আখ্যাত হইলেন। বৈষ্ণবরাজ পাণ্ডুবিজয় সেই তিনটী মূর্ত্তিকে পুনরুদ্ধার করিয়া এবং তাঁহাদিগকে রথে আরোহণ করাইয়া পুরীর পূর্ব্বোত্তরভাগে 'গুণ্ডিচাচল' নামক নির্জ্জন উপবনে সংরক্ষণ করিলেন। রাজা গুণ্ডিচাপাণ্ড্যের সময় এই স্থানের নাম গুণ্ডিচাচল হইয়াছিল। রাজা পাণ্ড্যবিজয় এই সময় বৌদ্ধগণের বিচার ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং কিছুদিন পরে সেই তিনটী শ্রীবিগ্রহকে পুনরায় শ্রীনীলাচলের শ্রীমন্দিরে আনিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন। এখনও রথযাত্রার দিন শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রার রথারোহণ-কার্য্যকে পাণ্ড্যবিজয়ের নামানুসারে 'পহাণ্ডি' বা 'পাণ্ডুবিজয়' বলিয়া থাকে। পাণ্ড্যবিজয়ের পুরোহিতের নাম হইতেই শ্রীজগন্নাথের সেবাধিকারিগণ 'পাণ্ডা'-নামে খ্যাত হইয়াছেন। ইহা শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়ের বহু শত বৎসর পূর্ব্বের কথা।

ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে যে, সত্যযুগে অর্থাৎ বুদ্ধদেবের জন্মের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে শ্রীপ্রহ্লাদ প্রথমে মহাবিষ্ণুর রথ টানিয়াছিলেন; তৎপরে দেবতা, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্বগণও এই রথযাত্রার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উত্থান-একাদশীতে শ্রীহরির উত্থানার্থে রথযাত্রার বিধান আছে। কিন্তু আষাঢ়-মাসে পুষ্যানক্ষত্রযুক্তা শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতেই শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার বিধি আছে। পুরীর রথযাত্রা এক বিরাট্ ব্যাপার। অতি প্রাচীনকাল হইতে সমগ্র ভারতে, এমন কি, সমগ্র পৃথিবীর ধর্ম্মপ্রাণ লক্ষ লক্ষ নরনারী এই রথযাত্রা-উৎসব দর্শনের জন্য পুরীতে সমবেত হইতেন ও এখনও হইয়া থাকেন। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার অগণিত গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত প্রতিবৎসর এই রথযাত্রা-মহোৎসব দর্শন এবং রথের সম্মুখে সাতটী সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায় রচনা করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন করিতেন।

শ্রীচৈতন্যদেব যখন ভক্তগণের সহিত রথাগ্রে নৃত্য করিতেন, তখন স্বয়ং মহারাজ প্রতাপরুদ্র রথের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য স্বর্ণসম্মার্জ্জনী-দ্বারা পথ পরিষ্কার করিতেন, ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীরথাগ্রে নর্ত্তনকারী শ্রীচৈতন্যদেবের নিত্য দর্শনাকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন,—

"রথারূঢ়স্যাগ্রে বিপদবি নীলাচলপতে-
র্জগন্নাথ-প্রেমোর্ম্মিস্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃতভবদ্বৈষ্ণবজনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্।"
(শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্—৭)

শ্রীজগন্নাথের রথ টানিবার সময় রথের চাকার নীচে পড়িয়া প্রাণ-বিসর্জ্জন * ধর্ম্মোন্মত্ত নর-নারীর মধ্যে এক-সময় খুবই দেখা যাইত। হৃদয়ের সহজ অনুরাগটী অনুকরণমূলক কৃত্রিমতার পরিণত হইলে তাহাই 'ধর্ম্মোন্মত্ততা'-নাম ধারণ করে। শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীসনাতন

* এ-সম্বন্ধে Puri Gazetteerএ (1929) ১৬৩৩ পৃষ্ঠাঙ্কে Bruton, ১৬৬৭ পৃষ্ঠাঙ্কে Bernier ও ১৭২৭ পৃষ্ঠাঙ্কে Alexander Hamilton নামক প্রত্যক্ষদর্শী পর্য্যটকগণের প্রদত্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

গোস্বামী 'কৃষ্ণসেবা লাভ হইল না, সুতরাং এই প্রাণ-পঞ্জর ধারণ করা বৃথা'—এই সহজ আর্ত্তি ও দৈন্যে বিভাবিত হইয়া কৃষ্ণবিরহে রথচক্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে চাহিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের নিত্য শুদ্ধ অন্তরঙ্গ পার্ষদের এই বিপ্রলম্ভময়ী চিদ্বৃত্তি ফলভোগকামিগণের ভোগময় বিচার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ভূমিতে অবস্থিত। নশ্বর ও সকাম পুণ্যের আশায় কতকগুলি মূর্খ লোক রথের চাকার নীচে প্রাণ-বিসর্জ্জনের ব্যর্থ করিত। ইহা যে কেবল ভারতে প্রচলিত ছিল, তাহা নহে। তথাকথিত সুসভ্য য়ুরোপের সিসিলীদ্বীপেও রথযাত্রার সময় ঐরূপ বীভৎস ও নির্দ্দয়কাণ্ড হইত,—

The heart sickens at sight of it and it is difficult to refrain from crying shame upon the horrible barbarity; for, bound to the rays of Sun and Moon, to the circles forming the spheres of the various planets, are infants yet unweaned. Whose mothers, for the gain of a few ducats, thus expose their offspring, to represent the cherub escort which is supposed to accompany the virgin to heaven.

When this huge machine has made its jolting sound, these helpless creatures guiltless of every reproach, but that of being the offspring of brutal mothers, having been wheeled round and round for a period of seven hours, are taken down from this fatal machine, already dead or dying.

(Memoirs, Page 22.)

অর্থাৎ সেই রথযাত্রা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। সেই বিভীষিকাময়ী অসভ্যতার ধিক্কার না দিয়া থাকা যায় না। সামান্য কএকটী মুদ্রার লোভে দেবদূতস্বরূপ (রথস্থ) কুমারীর সহিত স্বর্গলোকে গমনের বিশ্বাসে মাতা শুন্যপায়ী শিশুকে সূর্য্য ও চন্দ্রের কিরণে বিভিন্ন গ্রহের মণ্ডল-নির্দ্দেশক চক্রের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছে। যখন সেই সুবৃহৎ যন্ত্র সশব্দে ঘুরিতে থাকে, তখন সেই নিঃসহায় ও সর্ব্বপ্রকার দোষমুক্ত, নৃশংস মাতার শিশুসন্তানেরা প্রায় ৭ ঘণ্টাকাল সূর্য্যযানচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া মৃত বা মৃত-প্রায় অবস্থায় নীত হইয়া থাকে।

শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধান এই যে, আষাঢ় মাসের পুষ্যানক্ষত্রযুক্তা শুক্লা দ্বিতীয়া-তিথিতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীবলরামের সহিত শ্রীজগন্নাথদেবকে রথে আরোহণ করাইয়া এই উৎসব করিতে হয়। যদি এই তিথিতে পুষ্যা-নক্ষত্রের যোগ না হয়, তাহা হইলেও উক্ত তিথিতেই ইহার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। এইস্থলে কেবল তিথিরই প্রাধান্য, অধিকন্তু নক্ষত্র যোগ হইলে বিশিষ্ট ফল হইবে মাত্র। এইদিন নানাবিধ উৎসব ও ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতে হয়। শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীবলরামের সহিত শ্রীজগন্নাথদেবকে রথে আরোহণ করাইয়া যাত্রা বিধেয়। পরে সাত দিন এই রথ বসীতীরে রাখিয়া, আঠম দিনে নানাপ্রকার তূষণাদিদ্বারা রথ সজ্জিত করিয়া নবম দিনে পুনর্যাত্রা করিতে হয়। শ্রীবিষ্ণুর দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা অতি দুর্লভা ও মুক্তিপ্রদায়িনী।

দ্বিতীয়ার যাত্রার নবম দিনে পুনর্যাত্রা করিলে একাদশীর দিন পুনর্যাত্রা হইবে; তিথির বৃদ্ধি হইলে দশমীতেও হয়।

"আষাঢ়স্য দ্বিতীয়ায়াং রথং কৃত্বাদ্বিশেষতঃ।
আষাঢ়শুক্লৈকাদশ্যাং জপ-হোম-মহোৎসবম্॥
রথস্থিতং ব্রজন্তং তং মহাবেদীমহোৎসবে।
যে পশ্যন্তি মুদা ভক্ত্যা বাসস্তেষাং হরেঃ পদে॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং প্রতিজ্ঞাতং দ্বিজোত্তমাঃ।
নাতঃ শ্রেয়ঃ পদো বিষ্ণোরুৎসবঃ শাস্ত্রসম্মতঃ॥"

(পদ্মপুরাণ, রথযাত্রা)

অর্থাৎ আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়াতে রথযাত্রা করিয়া বিশেষতঃ শুক্লা একাদশীর দিন পুনর্যাত্রা করিতে হইবে। এই দিন জপ ও হোমাদি মহোৎসব বিধেয়। এই মহোৎসবে যাঁহারা শ্রদ্ধা ও আনন্দ সহকারে বিষ্ণুকে রথে গমন-সময়ে দর্শন করেন, তাঁহাদের বিষ্ণুলোকে বাস হইয়া থাকে। অতএব হে দ্বিজোত্তমগণ! আমি পুনঃ পুনঃ সত্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, এই শ্রীবিষ্ণুর উৎসব শাস্ত্রসম্মত এবং ইহা অপেক্ষা পরমমঙ্গলপ্রদ আর কিছুই নাই।

দোলযাত্রা

ফাল্গুনী দশমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত দোলযাত্রা-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যাধূপের পর শ্রীশ্রীদোলগোবিন্দ ভগবান্ স্বরূপশক্তি শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-

লক্ষ্মীদেবীর সহিত মণিখচিত বিমানে আরোহণ করিয়া শ্রীজগন্নাথবল্লভের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত বিজয় করেন এবং তথা হইতে মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কোলপূর্ণিমার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে কোলমণ্ডপের অভিকোণে 'বহ্নুৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ণিমার দিন শ্রীলোলগোবিন্দ শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীসরস্বতীকে সঙ্গে লইয়া বিমানারোহণে কোলমঞ্চে বিজয় করেন এবং হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত দোলায় অধিষ্ঠিত হন। এই সময় শ্রীমূর্ত্তি আবীর-রঞ্জিত হ'ন। শ্রীমন্দিরের উত্তরদিকে লক্ষ্মীবাজারের সন্নিকটে কোলমঞ্চ বিরাজিত। সন্ধ্যার পর শ্রীগোলগোবিন্দ বিমানে আরোহণ করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পুরুষা মহর

উৎকল ভাষায় 'মহর'-শব্দের অর্থ রাজপ্রাসাদ; 'পুরুষা মহর' বলিতে প্রাচীন রাজপ্রাসাদ। পুরীর প্রাচীন রাজ-প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বালিসাহি-পল্লীতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। প্রায় ৩০ একর ভূমি পুরাতন রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ও চিহ্নসমূহ বক্ষে ধারণ করিয়া উড়িষ্যারাজ-গণের অতীত-গৌরবের স্মৃতি এখনও ঘোষণা করিতেছে। এইসকল ভগ্নাবশেষের সীমানির্দ্দেশে পূর্ব্বরাজত্ববর্গের প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত দেবতাগণের মন্দির এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পূর্ব্ব সীমানায় মঙ্গলাদেবীর মন্দির, পশ্চিমে রামাদেবীদেবীর মন্দির, উত্তরে মারাধী ও দক্ষিণে সাবী-ভট্টারীদেবীর মন্দির বিরাজমান। কথিত হয় যে, পুরুষোত্তমের মধ্যে 'বটসাগর' সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র স্থান। এই বটসাগরের মধ্যেই রাজপ্রাসাদ তথা বিভিন্ন মহাভবনের মঠাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রীরাধাকান্তমঠ, শ্রীগঙ্গামাতা-মঠ, ঈশ্বর-চার্য্যের শ্রীগৌর্দ্ধনমঠ-প্রভৃতি সমস্তই বট-সাগরের অন্তর্ভুক্ত। অভিকোণে কেটী বিস্তৃত দীর্ঘিকা চতুর্দ্দিক মর্ম্মর-মণ্ডিত সোপানে শোভিত হইয়া এককালে রাজপ্রাসাদের যে বিশেষ শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। সেই দীর্ঘিকার সোপানাবলী ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, জল কর্দ্দমাক্ত, তথাপি ইহা যে বহু অর্থ-ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহার ভগ্নাবশেষ নীরব ভাষায় তাহা এখনও ব্যক্ত করিতেছে।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অনুকম্পিত মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র ও তাঁহার পিতৃদেব মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তমদেবের বিভিন্ন স্মৃতিচিহ্ন অদ্যাপি এইস্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। আমাদের পরমপূজ্য শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ রাজগুরু মহাশয় (ইনি বহু প্রাচীনকাল হইতে অবস্তনস্থলে উৎকল-রাজগণের গুরু এবং সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তি) বলিলেন যে, শ্রীপুরুষোত্তমদেবের পূর্ব্ব হইতেও রাজ-প্রাসাদের মধ্যে যে-সকল দেব-দেবী প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারা অদ্যাপি এইস্থানে পূজিত হইতেছেন; তন্মধ্যে অষ্ট শম্ভু উল্লেখযোগ্য। এই অষ্ট শম্ভুলিঙ্গ বহু প্রাচীনকাল হইতে গণপতিগণের আরাধ্য দেবতারূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। বর্ত্তমানে অষ্ট শম্ভুলিঙ্গ একটী ক্ষুদ্র মন্দির-মধ্যে বিরাজমান আছেন। অষ্টলিঙ্গের মধ্যবর্ত্তী লিঙ্গটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শ্বেতপ্রস্তরময়। তাঁহার চতুর্দ্দিকে আর সাতটী বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তরময় লিঙ্গ আছেন। শ্বেতশম্ভুর মস্তকোপরি অনন্তদেব বিরাজমান রহিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ভাষাকালীর মূর্ত্তি, শ্রীরাধাকান্তদেব এবং যে-সকল শ্রীবিগ্রহ শ্রীপুরুষোত্তমদেব কাঞ্চী হইতে শ্রীপুরুষোত্তমে আনিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি এখানে পূজিত হইতেছেন। কাঞ্চী হইতে শ্রীপুরুষোত্তমদেব-কর্ত্তৃক আনীত শ্রীরাধাকান্তদেব শ্রীগোপালগুরু-কর্ত্তৃক শ্রীরাধাকান্তমঠে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন বলিয়া শ্রীরাধাকান্ত-মঠের সেবকগণ দাবী করেন। হইতে পারে যে, বর্ত্তমানে রাজপ্রাসাদে কাঞ্চী হইতে আনীত শ্রীরাধাকান্তের প্রতিভূ-মূর্ত্তিটী আছেন।

অষ্ট শম্ভুর মন্দির ব্যতীত আরও একটী প্রাচীন মন্দিরে শ্রীশ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব এবং তাঁহার পূর্ব্ব ও উত্তর অবস্তন-গণের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমূর্ত্তিসমূহ দুইটী বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে পূজিত হইতেছেন। মন্দিরের একটি প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রী-বিগ্রহ ও তাঁহার প্রতিনিধি শ্রীরসিকরায়ের (ঐ শ্রীরাধাকৃষ্ণের) ধাতুময়ী শ্রীমূর্ত্তি বিরাজমান আছেন। আর একটি প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও শ্রীশ্রীগৌরজগদীশ্বরের দারুময়ী শ্রীমূর্ত্তি ও অন্যান্য বহু শ্রীমূর্ত্তি একটি উচ্চ বেদীর উপর বিরাজমান আছেন। শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও শ্রীশ্রীগৌরজগদীশ্বর মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হন। ইহা যে অতি প্রাচীন শ্রীমূর্ত্তি, তাহা বেশ বুঝা যায়। শ্রীশ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ শ্রীমূর্ত্তিদ্বয় প্রায় প্রমাণাকার; শ্রীশ্রীগৌর-জগদীশ্বর শ্রীমূর্ত্তি বাহুদৃষ্টিতে তদপেক্ষা ক্ষুদ্রকায়; ৪টী মূর্ত্তিই নৃত্যপরায়ণ। শ্রীপ্রতাপ-রুদ্রের পূজিত শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া মনে হয়, শ্রীবাস-অঙ্গনস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীগৌরহরিই যেন এই-

স্থানে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া নৃত্য করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত এই-স্থানে শ্রীনীলমাধব-চতুর্ভুজমূর্ত্তি, শ্রীশ্রীরাম-লক্ষ্মণ ও শ্রীসীতার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি, চতুর্ভুজ শ্রীজগন্নারায়ণ, পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, দ্বিভুজে বংশী ও ঊর্দ্ধ-হস্তদ্বয়ে শঙ্খ-চক্রধারী ত্রিভঙ্গিম-শ্রীকৃষ্ণ-নারায়ণমূর্ত্তি, শ্রীসরস্বতী, শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীশালগ্রাম অষ্টধাতুর ন্যায় মণ্ডলাকারে বিরাজমান; কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার অষ্টসাক্ষী মহাদেব-নামক আটটী শম্বুলিঙ্গও আছেন।

এইসকল শ্রীবিগ্রহের নিত্যপূজার জন্য রাজদরবার হইতে পূজারী ও নির্দ্দিষ্ট ভোগাদির বন্দোবস্ত আছে। এক-সময় শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের সেবাপ্রাণতায় এইসকল শ্রীমূর্ত্তির সেবা উজ্জ্বলরূপে প্রকটিত ছিল; কিন্তু পরবর্ত্তিকালের রাজন্যবৃন্দের সেবাশৈথিল্য-নিবন্ধন ইহা প্রাণহীন আনুষ্ঠানিক কৃত্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে। শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের পূজিত শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও শ্রীশ্রীগৌর-পাদপদ্মের শ্রীমূর্ত্তি বেশ-ভূষারহিত হইয়া কোনরূপে ঘাড়াটিয়া পূজকের নিয়মরক্ষা-মাত্র সেবার অভিনয়ের সাক্ষিস্বরূপে একটী অন্ধকারাচ্ছন্ন মন্দিরগৃহে অবস্থান করিতেছেন। এইসকল শ্রীবিগ্রহের ভোগের জন্য দৈনিক /৮ সের চাউল, /১ সের আটা, আধ সের মুগডাল, আধ সের ঘৃত ও আধ সের গুড়ের বন্দোবস্ত আছে। আটা, গুড় ও ঘৃতের দ্বারা কাকরা প্রস্তুত করিয়া ভোগ দেওয়া হয়।

পুরাতন রাজপ্রাসাদের অন্যান্য যে-সকল মূল্যবান্ বস্তু ও শিলালিপি-প্রভৃতি ছিল, তাহা পুরীর রাজা তাঁহার নূতন প্রাসাদে (যাহা বড়দাণ্ডের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত) স্থানান্তরিত করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। উক্ত নূতন রাজপ্রাসাদ রামচন্দ্রদেবের (৩য়) রাজত্বকালে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরাতন রাজপ্রাসাদ 'পুরণা মহল' বা 'বালি মহল' নামে পরিচিত।

শ্রীপুরুষোত্তমের পঞ্চতীর্থ

চক্রতীর্থ, স্বর্গদ্বার, শ্বেতগঙ্গা, মার্কণ্ডেয় ও ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবর—এই পাঁচটি তীর্থ শ্রীপুরুষোত্তমের পঞ্চতীর্থ-নামে খ্যাত। এসম্বন্ধে একটি শাস্ত্রবচন দৃষ্ট হয়,—

মার্কণ্ডেয়াবটেঽক্ষে চ শ্বেতগঙ্গে মহোদধৌ।
ইন্দ্রদ্যুম্নে নরঃ স্নাত্বা পুনর্জন্ম ন বিন্দতে॥

মার্কণ্ডেয়-অবটে অর্থাৎ মার্কণ্ডেয়-সরোবরে, অক্ষয়ে অর্থাৎ শ্বেতগঙ্গায়, বৌহিণেয়ে অর্থাৎ রোহিণীকুণ্ডে, মহা-সমুদ্রে ও ইন্দ্রদ্যুম্নে—এই পাঁচটি তীর্থে স্নান করিলে নরের পুনর্জন্ম হয় না।

চক্রতীর্থ

পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকে এবং শ্রীমন্দির হইতে প্রায় একক্রোশ দূরে বালগুণ্ডিনালায় (বাঁকা খোয়াবার) তীরে চক্রতীর্থ অবস্থিত। এইস্থানেই শ্রীচক্রকে ভাসিয়া আসিয়াছিলেন। এইস্থানে একটি প্রস্তরময় সুদর্শনচক্র একটি বেইনীর মধ্যে পূজিত হইয়া থাকেন। এই চক্রের অদূরেই একটি কূপ। এইস্থানে সকল সময়ে জল থাকে এবং ফলকামী কর্ম্মিগণ এইস্থানে শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন।

সন্নিকটেই সমুদ্রসৈকতপর্ব্বতোপরি বার বৎসর-বাবৎ নির্ম্মিত একটি নূতন মন্দিরে শ্রীচক্রনারায়ণ-চতুর্ভুজ-বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রকাশিত আছেন। শ্রীচক্রনারায়ণ মধ্যস্থলে, তাঁহার পশ্চিমভাগে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ও পূর্ব্বে শ্রীঅনন্ত-নারায়ণ। এই তিন বিষ্ণু-বিগ্রহেরই বক্ষে শ্রীলক্ষ্মীদেবী বিরাজমানা আছেন।

অদূরে আর একটি মন্দিরে শৃঙ্খলবদ্ধ শ্রীহনুমান্ 'বেড়ি হনুমান্'-নামে প্রসিদ্ধ আছেন। কথিত হয় যে, যাহাতে সমুদ্র আর অগ্রসর হইতে না পারে, সে-বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার জন্য শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীহনুমান্‌কে প্রহরি-স্বরূপ এইস্থানে অবস্থান করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীবজ্রাঙ্গজী লাড্ডু খাইবার প্রলোভন দমন করিতে না পারিয়া প্রভুর ঐ সেবাকার্য্যে অবহেলা করিয়াই অযোধ্যায় গমন করিয়া-ছিলেন। তাহাতে শ্রীজগন্নাথদেব হনুমান্‌কে অযোধ্যা হইতে আনাইয়া ঐস্থানে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রাখিয়াছেন। ইনি 'ধরিয়া মহাবীর'-নামেও খ্যাত; কারণ, ইনি চক্রতীর্থ-ধরিয়ার নিকটে অবস্থিত।

স্বর্গদ্বার

ব্রহ্মা শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নের প্রার্থনায় দেবতাগণের সহিত এই-স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অবতরণ-স্থানের নিদর্শনরূপে একখণ্ড প্রস্তর প্রোথিত আছে। উহাকে 'স্বর্গদ্বারশিলা' বলে। কেহ কেহ ইহাকে 'স্বর্গের সিঁড়ি' বলিয়া থাকেন। এইস্থানে সমুদ্রের ঘাটে অধিকাংশ সকাম তীর্থযাত্রী সমুদ্র-স্নান করেন। স্বর্গদ্বারের সমুদ্রতটে শ্মশানক্ষেত্র আছে।

শ্বেতগঙ্গা

স্বর্গদ্বার হইতে শ্রীমন্দিরে যাইবার পথে বামভাগে ও শ্রীমন্দিরের দক্ষিণদিকে একটী প'নির ভিতরে 'শ্বেতগঙ্গা'-তীর্থ বা কুণ্ডটি অবস্থিত। শ্বেতগঙ্গার চতুর্দ্দিক্ মর্ম্মর-সোপানমণ্ডিত রহিয়াছে। উহার দক্ষিণ-তটে প্রসিদ্ধ শ্রীগঙ্গামাতাদেবী অবস্থিত।

উৎকলখণ্ডে বর্ণিত আছে,—ত্রেতাযুগে শ্বেত-নামক এক রাজা শ্রীজগন্নাথদেবের পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি মহারাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নের প্রবর্ত্তিত প্রণালী-অনুসারে প্রত্যহ ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। একদিন প্রাতঃকালে তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের পূজার সময় উপস্থিত থাকিয়া সম্মুখে দেবপ্রদত্ত সহস্র সহস্র উপহারসমূহ দর্শনপূর্ব্বক মনে মনে বিচার করিলেন,—'দেবগণ দিব্য উপহারসমূহের দ্বারা যাঁহার অর্চ্চন করিতে সমর্থ হন না, সেই শ্রীজগন্নাথ-দেব কি আমার ন্যায় মর্ত্ত্য ব্যক্তির উপহার গ্রহণ করেন?' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজা শ্রীজগন্নাথদেবকে প্রণাম ও স্তব করিয়া শ্রীমন্দিরের দ্বারদেশে অবস্থান করিলেন। সেই সময় তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন—শ্রীলক্ষ্মীদেবী রাজার প্রদত্ত যত্নসম্পূর্ণ অন্নাদি শ্রীজগন্নাথদেবকে পরিবেশন করিতেছেন এবং শ্রীজগন্নাথ ও তাঁহার বিজয়-বিগ্রহগণ তাহা পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করিতেছেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া রাজা আপনাকে কৃত-কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। শ্বেতরাজা বহুকাল যাবৎ শ্রীজগন্নাথদেবের আরাধনায় নিরত ছিলেন। তাহাতে শ্রীজগন্নাথদেব অত্যন্ত প্রীত হইয়া শ্বেত-নৃপতিকে বর প্রদান করেন যে, তিনি অক্ষয়বট ও সাগরের মধ্যবর্ত্তী মুক্তিক্ষেত্রে আদি-অবতার শ্রীমৎস্য-ভগবানের সম্মুখে 'শ্বেত-মাধব'-নামে বিখ্যাত হইবেন। উক্ত শ্বেতমাধবের নামানুসারে এই দীর্ঘিকার নাম 'শ্বেতগঙ্গা' হইয়াছে। এস্থানে উক্ত শ্বেতমাধব ও ভগবান্ শ্রীমৎস্যমাধবের শ্রীমূর্ত্তি এবং সরোবরের তীরে নবগ্রহের মূর্ত্তি আছেন।

শ্রীমার্কণ্ডেয়-সরোবর

শ্রীমন্দিরের পশ্চিমভাগে এই সরোবরটী অবস্থিত। প্রলয়কালে শ্রীমার্কণ্ডেয়মুনি প্রলয়পয়োধি-জলে ভাসিতে ভাসিতে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে একটী বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। তৎসমীপস্থ একটী বালক মার্কণ্ডেয়কে "মৎসমীপে আগমন কর"—এইরূপ বলিতেছিলেন। মার্কণ্ডেয় 'এই বালক কোথা হইতে আসিতেছে' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণকে দেখিতে পাইলেন। মার্কণ্ডেয় শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের স্তব করিলেন। তখন শ্রীনারায়ণ মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন,—"বটবৃক্ষের উত্তরপ্রদেশে পত্রপুটকে যে বালক শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহাকে দর্শন কর। তাঁহার বিবৃত বদনে তুমি অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে।" শ্রীমার্কণ্ডেয় শ্রীনারায়ণের আজ্ঞানুসারে উক্ত বালকের মুখগহ্বরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—তাঁহার মুখগহ্বরে ব্রহ্মাণ্ডই যাবতীয় বস্তু ও চতুর্দ্দশ ভুবন অবস্থিত রহিয়াছে। অনন্তর মার্কণ্ডেয় তথা হইতে নির্গত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে দর্শন করিলেন। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—"এই ক্ষেত্র নিত্য; ইহাতে প্রলয় নাই।" মার্কণ্ডেয়মুনি বটবৃক্ষের বায়ুকোণে মার্কণ্ডেয়ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমের আদেশে তৎপ্রিয়তম শ্রীশিবের আরাধনা করিলেন। এখন এইস্থানে শ্রীমার্কণ্ডেয়েশ্বর ও শ্রীনীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেব বিরাজমান আছেন। হ্রদের তীরে পূর্ব্বে মার্কণ্ডেয়-বট বিরাজিত ছিল। চৈত্রী অশোকাষ্টমীতে ঐস্থানে কালিয়দমন-যাত্রা হয়।

শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবর

শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরের অনতিদূরে উত্তরদিকে এই মর্ম্মর-মণ্ডিত সুবৃহৎ সরোবর অবস্থিত। মহাভারতীয় আরণ্যক পর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়-সমস্যাপ্রসঙ্গে ইহার উল্লেখ আছে। উৎকলখণ্ডের বিবরণানুসারে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের অশ্বমেধ-যজ্ঞে গোদান-উপলক্ষে গোসমূহের খুরদ্বারা যে-সকল গর্ত্ত হইয়াছিল, তাহাই দানকালে হস্তচ্যুত জল ও গোসমূহের মূত্রে পূর্ণ হওয়ায় উক্ত তীর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরের তীরে শ্রীনীলকণ্ঠেশ্বর-মহাদেবের মন্দির আছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের বিবিধ জলকেলি-লীলা-প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে (চৈ চ ম ১৪।৭৫-৯১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

শ্রীনরেন্দ্র-সরোবর

শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের উত্তর-পূর্ব্বাংশে প্রায় এক মাইল দূরে 'শ্রীনরেন্দ্র-সরোবর' নামান্তর 'শ্রীচন্দনপুকুর' অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে ৮১০ ফিট্ ও প্রস্থে ৭৪০ ফিট্। এই বিশাল দীর্ঘিকার চতুষ্পার্শ্বে বাঁধান এবং সোপান-

সমূহ প্রস্তর-নির্ম্মিত। শ্রীনরেন্দ্র-সরোবরের সহিত শ্রীভুবনেশ্বরের বিন্দু-সরোবরের অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। কিংবদন্তী এই যে, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নারকপোদি-নরেন্দ্র-নামক কোন রাজকর্ম্মচারী এই সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন। নরেন্দ্র মহাপাত্র কবি নরসিংহের মন্ত্রী ছিলেন *। মহারাষ্ট্রীয়দিগের গুরু 'বাবা ব্রহ্মচারি'-দ্বারা সরোবরের চতুর্দ্দিকস্থ প্রস্তরময় বেষ্টন ও প্রস্তর-রচিত সোপানাবলী নির্ম্মিত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন,—নরেন্দ্র-শিরোমণি শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তমদেবের চন্দনযাত্রার উদ্দেশে এই দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন, এইজন্য ইহার নাম 'নরেন্দ্র-সরোবর' হইয়াছে। শ্রীনরেন্দ্র-সরোবরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিজয়-বিগ্রহ শ্রীমদনমোহনদেব স্বীয় মন্ত্রী শ্রীলোকনাথ-মহাদেবের সহিত অক্ষয়-তৃতীয়া হইতে জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা অষ্টমী-তিথি পর্য্যন্ত নৌকাবিলাস করেন। কথিত হয় যে, শ্রীনরেন্দ্র-সরোবরের তটে শ্রীশ্রীল গঙ্গাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন এবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীশ্রীঅদ্বৈত, শ্রীশ্রীস্বরূপাদি গোস্বামিবৃন্দ ও শ্রীপ্রতাপরুদ্র মহারাজ সেই ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন।

আঠারনালা

পুরীনগরে প্রবেশ করিবার যে সেতু আছে, তাহাকে 'আঠারনালা' বলে। ইহাতে আঠারটী খিলান আছে। পুরীর প্রায় ছয় মাইল উত্তরে এই সেতুটী অবস্থিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গৌড়ীয়-ভক্তগণ আঠারনালায় আসিয়া পুরীতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া মহাভাবে বিবশ হইতেন। এই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতে ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইসকল উক্তি আছে,—

চলিতে চলিতে প্রভু আইলা **আঠারনালা**।
তাহা আসি' প্রভু কিছু বাহ্য প্রকাশিলা॥
* * *
আঠারনালাকে আইলা গোসাঞি শুনিয়া।
হইখালা পাঠাইলা গোবিন্দ-হস্ত দিয়া॥

(চৈ ভ ম ৫।১৪৭, ১৬।৩৮)

আইলেন মাত্র প্রভু **আঠার-নালায়**।
সর্ব্বভাব সম্বরণ কৈলা গৌর-রায়॥
স্থির হই বসিলেন প্রভু সবা' ল'য়া।
সবারে বলেন অতি বিনয় করিয়া॥
"তোমরা ত' আমার করিলা বহু-কাজ।
দেখাইলা আমি' জগন্নাথ মহারাজ॥
এবে আগে তোমরা চলহ দেখিবারে।
আমি যা যাইব আগে, তাহা বল মোরে॥"
মুকুন্দ বলেন তবে "তুমি আগে যাও"।
"ভাল", বলি' চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ-রাও॥
* * *
শ্রীঅদ্বৈতসিংহ সর্ব্ব-বৈষ্ণব-সহিতে।
আসিয়া মিলিলা প্রভু **আঠার-নালাতে**।
প্রভুও আইলা নরেন্দ্রেরে আগুয়ান।
দুই গোষ্ঠী দেখাদেখি হৈল বিদ্যমান॥
দূরে দেখি' দুই গোষ্ঠী অন্যোন্যে সব।
দণ্ডবত হই' সব পড়িলা বৈষ্ণব॥

(চৈ ভা অ ২।৩১৯ ৪২৩, ৮।১৩৩-৩৫)

কিংবদন্তী যে, মহারাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন সর্ব্বপ্রথমে এই সেতু নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেতু-বন্ধনের সময় পুনঃ পুনঃ বিফলপ্রযত্ন হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের আদেশক্রমে স্বীয় অষ্টাদশ পুত্রের মস্তক এই নদীগর্ভে দান করিয়া তবে এই সেতুবন্ধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, রাজা মৎস্যকেশরী ইহা নির্ম্মাণ করেন। আঠারনালা-সেতু প্রাচীন হিন্দু-স্থপতি-নৈপুণ্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বাজপুরের নিকট এইরূপ একটী প্রস্তর-নালা আছে। এই সম্বন্ধে 'Puri Gazetteer'-এ এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—"The Atharanala bridge, which crosses the Madhupur Stream, measures in all two hundred and ninety feet long, and is composed of eighteen spans, ranging from seven to sixteen feet across. It is built of laterite and sandstones, and the openings are spanned by a characteristically Hindu construction of corbels and lintels in place of the more usal arch of later times. The bridge is said to have been built towards the end

* "It was constructed by Narendra Mahapatra, a minister of Kavi Narasingha." (List of ancient Monuments in Bengal, P. 486,)

of the thirteenth century A. D. and is mentioned in Chaitanya's biography (sixteenth century) and William Bruton's travels (1633) The followers of Chaitanya also visit the sites held sacred from association with that great apostle.—(Puri Gazetteers by L. S. S. O. Malley, I. C. S. 1929—P. 337).

শ্রীযমেশ্বর

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দ্বারপাল বা দেওয়ান-স্বরূপ পঞ্চ শ্রীলিঙ্গমূর্ত্তি শ্রীপুরুষোত্তমে বর্ত্তমান আছেন; তাঁহাদের নাম—(১) শ্রীযমেশ্বর, (২) শ্রীনীলকণ্ঠেশ্বর, (৩) শ্রীলোকনাথ, (৪) শ্রীকপালমোচন, (৫) শ্রীমার্কণ্ডেয়েশ্বর। 'শ্রীক্ষেত্রমাহাত্ম্য' ও 'নীলাদ্রিমহোদয়ে' শ্রীযমেশ্বর-লিঙ্গের নামোল্লেখ আছে।

শ্রীযমেশ্বর—শ্রীহরিহর-মূর্ত্তি; তাঁহার সম্মুখে গরুড়স্তম্ভ ও বৃষস্তম্ভ অবস্থিত। যমেশ্বর-মূর্ত্তির উত্তরে পার্ব্বতীদেবীর মন্দির। যমেশ্বরের সেবাইত পূজারী উক্ত শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ স্থানে একটী পল্লী গঠন করিয়া বাস করেন। ইঁহারা সকলেই পাণ্ডাপাসক গৃহস্থ এবং ইঁহারা পালাক্রমে যমেশ্বরের পূজা করিয়া থাকেন।

শ্রীযমেশ্বরের বিজয়-বিগ্রহ শ্রীহরিহর মূর্ত্তি বিভিন্ন উৎসবোপলক্ষে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে বিজয় করিয়া শ্রীজগন্নাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বিজয়-বিগ্রহ ধাতুময়ী চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি। উক্ত মূর্ত্তির বাম-ঊর্দ্ধহস্তে শঙ্খ, বাম-নিম্নহস্তে চক্র, দক্ষিণ-নিম্নহস্তে ডমরু, ঊর্দ্ধ-দক্ষিণ-হস্তে ত্রিশূল; ঐরূপস্বরূপ গরুড় ও বৃষ বিরাজমান আছেন।

শ্রীযমেশ্বরের অন্য নাম—যমেশ্বর; ইনি যমের দর্প ভঙ্গ করেন। এই ক্ষেত্রে যাঁহার মৃত্যু হইবে, তাঁহার প্রতি যমের আইন কার্য্যকরী হইবে না। এইজন্য শ্রীজগন্নাথদেবের এই ক্ষেত্রপাল 'যমেশ্বর'-নামে অভিহিত। ইনি শ্রীজগন্নাথদেবের প্রহরীর কার্য্য করেন এবং সর্ব্বদা ভগবৎ-প্রেমে নৃত্য করেন। এস্থানে প্রসিদ্ধি আছে—পুনর্যাত্রার পর যে একাদশী-তিথিতে যখন শ্রীজগন্নাথদেব রূপে থাকেন, তখন তাঁহার অন্ন-ভোগ হয় না; সেই দিন যমেশ্বরের যে অন্ন-ভোগ হয়, তাহা মহাপ্রসাদের সহিত অভিন্ন বলিয়া গৃহীত হয়। প্রত্যহই যমেশ্বরের অন্নভোগ হইয়া থাকে।

শ্রীযমেশ্বরের মন্দিরটী প্রাকারপরিবেষ্টিত। প্রস্তরের সিঁড়ি দিয়া নিম্নপ্রদেশে অবতরণপূর্ব্বক শ্রীমন্দিরে পৌঁছা যায়। এইস্থান 'যমনিক-তীর্থ' নামে প্রসিদ্ধ। কার্ত্তিকমাসে যম-দ্বিতীয়া বা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া এবং চৈত্র-মাসে শীতলা ষষ্ঠী—এই দুইটীই যমেশ্বরের প্রধান উৎসব। যমেশ্বরের সেবার জন্য উৎকল রাজের প্রদত্ত বহু জমি ছিল। শুনা যায়, বর্ত্তমানে হুড়াসপরা-নামক গ্রামে যমেশ্বরের জমিদারী আছে।

* যমেশ্বরের মন্দিরের দক্ষিণ-দক্ষিণে 'যমেশ্বরের টোটা' বা বাগান ছিল। সেই বাগানেই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুকে স্থানদান দিয়াছিলেন।

শ্রীলোকনাথ

শ্রীশ্রীজগন্নাথমন্দির হইতে প্রায় দেড় মাইল পশ্চিমে শ্রীশ্রীজগন্নাথের পঞ্চ দেওয়ান বা দ্বারপালের অন্যতম শ্রীলোকনাথ-মহাদেব অবস্থিত। অনাদি শিবলিঙ্গ শ্রীলোকনাথ মর্ম্মর-প্রাকারবেষ্টিত একটী মন্দিরে জলে নিমগ্ন হইয়া অবস্থিত আছেন। লোকনাথ-লিঙ্গের দুইপার্শ্বে দুইটী সুবর্ণনির্ম্মিত সর্প ফণাবিস্তার করিয়া শোভিত রহিয়াছেন। শ্রীলোকনাথ নিজপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের আশ্রয়ে এইভাবে শ্রীক্ষেত্রে বিরাজমান আছেন। সাধারণতঃ লোকে লোকনাথ-লিঙ্গের দর্শনলাভ করিতে সমর্থ হন না, লোকনাথের প্রতিনিধিমূর্ত্তি দর্শন করিয়াই সন্তুষ্ট হন। কারণ, অনাদি শিবলিঙ্গ শ্রীলোকনাথ জলে নিমজ্জিত আছেন। শিবরাত্রির সময় জল সেচন করিয়া তাঁহার পূজা করা হয়। চান্দ্র-বৈশাখের শেষে সোমবারে এখানে একটী মেলা হইয়া থাকে। ইহাকে 'সরণী-সোমবার' বলে।

শ্রীকপালমোচন-মহাদেব

শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ-দরজার নিকটে শ্রীকপালমোচন-মহাদেবের মন্দির অবস্থিত। কিংবদন্তী এই যে, পূর্ব্বে ব্রহ্মার পঞ্চ মস্তক ছিল। মহাদেব একটি মস্তক ছেদন করেন। সেই মস্তকটী (কপাল) ছিন্ন হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই মহাদেবের হস্তে সংলগ্ন হইয়া থাকিল। তিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল ভ্রমণ করিয়া কোথায়ও আশ্রয় পাইলেন না, অবশেষে ভূবৈকুণ্ঠ শ্রীপুরুষোত্তমে আসিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের শরণ গ্রহণ করিলে মহাদেব ব্রহ্মহত্যা-দোষ হইতে মুক্ত হইলেন। এইজন্য তিনি 'কপালমোচন'-নাম ধারণ করিয়া শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথদেবের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। ইনি শ্রীজগন্নাথদেবের পঞ্চ দ্বারপাল বা দেওয়ানের অন্যতম।

মহাতীর্থ সমুদ্র

নীলমহোদধির উত্তরতীরে শ্রীনীলাচল অবস্থিত। এই নীলসমুদ্রকে পাশ্চাত্য ভৌগোলিকগণ "Bay of Bengal" নামে অভিহিত করেন। শ্রীমাধবব্রত এই নীলসমুদ্রের জলে ভাসিতে ভাসিতে 'বহুমোহানা'য় উপনীত হইয়াছিলেন। কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীশ্রীরূপসনাতন, শ্রীহরিদাস, শ্রীস্বরূপাদি পার্ষদবৃন্দ প্রত্যহ শ্রীসমুদ্রস্নান করিতেন,—ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলাগ্রন্থ-পাঠে জানা যায়। বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যদেব নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণের পর তাঁহাকে সমুদ্রজলে স্নান করাইয়া "সমুদ্র আজ হইতে মহাতীর্থ হইল"—এইরূপ শ্রীমুখবাণী প্রকাশ করিয়াছিলেন (চৈ চ অ ১১।৬৪)—

"হরিদাসে সমুদ্রজলে স্নান করাইলা।
প্রভু কহে—'সমুদ্র এই মহাতীর্থ হইল' ॥"

শ্রীচৈতন্যদেব প্রত্যহ অপতিতভাবে সমুদ্রস্নান-লীলা প্রকট করিয়া শ্রীজগন্নাথমন্দিরের চক্র দর্শন করিতেন এবং নিজ ভক্তগণকেও তাহা অনুসরণ করিবার জন্য কৃপাদেশ করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু কহে—শুন, সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ।
• • •
সমুদ্রস্নান করি' কর' চূড়া দরশন।
(চৈ চ অ ১১।১৮২-৮৩)
সমুদ্রস্নান করি' প্রভু আইলা নিজস্থানে।
অদ্বৈতাদি গেলা সিন্ধু করিবারে স্নানে ॥
আসি' জগন্নাথের দেখিলা চূড়া দরশন।
প্রভুর আবাসে আইলা করিতে ভোজন ॥
(চৈ চ অ ১১।১৯৭-৯৮)

শ্রীচৈতন্যদেব মহাভাববিভাবিত গোপীশিরোমণির কিঙ্করীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া সমুদ্রে শ্রীযমুনা এবং সমুদ্রের উপবনশ্রেণীতে শ্রীবৃন্দাবন সাক্ষাৎকার করিতেন। একদিন শারদ-জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রজনীতে শ্রীমন্মহাপ্রভু আইটোটা হইতে অকস্মাৎ সমুদ্র দর্শন করিয়া যমুনাজ্ঞানে তাহাতে ঝম্প প্রদান করিলেন (চৈ চ অ ১৮।৩২)—

যমুনাতে জলকেলি—গোপীগণ-সঙ্গে।
কৃষ্ণ করেন, মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে ॥

শ্রীচৈতন্যনিজ-জনাগ্রগণ্য শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু শ্রীনীলাম্বুধিবিহারী সেই শ্রীচৈতন্যদেবের নিত্য সাক্ষাৎকার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন (শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্—৬),—

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালীকলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্যস্মরণজনিত-প্রেমবিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥

লবণ-সমুদ্রের তীরে শোভমান উপবনশ্রেণীর দর্শনে যিনি পুনঃ পুনঃ শ্রীবৃন্দাবনস্মরণহেতু প্রেমে বিবশ হইতেন, কখনও বা যাঁহার জিহ্বা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণনাম-আবৃত্তিহেতু চঞ্চল থাকিত, সেই ভক্তিরসিক শ্রীচৈতন্য কি পুনর্ব্বার আমার দৃষ্টিগোচর হইবেন ?

শ্রীজগন্নাথদেবের বহু ভক্তের ভক্তিপ্রাণতার কথা উৎকলসাহিত্যে প্রচারিত আছে। শ্রীদীনবন্ধু দাস, শ্রীদামোদর দাস, শ্রীবিশ্বম্ভর দাস, শ্রীরঘু অবধিং, শ্রীনীলাম্বর দাস, শ্রীরঘু বেহারা, শ্রীগঙ্গাধর দাস, শ্রীবন্ধু মহান্তি, শ্রীমণিদাস, শ্রীতিলোচন মহাপাত্র, শ্রীঅনন্ত ও শ্রীসাধনা, শ্রীগণপতি ভট্ট, শ্রীপীতা পাত্র, শ্রীনন্দ পট্টনায়ক, শ্রীগরীবদাস-প্রভৃতি শ্রীজগন্নাথদেবের বহু প্রাচীন ভক্তের সেবোৎকণ্ঠার প্রসঙ্গ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সচল জগন্নাথ শ্রীচৈতন্যদেব আশ্রয়বিগ্রহশিরোমণির ভাবে বিভাবিত হইয়া কি নীলাচলে নীলাম্বুধির তটে, কি শ্রীরথাগ্রে নর্ত্তনকীর্ত্তনকালে, কি শ্রীজগন্নাথমন্দিরের গরুড়স্তম্ভের পশ্চাতে দর্শনলীলা-প্রকটকালে—

"হা হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন !
কাহাঁ যাঙ, কাহাঁ পাঙ মুরলীবদন !!"

—অহর্নিশ বলিতে বলিতে যে শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধানাবেশময়ী বিপ্রলম্ভ লীলামাধুরী প্রকট করিয়াছেন, তাহা একমাত্র তাঁহার একান্তী ভক্ত শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামরায়, শ্রীশ্রীরূপসনাতন, শ্রীহরিদাস ঠাকুর-প্রমুখ গৌড়ীয়ভক্তগণের প্রাণকোটির দ্বারা নিত্য নির্ম্বহনের বস্তু হইয়া রহিয়াছে।

জয় শ্রীনীলাম্বুধিবিহারী শ্রীগৌরহরির জয় ! জয় শ্রীনীলাচলবিভূষণ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের জয় !! জয় শ্রীপুরুষোত্তম-সঙ্গী বহু ভক্তবৃন্দের জয় !!!

বিবিধ-প্রসঙ্গ

জ্যৈষ্ঠমাসের "ভারতবর্ষে" গত ২রা এপ্রিল (১৯২৫) রামচন্দ্রপুরস্থ কাঁকড়ার মাঠনিবাসী ব্রজমোহন দাস মহাশয়ের স্বধামগমন-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে,—"তিনি নবদ্বীপে মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান নির্ণয় করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত সাফল্য লাভ করেন।"

সম্ভবতঃ 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদক কোন অভিসন্ধিযুক্ত সংবাদদাতার ব্যক্তিগত অভিমত সংবাদদাতারই ভাষায় উদ্ধার করিয়াছেন, নতুবা এরূপ সম্পূর্ণ অলীক ও প্রমাণ-বিরুদ্ধ উক্তি কোনরূপেই সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না। নিরপেক্ষ বিচারকগণ সকলেই জানেন যে, ব্রজমোহন দাস মহাশয় মহাপ্রভুর জন্মস্থান-নির্ণয়ের বৃথাচেষ্টা তাঁহার জীবনের শেষ কয়েক বৎসর সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়া ও হতাশ হইয়া নীরব ছিলেন। এ পর্য্যন্ত একটি নিরপেক্ষ প্রত্নতাত্ত্বিকও তাঁহার কল্পিত স্থানকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এ সম্বন্ধে বিপুল সাহিত্য প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। ব্রজমোহন দাসজীর চেষ্টা তাঁহার দেহত্যাগের বহু পূর্ব্বেই বৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত হইয়াছে।

গত ২৩শে বৈশাখ, ৭ই মে সোমবার শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনদাসের লীলাভূমি শ্রীমোদ্রুমদ্বীপে, আকর-পীঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে ও অন্যান্য শাখামঠসমূহে শ্রীশ্রীঠাকুর-বৃন্দাবনের বিরহ-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে কলিকাতা-বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের চরিতগাথা ও তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে একটী বিদ্বজ্জনমণ্ডিত সভার অধিবেশন প্রদত্ত হইয়াছিল।

গত ৩১শে বৈশাখ সোমবার শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমদনমোহনের শ্রীচন্দনযাত্রা-উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীপুরুষোত্তমমঠস্থ বৈষ্ণববৃন্দ নরেন্দ্রসরোবরে শ্রীশ্রীমদন-মোহনের চন্দনযাত্রা-উৎসবের সেবা করিতেছেন।

গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে শ্রীশ্রীগৌরজন শ্রীশ্রীগৌরপদাঙ্কিত কূর্ম্মাচল বা শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্র দর্শনার্থ বিজয় করিয়াছিলেন। ১৪৩১ শকাব্দার প্রায় এই সময়ে অর্থাৎ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠমাসে শ্রীমহাপ্রভুবিগ্রহ রসরাজ-মহাভাব-দ্বিলিত-তনু শ্রীগৌরহরি শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়া কূর্ম্ম-নামক বৈদিক ব্রাহ্মণকে শক্তিসঞ্চারপূর্ব্বক কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রচার করিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন এবং বাসুদেব-নামক এক কুষ্ঠীবিপ্রকে নষ্টকুষ্ঠ, রূপপুষ্ট ও ভক্তিপুষ্ট করিয়াছিলেন। এই লীলাদ্বারা শ্রীগৌরহরি "শ্রীবাসুদেবামৃতপদ"-নামে ভক্তসমাজে খ্যাত হইয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর উপসংহারে শ্রীব্যাসদেব অদ্ভুত রসের বিষয়বিগ্রহ শ্রীকূর্ম্মহরির লীলাস্থানানুসন্ধান করিয়া জগজ্জীবকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন।

গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ শুক্লা নবমী তিথিতে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবরের আনুগত্যে বিভিন্ন মঠে শ্রীশ্রীজাহ্নবা-ঠাকুরাণীর আবির্ভাব-উৎসব তাঁহার চরিতগাথা-কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সমস্ত প্রতিষ্ঠানে শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী-উপবাস অহোরাত্র শ্রীপ্রহ্লাদেশ শ্রীনৃহরির লীলাগাথা কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগৌরজন ঐদিন শ্রীশ্রীনরেন্দ্রসরোবরে শ্রীশ্রীনৃসিংহ-দেবের আগে শ্রীশ্রীমদনমোহনের নৌকাবিহার-লীলা দর্শন ও শ্রীপ্রহ্লাদপ্রাণনাথ শ্রীনৃসিংহদেবের লীলাগাথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীজাহ্নবী পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীশ্রীনিবাস-আচার্য্য ঠাকুরের আবির্ভাব, শ্রীশ্রীপরমেশ্বরী ঠাকুরের তিরোভাব, শ্রীশ্রীবৃক্ষের পুষ্পদোল ও সলিলবিহারোৎসব-সংকীর্ত্তন সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে সপার্ষদ শ্রীশ্রীগৌরজন শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীজগন্নাথ-বল্লভোদ্যানে শ্রীশ্রীল রামানন্দপ্রভুর বিরহতিথির সেবার আদর্শ প্রকট করিয়াছেন। আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে, শ্রীগৌড়ীয়মঠে, শ্রীপুরুষোত্তমমঠে, শ্রীআলালনাথ-শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয়মঠে, শ্রীগোদাবরী-তটস্থিত শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে ও অন্যান্য শাখামঠে শ্রীশ্রীল রায়-রামের বিরহতিথি-সংকীর্ত্তন-মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীগদাধর-ভক্তিবিনোদ-বিরহ-সংখ্যা

গৌড়ীয়

শ্রীমদ্ভাগবত বিদ্বদ্ ভাগবতপুরাণম্।
নির্মিত হরিণা পূর্বং যস্মৈ মুক্তিঃ করে স্থিতা॥
তত্রারভ্য শিবব্রহ্মাদয়ো
বিদন্ত্যুরু মতি যতঃ।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
—শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুপাদ
'ভক্তি'-রসিক-শ্রেষ্ঠ জগদ্গুরু

২৩শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৩০শে আষাঢ়, ১৩৫২; ১৪ই জুলাই, ১৯৪৫ { ৪৯শ-৫২তম সংখ্যা

বিমুখ বিশ্ব

অনাদিকালব্যাপী পরতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানের অভাবকেই 'বিমুখতা' বলে। যে-সকল প্রাণী বা জীবের পরতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান নাই, সেইরূপ বিমুখ জীবের লইয়াই এই বিশ্ব-ব্যাপার চলিতেছে। বিমুখ জীব স্ব-স্ব বাসনা ও কর্ম্মানুযায়ী ফল ভোগ করিবার জন্য বিভিন্ন দেহ ধারণ করে। প্রাণি-জগতে স্ত্রী ও পুরুষ—এই দুই প্রকার সৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রী ও পুরুষের মিলনে সৃষ্টি প্রসারিত হয়। অতএব বিমুখ বিশ্ব মিথুনীভূত স্ত্রী ও পুরুষের সমষ্টিদ্বারাই ব্যাপ্ত।

তত্ত্ববিদ্গণ বিমুখ স্ত্রীপুরুষ-সমন্বিত জগতের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বিমুখতার বিচিত্রতা উপলব্ধ হয় এবং উন্মুখতার অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তার প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত বিমুখ পুঞ্জজগৎকে কয়েকটী পশুর আদর্শে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বিপদ বহুল হইয়াও বিমুখতা-নিবন্ধন আমরা ঐ সকল পশুর প্রতীকরূপেই আচারে ও ব্যবহারে প্রতিমুহূর্ত্তে নিজেদের পরিচয় প্রদান করিতেছি। শ্রীমদ্ভাগবত (২।৩।১৯; ৩।৩১।৩৯; ১১।১৩।৮) বিমুখ পুঞ্জজগৎকে 'শ্ব' অর্থাৎ কুকুর, 'খর' অর্থাৎ গর্দ্দভ, 'অজ' অর্থাৎ ছাগল, 'বরাহ' অর্থাৎ শূকর ও 'বানর'—এই পশু-পঞ্চকের প্রতীকরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। টীকাকার ও ভাষ্যকার আচার্য্যগণ ইহার তাৎপর্য্য বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন,—কুকুরকে যেরূপ গালি প্রদান করিলেও উহা উচ্ছিষ্টগ্রাসের জন্য সর্ব্বক্ষণ অপেক্ষা করে, আস্তাকুঁড়ে পতিত অখাদ্য দ্রব্যভোজনার্থ বহু ক্লেশ স্বীকার করে; গর্দ্দভ যেরূপ পৃষ্ঠোপরি সকলের অনিবার্য্যভাবে বোঝা বহন করে ও গর্দ্দভীর পাদতাড়ন-সত্ত্বেও উহাকেই অভিলাষ করে; অজ বা ছাগল যেরূপ ভক্ষনার্থ আনীত হইয়াও অজাবস্থায় পশ্চাদ্ধাবন করে অর্থাৎ কামপরবশ হয়; বরাহ বা শূকর যেরূপ সর্ব্বক্ষণ বিষ্ঠা বা অপরের বিসর্জ্জনীয় বস্তুর অনুসন্ধান করে; বানর যেরূপ নরের অনুকরণ করিয়া বা সাধু সাজিয়া পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করে অথবা কেবল কুটুম্ব-ভরণেই অভিনিবিষ্ট থাকে, মুক্তাদির ন্যায় মূল্যবান্ পদার্থকে হেয় বা অকিঞ্চিৎকর-বস্তু ভাবিয়া উহাকে দলিত ও নিক্ষেপ করে, তদ্রূপ বিমুখ মনুষ্য পুরুষাভিমানে নানাভাবে বিষয়ভোগের জন্য যত্ন করিয়া থাকে। গৃহব্রত ব্যক্তিগণ বৈধ ও অবৈধভাবে ঐ সকল পশুর ন্যায় বিষয়-আহরণের যত্ন করে; তাহাতে শান্তি ত পায়ই না, তৃপ্তিও লাভ করিতে পারে না, কারণ,—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি"

ভোগের দ্বারা কামের নিবৃত্তি হয় না, বরং অনলে ঘৃতাহুতির ন্যায় উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে জীবকে আলা-ভক্ষিত করিয়া দেয় এজন্য আর একপ্রকার বিমুখ জীব ইহার প্রতিযোগি-পন্থা গ্রহণ করে। "ত্যাগাদ্ভান্তিঃ",—এইমন্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহারা বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইতে চাহে কিন্তু কোন কৃত্রিম পন্থায় বিষয়

হইতে নিবৃত্ত হওয়া যায় না। নানাভাবে প্রচ্ছন্ন-আকারে বিষয় আক্রমণ করে। ইহারা যাহে কুল বিষয়সমূহ-ত্যাগের অভিনয় করিয়া অন্য আকারে পশুপক্ষীর প্রতীক হইয়া পড়ে। ইহারা কুকুরের ন্যায় প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা বা অপরের অনুগ্রহরূপ উচ্ছিষ্টের ভিখারী হইয়া ত্যাগীর বেশে বিচরণ করে, গর্দ্দভের ন্যায় শাস্ত্রের ভারবাহী হয়; বাহিরে কৌপীন পরিধান করিলেও অন্তরে অজ বা ছাগলের ন্যায় বৃদ্ধি-বিশিষ্ট থাকে এবং শাস্ত্রাদি (?) চর্চ্চা করিয়াও অবৈধ কাম পরিতৃপ্তি করিবার জন্য সচেষ্ট হয়; ইহারা বানরের ন্যায় সাধুদের প্রতিষ্ঠাহরণ। লৌকরী বিদ্যার জন্য আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিয়া থাকে, কখনও বা শাখামৃগের ন্যায় ফলমূলাদি সাত্ত্বিক-দ্রব্য আহার ও বৃক্ষাগ্রে বাস করিবার অভিনয় করিয়া দন্ত বা কাপট্যের ক্রীড়াস্থল হয়। বিমুখ বিশ্বের এই অবস্থা।

শ্রীমদ্ভাগবত (৫।১৪।২৭-৩৮) বিমুখ গৃহব্রতগণের অবস্থা বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন,—

"অন্ধকূপবদ্বিদ্ধি উপসর্গাস্তথা সুখ-দুঃখ-রাগদ্বেষভয়াভিমান-প্রমাদোন্মাদ-শোকমোহ-লোভ-মাৎসর্য্যের্ষ্যাবমান-ক্ষুৎপিপাসাধি-ব্যাধি-জন্মজরামরণাদয়ঃ।"

এই সংসারে পূর্ব্বোক্ত দুঃসহ কষ্ট ত' আছেই, তদ্ব্যতীত সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, ভয়, অভিমান, প্রমাদ, উন্মাদ, শোক, মোহ, লোভ, মাৎসর্য্য, ঈর্ষ্যা, অপমান, ক্ষুধা, পিপাসা, আধি, ব্যাধি, জন্ম, জরা, মৃত্যু-প্রভৃতি বহুবিধ উপসর্গ আছে।

"তাসি দেবমায়য়া স্ত্রিয়া কৃতমন্ত্রোপগূঢ়ঃ প্রস্কন্ন-বিবেক-বিজ্ঞানস্তদ্বিহার-গৃহারম্ভানুকূলমদয়তদাপ্রয়াবসক্ত-সুত-দুহিতৃ-কলত্র-ভ্রাতৃবিত্তাবলোক-বিচেষ্টিতাপহৃত-হৃদয় আত্মানমজিতাত্মা-পাশেরুদ্ধে তমসি প্রবিশোভি।"

কোন সময় দেবমায়া-রূপিণী স্ত্রীর বাহুবল্লীতে আলিঙ্গিত হইয়া জীবের আত্মজ্ঞানরূপ বিবেক ও ভগবদ্ভজনাত্মক বিজ্ঞান তিরোহিত হয়; তখন তাহার হৃদয় সেই স্ত্রীর বিলাসভবন নির্ম্মাণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে এবং সেই বিলাস-ভবনে আসক্ত পুত্র, পুত্রবধূ ও কন্যা-প্রভৃতির আলাপন, অবলোকন ও চেষ্টায় তাহার চিত্ত অপহৃত হয়। এইরূপে অজিতাত্মা জীব আপনাকে অপার অন্ধকার-নরকে নিপাতিত করে।

"কদাচিৎসীধরত ভগবতো বিষ্ণোশ্চক্রাৎ পরমাণ্বাদিদ্বি-পরার্দ্ধাপবর্গকালোপলক্ষণাৎ পরিবর্ত্তিনেন বয়সা রংহসা হরত স্ত্রীপ্রসঙ্গপ্রসক্তধীনাং কৃতানামবিদিবধো নিজতাং বিস্তম্ভ-হৃদয়স্তমেবেশ্বরং কালচক্রমিজ্যাদ্যং সাক্ষাদ্ভগবন্তং যজ্ঞপুরুষ-মনাদৃত্য পাষণ্ডদেবতাঃ কঙ্ক-গৃধ্র-বক-কঙ্কটাশ্রাব্য আর্ষ্যসময়-পরিহৃতাঃ সাত্বতোনাভিবত্তে।"

পরমেশ ভগবান্ বিষ্ণুর চক্রের নাম 'হরিচক্র'; ঐ চক্র পরমাণু হইতে দ্বিপরার্দ্ধব্যাপী কালস্বরূপ। উহা নিরন্তর ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মা হইতে তৃণগুল্মাদি পর্য্যন্ত সমস্ত বৃহৎকে বাল্যযৌবনাদি-ক্রমে অতিশীঘ্রই হরণ করে। কেহই তাহার প্রতীকার করিতে সমর্থ নহে। ঐ কালচক্র অভিনব সতর্ক; উহা ভগবানের স্বকীয় অস্ত্র। কালচক্র-ভীত জীব চক্রায়ুধ সাক্ষাৎ ভগবান্ যজ্ঞপুরুষকে অবজ্ঞা করিয়া গৃধ্র, বক, কঙ্ক, বায়সসদৃশ নিষ্টাচার-রহিত পাষণ্ড-দেবতা (অর্থাৎ পাষণ্ডশাস্ত্রবিহিত উপাস্যদেবতা)-দিগকে মূল-প্রমাণশূন্য অর্থাৎ কল্পিত পাষণ্ড শাস্ত্রানুসারে আশ্রয় করে। গৃধ্র-বকাদি যেমন সিংহভয়ে ভীত ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে পারে না, পাষণ্ড দেবতাগণও সেইরূপ কালচক্র হইতে জীবকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না।

"যদা তু পাষণ্ডিভিরাত্মবঞ্চিতৈস্তৈস্তৎক্বচিতৈ ব্রহ্মকুলং সমাধলংস্তেষাং শীলমুপনয়নাদি-শ্রৌত-স্মার্ত্ত-কর্ম্মানুষ্ঠানেন ভগবতো যজ্ঞপুরুষস্যারাধনমেব তদ্বয়োচেন্ মূত্রকুলং ভজতে নিগমাচারেণোদ্ভিতো যত্র মিথুনীভাবঃ কুটুম্বভরণং যথা বানরজাতেঃ।"

পাষণ্ডগণ নিজেই বঞ্চিত, উহাদের আশ্রিত পুরুষ তাহাদের নিকট হইতে আরও অধিক বঞ্চিত হইয়া ব্রাহ্মণ-কুলের আশ্রয় গ্রহণ করে; কিন্তু ব্রাহ্মণগণের উপনয়নাদি-শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান-দ্বারা ভগবান্ যজ্ঞপুরুষের আরাধনারূপ আচরণ তাহার প্রীতিকর হয় না, তখন সে মূত্রাচারের অনুসরণ করে। মূত্রগণ বিবাহ-বিবাহ, মূল্যপ্রদানাদি-দ্বারা বিবাহ-প্রবৃত্তি নিগমোক্ত বিধিহীন-আচারানুসারে যোষিৎসঙ্গ করিয়া থাকে। উহাদের বানর-জাতির ন্যায় কুটুম্বভরণ-ভিন্ন অগ্নিহোত্রাদি অন্য কোন ক্রিয়া নাই।

"তত্রাপি নিরবরোধঃ স্বৈরেণ বিহরন্নভিরূপবৃদ্ধিরতোৎস্ত-মুখনিরীক্ষণাদিনা গ্রাম্যকর্ম্মণৈব বিসৃতকালাবধিঃ।"

সেই ব্যক্তি শূদ্রসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া অবাধে স্বেচ্ছায় বিচরণ করে, সে অতিশয় মন্দবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া পরস্পর মুখাবলোকন ও গ্রাম্য কর্ম করিয়াই নিজের মৃত্যুকাল বিস্মৃত হয়।

"কচিদ্ভ্রমদ্বৈহিকার্থেষু গৃহেষু রংস্যন্ যথা বানরঃ সুতদারবৎসলো ব্যবায়ক্ষণঃ।"

বানরগণ যেমন বৃক্ষে ক্রীড়া করিতে করিতে ব্যাধের বন্ধনে পতিত হয় এবং আত্মবিমোচনে অসমর্থ হইয়া পড়ে, সেইরূপ ঐ পুরুষও ঐহিক সুখের হেতুভূত গৃহে আসক্ত হইয়া স্ত্রী-পুত্রাদিতে প্রীতিযুক্ত এবং মৈথুনোৎসবে রত হইয়া সংসার-বন্ধন হইতে আত্মরক্ষণে অশক্ত হইয়া পড়ে।

"এবমধ্বন্যবরুদ্ধানো মৃত্যুগজভয়ান্নমণি গিরিকন্দর-প্রায়ে।"

এই সংসারমার্গে পুরুষ যখন ভগবদারাধনা পরিত্যাগ-পূর্বক পাপাসক্ত হইয়া আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় ভোগ করিতে থাকে, তখন সে মৃত্যুরূপ হস্তীর ভয়ে ভীত হইয়া গিরিগহ্বর-তুল্য ঘোর অন্ধকারে পতিত হয়।

"কচিচ্চীত-বাতাতপানেক-দৈবিক-ভৌতিকাত্মীয়ানাং দুঃখানাং প্রতিকারমপ্যকুর্বাণো দুরন্তবিষয়বিষমদা বিবশ আস্তে।"

কখনও বা শীত-বাত প্রভৃতি বহুবিধ আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখের প্রতীকার করিতে না পারিয়া বিষম বিষয়-চিন্তায় বিবশ হইয়া পড়ে।

"কচিন্মিথো ব্যবহরন্ যৎকিঞ্চিদনুপযাতি বিত্তশাঠ্যেন যেষং গচ্ছতি।"

কখনও বা পরস্পর বিনিময়াদি ব্যবহার করিতে করিতে বঞ্চনাদি উপায়-দ্বারা যাহা-কিছু লাভ করে, তাহাতে পরস্পর পরস্পরের শত্রু হইয়া পড়ে।

"ক্বচিৎ ক্বচিৎ ক্ষীণধনঃ শয্যাসনাদ্যুপভোগবিহীনো যদৃচ্ছয়াপ্তৈরভিলব্ধ-মনোরথোপসাদ্যমানেঽধিষ্ঠিতমভিমন্যতেঽন্নপানাদীনি দুরাদভিলভতে।"

কখনও কখনও তাহার অর্থ না থাকায় শয্যা, আসন-প্রভৃতি ভোগাবস্তুর অভাব হয়। যখন সে সদুপায়ের দ্বারা নিজ-মনোমত বস্তু লাভ করিতে পারে না, তখন সে অসদুপায়ে পরের দ্রব্য গ্রহণ করিতে বাসনা করে এবং তন্নিমিত্ত লোকের নিকট অবমাননাদি প্রাপ্ত হয়।

"এবং বিত্তব্যতিষঙ্গবিবৃদ্ধ-বৈরানুবন্ধোঽপি পূর্ববাসনয়া বিদ্বান্ উপরতাপবর্হতি।"

এইরূপ অর্থাদিকে দ্বারা পরস্পর শত্রুতাপন্ন হইয়াও পূর্ববাসনাবশতঃ পরস্পর বিবাহাদি-সম্বন্ধে বদ্ধ হয়; আবার কখনও বা শত্রুতা-নিবন্ধন পরস্পরের ঐ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে।

"এতস্মিন্ সংসারাধ্বনি নানাক্লেশোপসর্গবাধিত আপন্ন-বিপন্নো যস্তমুহ যাবেতরস্তত্র বিস্পষ্টা ভাতমুপাদায় শোচেন্ মুহ্যন্ বিজ্ঞাদিনদন্ বিবহন্ সংজ্বয়ন্ ধাবন্ মহামানঃ সাধু-বর্জ্জিতো নৈবাবর্ত্ততেঽদ্যাপি যত আরব্ধ এষ নর-লোক-সার্থস্তমধ্বনঃ পারমুপদিশন্তি।"

এই সংসারমার্গে বহুবিধ ক্লেশ ও উপসর্গাদি-দ্বারা পীড়িত হইয়া যে-ব্যক্তি আপন্ন বা বিপন্নগ্রস্ত হয়, অন্য ব্যক্তি তাহাকে (সেই বিপন্ন পিত্রাদিরূপ মনুষ্যকে) পরিত্যাগপূর্বক নবজাত ব্যক্তিকে (পুত্রাদিকে) গ্রহণ করিয়া কখনও শোক করে, কখনও মোহপ্রাপ্ত হয়, কখনও ভীত হয়, কখনও চীৎকার করে, কখনও লালন-পালনাদি করিয়া থাকে, কখনও বা হৃষ্ট হইয়া গান করিতে থাকে; এইরূপে জীব সংসারে আবদ্ধ হয়। যে পরমেশ্বর হইতে অর্থাৎ যাঁহার প্রতি অনাদিবহির্মুখতা-নিবন্ধন এই নিত্যবদ্ধ জীব-সমূহ সংসারমার্গে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই সর্বকারণ-কারণ শ্রীভগবৎপদকেই তত্ত্বজ্ঞগণ সংসারমার্গের পার-স্বরূপ বলিয়া কীর্তন করেন, **সাধুসঙ্গবর্জ্জিত হইয়া কেহই অদ্যাপি সংসারের পরপারে পৌঁছিতে পারে নাই** অর্থাৎ নিত্যবদ্ধ জীবসমূহ মহৎসঙ্গ ব্যতীত কখনও প্রবৃত্তিমার্গ হইতে মুক্ত হইয়া ভগবৎসেবা লাভ করিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে 'যোষিৎ'-শব্দের পূর্বে পুনঃ পুনঃ 'দেবমায়া'-শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে; ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। শ্রীলাভিকে শ্রীব্যাসদেব 'দেবমায়া-বিনির্মিতা' বলিলেন কেন? ইহার মধ্যে বিশেষ রহস্য নিহিত আছে। স্বরূপশক্তিই অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তিরূপে যোগমায়া এবং তাহারই ছায়া বহিরঙ্গা শক্তি জড়মায়া। ছায়ার মধ্যে ভান ও প্রতিযোগিতা আছে, কিন্তু বাস্তবতা নাই। 'দেবমায়া' বলিতে 'ত্রিগুণাত্মিকা দৈবী মায়া' অথবা শ্রীবাসুদেবের স্বরূপশক্তি—উভয়কেই বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণ-যোষিৎসমূহ স্বরূপশক্তি, আর দৈবমায়াবিমোহিতা জীব-ভোগ্যা যোষিৎসমূহ জড়মায়াশক্তিরূপিণী; অতএব 'দেবমায়া'

যদিতে স্বরূপশক্তিপ্রকটিতা 'আদিবক্তা' বা কৃষ্ণানুরাগবশ-বশীভূতা অপ্রাকৃতা যোষিৎ অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীভগবদ্বস্তুকে একমাত্র প্রাণকান্তরূপে অনুভব করেন, সেইসকল গোপী বা গুরুবর্গ; আর ভেদবুদ্ধিবিনির্ম্মিতা অর্থাৎ অচিচ্ছক্তি-মায়া কর্ম্ম ও বাসনানুযায়ী যাহাদের বিমুখ দেহ রচনা করিয়াছে, সেইসকল নারীজগৎকেও বুঝায়। ভক্তবিদ্গণ বিমুখ ও উন্মুখ-ভেদে বিবিধ নারীজগতের বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

বিমুখ-নারীগণ, যথা—

(১) ভোগিনী—'ভোগ' অর্থাৎ ফল আছে যাহার, সেইরূপ ফলিনী বা সপিণ্ডীভূতা; 'ভোগ' (ফল) দেখিলে বড় সুন্দর বলিয়া বোধ হয়, সময় সময় উহার উপর মক্ষিও থাকে; কিন্তু তাহা প্রাণঘাতী। ভোগিনী পুরুষগণকে তাহাদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ভোগলালসারূপ বিষয়ান্ধতায় দংশন করিয়া কামবিষে জর্জ্জরিত এবং তাহাদের শুভেচ্ছার ক্ষীণপ্রাণটিকেও চিরতরে হরণ করে।

(২) যক্ষিণী—যক্ষ সর্ব্বদা ধন আগলিয়া থাকে, অপরকে স্পর্শ করিতে দেয় না অর্থাৎ ধনের সদ্ব্যবহার করিতে দেয় না। সেইরূপ কতকগুলি নারী নিজের পতি-পুত্র-পরিজন, দেহ-গেহ-সম্পৎকে পরতত্ত্ব বা সাধুগুরুবৈষ্ণবের সেবায় কিছুতেই নিযুক্ত করিতে দেয় না, সর্ব্বক্ষণ নিজে এরূপভাবে আগলিয়া থাকে, যেন তাহারা কোনরূপে কৃষ্ণসেবায় না লাগে।

(৩) রমণী—যে স্ত্রী বিবিধ হাব-ভাব-লাস্যাদিদ্বারা পুরুষকে সম্ভোগসক্ত করাইয়া ভোগাসক্ত করে।

(৪) কামিনী—যে স্ত্রী অতিশয় ভোগাভিলাষিণী বা কামাভিলাষিণী; এজন্য উহারা পুরুষকে কিছুতেই ভগবৎ-সেবার্থ ত্যাগ বা 'কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ-ত্যাগ' করিতে পারে না।

(৫) মোহিনী—যে স্ত্রী নানাবিধ ছলা বিস্তার করিয়া হরিবিমুখ পুরুষকে মোহিত করে অর্থাৎ সংসারে আবদ্ধ করে। 'মোহিনী' বলিলেই 'অসতী' মনে করিতে হইবে না। জাগতিক পরিভাষায় যাহাকে 'সতী'-'সাধ্বী' বলে, সেইরূপ পতিব্রতাও 'মোহিনী' হইতে পারে।

উন্মুখতার আভাস হইতে উন্মুখতার পরাকাষ্ঠা পর্য্যন্ত স্ত্রীদেহধারিণীগণের চিত্তবৃত্তির প্রতীকরূপে ভক্তবিদ্গণ নিম্নলিখিত অনুক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

(১) দেবী (শীর্ষণ্যা)—কর্ম্মার্পণ হইতে ভাগবত-ধর্ম্ম আরম্ভ হয়। দেবীজাতীয়-স্ত্রীগণ সমস্ত কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করেন; তাঁহারা কর্ম্মফল আস্বাদন করেন না। এই ফলফলত্যাগের চিত্তবৃত্তি হইতেই উন্মুখতা আরম্ভ হইল।

(২) ইন্দ্রাণী—ইহারা শীর্ষণ্যা-জাতীয়া স্ত্রী হইতে শ্রেষ্ঠা। ইন্দ্রাণী নিজে পুলোমা-দৈত্যের কন্যা হইলেও তাঁহার উপর অহৈতুকভাবে মহতের কৃপাদৃষ্টি পতিত হইয়াছে। শ্রীউপেন্দ্র ইন্দ্রাণীকে কৃপাপূর্ব্বক 'বৌদিদি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। অতএব কেবল কর্ম্মার্পণকারিণী দেবী হইতে মহতের কৃপাদৃষ্টি প্রাপ্তা ভাগবতকন্যা ইন্দ্রাণী শ্রেষ্ঠা।

(৩) ব্রহ্মাণী (সরস্বতী)—ব্রহ্মাণী আদিগুরু ব্রহ্মার সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্যা হইয়াছিলেন। গুরুপত্নীকে 'সামান্যযোষিৎ' জ্ঞান করিলে অপরাধ হয়। শ্রীগুরুদেব পত্নীর সঙ্গ করেন দেখিয়া যদি কোন 'শিষ্য'-নামধারী তাঁহাকে 'স্ত্রীসঙ্গী' মনে করে, তবে তাহার অপরাধের সীমা নাই; ইহা শাস্ত্র তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন।

(৪) ভবানী—ইনি বিরাগময়ী রূপসম্পন্না হইলেও স্বয়ং বিরাটের দ্বারা মুগ্ধা নহেন। ভবাভিলিপ্তা ভবানীকে দেখিয়া পাষণ্ডী অপরাধিগণ বঞ্চিত হয় অর্থাৎ তাঁহাকে বিরাড়্রূপের অন্তর্গত মনে করে। বস্তুতঃ ভবগৃহিণীর ভব বা সংসার নাই। তাঁহাকে যাহারা জড়সংসারী মনে করে, তাহাদেরই সংসার হয়। ভবানী দক্ষ হইতে প্রাপ্ত বিরাড়্-রূপ পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত বৈষ্ণবের নিকট তাঁহার স্বরূপ প্রকট করেন। বিভিন্ন স্থানে পতিত ভবানীর বিরাড়্রূপ লইয়া দেবীধাম বা ভবধামের ব্যক্তিগণ মত্ত থাকে।

(৫) শিবানী—ইহাতে কোনরূপ বিরাটের আবরণ বা বঞ্চনা নাই। ইনি শিব অর্থাৎ মঙ্গলস্বরূপ জগদ্গুরু শিবের শক্তিস্বরূপিণী বৈষ্ণবী। ইনি সর্ব্বদা নিজানুগত নবার্ব্বুদ নারীর সহিত ইলাবৃত-বর্ষে শিবের অনুগমনে শ্রীসঙ্কর্ষণের সেবা করেন। শিবানীর কৃপায় জীবের কৃষ্ণকীর্ত্তনে যোগ্যতা-লাভ হয়। তিনি সতী-সাধ্বী ও সর্ব্বদা বৈষ্ণব-বুদ্ধিতে শিবের সেবাপরায়ণা। শিবানী-জাতীয় স্ত্রীগণ সর্ব্বদা মহতের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে নিযুক্ত।

(৬) নারায়ণী—ভগবান্ শ্রীনারায়ণের স্বরূপশক্তি শ্রীবৈকুণ্ঠবাসিনী শ্রীনারায়ণীর আদর্শ-অনুসরণকারিণী নারীগণের চিত্তবৃত্তি সর্ব্বদা বৈকুণ্ঠরাজ্যে অবস্থিত।

কোরূপ কুণ্ঠাবর্জ্ম অর্থাৎ জড়ের মধ্যে যে জেতা, অবরতা, পরচ্ছিদ্রান্বেষণ, মাৎসর্য্য, কাপট্য, অসরলতা, অন্যাভিলাষ-প্রভৃতি আছে, তাহা নারায়ণীজাতীয়া নারীর চিত্তবৃত্তিতে নাই। তাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীবিষ্ণুর সুখানুসন্ধানে মত্ত। তাঁহারা শ্রীলক্ষ্মীর পদাঙ্কানুসরণে একমাত্র শ্রীনারায়ণপরায়ণা।

(৭) **যাদবী**—দ্বারকায় যদুকুলমুকুটমণি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্নেহপ্রীতিপরায়ণা আত্মীয়াগণ 'যাদবী'-নামে খ্যাত। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র শয়ন, ভোজন, উপবেশন, আলাপন করেন—সর্ব্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের প্রীতিতে আকৃষ্ট, তাঁহারা বৈকুণ্ঠাভিজ্ঞা নারায়ণী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা। যাদবীজাতীয় নারীগণের শ্রীকৃষ্ণে মমতাবুদ্ধি ও সর্ব্বক্ষণ সুখানুসন্ধান-আবেশময়ী স্মৃতির উদয় হইয়াছে।

(৮) **মাথুরী**—শ্রীকৃষ্ণের মথুরাবাসিনী সেবিকাগণ 'মাথুরী'-নামে পরিচিতা। তাঁহারা মাধব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাদবীগণ অপেক্ষাও অধিক প্রীতিপরায়ণা; মাথুরীজাতীয় নারীগণ শ্রীকৃষ্ণে কেবল-প্রীতিবিশিষ্টা। শ্রীদ্বারকা, শ্রীমথুরা ও শ্রীবৃন্দাবন—এই তিনটী ধামই অনুরাগের স্থান। যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগময়ী ভক্তির উদয় হইয়াছে অর্থাৎ যাঁহারা রাগাত্মিক-শ্রীকৃষ্ণজনের সেবাপরিপাটীতে মুগ্ধা হইয়া শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধানবিহ্বলা, তাঁহারাই উক্ত তিনধামের পরিকরগণের অনুগা বলিয়া কথিতা। তবে উক্ত ধামত্রয়ের মধ্যে উত্তরোত্তর রস-চমৎকারিত্বাধিক্য ও অনুরাগাধিক্য বর্ত্তমান।

(৯) **বল্লবী**—'বল্লবী'-শব্দে গোপী; ইঁহারা সমস্ত ঐশ্বর্য্যাবরণ-মুক্তা, কেবলস্বরূপাকৃষ্টা ও শ্রীরাধাবল্লভের মাধুর্য্যরসের পোষণকারিণী। ইঁহারা উঢ়া ও অনূঢ়া-ভেদে দ্বিবিধা। এই জাতীয়া নারী দুর্লোকে দুর্লভা হইতেও সুদুর্লভা। ইঁহাদের চিত্তবৃত্তিতে ভাগবতধর্ম্মের পরাকাষ্ঠার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবত ও ভাগবতসিদ্ধান্তবিদ্‌গণের পুরুষ ও নারী-জগতের উক্ত বিশ্লেষণ ব্যতীত রতিমঞ্জরী-প্রভৃতি কামশাস্ত্র-প্রণেতা পণ্ডিতগণ পুরুষ ও স্ত্রীজগতের আর একপ্রকার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। রতি-প্রকৃতি অনুসারে বহির্ম্মুখ পুরুষ ও নারী চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। পুরুষের বিভাগ এই,—

(১) **শশকজাতীয়**—শশকজাতীয় পুরুষের কাম-প্রবৃত্তি খুব কম। এই শ্রেণীর পুরুষ কতকটা ভাবগম্ভীর, কথার্থচিত্ত, মৃদুস্বভাবী, অল্পভোজী, সুশীল, সত্যবাদী, সুকেশ, সকলগুণভাজন ও নির্জ্জনে বা কোন সংসঙ্গে থাকিতে একান্ত ইচ্ছুক।

(২) **মৃগজাতীয়**—ইঁহারা মৃগের ন্যায় দ্রুতগামী, কণ্ঠ, স্বাবলম্বনতা-নিবন্ধন ভীতচিত্ত, মৃদুস্বভাবী, দীর্ঘনিদ্র, অত্যন্ত ভীরু, চপলনেত্র, সুস্নেহ ও প্রফুল্লচিত্ত; কামিনী-অভিলাষী হইলেও কামিনীগণের মনোরঞ্জনে ততদূর পটু নহেন।

(৩) **বৃষজাতীয়**—এই শ্রেণীর ব্যক্তি বৃষের ন্যায় শৌরকায়। ইঁহাদের বক্ষ প্রশস্ত, বাহু পেশীবহুল, মস্তিষ্ক বৃহৎ, গাত্রের রক্ত শুক্ল, জিহ্বা লম্বা, ঔদরিক ও জগৎকে সর্ব্বত্র কামিনীরূপে দর্শনে ব্যস্ত।

(৪) **অশ্বজাতীয়**—অশ্বজাতীয় পুরুষ বিলাসৈশ্বর্য্যে অশ্বের ন্যায় শক্তিশালী। ইঁহাদের কর্ণ ও শরীর দীর্ঘ, বক্ষ প্রশস্ত, বাহু অতিশয় দীর্ঘ, উদর ও কটিদেশ কৃশ; মিথ্যা কথা বলাই ইঁহাদের মজ্জাগত অভ্যাস; পরনিন্দা ইঁহাদের মুখরোচক বস্তু।

অনেক সময়ই এই চারি শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। রতিমঞ্জরী-প্রভৃতি-প্রণেতা পণ্ডিত-গণ বিমুখ স্ত্রীজগতের যে চারিপ্রকার শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন, তাহা এই,—

(১) **পদ্মিনী**—ইঁহারা বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্মপরায়ণা, সুন্দরী বা লাবণ্যময়ী; ইঁহাদের দেহ সুগঠিত ও দীর্ঘ; চক্ষু পদ্মের ন্যায় প্রশস্ত ও দীর্ঘায়ত; শরীর সর্ব্বপুষ্পসুষমের ন্যায় কোমল। ইঁহাদের গমনভঙ্গী মরালসদৃশ, কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট; ইঁহারা অল্পভোজিনী ও অল্পনিদ্রা-বিশিষ্টা। ইঁহাদের গাত্রগন্ধ পদ্মের ন্যায়। ইঁহারা সর্ব্বদা সুরুচিসম্মত মূল্যবান্ পোষাক পরিধান করিতে ভালবাসে। ইঁহারাই মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ দেখাইয়াছেন যে, বহির্ম্মুখ স্ত্রীগণের মধ্যে পদ্মিনী নারীগণই লক্ষ্মীযুক্তা। পুণ্যবান্ পুরুষগণ এইরূপ স্ত্রী কামনা করিয়া থাকেন। ইঁহাদের ধর্ম্মপরায়ণতা ঐকান্তিকী নহে অর্থাৎ পরমার্থকেই ইঁহারা জীবনে-মরণে একমাত্র প্রাপ্য প্রয়োজন বলিয়া বরণ করে নাই। 'জগতের ভোগসুখও থাকুক, অথচ পুণ্যশীলতা, লজ্জা, সচ্চরিত্র-প্রভৃতি প্রাকৃত গুণের সহিত নৈতিক ধর্ম্মের অনুশীলন করিয়া জীবন নির্ব্বাহিত হউক',—এইমাত্র ইঁহাদের আদর্শ। প্রকৃত-প্রস্তাবে

ইহারা পুণ্যবতী, সৌভাগ্যবতী, নীতিপরায়ণা, সুন্দরী ও সাধ্বী।

(২) চিত্রিণী—এই জাতীয়া স্ত্রীগণ বাদ্য-যন্ত্র, চিত্র, নৃত্যগীত ও বিলাস-শিল্প, কিন্তু কামচরিতার্থবিষয়ে অতিশয় আসক্ত নয়। ইহাদের চক্ষু মৃগচক্ষুর ন্যায় চঞ্চল; ইহারা মধ্যাকৃতি, ক্ষীণাঙ্গী ও সুশ্রী। ইহারা মৌনপ্রিয়া।

(৩) শঙ্খিনী—ইহারা অত্যন্ত কামপরায়ণা; ইহাদের কণ্ঠস্বর অতিশয় উচ্চ, কর্কশ, হস্তদ্বয় দীর্ঘ, নিতম্ব বৃহদাকার, শিরে বিপুল কেশরাজি। ইহারা পুরুষকে কর্কশবাক্য প্রয়োগ করিয়া নিজ-বশীভূত রাখিতে চেষ্টা করে। ইহারা ক্ষারপ্রিয়া।

(৪) হস্তিনী—ইহারা হস্তিনীর ন্যায় অতিশয় স্থূলাঙ্গী। ইহারা স্থূলাধরা, স্থূলস্তিতভাগা, স্থূলাঙ্গুলী, স্থূলকুচা। ইহাদের চক্ষু অতি ক্ষুদ্র এবং তাহাতে কামভাব ও লালসা বিস্ফারিত হইতে থাকে। ইহারা স্বভাবতঃ লজ্জাহীনা। ইহারা ঝাল ও টক্ খাইতে ভালবাসে। ইহারা হস্তিনীর ন্যায় পুরুষকে স্পর্শদ্বারা সুখ প্রদান করিয়া স্ববশে আনয়ন করে।

উপরি-উক্ত চতুর্বিধা নারী পূর্বোক্ত চতুর্বিধ-পুরুষের মধ্যে কে কাহাকে পরস্পর অভিলাষ করে, তৎসম্বন্ধে এইরূপ উক্তি পাওয়া যায়—

"পদ্মকে পদ্মিনী তুষ্টা মৃগে তুষ্টা চ চিত্রিণী।
বৃষভে শঙ্খিনী তুষ্টা হয়ে তুষ্টা চ হস্তিনী॥"

কামশাস্ত্রপ্রণেতা বাৎস্যায়নাদি ঋষিগণের স্ত্রীপুরুষ-জগতের বিচার কতকটা বৈজ্ঞানিক-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার মধ্যে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের পরিচয় আছে। বস্তুতঃ যতক্ষণ বৈমুখ্য, ততক্ষণই এইসকল মনোধর্ম্মের বিচারের মূল্য আছে। মহতের কৃপায় অসম্ভবও সম্ভবে পরিণত হয়। তাই শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের কৃপায় বেশ্যাও—

"প্রসিদ্ধা বৈষ্ণবী বৈশ্যা পরমা মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁ'র দর্শনেতে যাতি॥"

(চৈ চ অ ৩।১৪১)

সর্বাশেষরের অহৈতুকী কৃপায় বেশ্যাও অপ্রাকৃতলোকী-গৃহে আবির্ভূতা হইয়া বরবীগণের সঙ্গে গণিতা হইতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবতে দুই স্থলে—শিখণ্ডা বেশ্যা নির্বেদগ্রস্তা হইয়া বলিয়াছিলেন—

"সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্।
তং বিক্রীয়াত্মনৈবাহং রমেঽনেন যথা রমা॥"

(ভা ১১।৮।৩৪)

"ইনি শরীরিগণের প্রিয়তম, সুহৃৎ, স্বামী ও আত্মস্বরূপ। আমি আত্মসমর্পণ-দ্বারা ইহাকে বিশেষভাবে ক্রয় করিয়া শ্রীরমাদেবীর ন্যায় ইহার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-বিধান করিব।" এস্থলে শ্রীহরিরই স্বাভাবিক সৌহৃদ্যাদি ধর্ম্মসমূহের দ্বারা স্বাভাবিক পতিত্ব স্থাপন করিয়া অপর জড়দেহাভিমানী পতির ঔপাধিক পতিত্ব স্থাপিত হইয়াছে। এইস্থানে সচ্চিদানন্দ পরতত্ত্বের প্রতি স্বরূপশক্তি শ্রীরমার অনুগা হইয়া যে পরতত্ত্বের ইন্দ্রিয়-তর্পণার্থ লোভ, তন্মধ্যে প্রাকৃত রক্তমাংস-চর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। জড়দেহাভিমানী পতির প্রতি জড়দেহাভিমানিনী পত্নীর যে জড়দেহাসক্তি, তাহা ঔপাধিক; বস্তুতঃ ইহা একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা শ্রীকামদেবের প্রতি ওষধিভূতা প্রকৃতিগণের আসক্তিরই খণ্ডিত ও বিকৃত হেয় প্রতিফলন।

শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জীবাত্মার স্বাভাবিক স্বামী। জড়-রক্তমাংস-দেহধারী জীব ঔপাধিক স্বামী মাত্র। চক্র, মন্ত্র, আহুতি-প্রভৃতি কৃত্রিম উপায়দ্বারা ঔপাধিক স্বামী লাভ হয়, আর কৃষ্ণ স্বাভাবিকভাবেই স্বামী। ঔপাধিক স্বামীর দ্বারা জড়, নশ্বর সুখ পাওয়া যায়। ঐ সুখ নরকেও পাওয়া যায়। ঐ সুখ মাংসের মধ্যে আবদ্ধ—বিষয়াবিষ্ট চঞ্চল মনেরই; আত্মার সে সুখের সংস্পর্শ নাই। 'আত্মা'-শব্দে উল্লিখিত শ্লোকে পরম প্রিয়তম স্বামী শ্রীকৃষ্ণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

শ্রীরুক্মিণীদেবী আদর্শ নারীজগতের স্বরূপ-শিক্ষাদানকল্পে শ্রীকৃষ্ণসমীপে যে কয়েকটী কথা নিবেদন করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তদুত্তরে যে-সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য—

"যদ্যদ্যয়া নৃপশিখামণয়োঽঙ্গ-বৈন্য
জায়ন্তনাহুষসদাম্বয ঐলমুখ্যাঃ।
রাজ্যং বিসৃজ্য বিবিধোরুগুণং তমূলাক
সীদন্তি হেঽনুপদবীং ত ইহাশ্রিতাঃ কিম্?"

(ভা ১০।৬০।৪১)

হে কমললোচন, যাঁহার ভজন-কামনায় অঙ্গ, পৃথু, ভরত, যযাতি ও গয় প্রভৃতি উত্তম নরপতিগণ একচ্ছত্র

রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করিয়াছিলেন, সেই আপনার মার্গ অনুসরণ করিয়া উক্ত রাজগণ ক্লেশগ্রস্ত হইয়াছিলেন কি ?

"কান্তং প্রয়েত তব পাদসরোজগন্ধ-
মাঘ্রায় সন্মুখরিতং জনতাপবর্গম্ ।
লক্ষ্মীলয়স্ত্রবিগণয্য গুণালয়স্ত
মর্ত্ত্যা সংসোঢ়ুমর্হতি বিক্লবদৃষ্টিঃ ॥"
(ভা ১০।৬০।৫২)

নিখিল-গুণাশ্রয় আপনার পাদপদ্মসৌরভ আঘ্রাণে পুরুষগণেরও প্রশংসিত, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীরও সেব্য এবং জনসমূহের মোক্ষ স্বরূপ। মনুষ্যলোকে কোন্ রমণী একবার উহা লাভ করিলে তাহার অনাদরপূর্ব্বক অর্থ-কামনায় নিরন্তর মহাভয়গ্রস্ত মরণশীল পুরুষান্তরের আশ্রয় করিতে পারে ?

"তং ত্বাদৃশমভজং জগতামধীশ-
মাত্মানমত্র চ পরত্র চ কামপূরম্ ।
ত্যক্ত্বে তবাঙ্ঘ্রিশরণং স্মৃতিভির্মৃগ্যা
যো বৈ ভজন্নপপদ্যাত্যনৃতাপবর্গঃ ॥" (ঐ—৫৩)

অতএব আমি সর্ব্বতোভাবে অনুকূল জগদীশ্বর, সর্ব্বান্তর্যামী এবং ইহলোক ও পরলোকে সর্ব্বাভীষ্টপ্রদাতা আপনাকে আশ্রয় করিয়াছি ; আপনি সেবকগণের সংসার-বন্ধন বিনাশপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আপনার নিকট গ্রহণ করিয়া থাকেন। তজ্জন্য আপনার এই শ্রীপাদপদ্ম জন্ম-জন্মান্তরেও আমার শরণ হউক।

"তস্যাঃ সুরেচ্ছ্রিত নৃপা ভবতোপদিষ্টাঃ
স্ত্রীণাং গৃহেষু খরগোষ্ট্রবিড়ালভৃত্যাঃ।
যৎকর্ণমূলমরিকর্ষণ নোপযায়াদ্-
যুষ্মৎকথা মৃড়বিরিঞ্চিসভাসু গীতা ॥" (ঐ—৫৪)

হে শত্রুবিনাশন অচ্যুত, ব্রহ্মা মহেশ্বরের সভায় নিরন্তর কীর্ত্তিত তবদীয় চরিত-বৃত্তান্ত যে নারীর কর্ণপ্রান্তে উপস্থিত হয় নাই, তাদৃশ রমণীজনের গৃহে গর্দ্দভ, গো, অশ্ব, বিড়াল ও ভৃত্যের ন্যায় অবস্থিত পূর্ব্বকথিত রাজগণকেই তাহারা পতিরূপে প্রাপ্ত হউক।

"কৃষ্ণস্রগ্বরোমনখকেশপিনদ্ধমন্ত-
র্মাংসাস্থিরক্তকৃমিবিট্কফপিত্তবাতম্ ।
জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতিবিমূঢ়া
যা তে পদাব্জমকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী ॥" (ঐ—৫৫)

যে স্ত্রীলোক কখনও ভবদীয় পদকমলমকরন্দ আঘ্রাণ করে নাই, সেই রমণীই চর্ম্ম, পদ্ম, রোম, নখ, ও কেশাচ্ছন্ন এবং অভ্যন্তরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, কফ, পিত্ত, বায়ুময় জীবিত শবতুল্য শরীরধারী পুরুষাধমকে স্বামি-জ্ঞানে সেবা করিয়া থাকে।

"অথাব্জনাভ মম তে চরণানুরাগ
আত্মন্ প্রসাদ উত নঃ পরমানুকম্পা ॥" (ঐ—৫৬)

হে কমললোচন, যদিও আপনি আমার প্রতি অন্য-লোকসাধারণ-দৃষ্টিসম্পন্ন এবং আত্মাকে পরিতৃপ্ত, তথাপি আপনার শ্রীপাদপদ্মে আসক্তিই আমার পরম লাভস্বরূপ ; বিশেষতঃ বৎকালে এই বিশ্বের বৃদ্ধির জন্য অতিমাত্র রজোগুণের অবলম্বন-সহকারে আপনি আমাকে নিরীক্ষণ করেন, তৎকালে উহাই আমার পক্ষে পরম অনুগ্রহ হইয়া থাকে।

শ্রীরুক্মিণীদেবীর উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—

"যে মাং ভজন্তি দাম্পত্যে তপসা ব্রতচর্য্যয়া।
কামাত্মানোঽপবর্গেশং মোহিতা মম মায়য়া ॥"
(ভা ১০।৬০।৫২)

যাহারা বিষয়-ভোগাসক্তচিত্তে তপস্যা ও ব্রতচর্য্যাদ্বারা প্রেমভক্তিপ্রদাতা আমাকে সাধারণ দাম্পত্যসুখাভিলাষে আরাধনা করে, তাহারা আমার মায়ায় মোহিত হইয়া থাকে।

"মাং প্রাপ্য মানিন্নপবর্গসম্পদং
বাঞ্ছন্তি যে সম্পদমেব তৎপতিম্ ।
তে মন্দভাগ্যা নিরয়েঽপি যে নৃণাং
মাত্রাত্মকত্বান্নিরয়ঃ সুসঙ্গমঃ ॥" (ঐ—৫৩)

হে মানিনি, অপবর্গ ও নিখিল সম্পদের অধীশ্বর আমাকে লাভ করিয়াও যাহারা, যে-সকল বিষয় অতি নিকৃষ্ট যোনিতেও সুলভ, তাদৃশ বিষয়সমূহই প্রার্থনা করিয়া থাকে, ঐ-সকল পুরুষের পক্ষে বিষয়াত্মক নিকৃষ্ট যোনিই সুসঙ্গত হইয়া থাকে ; অতএব তাহারা মন্দভাগ্য।

"দিষ্ট্যা গৃহেশ্বর্যসকৃন্মমি ত্বয়া
কৃতানুবৃত্তির্ভবমোচনী খলৈঃ।
স্মৃতক্বচিন্মে স্মৃতয়াঽপরাধিনো
ক্ষমস্তরায়া নিরুতিং সুখং স্ত্রিয়াঃ ॥" (ঐ—৫৪)

হে গৃহেশ্বরি, নিষ্কাম তুমি যেভাবে নিরন্তর আমার অনুসরণ করিয়াছ, তাহা সকাম ইন্দ্রিয়তর্পণপরতা বন্ধন-পরায়ণা স্ত্রীগণের পক্ষে সুদুষ্কর। ইহা মঙ্গলজনক।

শ্রীহরি পুনরায় বলিলেন (ভা ১০।৮০।৪৮)—

"ভ্রাতুর্বিপক্ষকরণং ত্বয়ি নির্ব্যলীকয়া
প্রোদ্বাহপর্ব্বণি চ তদ্বধবন্ধশোচ্যম্।
দুঃখং সমুখসহোঽক্ষবিযোগজং তা
নৈবাবিদন্ কিমপি তেন বয়ং বিতাপ্তাঃ॥"

যুদ্ধে তোমার ভ্রাতার বিপক্ষকরণ ও অনিরুদ্ধের বিবাহোৎসবে দুরাত্মাদের তোমার ভ্রাতার বধ এবং তজ্জনিত দুঃখ—এ-সমস্ত তুমি আমাদের বিয়োগভয়ে সহ্য করিয়াছ, পরন্তু কিছুই বল নাই। তাদৃশ সহিষ্ণুতা-প্রভৃতি গুণেই তুমি আমাদিগকে বশীভূত করিয়াছ।

অধিকার-নির্ণয়

গুণ ও দোষ কিরূপে নির্ণেয়?

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

"যে যেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ॥"

(ভা ১১।২১।২)

নিজ নিজ অধিকারে যে অবস্থিতি, তাহাই গুণ এবং তাহার বিপর্য্যয়ই দোষ; গুণ ও দোষের এইরূপেই নির্দ্ধারণ হয়।

অধিকার নির্ণয়-সম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদ

অধিকার-নির্ণয়-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে সুবিচারপূর্ণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"অধিকারনির্ণয় একটি প্রধান ন্যায়াচরণ। যোগ্যতার নাম অধিকার। যোগ্যতা দুই প্রকার অর্থাৎ যে কর্ম্মে যাহার যোগ্যতা ও কত পরিমাণে সেই কর্ম্মে তাহার যোগ্যতা। সকল ব্যক্তিই সকল পুণ্যকর্ম্ম করিতে যোগ্য নয়। কোন ব্যক্তি কোন পুণ্যকর্ম্ম করিতে যোগ্য বটে, কিন্তু সেই কর্ম্ম পূর্ণরূপে করিতে যোগ্য নয়। অতএব যোগ্যতা স্থির না করিয়া যদি কেহ কর্ম্ম করেন, তবে সেই কর্ম্ম ফলবান্ হইবে কি না, তাহা বলা যায় না। তজ্জন্য অধিকার-নির্ণয় সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কর্ম্মকর্ত্তা নিজের অধিকার নির্ণয় করিতে পারে না, অতএব উপযুক্ত গুরুকে আগে অধিকারবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবে। উপযুক্ত কর্ম্ম করিবার সময় প্রক্রিয়া নির্ণয় করা পুরোহিতের কার্য্য। এইজন্যই লোকেরা উপযুক্ত গুরু ও পুরোহিত বরণ করেন। আজকাল যেরূপ গুরু ও পুরোহিত-বরণ হইতেছে, তাহা শাস্ত্রজ্ঞদিগের অভিপ্রেত নয়। নামমাত্র গুরু ও নামমাত্র পুরোহিত বরণ করা পুত্তলিকা-বরণের ন্যায় নিরর্থক। গ্রামের বিশেষ যোগ্য ব্যক্তিকেই বরণ করা উচিত। নিজ গ্রামে না মিলিলে অন্যত্র অন্বেষণ করাই কর্ত্তব্য; কর্ম্মের যোগ্যতার উদাহরণ দেওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা সহসা বোধগম্য হইবে না। পুষ্করিণী-খনন একটি পুণ্যকর্ম্ম। যদি নিজহস্তে খনন করে, তবে উপযুক্ত বল, অস্ত্রাদি, ভূমি ও সহায় থাকিলে ঐ কর্ম্মে যোগ্যতা হয়। যদি অর্থব্যয় করিয়া খনন করে, তবে অর্থ থাকা চাই। যে পরিমাণ বল, অস্ত্রাদি, ভূমি ও সহায় অথবা অর্থ থাকে, সেই পরিমাণই সেই কর্ম্মের অধিকার। অনধিকারীর কোন ফল হয় না এবং কর্ম্ম করিতে গেলে প্রত্যবায় হয়। বিবাহকার্য্যে শরীরের যোগ্যতা, সংসারনির্ব্বাহের সামর্থ্য ও দাম্পত্য-ব্যবহারের উপযোগী মানসসংস্কার ইত্যাদি যোগ্যতা আবশ্যক। এইরূপ যে কার্য্য করিতে ইচ্ছা হইবে, তাহার **অধিকার অগ্রে নির্ণয় করা উচিত।**"

সনাতন-শাস্ত্রের সর্ব্বত্র সর্ব্বাগ্রেই অধিকারের কথা আলোচিত হইয়াছে। অধিকার লঙ্ঘন করিলে মনুষ্য জগন্নাশকর কার্য্য করিতে বাধ্য হইবে। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শতপ্রকার জগন্নাশকর কার্য্যের কথা বিশ্লেষণ-সহকারে বিবৃত করিয়াছেন।

জগন্নাশ-কার্য্য

"জগন্নাশকার্য্য শত প্রকার—(১) সৎকার্য্যের ব্যাঘাত-করণ, (২) কদাচারপরতা, (৩) ধর্ম্মের নামে অনাচার-প্রবর্ত্তন

(৫) অন্যায়-যুদ্ধ ও (৬) অপচয়। অন্যলোকে যে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার স্বতঃ ও পরতঃ ব্যাঘাতকরণের দ্বারা করিলে অপরাধকার্য্য করা হয়। ভগবদ্ভক্তিজনিত বা জ্ঞানজনিত যে বিষয়বৈরাগ্য হয়, তাহা উত্তম; কিন্তু চেষ্টা করিয়া বৈরাগ্য উৎপাদন করিতে গেলে অনেক অমঙ্গল হইয়া উঠে। সংসারে বর্ত্তমান থাকিয়া গৃহস্থধর্ম্ম উত্তমরূপে পালন করাই সাধারণের কর্ত্তব্য। যথার্থ বৈরাগ্য উদিত হইলে সন্ন্যাসাশ্রমবিহিত বৈরাগ্য আচরণ করিবে অথবা ভগবৎসেবাপর হইয়া ক্রমশঃ গার্হস্থ্য-চেষ্টাসমূহ খর্ব্ব করিবে; ইহারই নাম যথার্থ বৈরাগ্য। অনেকে গৃহে কষ্টবোধ করিয়া অথবা অন্য কোন উৎপাতপ্রযুক্ত গৃহস্থধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, সেটি পাপকার্য্য। ক্ষণিক বিরাগ হইলে আশ্রম ত্যাগ করিবার অধিকার জন্মে না। কোন কোন লোক বুঝিতে না পারিয়া 'পরে ভক্তি অর্জ্জন করিব', তাই মনে করিয়া ভেক-ধারণরূপ বৈরাগ্যলিঙ্গ গ্রহণ করেন। ইহা তাঁহাদের ভ্রম, যেহেতু ঐ বৈরাগ্য স্বভাব হইতে উদিত হয় নাই, কেবল কোন ক্ষণিক চিন্তা বা বিরাগ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলে ঐ বৈরাগ্য কয়েকদিবসের মধ্যেই উৎসন্ন হয় এবং তদ্গ্রহীতাকে কদাচারে ও ইন্দ্রিয়পরতায় নিক্ষেপ করে। বৈরাগ্যের অধিকারই আচার-প্রবর্ত্তনের যোগ্য-হেতু। স্বীয় স্বীয় অধিকারে যে যে আচার নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সেই আচারই সেই সেই লোকের পক্ষে সদাচার। অধিকার বিচার না করিয়া অনধিকারগত আচার স্বীকার করিলে জগতের ও নিজের প্রকৃত অনিষ্ট ঘটে। কোন কোন লোক ভ্রম-ক্রমে, কেহ কেহ বা দুর্ব্বুদ্ধি-সহকারে উচ্চাধিকারযোগ্য না হইয়াও সেই অধিকারের কার্য্যসকল করিতে থাকেন, তদ্দ্বারা ক্রমশঃ জগন্নাশ হইয়া থাকে। ধর্ম্মের নামে অনাচার প্রচার করাই অনেকস্থলে দৃষ্ট করা যায়। ভাক্ত-সন্ন্যাসী-দিগের বর্ণাশ্রম-লোপরূপ ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন এবং নেড়া, বাউল, কর্ত্তাভজা, দরবেশ, কুম্ভপটিয়া, অতিবড়ী, স্বেচ্ছাচারী ভাক্ত ব্রহ্মবাদীদিগের বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ চেষ্টাসকল অত্যন্ত অহিতকর। ঐ সমস্ত কার্য্যদ্বারা তাহারা যে পাপ প্রচলিত করে, তাহা জগন্নাশকার্য্য-বিশেষ। সহজিয়া, নেড়া, বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতির যে অবৈধ স্ত্রীসংসর্গ সর্ব্বদা লক্ষিত হয়, তাহা নিতান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ। রাজ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য যতপ্রকার অন্যায়যুদ্ধ হয়, সে সমুদয় অধর্ম্ম ও জগন্নাশকার্য্যবিশেষ। নিতান্ত ন্যায়যুদ্ধ ব্যতীত ধর্ম্মশাস্ত্রে অন্য যুদ্ধ বিহিত হয় নাই। অর্থ, ক্ষমতা, সময়, সামগ্রী ন্যায়পূর্ব্বক ব্যয় করাই বিধি। অন্যায়রূপে ব্যয় করিলে অপচয়রূপ পাপ ঘটে। পাপের গুরুতা-লঘুতাক্রমে সকল পাপে গুরুতা-লঘুতা সংযুক্ত হয়। গুরুতা ও লঘুতা-অনুসারে পাপ, পাতক, অতিপাতক ও মহাপাতক-প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়। সাধু ও ঈশ্বরের প্রতি কৃত হইলে তাহাদিগকে অপরাধ বলে। অপরাধ সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও বর্জ্জনীয়।" (শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২।৪)

সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম-ভক্তি ও অধিকার-বিচার

অনেকে বলেন—'কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগমার্গে অধিকার-নির্ণয়ের প্রসঙ্গ আছে বটে, কিন্তু ভক্তিতে নরমাত্রেরই অধিকার। সুতরাং ভক্তির অনুশীলন করিবার সময় অধিকার-নির্ণয়ের কোনই আবশ্যকতা নাই।'

যাঁহারা "ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা"—এই উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ঐরূপ বিচার করেন, তাঁহাদের ঐ স্বকপোল-কল্পিত মতবাদ শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীজীবপ্রভু বলেন,—

"শ্রীভগবান্ মনুষ্যগণের শ্রেয়োবিধান-কামনায় কর্ম্ম-যোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—এই ত্রিবিধ যোগের কথা বলিয়াছেন; তন্মধ্যে কে কোন্ যোগের অধিকারী, তাহাও নির্ণয় করিয়াছেন।" (ভ স ১৭০-১৭১তম অনুচ্ছেদ)

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥
(ভা ১১।২০।৬)

যোগা উপায়াঃ; ময়া শাস্ত্রযোনিনা শ্রেয়াংসি মুক্তি-ত্রিবর্গপ্রেমাদি, অনেন ভক্তেঃ কর্ম্মত্বঞ্চ ব্যাবৃত্তম্।

• • • •

তেষনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥"
(ভা ১১।২০।৭)

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—শাস্ত্রযোনি আমাদের অনুষ্ঠানগণের মঙ্গল অর্থাৎ মুক্তিরূপ মঙ্গল, স্বর্গার্থকাম—এই ত্রিবর্গ-লাভরূপ মঙ্গল ও বিমুক্তি বা ভগবৎপ্রীতিরূপ মঙ্গলের বিধান-কামনায় যথাক্রমে জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগরূপ ত্রিবিধ যোগ কথিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত মঙ্গলের অন্য কোন উপায় নাই। ভক্তি ক্রিয়ারূপা হইলেও কর্ম্মের পৃথগ্‌রূপে উল্লেখ থাকায় ভক্তির কর্ম্মত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে।

যাহারা কামী অর্থাৎ গৃহাশ্রমের কর্ম্মসমূহ পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ এবং দেহ-গেহ-স্ত্রী-পুত্রাদিতে অতিশয় আসক্ত, সেইরূপ বিষয়াতুরচিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে কর্ম্মযোগই (কর্ম্মার্পণই) সিদ্ধিপ্রদ।

যাহারা এইরূপ কর্ম্মফলকামী, সেইরূপ অজ্ঞ ব্যক্তিগণকে কখনও কর্ম্মত্যাগের উপদেশ দেওয়া উচিত নহে এবং তাহারা যাহাতে বিহিত কর্ম্মের আচরণ করিয়া তাহার ফল শ্রীভগবানে সমর্পণের দ্বারা কর্ম্মযোগী হইতে পারে, তদ্বিষয়ে উপদেশ করা কর্ত্তব্য।

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥"
(গী ৩।২৬)

অজ—অতএব কর্ম্মাসক্তদিগের কর্ম্ম হইতে বুদ্ধিচাঞ্চল্য অর্থাৎ তাহাদের কর্ম্মত্যাগে প্রবৃত্তির উদয় করাইবে না। পরন্তু নিবিষ্ট হইয়া স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক তাহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে। অজ্ঞগণের বুদ্ধিকে বিচলিত করিলে কর্ম্মসমূহে শ্রদ্ধা হ্রাস পাইবে, আবার জ্ঞানেরও উৎপত্তি হইবে না, অতএব উভয়তঃ তাহারা ভ্রষ্ট হইবে।

জীব যতদিন পর্য্যন্ত অজ্ঞ থাকিবে, অর্থাৎ শ্রীভগবানের কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে 'জ্ঞা' অর্থাৎ শ্রদ্ধা বা দৃঢ়বিশ্বাস লাভ না করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে কর্ম্ম করিতে হইবে। যাহার 'জ্ঞা' অর্থাৎ শ্রীহরিকথায় দৃঢ়বিশ্বাস নাই, সে ব্যক্তিই অজ্ঞ। সেইরূপ যে ব্যক্তি অজিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া ব্রহ্মার (পরমেষ্ঠীর) সুখ পর্য্যন্ত ভোগে বিরক্ত নহে, তাহাকেও অবশ্যই কর্ম্ম করিতে হইবে। তাই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥"
(ভা ১১।২০।৯)

হে উদ্ধব! যে-কাল পর্য্যন্ত জ্ঞানীর ব্রহ্মলোক-সুখাদিতে নির্ব্বেদ অর্থাৎ অকিঞ্চিৎকর-বুদ্ধির উদয় না হয়, সেকাল-পর্য্যন্ত ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর কর্ম্ম করিতে হইবে; আর আমার কথার প্রতি যেকাল-পর্য্যন্ত আকস্মিক মহৎকৃপা-জনিত-শ্রদ্ধা উদিত না হয় অর্থাৎ 'ভগবৎকথা-শ্রবণাদি-দ্বারাই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে'—এই দৃঢ় বিশ্বাস যে-কাল পর্য্যন্ত জীবের না হয়, সেকাল পর্য্যন্তও কর্ম্ম (কর্ম্মার্পণ) করিতে হইবে।

যেহেতু কর্ম্মই করিবে, কখনও বেদনিষিদ্ধ কর্ম্ম করিবে না এবং সেই বেদবিহিত কর্ম্মও শ্রীভগবানে তৎ-ফলার্পণপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিলে কর্ম্মবন্ধনমুক্ত ঐহিক ও পারত্রিক ভোগে বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্য জন্মিবে।

নিষ্কামভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা পারলৌকিক ভোগসুখে যে নির্ব্বেদ লাভ করে, তাহা কিন্তু বহুকাল বিলম্বে ঘটিয়া থাকে; পরন্তু যে ব্যক্তি অতি সত্বর সর্ব্ববর্ণাশ্রম ও তদুপলক্ষিত জ্ঞানের পরিণাম-ফললাভের চরমফলস্বরূপ ভগবৎপ্রীতিলাভের ইচ্ছা করেন, তিনি অন্য সমস্ত কর্ম্মই স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চরাত্রকথিত ও বেদোক্তবিধি-অনুসারে শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার সহিত শ্রীকেশবদেব অর্থাৎ চতুর্ভুজ মহাবিষ্ণুর কেবল অর্চ্চন করিবেন। যাঁহারা শুদ্ধ বা কেবল অর্চ্চনে অধিকারী নহেন, তাঁহারা কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চন করিবেন। যাঁহারা একান্তভাবে নিরপেক্ষ অর্থাৎ নিষ্কাম ফলান্তর-কামনাহীন ও বর্ণাশ্রমের কর্ম্মসমূহ স্বরূপতঃ পরিত্যাগকারী —শাস্ত্রীয়-নির্ণয়-শ্রদ্ধাযুক্ত, তাঁহারাই চতুর্ভুজ মহাপুরুষের শুদ্ধ অর্চ্চনের অধিকারী, কিন্তু যাঁহাদের অতিশয় ব্যবহার-চেষ্টা আছে অর্থাৎ যাঁহারা স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-বন্ধু-সমাজ-প্রভৃতির সহিত ব্যবহারিকতায় আসক্ত, আঠার প্রকার বিবাদ (ব্যবহার)—ঋণদানাদি বিষয়-রক্ষণ-কৌশল বা মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতির দ্বারা বিষয়রক্ষায় নিপুণ এবং যাঁহারা স্বেচ্ছাচারমূলা লোক-পরম্পরাগতা শ্রদ্ধা-যুক্ত অর্থাৎ অন্য লোকের দেখাদেখি যাঁহাদের শ্রীভগবানে লৌকিক আদরমাত্র আছে, বস্তুতঃ তাঁহারা ভক্তি-ভক্ত-মহিম-জ্ঞানহীন এবং সংখ্যামাত্র

ভক্তিতে প্রবৃত্ত—এইরূপ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মরত, লৌকিক-শ্রদ্ধাযুক্ত, ভক্তিতে কনিষ্ঠাধিকারী স্ত্রীপুরুষগণের পক্ষে কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চনই ক্রমিক-মঙ্গলের উপায়।

'আমি ও আমার'-বুদ্ধি যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ উক্ত কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চন করিতেই হইবে এবং 'সমস্তই শ্রীবিষ্ণুর জীব ও শ্রীবিষ্ণু-কর্ত্তৃক চালিত হইয়াই আমার নিকট আসিয়াছে'—এই বুদ্ধি থাকিবে। চেতনের বিকাশানুযায়ী সকলকেই মান ও দান দিতে হইবে এবং ইহার ফল—মুক্তি। প্রাণীর মধ্যে মনুষ্য, ব্রাহ্মণ, জ্ঞানী, ভক্ত বা পরমহংস উত্তরোত্তর মান ও দানের শ্রেষ্ঠ পাত্র। পরমহংসের মধ্যে ব্রহ্মানুভবীই—আদি-পরমহংস, আর ভগবদনুভবীই—অন্ত্য পরমহংস। সুদুর্লভ ভাগ্যক্রমে ইহাকে প্রাপ্ত হইলে নিজের কোন 'স্বত্বগ্রহ' (ভা ৭।১৪।১১) না রাখিয়া সব ছাড়িয়া দিতে হইবে। জীব স্বতন্ত্রভাবে কামনা-বাসনা বা ইচ্ছা করিলে জীবের অমঙ্গল অনিবার্য্য। তজ্জন্য প্রথমে নিজ-বাসনা ত্যাগ করিয়া কামদেব শ্রীভগবানের সুখ-কামনার চিন্তা বা অনুসন্ধান আবশ্যক। এই কর্ম্মফলত্যাগই—সন্ন্যাস। ইহাই কর্ম্মযোগ, কর্ম্মার্পণ বা সাত্ত্বিকী ভক্তি।

অতএব নৃমাত্রেরই ভক্তিতে অধিকার আছে বলিয়া অশ্রদ্ধালু বা কপটী কখনও ভক্তির অধিকারী নহে, শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত হইতে ইহাই প্রমাণিত হইল। অন্ততঃ লৌকিক-শ্রদ্ধা না থাকিলে ভক্তিপ্রবৃত্তি আসিবেই হইবে না।

ভণ্ডামি ভক্তি নহে

যে শ্রীহরিকথায় শ্রদ্ধা নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম-ত্যাগের হেতু বলিয়া শ্রীভগবান্ "যৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে" শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন, [redacted] শ্রদ্ধার ভান [redacted] নহে। পরমার্থতির ভান বা অভিনয় কিন্তু কর্ম্মত্যাগের হেতুরূপা পরমার্থতিও নহে। কোনও উপদেশক যদি ঐ সকল ভানকারীর প্রকৃত অধিকার বিচার না করিয়া তাহাদিগকে কৃত্রিমভাবে কর্ম্ম-ত্যাগের উপদেশ ও কেবলা ভক্তির (?) শিক্ষা প্রদান করেন, তবে নিশ্চয়ই ঐ সকল মর্কটতুল্য আনুকরণিক ব্যক্তিগণ ভক্তি-মুক্তাফলকে ধনবী ভাবিয়া দন্তদ্বারা নিষ্পেষণ করিবার চেষ্টা করিবে এবং অচিরে উহাকে দূরে নিক্ষেপ করিবে।

'ভক্তিতে কর্ম্মজ্ঞানাদির মত যোগ্যতা বা অধিকার-বিচার নাই'—এই সিদ্ধান্তকে বিকৃতভাবে অপরিপক্ক মস্তিষ্কে বুঝিতে গিয়া ভক্তিযাজনের নামে বহু অনর্থজাল উপস্থিত হইয়াছে। তামসিকী ও রাজসিকী প্রকৃতির ব্যক্তিগণ কেবলা ভক্তির সর্ব্বোচ্চ-স্তরের কথা শ্রবণ করিয়া অধিকার-বিচারহীন হইয়া যে তামসিকী ও রাজসিকী ভক্তির দম্ভ প্রকাশ করে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীভক্তিরসার্ণবে প্রদর্শিত হইয়াছে। সদ্বৈদ্য ঔষধ ও পথ্য-নির্ব্বাচনে সর্ব্বদাই অধিকার বিচার করেন। এখানেই অর্দ্ধ চিকিৎসক বা হাতুড়িয়া চিকিৎসকের সহিত সদ্বৈদ্যের পার্থক্য। 'টাইফয়েড্' জ্বর-বিরামের পর যখন রোগী ক্রমশঃ সুস্থতার দিকে যায়, তখন তাহার শরীরের পুনর্গঠনের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের বিশেষ প্রয়োজন আছে। বাদাম, পেস্তা, ঘৃত, পুষ্পান্ন, সোহান-হালুয়া, নানাপ্রকার মোরাই মিঠাই, পায়সান্ন ও ক্ষীর অতীব পুষ্টিকর খাদ্য সন্দেহ নাই; কিন্তু জ্বর-বিরামের সঙ্গে-সঙ্গেই যদি ঐ সকল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে অনিবার্য্যরূপে হিতে বিপরীত ফলই ফলিবে। দৈহিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উক্ত রোগীকে হয়-ত ৫।৬ মাস বা তদধিককাল পরে ক্রমে ক্রমে নিয়মিত পরিমাণে সেই পুষ্পান্ন, বাদাম, পেস্তা খাওয়ান যাইতে পারে এবং সেই উপযুক্ত সময়েই ঐ সকল পুষ্টিকর দ্রব্য তাহার পক্ষে আদর্শ পথ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু রোগ সারিবার পরদিনই পুষ্পান্ন, সোহান-হালুয়া, বাদাম বা পেস্তা খাওয়াইলে পুষ্টি হওয়া দূরে থাকুক, রোগী সদ্যসদ্য মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। তৎপূর্ব্বে রোগীকে বহুদিন গ্লুকোস, মিছরির পানা, কমলালেবুর রস (তাহাও যতটুকু পরিমাণ সহ্য হয়, সেই পরিমাণে), ভাতের মণ্ড, শুক্তোর রস, জলমিশ্রিত দুগ্ধ-প্রভৃতি তরল পথ্য প্রদান করিতে করিতে ধীরে ধীরে উপযুক্ত সময়ে পথ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিতে হইবে।

কোন ব্যক্তি সুস্থাবস্থায় দুই মণ বোঝা বহন করিতে পারে; কিন্তু তাহার বিসূচিকা ব্যাধি হইলে সেইদিন বা ঐ ব্যাধি-উপশমের এক সপ্তাহের মধ্যে যদি তাহার মস্তকে দুই মণের একটি বোঝা দিয়া তাহাকে কশাঘাত করা যায়, তবে কি সে জীবনে আর কোনও দিন পূর্ব্ববল লাভ করিতে পারিবে? তাহাকে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে

উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্য প্রদান করিতে করিতে বলবৃদ্ধির সহায়তা করিলে সে পুনরায় দুই-তিন দণ বোঝা অনায়াসে বহন করিবে।

ভক্তিরাজ্যে ক্রমবিপর্য্যয়ে বিপদ

ভক্তিরাজ্যেও সেইরূপ ভক্তিসাধক শ্রীভাগবতধর্ম্মের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া জানিতে পারিলেন—'রাগানুগা ভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; শ্রীব্রজগোপীগণের আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণভজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; সেহপরিজন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীব্রজধামে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের পদাঙ্কানুসরণে এক-এক বৃক্ষের তলে এক-এক-দিন বাস করিয়া হরিভজনই কাম্য; এই জীবনেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলসেবা-প্রাপ্তি জীবের একমাত্র প্রয়োজন।' এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সাধক এক লম্ফে চতুর্দ্দশ ভুবন, বিরজা, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ ও গোলোকের মধ্যে শ্রীদ্বারকা, শ্রীমথুরা, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীগোবর্দ্ধন—সমস্ত অতিক্রম করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবালাভের আকাঙ্ক্ষায় যদি রাধা-দাস্যভাব প্রদর্শনী উন্মোচন করেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অধিকারে অবস্থিত ব্যক্তিগণের অধিকার অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদিগকেও রাতারাতি শ্রীরাধাকৃষ্ণে আনয়ন করিবার জন্য প্রচার আরম্ভ করেন, তাহা হইলেই কি তাঁহার শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন বা শ্রীরাগানুগা ভক্তিতে প্রবেশ-লাভ ঘটিবে? সাধক বিভিন্ন যোগ্যতা বা অধিকারকে অগ্রাহ্য করিয়া একদিনেই কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকারে উপনীত হইতে পারেন? অথবা শরণাগতির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিতে পারিলেই কি শরণাগত হওয়া যায়? তবে কেন শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু সাধুগণের প্রভাব বা চিবল ও সাধকের প্রভাব বা চিবল, সাধুর কৃপাশক্তিসঞ্চার-সামর্থ্য ও তদনুযায়ী সাধকের কৃপাশক্তিগ্রহণ-যোগ্যতা, সাধুর স্বরূপগত ও পরিমাণগত ভক্তিযাজনা-ভেদ এবং সাধকের স্বরূপগত ও পরিমাণগত ভক্তিযাজনা-ভেদ-অনুযায়ী ন্যূন বা বিলম্বে—বিদ্যুদ্গতিতে বা শম্বুকের গতিতে ফলপ্রাপ্তি এবং ফলের মধ্যে আবার বিভিন্ন জাতীয় ও বিভিন্ন পরিমাণের ফল-প্রাপ্তির কথা জ্ঞাপন করিলেন? যদি একদিনেই সকল অধিকারীরই একই প্রকার ফল-প্রাপ্তির সম্ভাবনা হইত, তাহা হইলে শ্রীরূপানুগবর এরূপ বিচার করিতেন না। বিদ্যুদ্গতিতে সকলেই চলিতে পারিলে বৈধী ভক্তির ক্রমিক বিধান থাকিত না।

পৃথিবীর সকলেরই বা সাধকগণের মধ্যেও সকলের একই প্রকার অধিকার নাই, সুতরাং সকলকেই একই গণ্ডির মধ্যে আনয়ন করিয়া একই প্রকার ঔষধ ও পথ্য একই পরিমাণে দিয়া চিকিৎসা করিলে হিতে বিপরীত ফল হয়। এখানে কেহ কেহ বলেন—'ভক্তিরাজ্যে ত একমাত্র ঔষধ শ্রীহরিনাম ও একমাত্র পথ্য শ্রীমহাপ্রসাদ; সুতরাং সকলকেই এক হাসপাতালের একই ওয়ার্ডের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া সেই দুইটি পেটেন্ট ঔষধ ও পথ্য একই পরিমাণে প্রদান করিলে কেনই বা রোগ না সারিবে? যদি না সারে, তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিধান ত' মিথ্যা হইয়া যায়।'

এই যুক্তির মধ্যে যে হেত্বাভাস রহিয়াছে, তাহা আমরা অনেকেই প্রণিধান করি না। ঔষধ ও পথ্য একমাত্র শ্রীহরিনাম ও শ্রীমহাপ্রসাদ হইলেও অশ্রদ্ধালু, অপরাধী, কুটিল ব্যক্তিগণের নিকট সেই ঔষধ ও পথ্য আবরণযুক্তই থাকে। অশ্রদ্ধা, কুটিলতা ও অপরাধেরও আবার বিভিন্ন তারতম্য আছে। সকলকে এক হাসপাতালের একই ওয়ার্ডে রাখিলেও পাশাপাশিই কেহ হয়-ত শুদ্ধসত্ত্ব, কেহ হয়-ত সাত্ত্বিক-প্রকৃতিবিশিষ্ট, কেহ বা রাজসিক, কেহ বা তামসিক চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট থাকিতে পারে, সুতরাং তাহাদিগকে 'সম-মাত্রায়ই একই প্রকার পেটেন্ট ঔষধ ও পথ্য দেওয়া যাইতে পারে না। যাহার চিত্তবৃত্তিতে কর্ম্মবাসনার ঊর্ম্মি রহিয়াছে, তাহাকে শ্রীহরিনাম-প্রদানের অভিনয় করিলেও তাহার শ্রীহরিনামে শ্রদ্ধা ও রুচি হয় না।

শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত।"

যিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব শত শত জন্মে শ্রীবাসুদেবের কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চন করিয়া শ্রীনামে রুচিবিশিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারই মুখে সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম নৃত্য করেন।

কোথাও এখানে একদিনে বা এক জন্মেই যে সকলেরই শ্রীহরিনামে রুচি হইবে, শাস্ত্র এরূপ ত' বলিলেন না? কোন কোন অধিকারে শ্রীহরিনামে রুচি হইতে শত শত জন্মের প্রয়োজন হয়। সেই শত শত জন্মে তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার ঔষধ ও পথ্য ব্যবহার করিতে হয়।

কোন কোন ব্যক্তির কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চন বা কর্ম্মার্পণের দ্বারা মঙ্গল হয়, আবার এমন কোন পশুবৎ চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিও থাকিতে পারে, যাহাকে ঐ সকলরূপ স্থানপাতালে রাখিলে বা তাহাকে ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস-আশ্রমে দীক্ষিত করিলে সেই ব্যক্তি অবৈধভাবে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য চেষ্টান্বিত হইবে; আর যদি তাহাতে কৃত্রিমভাবে বাধা দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে জগজ্জঞ্জাল সৃষ্টি করিবে। সেইরূপ ব্যক্তিকে শাসন-তরবারির নিম্নেও অধিক সময় রাখা যায় না। ইহারা হরিকথায় রুচির অভিনয় দেখাইলেও—ভক্তির অধিকারের অভিনয় দেখাইলেও মঠবাস বা ব্রহ্মচর্য্য-বানপ্রস্থাদি আশ্রমের বেষ পরিধান করিলেও তাহারা 'রক্তিমঞ্জরী'-নামক কামশাস্ত্রের বিশ্লেষণানুসারে শশক, মৃগ, মৃষ ও অশ্ব-জাতীয় অথবা শ্রীমদ্ভাগবতের বিশ্লেষণানুযায়ী কুকুর, গর্দ্দভ, ছাগল, শূকর ও বানর-জাতীয়। ইহাদিগকে স্বভাববিহিত ধর্ম্মাচরণ করাইয়া ক্রমে ক্রমে বিরাগযুক্ত হইবার কথাই শ্রীনারদ শ্রীযুধিষ্ঠিরের নিকট উপদেশ করিয়াছেন। প্রবৃত্তির উত্তাপনায় উন্মত্ত ব্যক্তির নিকট নির্ব্বেদের উপদেশ বা ঐকান্তিকী হরিভক্তির কথা বলিলে তাহা ব্যর্থ হয়। উপদেষ্টারও অশ্রদ্ধাস্থানে উপদেশদানজন্য প্রত্যবায় ঘটে।

স্বভাববিহিত ধর্ম্মই মঙ্গলজনক

শ্রীনারদ বলিতেছেন (ভা ৭।১১।৩১-৩৪),—

"প্রায়ঃ স্বভাববিহিতো নৃণাং ধর্ম্মো যুগে যুগে।
বেদদৃগ্‌ভিঃ স্মৃতো রাজন্ প্রেত্য চেহ চ শর্ম্মকৃৎ॥"

হে রাজন্, বেদদৃগ্‌গণ যুগে যুগে প্রায় স্বভাববিহিত ধর্ম্মকেই ইহলোকে ও পরলোকে মঙ্গলজনক বলেন।

"বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম্ম শনৈর্নির্গুণমাশ্রয়েৎ॥"

স্বভাবকৃত-বৃত্তির সহিত বর্ত্তমান স্বধর্ম্মাচারী ধীরে ধীরে আপনার স্বভাবজাত কর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিষ্কাম-ভাব প্রাপ্ত হন।

"উপার্জ্জিতানাং বিত্তানাং ত্যাগো রক্ষণমেব চ।
নাশ এষাং তৃতীয়ঃ স্যাদ্ দানভোগো হ্যপায়িনাম্॥"

হে রাজন্, যাহাদের বীজবপনে ক্ষেত্র নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়ে এবং পুনরায় শস্যোৎপাদনে অসমর্থ হয় এবং কদাচিৎ উপ্ত বীজও নষ্ট হইয়া যায়। ঘৃতবিন্দুসমূহদ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত না হইলেও প্রচুর ঘৃতনিক্ষেপকালেই যেমন নির্ব্বাপিত হয়, তদ্রূপ কামসকলের অতি সেবা-দ্বারা কামাসক্তচিত্ত অগত্যেষে বিরক্ত হয়।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—"উৎকট-বাসনাবিশিষ্টস্য সহসৈব কামত্যাগাসম্ভবাদ্ বেদোক্ত-নিয়মেন বহুশঃ কামান্ ভুঞ্জানস্যৈব নিত্যনৈমিত্তিকৈর্বিশুদ্ধ-চেতসস্তদ্দোষদর্শনেন যযাতি-সৌভরিপ্রভৃতীনামিব শনৈর্বিরাগো ভবতি। যথা সবীর্য্যাং ক্ষেত্রং নির্বীর্য্যং শনৈর্ভবতি, যথা চ প্রজ্বলিতোঽগ্নির্ঘৃতবিন্দুভিঃ শাম্যতি, মহতা ঘৃতপুরেণ তু শাম্যত্যেব, তদ্বৎ। প্রত্যেকৃত-রাতৌ কৌমার এব নিবৃত্যুপদেশো মন্দবাসনাবামধিকারেণ. তদুক্তং তত্রৈব—'বালা অপ্রতিবিধেয়া যথাবামেবিতেরিতৈঃ' ইতি। অতঃ সর্ব্বমনবদ্যম্।"

অর্থাৎ এই যে, উৎকট কামনাযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে সহসা কামত্যাগ অসম্ভব বলিয়া বেদবিহিত নিয়মে বহু প্রকারে কামসমূহ ভোগ করিতে করিতে নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য কর্ম্মসমূহের দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া ঐ সকল কর্ম্মের দোষদর্শনে যযাতি-সৌভরি-প্রমুখ ব্যক্তিগণের ন্যায় ধীরে ধীরে কামের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হয়। যেরূপ সবীর্য্য ক্ষেত্রে বীর্য্য সেক করিতে করিতে ধীরে ধীরে উহা নির্ব্বীর্য্য হয়, প্রজ্বলিত অগ্নিতে বিন্দু বিন্দু পরিমাণে ঘৃত-আহুতি দিলে অগ্নির বেগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, প্রশমিত হয় না, কিন্তু যদি প্রচুর পরিমাণে ঘৃত নিক্ষেপ করা হয়, তাহা হইলে যেরূপ অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, তদ্রূপ প্রচুর পরিমাণে কামোপভোগ করিয়া উৎকট কামুকগণ নির্ব্বেদ লাভ করে; তবে সেই কামোপভোগ শাস্ত্রীয় প্রণালীতে হওয়া চাই, যেমন যযাতি-সৌভরি-প্রভৃতির উদাহরণে দৃষ্ট হয়; অশাস্ত্রীয়ভাবে কামভোগ বা অবৈধ কামভোগের দ্বারা কামের তৃপ্তি হয় না বা যথার্থ স্থায়ী নির্ব্বেদ আসে না।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—তবে কেন শ্রীপ্রহ্লাদ কৌমারকালেই অসুর-বালক-নির্ব্বিশেষে নিবৃত্তির উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন? যাহাদের পিতা-মাতা অসুর-অসুরী, সেই সকল বালকদের মধ্যে কি উৎকট কাম লুক্কায়িত ছিল

ন? তদুত্তরে বলিতেছেন,—যাহাদের কামের পাকোপ মন্দীভূত, সেরূপ অধিকারী ব্যক্তিগণের নিকটই শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ নিবৃত্তির উপদেশ দিয়াছিলেন।

অসুর বালকগণের বাসনা মন্দীভূত; ইহা কি স্বকপোল-কল্পনা নহে? তদুত্তরে বলিতেছেন,—না। শ্রীমদ্ভাগবতই সেই অসুর বালকগণের স্বভাব নিম্নলিখিত শ্লোকে অর্থাৎ "কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ" শ্লোকের অব্যবহিত পূর্ব্ব-শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"তে তু তাম্লীবয়াং সর্ব্বে ত্যক্তক্রীড়াপরিচ্ছদাঃ।
বালা অদূষিতধিয়ো যদ্ধারাধেরিতেহিতৈঃ॥"

(ভা ৭।৬।২৬)

একদিকে মহাভাগবতবর শ্রীপ্রহ্লাদের প্রভাব অর্থাৎ শক্তিসঞ্চার-সামর্থ্য, আর একদিকে সেই সকল অসুর বালকগণ সুখদুঃখ-বন্ধনশূন্য ব্যক্তিগণের উপদেশের দ্বারা অদূষিতান্তঃকরণ থাকায় তাহারা শ্রীপ্রহ্লাদে গৌরববুদ্ধি-হেতু ক্রীড়াপরিচ্ছদাদি ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং মহা-ভাগবতবর শ্রীপ্রহ্লাদে চিত্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। এইরূপ অদূষিতচিত্ত নিরপরাধ বালকগণকে শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রীভাগবত-ধর্ম্মের অধিকারী জানিয়া নিবৃত্তির উপদেশ দিয়াছিলেন।

প্রশ্ন হইতে পারে,—বালকগণ হিতাহিত-বিচারশূন্য, অনুকরণপ্রিয়, সাময়িক উল্লাসপ্রবণ; তাহারা হয়ত' সাময়িক উল্লাসের বশে ঐরূপ খেলাধূলা পরিত্যাগ করিয়াছিল। এজগতেও অনেক নবীন সাধককে এইরূপ শ্মশানবৈরাগ্যে উন্মত্ত হইতে দেখা যায়, সুতরাং তাহা কিরূপে নিবৃত্তির উপদেশ-গ্রহণের অধিকার হইতে পারে? তদুত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন যে, বালকগণ যদি সাময়িক উল্লাসে ক্রীড়াপরিচ্ছদাদি পরিত্যাগ করিয়া সাধু সাজিতেন, তবে তাহাদের সম্বন্ধে শ্রীভগবৎপার্ষদ শ্রীনারদ এইরূপ বলিতেন না,—

"অথ দৈত্যসুতাঃ সর্ব্বে শ্রুত্বা তদনুবর্ণিতম্।
জগৃহুর্নিরবদ্যত্বান্নৈব গুর্ব্বনুশিক্ষিতম্॥
অথাচার্য্যসুতস্তেষাং বুদ্ধিমেকান্তসংস্থিতাম্।
আলক্ষ্য ভীতস্ত্রিতো রাজ আবেদয়দযথা॥"

(ভা ৭।৬।১-২)

দৈত্যবালকগণ সকলেই শ্রীপ্রহ্লাদের উপদেশ শ্রবণ করিয়া উৎকৃষ্টবোধে তাহা গ্রহণ করিয়াছিল এবং শ্রীপ্রহ্লাদের সঙ্গগুণে দৈত্য-বালকগণের বুদ্ধি শ্রীবিষ্ণুতে অচলা হইয়াছিল। যাহারা সাময়িক উল্লাসে বিরাগযুক্ত হয়, তাহাদের বুদ্ধি কখনও শ্রীভগবানে 'একান্ত-সংস্থিতা' হইতে পারে না। অতএব শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ দৈত্য-বালকগণকে অধিকারী দেখিয়া বা সঙ্গপ্রভাবে অধিকারী করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন এবং শ্রীপ্রহ্লাদের কৃপা তাহাদের প্রতি ব্যর্থ হয় নাই; তাহাদের সকলেরই শ্রীভগবানে একান্ত-নিষ্ঠা হইয়াছিল।

কোন বালক হয়-ত সাময়িক উল্লাসে 'সাধুসঙ্গে থাকিব, হরিভজন করিব ও মাতাপিতার নিকট আর যাইব না, কারণ তথায় নানাপ্রকার অভাব-অশান্তি বা বাধ্যবাধকতা আছে'—এইরূপ প্রচণ্ড চিন্তাস্রোতঃ লইয়া মাতাপিতা বা গৃহ ত্যাগ করিল। বালকের সেই সাময়িক নবীন উল্লাসকেই যদি তাহার সংসারত্যাগের অধিকার বিচার করিয়া সেই বালককে সংসারবিরাগী সাজাইয়া দেওয়া হয় এবং যাহাতে তাহার চির মাতাপিতার সহিত কোনরূপ সংস্পর্শ না হয়, তজ্জন্য কৃত্রিম কৌশলে লুকাইয়া রাখা হয় ও স্বজনাখ্য-দস্যুগণের প্রতি বালকের সাময়িক বিরাগ উৎপাদন করিয়া দিবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলেও যতদিন পর্য্যন্ত না বালকের নিত্য স্বভাব বা অধিকারের উদয় হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত ঐরূপ কৃত্রিমপন্থা একবৎসর, দুইবৎসর বা দশ-বিশ বৎসর পরে নিশ্চয়ই একটী উৎপাত সৃষ্টি করিয়া ফেলিবে। মাতাপিতার নিকট 'ছেলেধরা-সম্প্রদায়'-আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াও ছেলেকে অধিকদিন ধরিয়া রাখা যাইবে না। এরূপ বহু বালক, যুবক ও বৃদ্ধকে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে—যাহারা পূর্ব্বে লুকাইয়া থাকিবার জন্য যত্ন করিয়াছিল, পরে তাহারাই মাতাপিতার, স্ত্রী-পুত্র বা দৈহিক আত্মীয়স্বজনের নিকট ধরা দিবার জন্য অর্থাৎ সাধুদের 'খোঁয়াড়' (?) হইতে ছুটি পাইবার জন্য কতগুণ অধিক যত্ন, কৌশল ও উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। পূর্ব্বে যে বালক মাতাপিতা বা আত্মীয়-স্বজনকে দেখিলে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিত অথবা "তোমরা কে? তোমাদিগকে চিনি না; আমি বহুজন্মে কত মাতা-পিতা পাইয়াছি, কাহারও কোন সন্ধান রাখি না, তোমরা

কোন্ চক্ষুর দ্বারা আমাকে দেখিবে? তোমরা চামার (অর্থাৎ চর্ম বা দেহের প্রতি আসক্ত), আমি চামারের দলে আর মিশিব না'—এই সকল তত্ত্বকথা (?) বলিত, সেই বালক কিছুদিন পরে, এমন কি, বিশ-পঁচিশ বা ত্রিশ বৎসর পরে চামারের দলে মিশিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই সকলের মূল কারণ কি? অধিকার-লঙ্ঘনই—মূল কারণ। মাতাপিতাকে কৃত্রিমভাবে 'স্বজনাখ্যাদনু' বলিতে শিক্ষা করিয়া অনেক পুত্র বৈধ ও অবৈধ কামে বা নিজ-দেহারামতার প্রতি আসক্ত হইয়াছে। কেহ কেহ 'ভোগী' হইতে সাময়িক উচ্ছ্বাসে 'ত্যাগী' সাজিয়া বিকৃত-মস্তিষ্ক হইয়া পড়িয়াছিল, পরে স্ত্রীর নিকট অভিগমন করিয়া সুস্থ ও কর্মক্ষম হইয়াছে।

কেহ কেহ যুক্তি প্রদর্শন করেন,—'এইরূপ দশ-বিশজন বালকের মধ্যেও যদি দুই-চারি জন বালকের মঙ্গল হয়, তবুও ত' লাভ।' কিন্তু শাস্ত্র বলেন—অধিকার লঙ্ঘন করিয়া কোনও সাধারণ সাধকজীবের কখনও মঙ্গল হইতে পারে না। পঞ্চাশ বৎসর পরেও তাহাদের কাপট্য বা প্রচ্ছন্ন অভ্যাভিলাষ প্রকাশিত হইয়া পড়ে; ইহার বহু বহু প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা

লোকশিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথাদি গোস্বামিবৃন্দ এইরূপ কৃত্রিমপন্থাকে প্রশ্রয় দেন নাই, বরং ইহা সর্বতোভাবে গর্হণ করিয়াছেন। সাধকের লীলাভিনয়-কারী নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথদাস-প্রভুর দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহা শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথকে বলিতেছেন,—

"স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
কর্মঠবৈরাগ্য না কর' লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহে লোকব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥"

(চৈ চ ম ১৬।২১-২২)

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীকূর্মক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন, তখন সেই স্থানের কূর্মনামক এক গৃহস্থ ব্রাহ্মণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচুর কৃপাশক্তি-সঞ্চারিত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরহরির প্রতি কূর্মবিপ্রের স্বভাবতঃই পরমেশ্বর-বুদ্ধি হইয়াছিল। গৃহস্থ কূর্মবিপ্র গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগমন করিতে উদ্যত হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু কূর্মবিপ্রকে বলিলেন (চৈ চ ম ১।১২৭ ৪৯),—

"ঐছে বাত কভু না কহিবা।
গৃহে রহি' কৃষ্ণনাম নিরন্তর লইবা॥
যাঁরে দেখ তাঁরে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥"

কূর্মবিপ্র শ্রীগৌরহরির অনুসরণ করিয়া অনেক দূর পর্যন্ত আসিলে—

"প্রভু তাঁরে যত্ন করি' ঘরে পাঠাইলা॥"

(চৈ চ ম ৭।১২৫)

"স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল। ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥" "ঐছে বাত কভু না কহিবা", "যত্ন করি' ঘরে পাঠাইলা"—এই সকল উক্তির মধ্যে যে কতটা চিন্-বৈজ্ঞানিক মহানতা ও লোকশিক্ষকের প্রবীণতা নিহিত রহিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যাঁহারা নবীন উপাসক, যাঁহারা অপরিপক্ক, যাঁহারা সাময়িক উচ্ছ্বাসপ্রবণ বা যাঁহারা কৃত্রিমপন্থার দলপুষ্টির জন্যই ব্যস্ত, তাঁহারা এই বৈজ্ঞানিক সত্যটি প্রথমমুখে বুঝিতে পারেন না, ক্রমে ক্রমে ঠেকিয়া শিখেন। সাময়িক উচ্ছ্বাসের বশবর্তী হইয়া যাঁহারা বৈরাগ্যের ধ্বজা ধারণ করেন বা অপরের হস্তে তাহা প্রদান করেন, তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের এই শিক্ষাটি অনেক সময় অবহেলা করিয়া শ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রভু কিরূপ অনুনয়ের ছল বা কারারক্ষককে উৎকোচ প্রদান করিয়া শ্রীগৌরপাদপদ্মে মিলিত হইয়াছিলেন, শ্রীল রঘুনাথ দাস প্রভু কিরূপে বহির্মুখ স্বজনাদিকে বঞ্চনা করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, কেবল সেই একদেশীয় শিক্ষাই বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। অনধিকারীকে সেই শিক্ষা প্রদান করিলে স্বাভাবিক কৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশে ভোগত্যাগের চিত্তবৃত্তি না হওয়ায় যখন তাহাদের প্রণাম বৈরাগ্যের ধ্বজা চলিয়া যায়, তখন তাহারা দুর্নীতিই শিক্ষা করে। শ্রীশ্রীল সনাতনের বা শ্রীশ্রীল রঘুনাথের স্ব-স্ব প্রাণকোটি-সর্বস্ব অতীষ্টদেবের সহিত মিলনের জন্য যে সহজ অনুবাসের অনুশিক্ষা, উহার দ্বারাও কৃত্রিমপন্থী বা অভ্যাসযোগে বৈরাগ্য-শিক্ষাকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে পতিত হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত নিষ্কপটা ভাগবতার বহির্মুখতা-দর্শনে পত্নীকে বঞ্চনা করিয়া ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অপরিপক্ক সাময়িক উচ্ছ্বাসপ্রবণ অনধিকারী ব্যক্তি অনেক সময় পত্নীর সহিত বা দৈহিক স্বজনাদির সহিত ঐরূপ কলহ করিয়া সাময়িক উচ্ছ্বাসে অর্থাৎ ক্রোধাদি রিপুর তাড়নার বৈরাগ্যের বেষ গ্রহণ করে; কিছুদিন পরেই মায়াদেবী যখন তাহার যৌবনহস্ত-স্পর্শে ঐ রিপুবেগকে একটু প্রশমিত করিয়া দিয়া অন্য প্রকার বেগের উদ্রেক করিয়া দেয়, তখন সেই শ্মশান বৈরাগী অধিকতর নীচতা স্বীকার করিয়া "পুনর্মূষিকো ভব" ন্যায়ে দীক্ষিত হয় অর্থাৎ অধিকতর তীব্র বাসনা ও অভিনিবেশের সহিত পূর্ব্বোক্ত বহির্মুখ আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গ করিবার জন্য আকাশ পাতাল আলোড়ন করে।

কেবল ব্যতিরেক-শিক্ষার কুফল

অনধিকারীদের নিকট কেবল ব্যতিরেক বা নিষেধমূলক শিক্ষাই উপস্থিত করিলে নিশ্চয়ই তাহারা কোনও দিন মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে না। কিছু বাস্তব বস্তু না পাইলে কেহ কেবল নিষেধমূলক নিন্দা বা বঞ্চনা শুনিয়া কোন স্থায়ী অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতের কথা কণ্ঠে চাইয়া তথাকথিত সরাগ শিক্ষক ও শিক্ষিত উভয়েই যদি কেবল জাগতিক ব্যক্তিগণকে 'গৃহমেধী', 'স্ত্রৈণ', 'পশুঘ্ন' প্রভৃতি আসুরিক গালি দিতে শিক্ষা করে, তবে সেইরূপ বহির্মুখ-জন-বিদ্বেষফলে বহির্মুখতা ও' কোনদিনই যাইবে না, বরং উহাদ্বারা প্রচ্ছন্নভাবে অন্তরে অন্তরে অধিকতর সঙ্গ, আবেশ ও অভিনিবেশ হইতে থাকিবে। এজন্য সহস্র সহস্র ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে—যাহারা কোন বস্তুর নিন্দায় অনুক্ষণ রত ও বিদ্বেষী, তাহারাই সেই বস্তুর ধ্যানফলে তাহাতে সাযুজ্য লাভ করিয়াছে। শ্রীভাগবত বা লোকশিক্ষক আচার্য্যের পরমুখে দ্রষ্টা হইয়া যে নিন্দাপ্রতিম বা পরচর্চ্চা-প্রতিম উক্তি, অনধিকারী সরাগ বক্তা উহার অনুকরণ করিলে অসৎসঙ্গের ধ্যানেই অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িবে।

শ্মশানবৈরাগ্যের প্রচ্ছন্নভাবে কুফল

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম ব্যতীত যে শ্রীরঘুনাথের অন্য কোন স্মৃতি ও অভিনিবেশ ছিল না, তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষা দিলেন যে, নবীন সাধকের সাময়িক উচ্ছ্বাস বা উৎকট শ্মশানবৈরাগ্যকে সম্প্রশ্রয় দিলে হিতে বিপরীত ফল হয়। কিন্তু যাঁহারা অধিকারের বিচার করেন না, তাঁহারা 'একটী নূতন শিকার মিলিল' ভাবিয়া 'ছেলে ধরার দল' সাজিয়া বালককে ঐরূপ উপদেশ দান করিবার পরিবর্ত্তে নিজের দল বৃদ্ধি করিবার জন্য নানারূপ কৃত্রিম মিথ্যা-প্রবঞ্চনাদি অতি প্রাথমিক অবস্থাতেই শিক্ষা দান করেন। বালক ঐসকল অন্ধ ভবিষ্যতের জন্য গোপনে রক্ষা করে এবং উপযুক্ত সময়ে 'ছেলে ধরা'-সম্প্রদায়ের উপরে অধিকতর তীব্রভাবে প্রয়োগ করে।

অধিকার বিচার না করিয়া যাহারা কেবল কৃত্রিমপন্থায় দলপুষ্টির জন্য শ্রীমদ্ভাগবত কথিত ও সর্ব্ব-মহিমগণ-ঘোষিত বদ্ধজীবের অধিকারোচিত স্বাভাবিক-প্রণালী লঙ্ঘনপূর্ব্বক অপরিপক্ক অবস্থায় গায়ের জোরে বা কথার মারপেঁচে দেহ-গেহাসক্ত ব্যক্তিগণকে তোতাপাখীর মত কতকগুলি 'বুলি' শিখাইয়া সংসার ত্যাগ করাইতে চাহেন এবং তাহাদিগকে তাহার অধিকার-বহির্ভূত প্রতিষ্ঠাদির দ্বারা লুব্ধ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ক্ষীরোদকশায়ী ভগবানের চরণে ঐ সকল বদ্ধজীবকে অপরাধী করিয়া তোলেন। জগতে অব্যক্ত ষড়্‌বেগ ধারণপূর্ব্বক জড়াসক্ত ব্যক্তিগণ যে কৃত্রিমভাবে সংসার হইতে দূরে থাকিবার অভিনয় করে, তাহাতে তাহারা কার্য্যতঃ আরও অধিকতর অভিনিবেশের সহিতই কনককামিনী-প্রতিষ্ঠা, দেহগেহ, স্ত্রী-পুত্র ও সংসারেরই চিন্তা করিতে করিতে সেই আবেশেই আবিষ্ট থাকে; এজন্যই তাহাদের মধ্যে কিছুদিন পরেই অন্যমনস্কতা, স্মৃতিভ্রংশ, সেবায় ঔদাসীন্য, শৈথিল্য, কাপট্য, মাৎসর্য্য, পরছিদ্রান্বেষণ-প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হয়।

অপুষ্টদেহ ব্যক্তিগণকেও তাহাদের অধিকার বিচার না করিয়া কেবল কতকগুলি 'বুলি শিখাইয়া' লোকবৃদ্ধি বা কর্ম্মীর সংখ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজনানুরোধে মঠে বাস করাইলে তাহারাও পথে-ঘাটে, যান-বাহনে, লোকালয়ে, গৃহস্থের গৃহে বিচরণকালে জগতের ভোগ্য নাম-রূপের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পড়ে এবং অন্তরে গোপনে ভোগের ছবি ধ্যান করিতে করিতে প্রকৃত মঙ্গলের প্রতি অন্যমনস্ক, স্মৃতিহীন, সেবায় শিথিল, উদাসীন, ক্রোধী, অহঙ্কারী, কপটী, মৎসর, কামাহতচিত্ত, পরস্পর কলহপ্রিয়, বিক্ষিপ্তচিত্ত, পরচর্চ্চক ও আত্মম্ভরী জীববিশেষে পরিণত হয়।

অনর্থযুক্ত অনধিকারী সাধক জীবকে উচ্চ পারমার্থিক পদবী বা ভক্তের প্রতিষ্ঠাদি প্রদান করাও অধিকার-লঙ্ঘনে প্রশ্রয়দানজনিত জগদ্ব্যাপকের কার্য্যবিশেষ। যাহার 'একদিনে তিন অবস্থা,' এইরূপ ব্যক্তি বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠাকে শুদ্ধ-বুদ্ধিতে বরণ না করিয়া ভোগ্য-বুদ্ধিতে ভোগ করিতে বাধিত হয়; সুতরাং অচিরেই পতিত হইয়া পড়ে।

অধিকার লঙ্ঘন করার ফলেই ভক্তিযাজনের অভিনয় করিয়াও—শ্রীহরিনাম-গ্রহণের অভিনয় করিয়াও অনেক পাষণ্ড-মতবাদের আবির্ভাব হইয়াছে। অধিকার লঙ্ঘন করার ফলেই 'বারশত বেড়া', 'তেরশত বেড়ী', সহজিয়া, সখীভেকী, জাতিবৈরাগী, আউল-বাউল-প্রভৃতি মতবাদ জগতে প্রচারিত হইয়াছে। অধিকার লঙ্ঘন করার ফলেই কি গৃহী, কি ত্যাগীর অভিনয়কারী ব্যক্তিগণের মধ্যে—তীর্থ-স্থানের সর্ব্বত্র নানাপ্রকার ব্যভিচার-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে।

অধিকার-লঙ্ঘনের প্রশ্রয়দানকারীর দায়িত্ব

অধিকার-লঙ্ঘন-ব্যাপারে যে সাধক বা শিষ্যই কেবল দায়ী, তাহা নহে, যাঁহারা আচার্য্য বা গুরুর কার্য্য করিবেন, তাঁহারাও এই দিকে তীব্র দৃষ্টি না রাখিলে ভজনেচ্ছু সাধকের বিপথে গমন অবশ্যম্ভাবী। অনেক সংসার-তপ্ত ভাবপ্রবণ নবীন সাধক সাময়িক উচ্ছ্বাস ও নবীন উদ্দীপনার বশবর্ত্তী হইয়া একদিনেই সংসারত্যাগ বা শরণাগতির অভিনয় প্রদর্শন করেন; তখন যদি আচার্য্য বা শ্রীগুরুদেব সংখ্যাবৃদ্ধি করিবার লোভে বা তাঁহার আশ্রমের লোকাভাব-পূরণ বা সঙ্ঘ-পরিচালনার প্রয়োজনীয়তার অনুরোধে অনধিকারীকে সংসার-পরিত্যাগের উপদেশ বা অন্তরে অশ্রদ্ধালুকে বা অযোগ্যকে শরণাগতের আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিতে প্রশ্রয় দান করেন, তবে সেই গুরুনামধারী ব্যক্তি কি সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের নিকট দায়িত্ব এড়াইতে পারিবেন? উচ্ছ্বাসপ্রবণ অবুঝ সাধকের না বুঝিয়া ভুল করিলে বরং ক্ষমা আছে, কিন্তু গুরুর আসন-গ্রহণকারী তাহাতে প্রশ্রয় দিলে তাহা কি শ্রীভগবান্ সহ্য করিবেন? ঐরূপ কৃত্রিমপন্থীর সঙ্ঘদ্বারা কি জগতের অহিত ব্যতীত হিত হইবে?

শ্রীভগবানের প্রত্যুপদেশ (গী ৩।২৬) এই—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥"

বিদ্বান্ ব্যক্তিও শুদ্ধভক্তিমাহাত্ম্যে অনভিজ্ঞ ফলকামী ব্যক্তির কর্ম্মত্যাগের প্রবৃত্তির উদয় করাইবেন না, অজ্ঞব্যক্তি যাহাতে কর্ম্মার্পণের পথে চলিতে শিক্ষা করে, তদ্বিষয়ে নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিবেন, তাহাতে প্রযোচিত করিবেন; লোক-শিক্ষক নিরপেক্ষভাব প্রদর্শন করিলে অনেক সময় অজ্ঞব্যক্তি নিশ্চেষ্ট বা শিথিল হইয়া পড়ে।

শুদ্ধভক্তি-মাহাত্ম্যে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরও কোনওরূপে প্রাকৃত-সহজাত ভক্তি-সংস্কার অনুমান করিয়া যে ভক্তির অধিকারি-নির্ণয়ের প্রসঙ্গ আছে, তাহা অনধিকারী বা অশ্রদ্ধালুকে তথাকথিত 'সুযোগ (chance) দেওয়া'র নামে 'বিপথগামী করা' নহে। কলিকালে কর্ম্ম-সন্ন্যাস ও জ্ঞানসন্ন্যাস নিষিদ্ধ, কিন্তু ভক্তিসন্ন্যাস শাস্ত্র ও মহাজন-আচার-সম্মত,—ইহা "অযমেবং গবালম্ভঃ"-শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে আমরা অনেক সময় প্রবণ করিয়াছি। কিন্তু যে স্থানে অশ্রদ্ধালু, অপরাধী, অত্যন্ত ভক্তাভিনিবিষ্ট, কুটিল ও ভক্তির অভিনয়-জনিত অহঙ্কারে স্ফীত অর্থাৎ অনধিকারী ব্যক্তি ভক্তিশাস্ত্র-সম্মত সন্ন্যাস-গ্রহণের নামে বিরক্ত-বেষাদি গ্রহণ করে, সেস্থানে ঐরূপ সন্ন্যাস-গ্রহণচেষ্টা কর্ম্ম-সন্ন্যাস অপেক্ষাও অধিকতর নিন্দনীয় নহে কি? ভক্তিপথের সন্ন্যাস-গ্রহণের অভিনয় করিয়া যদি দণ্ডধারী বা বেষোপজীবী ভিক্ষুকের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়, রাবণের ন্যায় শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগীর দল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তবে তাহাদের সন্ন্যাস কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষাও কলির অধিক উৎপাত-বিশেষ ব্যতীত আর কি? অনধিকারী ব্যক্তি ভাক্ত সন্ন্যাসী সাজিয়া ধর্ম্মের আবরণ দিয়া নিজ দেহ বা স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান বা ভূ-সম্পত্তি-বৃদ্ধি-প্রভৃতি কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়ে, কখনও বা পূর্ব্বাশ্রমের স্ত্রীর সেবাদি গ্রহণচ্ছলে স্ত্রীসঙ্গ করিয়া থাকে। অন্যদিকে কুবিষয়াসক্ত অনধিকারীকে 'পরমহংস-মহাভাগবত' সাজাইয়া তাহার অত্যন্ত কুভোগপর গৃহব্রতধর্ম্মকে মুক্ত-বৈরাগ্য বা শ্রীরাধারমানন্দ ও শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির অধিকার বা রাগমার্গের অধিকার বলিয়া প্রখ্যাপন করিলেও তদ্দ্বারা জগদ্ব্যাপকের কার্য্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। গৃহব্রতকে তাহার অধিকার উপলব্ধি করিতে দিয়া ক্রমে ক্রমে ফলকামনা-ত্যাগরূপ ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদানপূর্ব্বক অতি প্রাথমিক ভাগবত-ধর্ম্মের সমীপস্থ করাই শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম্মের উপদেশ। তাহাকে

গোস্বামী, প্রচারক, আচার্য্য, বক্তা ও উপদেষ্টা সাজাইলে বা মিথ্যা প্রতিষ্ঠার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করাইলে সে কয়দিন তাহার পোষাকী স্বভাবটি রক্ষা করিতে পারিবে? অচিরেই তাহা-দ্বারা নানাপ্রকার উৎপাত, নানাপ্রকার গুপ্ত ব্যভিচার ও স্বপক্ষত্যাগের স্তূপ সৃষ্টি হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু এইরূপ অনধিকারী সন্ন্যাস বক্তাকে ভাগবতধর্ম্মের বক্তার আসন প্রদান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সন্ন্যাস-বক্তার অনুভব নাই, কেবল নিজেকে জাহির করিবার জন্য বাক্য-বাগীশতা আছে। সদ্যঃপুত্রশোকাতুরা জননীকে পুত্র-স্নেহের মিথ্যাত্ব-উপদেষ্ট্রিণী বক্তার অথবা অপর জননীকে পুত্রশোকের অকিঞ্চিৎকরতার উপদেশে পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনকারিণী অথচ নিজের বেলায় তদ্বিপরীত-আচরণ-কারিণীর উপদেষ্টা বা প্রচারকের আসন-গ্রহণ নিষ্ঠুর পরিহাসেরই কার্য্য হয়; ইহা ধর্ম্মকে লইয়া 'ছিনিমিনি খেলা'র চেয়া বাস্তবিক আর কি?

অধিকার-লঙ্ঘনজনিত কুফলের দৃষ্টান্ত

অধিকার-লঙ্ঘনজনিত ভয়াবহ ফলের দৃষ্টান্ত ভারতের ধর্ম্মের ইতিহাসে ভূরি ভূরি রহিয়াছে। এককালে নীতিবাগী বৌদ্ধ, জৈনপ্রভৃতি ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকার-লঙ্ঘনজনিত ব্যভিচারের স্রোত প্রচুরভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল। তান্ত্রিকগণের মধ্যে একসময় যে কত অবৈধ-আচারের তাণ্ডব-নৃত্য হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। অকালপক্ক ব্যক্তিগণ ব্রহ্মচর্য্য করিবার উল্লাস দেখাইয়া কৌপীন গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু কৌপীনের মর্য্যাদা রাখিতে পারে নাই; পরে কেহ গুপ্ত-বাস্তাশী, কেহ বা ব্যক্ত-বাস্তাশী হইয়া পড়িয়াছে। ব্যক্ত বাস্তাশিগণ জাতিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষ সৃষ্টি করিয়া পরিধানে কৌপীন-বহির্ব্বাস অথচ অঙ্কে স্ত্রী-পুত্র লইয়া আখড়াধারী হইয়াছে। অনধিকারিণী কুমারী দেবদাসীর অভিনয় করিতে গিয়া শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিবার পরিবর্ত্তে ছাগরক্ষী মানবের ভোগ্যা হইয়া বারবনিতার সঙ্ঘের সৃষ্টি করিয়াছে। অধিকার-লঙ্ঘনের ফলে তথা-কথিত পুষ্টিমার্গের মধ্যে একদ্বারে গৃহব্রতধর্ম্ম ও অবৈধ আচারের তাণ্ডব নৃত্য চলিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মে একদিকে সর্ব্বাধিকারি-সাধারণ সন্ন্যাস, জৈনগণের সর্ব্বাধিকার-পালনীয় দীর্ঘ উপবাস-প্রধান কৃত্রিম ব্রতচর্য্যার যে কি কুফল হইয়াছিল এবং অনধিকারী স্ত্রীলোকের মধ্যেও সন্ন্যাস ধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়া যে পতিতা বৌদ্ধভিক্ষুণী ও জৈনমন্ত্রাবলম্বি-ক্ষপণিকার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় বাৎস্যায়নের কামসূত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। বাৎস্যায়ন বলিতেছেন (কামসূত্র ৩।৫।১),—

"ভিক্ষুকীশ্রমণাক্ষপণাকুলটাকুহকেক্ষণিকামূলকারিকাভির্ন সংস্তবেত।"

ভিক্ষুকী, শ্রমণা (বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী), ক্ষপণা (জৈন-সন্ন্যাসিনী), কুলটা, কুহকা (মায়াবিনী), ঈক্ষণিকা (দৈবজ্ঞ স্ত্রীলোক), মূলকারিকা (বশীকরণ-প্রভৃতি করিবার জন্য যাহারা ঔষধ-মন্ত্রাদি প্রদান করে)—ইহাদের সহিত কখনও মিশিবে না।

স্ত্রীলোকের সন্ন্যাস

বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিনী ও জৈন-সন্ন্যাসিনীকে কুলটা ও কুহকার সহিত সমপর্য্যায়ে গণনা করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে সাধারণ স্ত্রীজাতির পক্ষে সন্ন্যাস সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। বেদাদি-শাস্ত্রেরও ইহাই অভিমত। তবে সর্ব্বত্রই বিশেষবিধি আছে, কিন্তু তাহা সাধারণের অধিকার জ্ঞাপন করে না। শ্রীগোপাদেবী, শ্রীমাধবীমাতা, শ্রীবন্দিনী দেবী, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া (শ্রীল হরিদাস পণ্ডিতের শিষ্যা), শ্রীগঙ্গামাতা প্রভৃতির ন্যায় অধিকার সাধারণ বদ্ধজীবের হয় না। একমাত্র মহতের বিশেষ কৃপায় বিশেষ অধিকার লাভ হয়।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—"স্ত্রীলোকের গৃহস্থাশ্রম ও স্থলবিশেষে বানপ্রস্থ ব্যতীত অন্য কোন আশ্রম স্বীকর্ত্তব্য নয়। কোন অসাধারণ-শক্তিসম্পন্না স্ত্রী বিদ্যা, ধর্ম্ম ও সামর্থ্য লাভ করত যদি **ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাসাশ্রম** গ্রহণ করিয়া সাফল্য লাভ করিয়া থাকেন বা লাভ করেন, তাহা **সাধারণতঃ কোমলপ্রাণ, কোমলশরীর, কোমলবুদ্ধি স্ত্রীজাতির পক্ষে বিধি নয়।**" (শ্রীচৈ শি ২।৭)

কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গদেশে চিরকুমার ও চিরকুমারীর সঙ্ঘ বা সঙ্ঘের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং কোন কোন নব্যধর্ম্মের মধ্যে সেই স্রোত প্রবলবেগে প্রবেশ করিয়াছিল। উহার ফল যে কি বিষময় হইয়াছে ও কতটা জঞ্জাল উপস্থিত করিয়াছে, তাহা অনেকেই জানেন।

ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে কেহ কেহ বলেন,—"শ্রীভগবান্‌কে আশ্রয় না করিয়া থাকায় ঐ সকল পতনের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।"—ইহা সত্য; আবার ইহাও সত্য যে, ধর্মের ধ্বজা লইয়া অধিকার-বহির্ভূত যে সকল কার্য্য হইয়াছে, তাহাতেই পতনের ইতিহাস অধিকতর আচ্ছন্নমানরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। মহারাজ চূড়গঙ্গদেব পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবার্থ পবিত্রচরিত্রা চিরকুমারী দেবদাসী নিযুক্ত করিয়া চূড়গঙ্গাহী-পল্লীতে (শ্রীজগন্নাথমন্দির-উদ্যানের পার্শ্বে) তাঁহাদিগের বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু বর্ত্তমানে সেই পল্লীর নাম শুনিলে লোকে নাসিকা-কুঞ্চন করে; কারণ, তাহা বারবনিতা-পল্লীতে পরিণত হইয়াছে।

অধিকারলঙ্ঘন হইতে মহদ্বেষমাৎসর্য্যের উৎপত্তি

একমাত্র মহতের আশ্রয় ব্যতীত ধর্ম্মের ধ্বজা ধারণ করিয়াও স্ত্রীই হউক, আর পুরুষই হউক, কেহই আত্মরক্ষা করিতে পারে না। আবার মহতের সঙ্গে থাকিবার অভিনয় করিয়া—মহতের অনুকরণ করিয়া অধিকার-বহির্ভূত ভজনের প্রদর্শনী উন্মোচন করিলে মহতের চরণে অপরাধ-ফলে পতন অবশ্যম্ভাবী। তাই শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামি-মহারাজের অনুকরণ করিয়া কেহ কেহ পূর্ব্বাশ্রমের স্থানে বাস ও কৌপীনাদি-পরিধানের অভিনয় করিলেও তাহারা অবৈধ-কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিল। পরম করুণাময় শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাহাদিগকে বৈধজীবন-যাপনের উপদেশ দিয়াছিলেন। অধিকার-লঙ্ঘনের এরূপ বিষময় ফল।

মহতের চরণে অপরাধফলে অধিকার-লঙ্ঘন-জনিত দম্ভ আসিয়া উপস্থিত হয়। সাময়িক উচ্ছ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অনধিকারোচিত ব্যবহার-প্রদর্শনকারী যখন আত্মরক্ষা করিতে পারে না, তখন সে মহৎকেই দোষী সাব্যস্ত করে; মহৎ তাহার ভোগের পথে কণ্টক হইয়াছে মনে করিয়া মহতের নিকট নানাপ্রকার প্রবঞ্চনা, এমন কি, ধরাধাম হইতে তাঁহার অন্তিত্ব-লোপের কামনা করে। ইহা অধিকার লঙ্ঘন-জনিত মিথ্যাচার বা কপটাচারের অবশ্যম্ভাবী ফল। বাহিরে বরং নিরধিকারে থাকার অভিনয় করা ভাল, কিন্তু বাহিরে উচ্চাধিকার দেখাইয়া ভিতরে কপট-কাষাচারী হওয়া হরিভজন হইতে চিরতরে বিদায় লইবার যড়যন্ত্র ব্যতীত আর কি?

সাধারণ জীবকোটি যে তাহার নৈসর্গিক অধিকার কৃত্রিমভাবে অতিক্রম করিতে পারে না, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিতেছেন,—

"বিরক্ত বলিয়া পরিচয় দিলেই যে বিরক্ত হয়, এরূপ নয়। যদি ভাবোদয়-ক্রমে ইন্দ্রিয়ার্থে অরুচি স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া থাকে, তবে তাহাদের ভেক গ্রহণ করা অবৈধ।" (শ্রীচৈ শি ৪।২)

"যদি স্ত্রীসম্ভাষণ-প্রবৃত্তি হৃদয়ের কোন দেশে অবস্থিতি করিতে থাকে, তবে যেন ভেক গ্রহণ না করেন। গৃহে থাকিয়া মর্কট-বৈরাগ্য দূর করত সর্ব্বদা কৃষ্ণনামানন্দে আত্মার উন্নতি সাধন করুন, ব্যস্ত হইয়া অকালে বৈরাগ্য গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই। ভক্তিজনিত স্বাভাবিক বৈরাগ্য পূর্ণবলে উদিত হইবার পূর্ব্বে যে গৃহস্থ গৃহস্থধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহারই মর্কট-বৈরাগ্য হইবার সম্ভাবনা।"

(সজ্জনতোষণী ৮।১০, 'মর্কটবৈরাগ্য'-প্রবন্ধ)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অন্যত্র লিখিয়াছেন—"রক্ত-মাংস-গঠিত শরীরে যাঁহারা অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রীসঙ্গ একপ্রকার নিসর্গজনিত ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। এই নিসর্গকে সঙ্কুচিত করিবার জন্যই বিবাহ-বিধি। বিবাহ-বিধি হইতে যাঁহারা মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রায়ই পশুবৎ-ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত। অথবা যাঁহারা সৎসঙ্গজনিত ভজনবলে নৈসর্গিক বিধি অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত-বিষয়ে রতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রী-পুরুষ-সঙ্গ নিতান্ত তুচ্ছ।"

(স তো ১১।৫, 'বৈধী'-প্রবন্ধ)

স্বাধিক্য ও ন্যূনতা—উভয়ই ভক্তিপ্রতিকূল

শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—

"যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাত্তাবদর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ ব্যত্যেতে পরমার্থতঃ॥"

(ভ র সি, পূ ২।৭১)

পরমার্থবিৎ ব্যক্তি যে-পর্য্যন্ত গ্রহণ করিলে ভজননির্ব্বাহ হয়, সেই পরিমাণই গ্রহণ করিবেন; অধিকও গ্রহণ করিবেন না, কমও গ্রহণ করিবেন না। অধিক গ্রহণ করিলেও যেরূপ পরমার্থ হইতে চ্যুত হইবেন, কম গ্রহণ করিলেও

সেরূপই পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িবেন। অনেক সময় উচ্চাধিকারীর অনুকরণ করিয়া কেহ কেহ এরূপ অধিক ও অল্প গ্রহণ ও ত্যাগের চেষ্টা দেখাইয়া পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হন। শ্রীশ্রীল রায় রামানন্দ ও শ্রীশ্রীল পুরুষোত্তম বিদ্যানিধির অনুকরণ করিয়া অধিকার-বহির্ভূত অধিক বিষয়-গ্রহণের চেষ্টা দেখাইয়া যেরূপ সাধক পরমার্থ হইতে সম্পূর্ণরূপে ভ্রষ্ট হইয়াছে, তদ্রূপ শ্রীশ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভু বা শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের অনুকরণ করিয়া অধিকার-বহির্ভূত বৈরাগ্য বা অল্প বিষয়-গ্রহণের চেষ্টা দেখাইয়া অনেকেই পরমার্থ হইতে চিরতরে বিচ্যুত হইয়াছে; সুতরাং অধিকারবহির্ভূত অল্প ও অধিক বিষয় গ্রহণ করিলে তদ্দ্বারা ভজননির্ব্বাহ হইবে না।

অধিকার-লঙ্ঘন হইতে যে কেবল পাপ ও দুর্নীতির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নহে; বহুলোক নাস্তিক, বহুলোক পাষণ্ডী ও বহুলোক অপরাধী হইয়া জগতের বহু জীবকে জন্মজন্মান্তরের জন্য বিপথে চালিত করিয়াছে। অধিকার-লঙ্ঘনের ফলেই শত শত কালাপাহাড়, শত শত রূপানন্দ ও শত শত ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছে। কালাপাহাড় পূর্ব্বে গৌড়ীয় হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু পরে হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষী হইয়া হিন্দুধর্ম্ম-দলনে তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন। রূপানন্দ পূর্ব্বে শিবার্চ্চক ছিলেন, কিন্তু যে অধিকারে শিব-অর্চ্চনের যোগ্যতা লাভ হয়, সেই অধিকার লঙ্ঘন করায় তিনি শিববিদ্বেষী হইয়া ক্রমে শাস্ত্রশাস্ত্র-বিদ্বেষী হইয়া পড়েন। ভারতচন্দ্র রায় পূর্ব্বে বিরক্ত-বৈষ্ণব-বেষ গ্রহণ করিয়া পুরীর সাত্তাসন-মঠে অবস্থানপূর্ব্বক গৌড়ীয়-রসশাস্ত্রসমূহ আলোচনা করেন, কিন্তু অনধিকারী হইয়া পত্নী পরিত্যাগপূর্ব্বক বিরক্তের বেষ গ্রহণ ও রসশাস্ত্র আলোচনা করিবার ফলে পরে বেষত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মবিরোধী, শাক্তমতবাদী ও প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার সম্ভোগ-বর্ণনে সিদ্ধহস্ত গ্রাম্য মহা-কবি বলিয়া বিখ্যাত হন।

অশ্রদ্ধাধামে শুষ্কভক্তির উপদেশের কুফল

কেবল যে অনর্থযুক্ত সাধককে লীলাকীর্ত্তন বা মাধুর্য্য-রসের কথা আলোচনা করিতে না দিলেই বা তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে সতর্ক করিলেই অধিকার লঙ্ঘন করা হয় না, তাহা নহে। অশ্রদ্ধালুকে কর্ম্মত্যাগের উপদেশ, লৌকিক শ্রদ্ধালুকে রাতারাতি শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধালু সাজাইয়া দেওয়া, অত্যন্ত দেহগেহাসক্ত পশুপ্রকৃতির ব্যক্তিকে কৌপীন পরিধান করাইয়া দেওয়া, অত্যন্ত গৃহাসক্ত ব্যক্তিকে আসক্তি ত্যাগ করিবার শাস্ত্রীয় ক্রমিক ভজন-কৌশল শিক্ষা না দিয়া কেবলমাত্র স্ত্রীলোকের নিন্দার মুখস্থ পদ শিক্ষা দেওয়া বা তাহাদের মজ্জাগত প্রচ্ছন্ন উৎকট স্ত্রীলম্পটতাকে চাপা দিবার জন্য তৎপরিবর্ত্তে কর্ণ ও জিহ্বার ক্ষুধা-বহ্নির ইন্ধন সরবরাহ করা অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা ও উত্তম-ভোজনাদি প্রদান করা কৃত্রিম পন্থামাত্র; উহা ভাগবত-ধর্ম্মের পথ নহে। এক ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা আর এক ইন্দ্রিয়ের ইন্ধন যোগাইয়া রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বেগই প্রবলতরভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে; তৎফলে আজ যে নিজেকে স্ত্রীসঙ্গবিরহিত ব্রহ্মচারী মনে করিয়া নিজ-জনককে 'স্ত্রীলম্পট' ও জননীকে 'পুরুষরূপ যোষিতের সঙ্গিনী' বলিয়া গালি প্রদান করিয়াছে, কালই সেই জনকের পুত্রটি একটি অবৈধ দাসীর ক্রীড়ামৃগ হইয়া পড়িয়াছে, কেহ বা বিমাতৃগামী হইয়াছে—এইরূপ প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য পাওয়া যায়। আজ যে ট্রেনে গমনকালে কন্যার সহিত পিতাকে একাসনে অবস্থিত দেখিয়া পিতাকে মুহিতৃসঙ্গিরূপ স্ত্রীলম্পট বলিয়া প্রচার করিতে সাহসী হয় এবং বালক-যুবক-নির্ব্বিশেষে সকলের নিকট স্ত্রীবিদ্বেষ প্রচার করে, সেই ব্যক্তিই পরে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া পঞ্চাশৎ বৎসরের বয়স্কা বৃদ্ধা পত্নীকে পাশ্চাত্যদেশীয় যুবতীগণের ন্যায় সাজাইয়া ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করিতে লোলুপ হয়। অধিকার-লঙ্ঘনের এই সকল ভয়াবহ ফল।

রোগের সাময়িক বিরতি বা প্রাবল্য দেখিয়া কেবল রোগ বা রোগীর নিন্দা বা বন্দনা করিলে রোগ নির্ম্মূল হয় না। সর্ব্বপ্রথমে রোগ নির্ণয় করা আবশ্যক, তৎপরে রোগীর অধিকার-অনুযায়ী রোগের নিদানচিকিৎসা আবশ্যক। রোগের যাহা ঔষধ ও পথ্য, তাহারও উপযুক্ত মাত্রা, উপযুক্ত সময় ও উপযুক্ত ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা আছে। মনে করুন, কোন ব্যক্তিকে কবিরাজ স্বর্ণসিন্দুর ও কোন ডাক্তার হাইপোফস্‌ফাইট্‌স্ নার্ভিগার ব্যবস্থা করিয়া বলিলেন যে, ঔষধ-সেবনে রোগীর যাবতীয় স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য নষ্ট হইবে। এই প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ পাইয়া রোগী মনে করিলেন—'একতোলা স্বর্ণসিন্দুর প্রত্যহ একমাত্রায় তিনমাস ছয়দিন সেবন করিয়া এত সময় নষ্ট করার

কি আবশ্যকতা আছে? যদি আজই সবটা সেবন করি, তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি সবল হইয়া উঠিব।' আর এক হাতুড়ে ডাক্তার আসিয়া অন্য-এক রোগীকে বলিলেন —"নাগিদারের শিশিটি একমাস ধরিয়া সেবন না করিয়া আজই সব সেবন করিয়া ফেলুন, দেখিবেন—আজই শরীরে হেরকুলেসের মত বল পাইবেন।" আর এক কবিরাজ এক রোগীকে তাহার যকৃতের ব্যাধির জন্য কাঁচা পেঁপে-সিদ্ধ পথ্যরূপে গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কাঁচা পেঁপের অপূর্ব্ব গুণ শ্রবণ করিয়া সেই রোগীটি বাজার হইতে পাঁচ সের পেঁপে আনিয়া তাতে সিদ্ধ করিতে দিলেন এবং একবারেই সমস্ত পেঁপে-সিদ্ধ (পেট ভরিয়া গেলেও, ভাবী মঙ্গল-লাভের আশায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও) গ্রহণ করিলেন। আর একব্যক্তি জনৈক কবিরাজের নিকট শুনিয়াছিলেন— "কদাপি দুষ্যতে মাতা, নোদরস্থা হরিতকী"; তাই তিনি এক সের হরিতকী কিনিয়া আনিয়া উহা বাটিয়া সেবন করিলেন!

পাঠক! এই সকল ব্যক্তিদের অবস্থা কি হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করিবার আবশ্যকতা নাই। ধর্ম্মরাজ্যে বা ভক্তিরাজ্যে অধিকার-লঙ্ঘনকারী ব্যক্তিগণেরও এইরূপ দশা হয়। ঔষধ ও পথ্যই তখন অধিকার বা যোগ্যতা-অনুযায়ী গ্রহণ না করায় জীবনঘাতী হইয়া পড়ে। পশু-প্রকৃতির ব্যক্তি যদি আবেশময়ী ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব শুনিয়া একদিনে কেবলা ভক্তিকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করে অথবা দেহ-গেহাসক্ত গৃহব্রত ব্যক্তি যদি কর্ম্মমিশ্র-অর্চ্চন বা কর্ম্মার্পণ পরিত্যাগ করিয়া অকিঞ্চনগণের ন্যায় কেবল নামনিষ্ঠের অভিনয় করে; যাহার হৃদয়ে পশুভাব প্রবল, সে যদি কৃত্রিমভাবে ভেকধারী নির্জ্জন-ভজনানন্দী বৈরাগী সাজে, তবে তাহার স্বর্গধামে ভক্তিলাভ ত' হইবেই না, জীবনে ভক্তিলাভের আশাও নির্ম্মূল হইয়া যাইবে।

মহৎসঙ্গ ও মহদপরাধ

যে পর্য্যন্ত স্বতঃ উদিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত কৃত্রিম-চেষ্টার দ্বারা কিছুই হইতে পারে না। নিত্যসিদ্ধ স্বভাব উদয় করাইবার জন্য মহতের সঙ্গের একান্ত আবশ্যকতা আছে। মহতের দ্বারা নিরন্তর সঙ্গে মহতের সঙ্গপ্রাপ্তির সুযোগ আছে; কিন্তু সঙ্গে থাকিলেও সকলেরই প্রকৃতি একরূপ নহে। আবার যিনি সঙ্গে থাকেন, তাঁহারই মহতের সঙ্গ ও কৃপালাভ হয়; যিনি সঙ্গে থাকেন না, তাঁহার মহতের সঙ্গ বা কৃপালাভ হইতে পারে না, তাহাও নহে। সঙ্গে না থাকিলেও মহতের কৃপালাভ হয় না, আবার সঙ্গে থাকিলেও মহতের কৃপালাভ হয় না; আবার সঙ্গে থাকিলেও মহতের কৃপালাভ হয়, সঙ্গে না থাকিলেও মহতের কৃপালাভ হয়। সঙ্গে থাকিলে মহতের কৃপালাভের অনেক সুযোগ আছে বটে, কিন্তু সুযোগ থাকিলেই যে তাহা গ্রহণ করা যায়, তাহাও নহে। কলেজ-বোর্ডিংএ থাকিয়াও অনেকে চাবি-পাচবার ফেল করে, আবার প্রাইভেট্ পড়িয়াও অনেকে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। মহামহোৎসবের সময় যখন পঙ্‌ক্তি-ভোজন হয়, তখন পঙ্‌ক্তিতে সকলের পক্ষে একই প্রকার প্রসাদ পরিবেষিত হইলেও যাহারা উদরাময়গ্রস্ত রোগী, তাঁহারা হয় ত কেহ পুষ্পায়-মণ্ডপুপ-প্রকৃতি প্রতিবেষণ-কালে তাহা গ্রহণ করেন না, কখনও গ্রহণ করিলেও এক রকমাত্র গ্রহণ করেন। গ্লুরিসি বা বাতের রোগী ঘৃত-পরিবেষণকালে যদি গ্রহণ করেন না; আবার যাঁহারা অত্যন্ত বেশ রোগী, তাঁহারা বুদ্ধিমান্ হইলে বিচার করেন যে, 'পঙ্‌ক্তিতে বসিলে আমার চলিবে না, আমি হয় ত' অনেক প্রতিকূল সামগ্রী অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রহণ করিয়া ফেলিব, না হয় যাত্রা ঠিক রাখিতে পারিব না'; তাঁহারা নিজের ঘরেই পৃথগ্‌ভাবে প্রসাদ পা'ন। কোন শয্যাশায়ী রোগীর জন্য হয় ত' মহাপুষ্পের উৎসবের দিনেও সাগু-বার্লি বা ডাবের জলের পৃথক্ ব্যবস্থা থাকে, কাহারও বা একবারে উপবাসেরই ব্যবস্থা থাকে। কাজেই মহাপ্রসাদ মঠবাসিনির্ব্বিশেষে পথ্যরূপে ব্যবস্থিত থাকিলেও যদি প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অধিকার বা যোগ্যতা বিচার করা না যায়, তবে ভক্তির অনুকূল জীবন-নির্ব্বাহ হইতে পারে না।

ভাবপ্রবণতার অধিকার-লঙ্ঘনের কুফল

পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে যে, মহতের কৃপায় স্বভাবের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের ভক্তিবৃত্তি নৈষ্ঠিকী হয় না কেহ হয় ত' ভাব-প্রবণতা, উচ্ছ্বাস, অনুকরণপ্রিয়তা কিংবা প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষামূলে দুই-একবার কিংবা দুই এক বৎসর একাদশীতে নিরম্বু উপবাস, রাত্রি-জাগরণ, শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ বা নৃত্যগীতাদি করিলেন, কিন্তু যদি মহতের কৃপায় ঐ সকল ভক্ত্যনুশীলন-রুচি সহজ-স্বভাবরূপে উদিত না

হয়, তবে কিছুদিন পরে তাহা বন্ধ হইয়া যাইবেই যাইবে। তখন একাদশীতে নিয়মু উপবাসের পরিবর্ত্তে অনুকল্পের নামে চীনাবাদাম, ছানার ডালনা ও লুচি ভোজন-মহামহোৎসব, রাত্রি-জাগরণের পরিবর্ত্তে দিবানিদ্রা ও অন্য রাত্রিতেই নিদ্রার ক্রোড়ে পরনারি কার্য্য আরম্ভ হইয়া যাইবে। অনধিকারী ব্যক্তি কেবল দাম্ভিক উক্তি দেখাইয়া আপনাকে অধিকারী বলিয়া প্রকাশ করিলেই অধিকারী হইতে যাইতে পারে না। অধিকারকে ক্রমে ক্রমে মহতের সঙ্গ, উপদেশ, যথাদিষ্ট সাধন ও অনুশীলনের দ্বারা উন্নত করা যায়, কিন্তু অধিকার-বহির্ভূত সাধনের অভিনয় করিয়া কেহই মঙ্গললাভ করিতে পারে না। অমুক প্রতিষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত সেবকের অভাব, অমুক স্থানের ভিক্ষা-সংগ্রহার্থ লোকের প্রয়োজন, অমুক স্থানের সংকীর্ত্তনসঙ্ঘের নেতা আবশ্যক, অমুক আশ্রমে মাসিক দুই-হাজার টাকা আনুকূল্য প্রয়োজন, অমুক আশ্রমে অর্চ্চক আবশ্যক, অমুক সভায় বক্তৃতার জন্য বক্তা, অমুক আসরে গান করিবার জন্য গায়ক আবশ্যক—এক কথা, আর অকপট সেবকের প্রার্থনা আর এক কথা। কর্ম্মদক্ষতা থাকিলেই তিনি সহজ সেবক বা কীর্ত্তনসঙ্ঘের পরিচালক হইতে পারেন না বা অর্চ্চনের মন্ত্রমুদ্রা-প্রভৃতি জানিলেই অর্চ্চক হইতে পারেন না। যে অধিকার ও যোগ্যতা থাকিলে যে সেবার সাধন করিতে পারা যায়, সেই সেবা ও যোগ্যতা না দেখিয়া কেবল লোক-সংগ্রহ, অর্থ-সংগ্রহ বা প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের জন্য সময়সেবী (Time-server) সৃষ্টি করিলে তদ্দ্বারা হিতে বিপরীত ফলই অবশ্যম্ভাবী। যাহার পশুবৎ চিত্তবৃত্তি আছে, সেরূপ ব্যক্তি যদি কেবল বাগ্মিতাশক্তির গুণে কোন কীর্ত্তনসঙ্ঘের পরিচালক হইয়া লোকসমাজে ভক্তির উপদেশ করে, তবে তদ্দ্বারা অনেক লোকই বিপথগামী হইবে। উচ্ছ্বাসময়ী বক্তৃতার দ্বারা লোক মাতাইয়া অর্থ বা প্রতিষ্ঠাসংগ্রহ—জীবে দয়া নহে। জীবকে ব্রাহ্মপথে চালিত করিবার অধিকার কাহারও নাই। চিদ্‌বিলাসানু-ভবসম্পন্ন শাস্ত্রদ্রষ্টা মহাপুরুষব্যতীত ব্রহ্ম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-বর্জ্জিত সত্য কেবল ঐ সকল বুলি কপচাইয়া কেহ স্থাপন করিতে পারে না। ঐরূপ বক্তা শ্রীভগবান্ ও ভক্তের মহিমা যতটুকু বলেন, তাহাও অনুভবের সহিত বলিতে পারেন না। এতদ্ব্যতীত উচ্চতর সিদ্ধান্ত বা অনুভবের কথায় ত' তাহাদের অধিকারই নাই, কিন্তু অনেক সময় বাধ্য হইয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার জন্য শাস্ত্রদ্রষ্টা পুরুষগণের ন্যায় অনেক সিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিবার বা অনেক সমস্যামূলক প্রশ্নের উত্তর দিবার অভিনয় করিতে হয়; ইহার দ্বারা অনুভবহীন নরাধম বক্তা নিজের মনকে ঠকাইয়া অপরকে ঠকাইয়া থাকেন।

গৃহত্যাগের অধিকার-লক্ষণে শ্রীভক্তিবিনোদ

অধিকারবিচার না করিয়া গৃহী ও গৃহত্যাগী সাজিলে ও সাজাইলে কলির উৎপাত উপস্থিত হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৃহী ও গৃহত্যাগীর অধিকার বিচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"অবস্থিভেদে ভক্ত দুই প্রকার—গৃহস্থভক্ত ও গৃহত্যাগী ভক্ত। ভক্তগণ যখন গৃহস্থ থাকেন, তখন বিষয়ীদের ন্যায় বিষয়ে কেবল ইন্দ্রিয় তর্পণ করেন না; তাঁহার কর্ণ হরিকথা ও সাধুজীবন শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়; তাঁহার আশা, ক্রিয়া, আতিথ্য, যাহা—সমস্তই কৃষ্ণসেবার অধীন। তাঁহার সমস্ত জীবনই জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম ও বৈষ্ণব সেবন—এই মহোৎসবময়। কলিকালে জীবের পক্ষে গৃহস্থ-বৈষ্ণব হওয়াই উচিত, পতনের আশঙ্কা নাই; ভক্তিসমৃদ্ধিও সম্পূর্ণরূপে হইতে পারে। গৃহস্থ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে অনেক ভক্তও গুরু আছেন, তাঁহাদের সঙ্গ জীবের বিশেষ শ্রেয়স্কর। মহা-প্রভুর অধিকাংশ পার্ষদগণই গৃহস্থভক্ত। অনাদিকাল হইতে ভক্ত রাজর্ষি দেবর্ষি অনেকেই গৃহস্থভক্ত। ধ্রুব-প্রহ্লাদ-পাণ্ডবাদি সকলেই গৃহস্থভক্ত। গৃহস্থভক্তকে জগতের পূজনীয় বলিয়া জানিবেন। **গৃহস্থভক্তগণের মধ্যেই কেহ কেহ গৃহত্যাগী হইবার অধিকারী হন। জগতে তাঁহাদের সংখ্যা অল্প এবং তাঁহাদের সঙ্গ বিরল।**" (বৈষ্ণবধর্ম্ম, ৭ম অধ্যায়)

এই গৃহত্যাগি-ভক্তের অধিকার-লক্ষণ কি, তদ্বিষয়ে, ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ বলিতেছেন (বৈ ধ ১৮ অ),—

"প্রবৃত্তি যখন পূর্ণরূপে অন্তর্মুখী হয়, তখনই গৃহত্যাগের অধিকার জন্মে। তৎপূর্ব্বে গৃহত্যাগ করিলে পুনরায় পতন হইবার বিশেষ আশঙ্কা। আমৌ স্ত্রীসঙ্গস্পৃহাশূন্যতা, সর্ব্বজীবে পূর্ণদয়া, অর্থ-ব্যবহারে তুচ্ছজ্ঞান, কেবল প্রাণাচ্ছাদন-সংগ্রহের জন্য অভাবকালে ধর্ম্ম, কৃষ্ণে শুদ্ধা রতি, বহির্মুখসঙ্গে

তুচ্ছজ্ঞান, মানাপমানে সমবুদ্ধি, বহ্বারম্ভে শূন্যপূর্ণতা, জীবনে-মরণে রাগদ্বেষরাহিত্য"—গৃহত্যাগী ভক্তের অধিকার-লক্ষণ। 'নিরপেক্ষ গৃহত্যাগী ভক্তের সন্ধান পাইব'—এই আশায় কেহ কেহ কৃত্রিম অধিকার প্রকাশ করেন। সেটা নিরর্থক ও অত্যন্ত অমঙ্গলজনক।

গৃহত্যাগের অধিকার-বিচার-সম্বন্ধে শিষ্য অপেক্ষা গুরুর অধিকতর দায়িত্ব আছে; এতৎ-সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—"আগে গুরুদেব দেখিবেন যে, শিষ্য উপযুক্ত পাত্র কিনা। গৃহস্থভক্ত হইয়া কৃষ্ণভক্তির বলে শম-দমাদি ব্রহ্মস্বভাব লাভ করিয়াছেন কিনা, স্ত্রীসঙ্গ-শূন্যপুরুষ হইয়াছেন কিনা, অর্থ-পিপাসা ও 'ভাল খাওয়া পরা'র বাঞ্ছা নির্মূল হইয়াছে কিনা, কিছুদিন শিষ্যকে নিজের নিকট রাখিয়া ভালরূপে পরীক্ষা করিবেন। যখন উপযুক্ত পাত্র বলিয়া জানিবেন, তখন ভিক্ষাশ্রমের বেষ দিবেন; তৎপূর্ব্বে কোন প্রকারেই দিবেন না। অনুপযুক্ত পাত্রে বেষ দিলে গুরু অবশ্যই পতিত হইবেন।" (জৈ ধ, ৭ম অ)

কেহ কেহ বলেন,—অত্যন্ত অনর্থযুক্ত জীবের পক্ষে গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করিতে গেলে তাহাকে অধিকতর কাম, ক্রোধ, মোহ, আসক্তি-প্রভৃতি অনর্থের মধ্যেই ডুবিতে হয়; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অত্যন্ত কামুক-প্রকৃতি বদ্ধজীবের অধিকারে গৃহস্থাশ্রম-স্বীকারের দ্বারাই ক্রমিক-মঙ্গলের কথা অতি সুস্পষ্ট ভাষায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। গৃহস্থগণ হয় পরমহংস, না হয় অতি বদ্ধজীব। বিদ্বদ্গৃহস্থগণের সহিত (যেমন শ্রীজনক, শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত-প্রভৃতি) অতিবদ্ধ, ক্রমিক-মঙ্গলকামী গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক কর্ম্মার্পণের উপদেশ-অনুসরণেচ্ছু ব্যক্তিগণকে একাকার করিতে হইবে না। অত্যন্ত কামী ব্যক্তিগণকে ব্রহ্মচর্য্য-সন্ন্যাসাদি-আশ্রম স্বীকার করাইলে তাঁহারা সেই আশ্রমের মর্য্যাদা কিছুতেই রাখিতে পারিবেন না, কেবল কতকগুলি উৎপাতের সৃষ্টি করিয়া ক্রমিক-মঙ্গলের পথটীকেও রুদ্ধ করিবেন।

এইরূপ ক্রমিক-মঙ্গলেচ্ছু অর্থাৎ বর্ণাশ্রমে অবস্থান-পূর্ব্বক কর্ম্মার্পণরূপ প্রাথমিক ভাগবতধর্ম্মের দ্বারে প্রবেশেচ্ছু গৃহস্থগণের ক্রমে-ক্রমে কৃষ্ণপ্রীত্যে ভোগত্যাগের চেষ্টাকে একদিনেই 'যুক্তবৈরাগ্য'-আখ্যা দেওয়া যায় না। তবে তাঁহারা ক্রমে-ক্রমে যতটা কৃষ্ণপ্রীতির জন্য ভোগত্যাগে পরিপক্ক হইতে থাকিবেন, ততটা যুক্ত-বৈরাগ্যের দিকে অভিযান করিতে পারিবেন। অতিবদ্ধ কামুক জীব গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করিবামাত্রই তাহাকে যুক্তবৈরাগী বলিলে ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধ করা হইবে। বস্তুতঃ যুক্তবৈরাগ্যের পরিপক্কাবস্থাই বিদ্বদ্গৃহস্থাবস্থা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিকে যেমন শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামী প্রভুকে "কনকটবৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা," "ক্রমে-ক্রমে পাব লোক ভবসিন্ধুকূল"—এইরূপ উপদেশ দিলেন, আর একদিকে অকৃতদার শ্রীল রঘুনাথ ভট্টকে "বিবাহ করিও না, বৈষ্ণব মাতাপিতার সেবন করিও এবং তাঁহাদের স্বধামগমনের পর একান্তভাবে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের আদর্শ অনুসরণ করিও"—এইরূপ উপদেশও দিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বিভিন্ন পার্ষদগণের দ্বারা বিভিন্ন লীলা-প্রাকট্যের মধ্যেও অধিকার-বিচারের সুস্পষ্ট আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনকে যে-ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, শ্রীরঘুনাথ ভট্টকে ঠিক সেইভাবে তৎক্ষণাৎ গৃহত্যাগের লীলা করিবার শিক্ষা প্রদান করেন নাই। শ্রীল রঘুনাথদাস-প্রভুকে দ্বারাও সেইরূপ শিক্ষা প্রচার করেন নাই। শ্রীপ্রতাপ-রুদ্রকে সমস্ত রাজৈশ্বর্য্য ও স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রী-রূপ-সনাতনের ন্যায় যুক্তবৈরাগী হইবার উপদেশ প্রদান করেন নাই। শ্রীবাস-পণ্ডিতের সমগ্র সংসার শ্রীমন্মহা-প্রভুর সেবা-তৎপর ছিলেন; কিন্তু মহারাজ শ্রীপ্রতাপ-রুদ্রের মহিষীগণ সকলেই বা তাঁহার সকল পুত্রই শ্রীগৌর-পাদপদ্মে একান্ত অনুরক্ত ছিলেন না, ইতিহাসের পৃষ্ঠা ইহার সাক্ষ্য প্রদান করে। শ্রীপ্রতাপরুদ্রের অপ্রকটের পর তাঁহার কোন কোন পুত্র বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া নিহত ও দণ্ডিত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীপ্রতাপ-রুদ্রকে তাঁহার অধিকারোচিত শিক্ষাই প্রদান করিবার লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। "গৌরাঙ্গ-বিরোধিজনের মুখ না হেরিব"—এই শিক্ষা বৈষ্ণব-পিতার হৃদয়ে সহজেই উদিত হয়, কিন্তু বিষয়াসক্ত পিতাকে কৃত্রিমভাবে জোর করিয়া পুত্রাসক্তি ছাড়াইতে গেলে আসক্ত পিতা গোপনে গোপনে ভণ্ডামি বা কাপট্য শিক্ষা করে। যাহা ভক্তির প্রাকট্যে স্বাভাবিকভাবে উদিত হয়, তাহাকে কৃত্রিম-

পরার অনবরে উৎপাদন করিতে গেলে ছিতে বিপরীত ফল হয়। শ্রীল রায়-রামানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ অবস্থান করিবার জন্য রাজ-কার্য্য পরিত্যাগ করিবার লীলা প্রদর্শন করিলে শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীল রায়-রামানন্দকে বলিয়াছিলেন,—

"তোমার যে বর্ত্তন, তুমি খাও সেই বর্ত্তন।
নিশ্চিন্ত হঞা ভজ চৈতন্যের চরণ॥"

(চৈ চ ম ১১।২২)

নিশ্চিন্ত শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীরায়-রামানন্দ বর্ত্তন না পাইলে কি অর্থাভাবে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না? শ্রীপ্রতাপ-রুদ্রের শ্রীরামানন্দের প্রতি এই যে শুদ্ধ-প্রীতি, তাহা কমলাকান্ত বিশ্বাস বা বাউলিয়া বিশ্বাসের শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুকে তিনশত মুদ্রার অধমর্ণরূপে স্থাপন করিয়া শ্রীপ্রতাপ-রুদ্রকে উক্ত ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য 'অনুরোধ-পত্রিকা'-প্রেরণের ন্যায় ব্যাপার নহে। আবার শ্রীরামরায়কে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

"ঐছে ঘর যাই' কর' কুটুম্ব-মিলন।"

(চৈ চ ম ১১।৩৯)

এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামরায়কে শ্রীজগন্নাথ-দর্শন ও তৎসঙ্গে আবার গৃহে গমন করিয়া কুটুম্বগণের সহিত মিলনের কথা বলিলেন কেন? কেহ কেহ বলিবেন,—শ্রীরামরায় পরমহংস-বিদ্বৎ-শিরোমণি; তাঁহার কুটুম্ব-দর্শনে জড়াসক্তির কোন প্রসঙ্গই হইতে পারে না।

এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বটে; কিন্তু অনধিকারী ব্যক্তি-গণকে শ্রেষ্ঠ অধিকারী ব্যক্তিগণের আদর্শ অনুকরণ করিতে দেওয়া যেরূপ বিপজ্জনক, তদ্রূপ অনধিকারীকে কৃত্রিমভাবে স্বল্পাসক্তি বা জড়াসক্তি-পরিত্যাগের জন্য বল-প্রয়োগও ভক্তির পথ নহে; ইহা আরোহবাদিগণের কৃত্রিমপন্থার অযৌক্তিক অনুকরণমাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন যে, শ্রীবাসুদেবে প্রীতিযোগের উদয় না হইলে কৃত্রিম বল-প্রয়োগের দ্বারা দেহযোগ বা জড়াসক্তি দূর হয় না, ইহা বহু প্রত্যক্ষ উদাহরণের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। কোন কোন ব্যক্তি চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবায় (?) পরম উৎসাহী, এমন কি, উচ্চ কর্ম্মচারিবৃন্দের বিরাগভাজন হইয়াও ছলে-বলে-কৌশলে সাধুসঙ্গের জন্য ব্যস্ততা প্রদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর তিনি একান্তভাবে শ্রীধামবাস, সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গ, শ্রীহরিকথা-শ্রবণের অভিনয় করিয়াও পূর্ব্বের সমস্ত উৎসাহ হারাইয়া ফেলিয়াছেন, তৎপরিবর্ত্তে অধিকতর দেহ গেহাসক্ত, কপটী, অপরাধী ও প্রচ্ছন্ন নাস্তিক হইয়া গুরুবৈষ্ণবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন।

শ্রীরামরায়ের আদর্শের কথা অনধিকারীকে শিক্ষা দেওয়ার ফলে তাহারা শ্রীরামরায় ও তদ্ভিন্ন-বিগ্রহগণের শ্রীচরণে অপরাধই করিয়াছে। অনধিকারীকে নিষ্কিঞ্চনতা শিক্ষা দিতে গেলে এইরূপই উৎপাত উপস্থিত হয়।

কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম অধিকারের যথার্থস্বরূপ

ভক্তিরাজ্যে অধিকার বলিতে ত' জানিয়া রাখিয়াছিলাম,—কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম অধিকার; সে-সম্বন্ধে একটা মনগড়া পরিমাপ-যন্ত্রও ছিল, যথা—যাঁহারা ঠাকুর-সেবা করেন, তুলসীচন্দন করেন, চন্দন ঘষেন, ঠাকুরের বাসন মাজেন, ঠাকুরের নৈবেদ্য রন্ধন ও ভোজন করেন, তাঁহাদের অধিকারই কনিষ্ঠাধিকার; আর যাঁহারা গৃহস্থই হউক, আর অগৃহস্থই হউক, ঠাকুর-সেবার কোন প্রকার ধার ধারেন না, তুলসী বা ভগবন্নৈবেদ্যাদির সহিত যাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই, ঠাকুরের ভোগের পূর্ব্বেই যাঁহারা ভোজন, শয়ন বা কর্ম্মক্ষেত্রে গমন করেন, অর্থাৎ যাঁহাদের কোন নিয়ম-তান্ত্রিকতার ধারাই নাই, তাঁহাদের অধিকারই মধ্যম অধিকার; আর মধ্যম অধিকার তাঁহাদেরই, যাঁহারা মস্তিষ্কের কসরৎ করিয়া বিচার বা সিদ্ধান্তের নামে যে-কিছু স্বকপোল-কল্পনাকে স্থাপন করিতে পারেন। শাস্ত্রের আনুপূর্ব্বিক ও প্রণালীবদ্ধ অনুশীলন না করিয়াই, শাস্ত্রের উপক্রম-উপসংহারাদির দ্বারা তাৎপর্য্য অবধারণ না করিয়াই নিজের মতবাদ স্থাপন করিবার জন্য যে কোন শ্লোক বা পয়ারের যে-কোনরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারেন, অথবা যাঁহারা অক্ষজিরসন বা সাংখ্য-জ্ঞানের অসৎসঙ্গ বিচার লইয়া মনীষাকে আলোড়ন করিতে পারেন, তাঁহাদেরই মধ্যমাধিকার। আর উত্তম অধিকারের রহস্য অনেক সময়ই রহস্যাবৃত; কোন কোন সময় যাঁহারা বেদবিধির অবমাননা করিতে পারেন, স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি আসক্তি, বিষয় চেষ্টা-প্রবৃত্তিকে নিজ নিজ পতির জ্ঞাপক

বা পালনের দ্বারা অপরের অধ্যাত্মজ্ঞানগোচর বলিয়া স্থাপন করিতে পারেন এবং সেই অভিনয়ের অন্তরালে বিষয়-মুগ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে অতি সুলভে সিদ্ধ-পরিচয়, গুরু-শ্রেষ্ঠত্ব ও অন্তরঙ্গত্ব প্রচার করাইতে পারেন, এই জাতীয় অধিকারিগণই উত্তম অধিকারী !

এইরূপ কাল্পনিক অধিকার-পরিমাপের যানযন্ত্রটির সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের নাম আরোপ করিয়া অধিকার-নির্ণয়ের যে চেষ্টা চলিয়াছিল, উহার কাপট্যনাট্য শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর প্রেরিত কোন মহাজন শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর প্রদত্ত আলোক-বর্ত্তিকাদ্বারা প্রদর্শন করিয়া অধিকার-নির্ণয়ের প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের "অর্চ্চায়ামেব"-শ্লোক-কথিত 'প্রাকৃত ভক্ত' বা কনিষ্ঠভাগবতের বিচার আমাদের কল্পিত পরিমাপ-যন্ত্রের অনুযায়ী নহে ; 'প্রাকৃত' বলিতে প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত হেয়বস্তু নহে ; যাহার ভক্তিপ্রকৃতি বা স্বভাব সম্প্রতি আরব্ধ হইয়াছে, তিনিই প্রাকৃতভক্ত। সেই প্রাকৃত ভক্ত বা কনিষ্ঠভাগবত আবার কনিষ্ঠ-সোপানাশ্রিত, মধ্যম-সোপানাশ্রিত ও উত্তম-সোপানাশ্রিতভেদে ত্রিবিধ। উত্তম-সোপানাশ্রিত বা মুখ্যকনিষ্ঠ অজাতপ্রেমা ও শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধা-যুক্ত, সুতরাং কনিষ্ঠাধিকারী বলিয়া ডিক্রী ডিস্‌মিস্ করিলে চলিবে না। কনিষ্ঠভাগবতগণের মধ্যে যে ত্রিবিধ অধিকার, সেই অধিকার-অনুযায়ী ব্যবহার ও অনুশীলন করিতে হইবে। সাধক ও সিদ্ধের কায়িক, বাচিক ও মানসিক লক্ষণের দ্বারা অধিকার-বিচার হয়। মস্তিষ্কের জোরে সাংখ্যযোগের দুই-চারিটি কথা তোতাপাখীর ন্যায় বলিতে পারিলেই তাহাকে মধ্যমাধিকারী বলা যায় না। মধ্যম [illegible] সৎ বা সাধক নহেন, তিনি মহাভাগবতের অন্যতম ; তিনি মহৎ অর্থাৎ সিদ্ধ। সেই মধ্যম মহা-ভাগবতের মধ্যে আবার কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম শ্রেণী আছে। উত্তম মহাভাগবতও আবার তাঁহার আবেশ ও স্মৃতির তারতম্য-অনুসারে কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম শ্রেণীর হইয়া থাকেন।

অধিকার-লঙ্ঘনাশঙ্কায় জাত্যারূপ অধিরূঢ়তা

অত্যন্ত জড়াভিনিবিষ্ট অপরাধী জীবের ভক্তিবিধিলঙ্ঘন-স্বভাব হইতে উন্নত অধিকারে আরোহণের প্রতি নৈসর্গিক জাড্য উপস্থিত হয় ; কারণ, উন্নততর অধিকারে আরোহণের আনুষঙ্গিক ফল 'কৃষ্ণপ্রীত্যে ভোগত্যাগ' ; তাহা জড়াভিনিবিষ্ট ব্যক্তি করিতে প্রস্তুত নহে, সে পানাপুকুরে আবৃত বদ্ধ জলের ন্যায় চিরকাল একই আড্যাভাব লইয়া থাকিতে ভালবাসে। অনেক সময় কৃষ্ণপ্রীতিতে ভোগত্যাগ করিতে হইবে, এই আশঙ্কায় সৈন্যের আবরণে নিজের ক্ষুদ্র অধিকার জ্ঞাপন করিয়া ক্রমশঃ নিম্ন হইতে নিম্নতর পিচ্ছিলপথে পতিত হইতে থাকে। এইরূপ ক্ষুদ্রাধিকার-নিষ্ঠার অত্যাগ্রহ দেখিয়া প্রকৃত গুভানুধ্যায়ী নিরস্ত হন না। পরম করুণাময় শ্রীগুরুদেব সেরূপ ব্যক্তিরও ক্রমিকমঙ্গল বিধান করেন ; তাহাকে ক্রমে ক্রমে উন্নততর অধিকারে আনয়ন করিবার চেষ্টা করেন। তাহার বদ্ধাবস্থা ও জাড্যকে প্রশ্রয় দেন না ; আবার তাহাকে অধিকার-বহির্ভূত কোন সোপানে অকস্মাৎ আনয়ন করিয়া চিরতরে পঙ্গু করিয়া দেন না ; তাহাকে ক্রমে ক্রমে আরোহণ করিবার প্রণালী শিক্ষা দেন।

অনুকরণ ও অধিকার

অনুকরণ করিয়া কোন অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। এমন অনেক ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা অপর ব্যক্তিকে সংসার ত্যাগ করিতে দেখিয়া নিজের সেরূপ ভজনবল বা হৃদয়ের বল না থাকিলেও দেখাদেখি সংসার ত্যাগ করেন। কেহ কেহ বা দেখাদেখি দীক্ষা-গ্রহণের অভিনয়, শ্রীহরিনাম-গ্রহণের অভিনয়, সঙ্ঘে থাকিবার অভিনয়, শরণাগত হইবার অভিনয়, শ্রীবাস-বাসের অভিনয় প্রভৃতি করিয়া থাকে। এই সকল অনুকরণ-চেষ্টা যোগ্যতা বা অধিকারোচিত চেষ্টা নহে। কারণ, কিছুদিন পরেই এই অনুকরণ-চেষ্টা ধরা পড়ে। যে অপরকে দেখিয়া উল্লাসভরে ঐ সকল কার্য্য করিয়াছিল, সে ব্যক্তি বেশীক্ষণ তাহা সংরক্ষণ করিতে পারে না। তাহার হৃদয়ে বিষয়পিপাসা আরও প্রবলভাবে জাগিয়া উঠে এবং সুদে-আসলে ক্ষতি-পূরণ আদায় করে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (২।৫৯) শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥"

যিনি ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় গ্রহণ করেন না, এরূপ জীবের নিকট ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু আসক্তি

নিবৃত্ত হয় না, পরন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়বাসনা পর-তত্ত্বকে দর্শন করিয়া আপনিই নিবৃত্ত হয়।

উৎকৃষ্ট রস না পাইলে নিকৃষ্টরস কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে না; কারণ, রসাস্বাদন করাই জীবের স্বভাব। কেবল বিষয় হইতে জীবকে দূরে রাখিলে বিষয়-গ্রহণের পিপাসা মূল-নীড় নষ্ট হয় না। স্থূলতঃ হইতে দূরে রাখিলে জীবের নৈসর্গিক স্থূলদর্শিতা নির্মূল হয় না, বরং বিরহে সম্ভোগের অধিকতর পুষ্টি অর্থাৎ স্মৃতি, আবেশ ও অভি-নিবেশ আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কোন কোন কর্ম্মি-সম্প্রদায়ের মতবাদানুসারে বিষয় হইতে কৃত্রিমভাবে দূরে রাখিয়া বিষয় ভুলাইবার চেষ্টা হয় বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না। রসময়ী ভক্তি সেরূপ কৃত্রিমপন্থা শিক্ষা দেন না। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলেন,—

"স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব।"

রসরাজের শ্রীচরণামৃত-রস অনুভব না করা পর্য্যন্ত কেহ কুরস, বিরস বা অপরস পরিত্যাগ করিতে পারে না।

ক্রমানুসরণ

রসরাজের এই রস আস্বাদন করাইবার প্রণালী মহাভাববিগ্রহ মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দর শিক্ষা দিয়াছেন। সেই শিক্ষার মধ্যে ক্রম আছে। শ্রীরাধা-রামানন্দসংবাদে অধিকারানুযায়ী ক্রম-নির্দ্দেশ আছে। মহতের বিশেষ-কৃপায় কোন কোন ব্যক্তির ক্রমবিপর্য্যয়সত্ত্বেও তদুপায়ে ভক্তিলাভের দৃষ্টান্ত সাধারণ বিধি হইতে পারে না। শরণা-পত্তি বৈধী ভক্তির অঙ্গতম, কিন্তু যাহার লৌকিক-শ্রদ্ধার অঙ্কুরমাত্র হইয়াছে, তাহাকে একদিনেই শরণাগত করা যায় না। বৈধী ভক্তিতে শাসন বা দণ্ডের বিধান আছে, কিন্তু শাসন বা দণ্ডদ্বারা পরিচালনা করিয়া কাহাকেও একমুহূর্ত্তে শরণাগত করা যায় না। পুনঃ পুনঃ দ্বারার ঘাত-প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া অন্য উপায় না দেখিয়া সাধারণ নিত্যবদ্ধ জীব শরণাগত হয়। সেই ক্রম, সময় ও যোগ্যতা অস্বীকার করিলে হিতে বিপরীত ফল হইয়া থাকে। সাধকের শত শত দোষ-ত্রুটীসমূহ বিশ্লেষণ করিয়াও সাধকের কোন মঙ্গল করা যাইবে না, কিন্তু শ্রৌত-শাস্ত্রসম্মত অধিকার নির্ণয় করিয়া সদ্বৈদ্যের দ্বারা সুচিকিৎসা হইলে অবশ্যই ফললাভ হইবে।

চিন্তাধিকারীর প্রতি অহৈতুকী কৃপা

অবশ্য ইহাও সত্য যে, এমন অনেক সদ্বৈদ্যের আছেন, যাঁহারা এইটী নিম্ন-ভূমিকায় অবতরণ করিয়া চিকিৎসা করেন না। সেইরূপ কোন কোন সদ্গুরুপাদপদ্ম সকল সময়েই পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা দান করিবার জন্য প্রস্তুত হন না। যিনি অধ্যাপকগণেরও অধ্যাপক-বা যিনি কলেজ্ ইন্‌স্‌পেক্টার, তাঁহার পাঠশালায় বিদ্যা বা 'ক' 'খ' শিক্ষা দিবার সময় নাই। তবে কখনও তিনি যদি স্বেচ্ছায় কৃপাপূর্ব্বক পাঠশালা পরিদর্শন করিতে গমন করেন, তখন ছেলে-দিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য 'ক' 'খ'-সম্বন্ধে প্রশ্ন, বা 'ক' 'খ' শিক্ষা দিতে পারেন, কিন্তু ইহা তাঁহার চিরস্থায়ী ভূমিকা নহে; তিনি নিত্য যে ভূমিকায় অবস্থান করেন, তাহাতে তিনি পোষ্ট গ্রাজুয়েট্ বা অধ্যাপকগণেরই 'বিসিস্' পর্য্যবেক্ষণে রত। তবে এই জগতে পোষ্ট গ্রাজুয়েট্ বা ডক্টরের সংখ্যা অতি অল্প; স্কুল ও হীরক অত্যন্ত কম, মাটির পরিমাণই বেশী। সাধকগণের মধ্যেও অনন্য ভক্তির ঐকান্তিক-সাধক খুব বিরল।

সময়ের পরিপক্কতা

সাধনরাজ্যে অধিকারবিচার ও সময়বিচার—উভয়ই আবশ্যক। এজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—যখন জীবের সংসারক্ষয়ের সময় হয়, তখনই মহতের দর্শন ঘটে। সময় না হইলে মহতের কৃপা হয় না। সাধারণ জীবজগৎ জন্ম-জন্মান্তর বাসনারাজ্যে ভ্রমণ করিতে থাকে। সেই সময় হইবার পূর্ব্বে কেহ জোর করিয়া লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি জন্মের সংসার-বাসনাকে একমুহূর্ত্তে দূর করিতে পারে না; তবে আবার মহতের বিশেষ কৃপায় একমুহূর্ত্তও রাখিতে পারে। কেহ কেহ সঙ্ঘের মধ্যে একত্রিত হইয়াছেন বা শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের অভিনয় বা সেবার অভিনয় করিতেছেন বা হরিকথা-শ্রবণের অথবা মহতের দর্শন-স্পর্শনাদির অভিনয় করিতেছেন বলিয়াই যে তাঁহারা মহতের কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাও বলা যায় না। কারণ, কার্য্যের দ্বারাই কারণ নির্ণয় করা হয়। মহতের কৃপালাভ হইলে সংসার-বাসনা অর্থাৎ কোনরূপ আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-বাসনা থাকিবে না; কেবল অতীষ্টদেবের সুখানু-সন্ধান-বৃত্তিই আবেশ থাকিবে। ইহারই নাম মহতের প্রকৃত কৃপা।

অতএব সেরূপ মহৎকৃপা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত অধিকার-বিচার ও সময়ের অপেক্ষা—উভয়ই করিতে হইবে। দশ বৎসর, বিশ বৎসর, পঁচিশ বৎসর হইল হরিভজন করিতে আসিয়াছি বলা ত' দূরের কথা, পঞ্চাশ বৎসর, এক জন্ম, দুই জন্ম, এক লক্ষ জন্ম বা বিশ লক্ষ জন্মও চলিয়া যাইতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"শ্রীবাসুদেবে আমাতে যেকাল পর্য্যন্ত প্রীতি না হইবে, সেকাল পর্য্যন্ত জীবের দেহবন্ধন হইতে মুক্তি হইতে পারে না" (ভা ৩।৫।৩)। এই দেহযোগ হইতে মুক্তি একমাত্র ভগবৎ-প্রীতির আনুষঙ্গিক ফল। আবার ভগবৎপ্রীতি মহতের কৃপাসাপেক্ষ। আমরা হয় ত' মনে করি,—'আমরা ত' সর্ব্বক্ষণ মহতের সঙ্গে বাস করিতেছি'—কেহ বা বলিব, "মহতের পরিচর্য্যা, মহতের শ্রীমুখবিগলিত হরি-কথা শ্রবণ করিতেছি অর্থাৎ মহতের পরিচর্য্যা ও প্রসঙ্গরূপা সেবা করিতেছি; যদি আমাদের মহতের পরিচর্য্যা ও প্রসঙ্গরূপা সেবা হয়, তবে তাহার ফলও নিশ্চয়ই হইবে।"

মহতের পরিচর্য্যার ফল-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন যে, মহতের পরিচর্য্যার দ্বারা তাঁহার পাদপদ্মে রতিরাস বা প্রেমোৎসবের উদয় হয় এবং আনুষঙ্গিকভাবে সংসারাসক্তি বা দেহাসক্তি দূর হয় (ভা ৩।৭।১৩); আর যাঁহারা শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মসৌরভ-লুব্ধ সাধুগণের সঙ্গ করেন, তাঁহাদের সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসুখানুসন্ধান-স্মৃতি বা আবেশ থাকে বলে তাঁহারা অতিপ্রিয় এই মর্ত্ত্য শরীর ও ইহার অনুগত স্ত্রী-পুত্র, গৃহ-সুহৃৎ-প্রভৃতির স্মরণ স্বাভাবিকভাবেই করেন না।

'কৈ, আমাকে ত' লাঠি মারিয়াও দেহ-দেহাসক্তি হইতে, সংসারস্মৃতি হইতে সাধুগণ রক্ষা করিতে পারিতেছেন না? শ্রীভগবানে রতিরাসের কথা ত' আমার কাছে স্বপ্নের তুল্য; শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের ত' অনেক অভিনয় করিতেছি, কিন্তু এই মর্ত্ত্যশরীর ও ইহার অনুগত বস্তুর প্রতিই ত' সর্ব্বক্ষণ স্মৃতি ও অভিনিবেশ রহিয়াছে; ভগবৎ-স্মৃতি ত' এক মুহূর্ত্তও হয় না।' ইহার কারণ-নির্ণয়ে মহাজনগণ বলেন,—যখন তোমার মহতের অনুক্ষণ-সঙ্গাদি-লক্ষণভক্তিদ্বারাও জড়াভিনিবেশ, ভক্তিশিথিলতা-প্রভৃতি দূর হইতেছে না, তখন তাহা নিশ্চয়ই কোন পূর্ব্বাপরাধেরই ফল। আমার ব্যাধির এই নিদান মহাজনরূপী সদ্বৈদ্য নির্ণয় করিয়া দিলেন আর অপরাধ দূর করিবার যে বিধান, তাহাও বলিয়া দিলেন— (১) মহতের নিকট বিগলিত-হৃদয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করা, (২) কোন্ মহাজনের নিকট অপরাধ হইয়াছে জানিতে না পারিলে সর্ব্ব-মহতেরই প্রাণ-বন্ধু শ্রীহরিনামের অবিরাম অনুশীলন করা, আর (৩) তাহাও না পারিলে জন্ম-জন্মান্তর কষ্ট ভোগ করিয়া অপরাধের ক্ষয় করা অর্থাৎ অপরাধ-ক্ষয়ের জন্য সময়ের অপেক্ষা করা।

প্রথম দুইটি ঔষধ আমার পক্ষে গ্রহণ করা কঠিন। বাহিরে মহতের নিকট আমি ক্ষমা-ভিক্ষার অভিনয় করিলেও বিগলিত-হৃদয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে পারি না। হৃদয় ত' অপরাধে প্রস্তর হইয়া রহিয়াছে, একবিন্দুও জল চক্ষে আসে না—হৃদয় গলে না: দ্বিতীয় প্রকার ঔষধটিও আমার পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব। শ্রীহরিনামে একটুকুও রুচি নাই, অবিরাম অনর্গল হরিনাম গ্রহণ করার কথা ত' আমার পক্ষে 'আকাশ-কুসুমে'র ন্যায় অলীক। সুতরাং বাধ্য হইয়া আমাকে তৃতীয় প্রকার ব্যবস্থাই গ্রহণ করিতে হইতেছে, জন্মজন্মান্তর সংসারক্লেশরূপ দণ্ড ভোগ করিতে করিতে যদি কোনদিন অপরাধের ক্ষয় হয়, এই আশায়।

এখন আমার এইরূপ অধিকারে বা এইরূপ অধিকার-যুক্ত সমশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের দেহ-দেহাসক্তি কি আত্মকৃতা করিলেই দূর হইবে? অপার করুণাময় অদোষদর্শী সাধুগণ কি এরূপ অধিকারেও জীবের মঙ্গলের ব্যবস্থা করিয়াছেন? এইরূপ অধিকারের লোকসংখ্যা বহির্মুখবিশ্বে কম নহে। কাহারও বা মহতের সঙ্গে থাকিবার অভিনয় করিয়াও তাঁহার বাণীর প্রতি রুচিই হইতেছে না, কাহারও আপাত রুচি দেখা গেলেও সাধুর সঙ্গ-প্রভাবে উত্তরোত্তর উন্নত হওয়ার পরিবর্ত্তে যেন আরও অধঃপতনের দিকেই গতি দেখা যাইতেছে। প্রথম দিকে যে উৎসাহ ও জড়াসক্তি-ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়, কিছুদিন পরে আর সেই উৎসাহ থাকে না, দৈন্যের পরিবর্ত্তে জড়াহঙ্কার, জড়াসক্তির প্রতি শৈথিল্যের পরিবর্ত্তে ভক্তিশৈথিল্য ও অধিকতর জড়াসক্তি দৃষ্ট হয়। এরূপ অধিকারের ব্যক্তিগণ কি একবারেই দুশ্চিকিৎস্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে অথবা ইহাদেরও ক্রমে ক্রমে মঙ্গল হইতে পারে? সজ্জনালয়ে এই অধিকারের ব্যক্তিগণের চিকিৎসার দুইটি চরম-প্রণালী

দেখিতে পাওয়া যায়—(১) ইহাদিগকে চিকিৎসিত বলিয়া সম্পূর্ণ পরিবর্জ্জন করা ও (২) ইহাদিগকে একদিনেই কেবলা ভক্তির রাজ্যে আনয়ন করিবার জন্য প্ররোচনা বা চাপ দেওয়া।

এই দুইটি চরম প্রণালীই কি তাহাদের পক্ষে মঙ্গল-দায়িকা? বরং একবারে পরিবর্জ্জনের দ্বারা কখনও কখনও তাহারও নির্দ্দেশ দেখা যায়, কিন্তু ইহাদিগকে রাতারাতি সাধু করিয়া ফেলিবার যে প্রচেষ্টা ও প্ররোচনা দেখা যায়, তাহা নিশ্চয়ই সাধকের অধিকার লঙ্ঘন করাইবার চেষ্টা। নিম্নাধিকারীকে গায়ের জোরে উচ্চাধিকার প্রদান করা যায় না, প্রদান করিলেও তাহা থাকে না। তবে মহতের স্বতন্ত্র-কৃপাশক্তির কথা পৃথক্।

মিথ্যাচার

গায়ের জোরে উচ্চাধিকার প্রদান ও গ্রহণের ফলে অনেক আত্মমঙ্গলেচ্ছু সৎসাধকও 'মিথ্যাচার' হইয়া পড়ে। এজন্যই শ্রীভগবদ্গীতায় (৩.৬) শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়-সমূহকে নিগৃহীত করিয়া ভগবদ্-ধ্যানচ্ছলে মনে মনে বিষয়-সমূহ স্মরণ করিয়া অবস্থান করে, সেই বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি কপটাচার 'দাম্ভিক' বলিয়া কথিত হয়। অনেকে প্ররোচনায় পড়িয়া বা প্রতিষ্ঠাশা-লাভের জন্য রিপুর তাড়না ও কর্ম্মের পূর্ব-বাসনা থাকা সত্ত্বেও বাক্‌পাণি-প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়কে নিগৃহীত করিয়া ত্যাগীর আশ্রমে, মঠে বা সঙ্ঘে বাস করিয়া ভগবদ্ধ্যান বা হরিকথায় মন থাকিবার অভিনয় করে। কিন্তু তাহাদের মনটী সর্ব্বক্ষণ দেহ-গেহ-চিন্তাতে অভিনিবিষ্ট থাকে। উপস্থাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বাহ্যে নিগ্রহ করিলে কি হইবে, মনে মনে তাহারা আরও অধিকতর কাপট্যের সহিত চিন্তাদ্বারা মানসে বা কখনও স্থূলভাবে বিষয় ভোগ করিয়া থাকে। বরং তাহারা যদি গৃহাদিতে থাকিয়া বৈধ জীবন যাপন করিত, তাহা হইলে ত্রিতাপের তীব্র জ্বালায় অবিরাম-অনুভূতি হইতে বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণার উদয় হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া অপরের প্ররোচনায় বা প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির জন্য কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযম করিয়া ভগবদ্ধ্যানে মগ্ন থাকিবার অভিনয়ে তাহারা দেহগেহের চিন্তা যতটা করা প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক করিয়া থাকে। ভোগ্যবস্তুর কৃত্রিম ত্যাগ-জনিত বিরহে তাহাদের সম্ভোগলালসা হৃদয়ের মধ্যে হুতাশনের ন্যায় জ্বলিতে থাকে। কেবল তাহারা সরাগ বক্তার ন্যায় মঠ, আশ্রম বা বিরক্তগণের সঙ্গে থাকিয়া মুখে বাক্যবাগীশ মাত্র হয়। ইহাদের এই ব্যবহার নিশ্চয়ই লোকনাশের জন্য হইয়া থাকে। এই যে দ্বিজিহ্ব-ব্যবহার, ইহা জগতের পক্ষে ভয়াবহ অনিষ্টকর, নিজের পক্ষে ত' অনিষ্টকর বটেই। অধিকার-বহির্ভূত বর্ণাচরণের অভিনয় দেখাইতে গিয়া ইহারা 'দুই নৌকায় পা দেওয়া'র নীতি অবলম্বন করে এবং বিষয়ের অতলজলে ডুবিয়া প্রাণ হারায়। মহাজনগণ বলিয়াছেন,—অন্তরে বিরাগগ্রস্ত থাকিয়া বাহিরে বিষয়িপ্রায় থাকিলে ভজন-বৃদ্ধি হয়। কিন্তু অধিকার-বহির্ভূত বর্ণা করায় অনেকে বাহিরে বৈরাগী সাজিয়া অন্তরে বিষয়ী হইয়া পড়ে। অধিকার-লঙ্ঘনের ফলে এই মিথ্যাচাররূপ ফল অবশ্যই লাভ হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন—'মিথ্যাচার' না হইয়া হৃদয়ের কথা শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট খুলিয়া বলিলে শ্রীগুরুদেব তদনুযায়ী অধিকার নির্ণয় করিতে পারেন। বৈষ্ণবধর্ম্মে (৮ম) দেখিতে পাওয়া যায়—শ্রীহরিদাস বাবাজীমহাশয় শ্রীনিত্যানন্দদাসের চিত্তবৃত্তির অবস্থার অকপট বর্ণন শ্রবণ করিয়া তাঁহার অধিকার নির্ণয় করিয়াছিলেন।

সঙ্ঘের মধ্যে থাকিয়া সকল ক্ষেত্রে এইরূপে অকপটে নিজচিত্তবৃত্তির অবস্থা-বর্ণন সম্ভবপর হয় না। প্রথম বাধা এই যে, সঙ্ঘে একটু সেবার অভিনয় দেখাইলেই সঙ্ঘে সঙ্গে হস্তে একটি প্রতিষ্ঠার পতাকা উপহার পাওয়া যায় অর্থাৎ নানা প্রকার উপাধি ও প্রশংসাপত্রাদি বা সঙ্ঘের কোন বিশিষ্ট পদ লাভ হয়। বদ্ধজীবের পক্ষে প্রতিষ্ঠাশার এমনি মোহ যে, উহা ত্যাগ করিয়া বদ্ধজীব কিছুতেই নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিতে পারে না। কেহ কেহ নিজের অবস্থা কিছুটা উপলব্ধি করিতে পারিলেও যদি সে লাজুক-প্রকৃতি অথবা ভীরু-স্বভাব হয় এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে সমালোচনার বাণ বর্ষিত হইবে বলিয়া শঙ্কিত হয়, তবে সেইরূপ সাধকের নিজের অবস্থা অকপটে বর্ণন করা অনেক সময়েই কার্য্যতঃ হইয়া উঠে না, তাহাতে ভিতরে ভিতরে

নালি-বা বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং অকস্মাৎ একদিন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

সঙ্গে থাকিবার অভিনয়কারী এরূপ শত শত প্রতীক দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, যাঁহাদের নিকট মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বা স্নেহ-প্রেম বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার নামোচ্চারণ করিলে তাঁহারা তৎপ্রতি উৎকট-বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেন; মনে হয়, তাঁহাদের ঐ সকল মায়িক বস্তুর প্রতি বিন্দুমাত্রও আসক্তি নাই। এমনও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে—মঠে পিতা ও পুত্র উভয়েই আছেন; পিতা পুত্রের দিকে ভ্রমক্রমেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না, যেন কাষ্ঠ-প্রস্তরের ন্যায় পরস্পর স্পন্দন-রহিত; কিন্তু মঠের সীমা অতিক্রম করিবার পরই যখন তাঁহারা গোপনে মিলিত হন, তখন তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া কত যে সুখ-দুঃখের কথার বিনিময় করেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। ভগবদ্ধামে মাতা-পুত্র, স্বামি-স্ত্রী পৃথগ্ভাবে বাস করিতেছেন; মনে হইতেছে যে, উভয়েই শ্রীধামের শরণাগত, পরস্পর আসক্তিহীন কিন্তু সেবানুরোধে (?) বা কোনও কারণে পরস্পর দূরবর্ত্তী হওয়ায় তাঁহাদের ভক্তাসক্তির প্রচ্ছন্নপটটী নানা আকারে উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। অনেকে কৃত্রিমভাবে শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার অধিকার, ব্যবহারে অকার্পণ্য প্রভৃতি, প্রদর্শন বা অভ্যাসযোগের দ্বারা আয়ত্ত বা অনুকরণ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহা রক্ষা করিতে পারেন না এবং 'ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ' হইয়া পড়েন।

এই যে কপটাচার, ইহার মূলে কি আছে? অনধিকারীকে ছলনাময়ী বা সগুণা ভক্তির উচ্চাধিকারে কৃত্রিম পন্থায় বা তথা-কথিত অভ্যাসযোগের দ্বারা আরোহণ করাইয়া এরূপ ভণ্ড প্রতিষ্ঠাশায় আসক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, সে ভয়ে, লজ্জায় বা সঙ্কোচে কৃত্রিম আত্মসম্মান বজায় রাখিবার অভিসন্ধিতে ঐরূপ মিথ্যাচার হইতে বাধ্য হইয়াছে। অপ্রাকৃত বা লৌকিক-শ্রদ্ধালুকে শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার অধিকারে কৃত্রিমভাবে আরোহণ করাইতে গেলে অনর্থযুক্ত জীব মিথ্যাচার হইতে বাধ্য হয়।

এই জাতীয় ব্যক্তি বাহিরে নির্ব্বাত-নিষ্কম্প-প্রদীপবৎ সম্পূর্ণ মৌনী, অবিক্ষুব্ধচিত্ত ও অনাসক্ত বলিয়া মনে হইলেও তাঁহার ভিতরে আন্দোলনের আগ্নেয়গিরি সক্রিয় হইয়া রহিয়াছে। ঐ নীরবতা ও নিস্তব্ধতার মধ্যে তিনি সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছেন। বহির্মুখতার যে চিরন্তন স্বভাব, সেই স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কখনও দেখিতেছেন,—'অপর ব্যক্তিকে ভোগে যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে, আমার বেলায় তাহার বাধা পড়িয়াছে।' এইরূপ বিচার করিয়া সেই ব্যক্তি কখনও ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধী, কখনও বা বিদ্বেষী হইয়া পড়িতেছেন। অবশ্য অন্যান্য দুর্ভাগ্য থাকিলেই এই সব উৎপাত উপস্থিত হয়।

স্ব-স্ব অধিকারে নিষ্ঠাই সিদ্ধির সোপান

যদি কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শতকরা ৮০ জন ছাত্র কৃতিত্ব লাভ করেন, তবেই সেই শিক্ষায়তনের মহত্ত্ব প্রমাণিত হয়; আর যদি শতকরা ৮০ জন ছাত্রই অকৃতকার্য্য হয় অথচ যদি সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের সকলেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পারদর্শিতার খ্যাতি থাকে, তবে কি স্বতঃই হৃদয়ে উদিত হয় না যে, অনধিকারী ছাত্রগণকে উচ্চ শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিবার ফলেই ঐরূপ অকৃতকার্য্যতা হইতেছে?

অধিকার নির্ণয় না করিয়া যতই কিছু সাধন-ভজনের বা মঙ্গলজনক উপদেশ-প্রদানের চেষ্টা করা হউক, তাহা হস্তিস্নানের ন্যায় সাময়িক ও নিরর্থক হইয়া পড়ে। রোগীর কেবল রোগ-নির্ণয় হইলেই বা রোগের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করিলেই তাহার কখনও রোগশান্তি হয় না, অধিকারোচিত বাস্তব চিকিৎসাও প্রয়োজন।

কেহ কেহ বলেন—'প্রকৃত ভজনকারীর সংখ্যা চিরকালই সুদুর্লভ, এজন্য বহুলোক ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের অভিনয় করিলেও তন্মধ্য হইতে দুই-একজন উত্তীর্ণ হ'ন অর্থাৎ যথার্থ ভজনে প্রবেশ লাভ করেন।' এই যুক্তির উত্তর এই যে, পোষ্টগ্রাজুয়েট বা ডক্টরের সংখ্যা খুব মুষ্টিমেয় হইতে পারে, কিন্তু যাহাদের বর্ণ-পরিচয় পর্য্যন্ত হয় নাই, তাহাদিগকে উচ্চ-শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া সাময়িক প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টার ফলে যদি শতকরা নিরানব্বই জনের পতনের ইতিহাস পরিদৃষ্ট হয়, তবে সেইরূপ অনুত্তীর্ণ ব্যক্তির সংখ্যা-দ্বারা কি জগন্নাশ হইবে না? ঐ সকল ব্যক্তির ক্রমিক মঙ্গলের পথও চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। উচ্চতম-শ্রেণীর ছাত্র বা সাধক মুষ্টিমেয় হইবেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু নিম্নতর-শ্রেণীর ছাত্রগণ কি সেই সেই শ্রেণীতে সকলেই চিরকাল অকৃতকার্য্যই হইতে থাকিবেন? স্ব-স্ব অধিকারানুযায়ি-শ্রেণীতে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াই

ক্রমে ক্রমে উচ্চতর-শ্রেণীতে আরোহণের অধিকার-লাভ হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"জীব স্বীয় অধিকারে স্থির থাকিতে পারিলেই জীবের ক্রমোন্নতি হয় এবং অধিকারচ্যুত হইলে পতন হয়।" (স তো ১০।৮, 'শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবা-মাহাত্ম্য')

ভক্তি-প্রতিষ্ঠানে যতদিন অবস্থান বা ভক্তির কথা যতদিন আলোচনা করিবার অভিনয় করিলেই বা অধিক বয়স হইলেই যে বৈরাগ্যের অধিকার হইবে, তাহা নহে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

"কেবল বয়সকে অধিকারের মূল বলা যায় না। অনেক বৃদ্ধ পুরুষ মনে মনে ভাষাগুড়ি দিয়া থাকেন। সে-সকল বৃদ্ধের যখন বৈরাগ্য হয় না, তখন বয়সকে বৈরাগ্যের মূল কারণ বলা যায় না।" —স তো ৮।১১

ভাগবতধর্মে অধিকার-নির্ণয়

শ্রীভাগবত ধর্ম-যাজনের আভাসেও পতন ও অমঙ্গল হয় না; অথচ যাঁহারা ভাগবত-ধর্মের পরাকাষ্ঠা যাজন করিতেছেন বলিয়া দাবী করেন, এরূপ ব্যক্তিগণের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনকেই অধিকাংশ সময় স্খলিত, পতিত, ভ্রষ্ট ও বিপথগামী হইতে দেখা যায়; তাহা হইলে কি শ্রীমদ্ভাগবতের কথা মিথ্যা অথবা যাঁহারা ভাগবতধর্ম যাজন করেন বলিয়া দাবী করিতেছেন, তাঁহারাই কি অন্য কিছু করিতেছেন? শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী মিথ্যা নহে। শ্রীভাগবতধর্মোপদিষ্ট অধিকারানুযায়ী পথ অনুসরণ না করায় এই সকল অনর্থ ও উৎপাতের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাগবতধর্মে যাজন ও পতনের আশঙ্কা নাই বটে, কিন্তু তাহাতে অধিকারের বিচার আছে।

যাহার কর্মকাণ্ডে কিংবা কর্মার্পণে অধিকার, তাহাকে তথাকথিত ভজনকামী বা শুভেচ্ছাবাদী হইয়া অকিঞ্চনা ভক্তি বা শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার অধিকারী সাজাইয়া দিলে বিপথগামীই করা হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত এই অধিকার-লঙ্ঘনকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীনারদ-গোস্বামী নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ হইয়াও লোকশিক্ষাকল্পে নিজ পূর্বজন্মের অধিকারোচিত সাধনলীলার কথা নিজ শিষ্য শ্রীব্যাসদেবের নিকট বর্ণন করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। কোনও শুভেচ্ছাবাদীই অধিকার লঙ্ঘন বা অপরের কৃত্রিম অনুকরণ করিয়া একলম্ফে বিদ্যাগতিতে অকিঞ্চনা রাগময়ী ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সমস্তই মহতের কৃপা ও সাধকের কৃপাশক্তিধারণ-যোগ্যতার উপর নির্ভর করে।

শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু গুরু ও শিষ্য উভয়েরই যথাক্রমে কৃপা-শক্তি-সঞ্চার-সামর্থ্য ও তদ্ধারণ-সামর্থ্যের তারতম্যানুসারে ফললাভের তারতম্যের নির্দেশ করিয়াছেন। অকিঞ্চনা ভক্তির দাতা ও গ্রাহক—গুরু ও শিষ্য উভয়েই লোকে দুর্লভ। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপের একান্ত অনুগবর অকিঞ্চনাগ্রগণ্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা বরণ করিবার অধিকার হইতে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অনুকরণ করিয়া সেই অকিঞ্চনা সুতীব্রা রাগময়ী ভক্তি-লাভের অধিকার হয় না। সাধারণ জীব অতি প্রাথমিক ভাগবত-ধর্ম বা কর্মার্পণের পথে যাহাতে চলিতে শিক্ষা করে তজ্জন্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু সেই কর্মমিশ্রাধিকারে গৃহি-গুরু-গ্রহণের ব্যবস্থা (হ ভ বি ১।৩১) পর্য্যন্ত দিয়াছেন। সর্বোহারা নিষ্কিঞ্চনশ্রেষ্ঠ শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্ম জীবের প্রতি যে তীব্র আবেশময় ভক্তি-যোগের উপদেশ প্রদান করেন তাহা সেরূপ অকৃত্রিম অধিকারীই অসঙ্কোচে সৌভাগ্যফলে বরণ করিয়া কৃতার্থিত হন। দেখাদেখি অনুকরণ করিয়া বা 'শুনিতে বড় ভাল' এইরূপ মনোভাবে চালিত অনধিকারী হইয়া উচ্চ অধিকারের অনুকরণ করিলে, লৌকিক শ্রদ্ধালু হইয়া শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধাধিকারীর ন্যায় অভিনয় করিলে, কর্মাধিকারী বা কর্মমিশ্র-অর্চনাধিকারী হইয়া অকিঞ্চনা ভক্তি-যাজনের লজ্জা গ্রহণ করিলে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী।

অতএব শ্রীভক্তিসম্বন্ধে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীরূপের শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর (পূ ২।৩৮) সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন,—"অতএব কর্মার্পণ-কেবলজ্ঞান-কেবল-ভক্তযোহ-বিকারিভেদেন ব্যবস্থাপিতাঃ; ততঃ স্বাধিকারানু-সারেণৈব স্বাতন্ত্র্যমিত্যাহ—'যে যেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ' ইতি" (ভ স ১১৪-১১৫ অনুচ্ছেদ): অর্থাৎ অধিকারিভেদে কর্মার্পণ, কেবল-জ্ঞান ও কেবল-ভক্তি ব্যবস্থাপিতা হইয়াছে। অতএব নিজ নিজ অধিকারানুসারেই অবস্থান করা কর্তব্য। এই হেতু শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—'নিজ নিজ অধিকার-বিষয়ে যে নিষ্ঠা, তাহাই গুণ বলিয়া কীর্তিত হয়।'